সাহিত্য সাধনার ধারা
বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা

প্রভাতকুমারের সাহিত্য সাধনার কালসীমা ১২৯৭ সাল থেকে ১৩৩৮ সাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখাতেই তাঁর বিচরণ। সর্বত্র সমান দক্ষতা দেখাতে না পারলেও তিনি কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, অনুবাদ ও প্রহসনের চর্চা করে গেছেন। তাঁর সাহিত্য অনুশীলনের বৈচিত্র্য এর ভেতর দিয়ে অনুভব করা যায়। প্রভাত-সাহিত্যের বিশিষ্টতার অনুধাবন তাঁর রচনাবলীর বিশদ পর্য্যালোচনা সাপেক্ষ। পর্যায়ক্রমে কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, অনুবাদ ও প্রহসন প্রভৃতির আলোচনার মাধ্যমে অতঃপর সেই প্রয়াসে অগ্রসর হওয়া সমীচীন। প্রসঙ্গতঃ তাঁর ভাষা ও রচনারীতির আলোচনা হওয়াও বিধেয়। কবিতা রচনার মাধ্যমে যেহেতু প্রভাতকুমারের সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত, বর্তমান আলোচনাও তাই কবিতা দিয়ে শুরু করে উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, অনুবাদ, প্রহসন এই পর্যায়ে এগিয়ে যাবে। প্রসঙ্গতঃ অপর একটি অধ্যায়ে তাঁর ভাষা ও রচনারীতির আলোচনাও সংযোজিত হয়েছে।

—: কবিতা :—

কবিতা রচনার মাধ্যমে প্রভাতকুমার সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করলেও খুব বেশী দিন তিনি কাব্য চর্চা করেন নি । তাঁর প্রথম কবিতা রচিত হয়েছিল ১২৯৬ সালে ।রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন 'আমার প্রথম কবিতা ২৬শে বৈশাখ ১৩৯৬ সালে লিখিয়াছিলাম ...'.[১] কবিতাটি পত্রমধ্যেই রয়েছে, কবিতাকারে কোন মাসিক পত্রে প্রকাশ লাভ করেনি । তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'চির নব', কার্ত্তিক ১২৯৭ সালে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । এরপর বেশ কিছুদিন তাঁর কবিতা রচনার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না অবশ্য তিনি যে কবিতা রচনা থেকে বিরত থাকেননি রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিপত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায় । 'কবিতায় আমার প্রথম উদ্যম একটু ভাল হইয়াছিল , তাই আমি পুন: পুন: চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় , চতুর্থ ইত্যাদি উদ্যমগুলি এক বৎসর ধরিয়া এত খারাপ হইয়াছিল যে, কি আর বলিব। '[২] রবীন্দ্রনাথকে আরও জানিয়েছেন —' ১২৯৭, ৯৮, ৯৯ এই তিন বৎসরের কবিতা আমার পুস্তকের আকারে লেখা আছে , যদি আপনার অনুমতি পাই, তবে আপনাকে পাঠাই, আপনি অবসর সময়ে দেখিবেন — যতদিনে হয় ফিরিয়ে দিবেন, কারণ আমার হাতে ৫০ টাকা হইলে তাহার একশত খণ্ড গোপন প্রচারের জন্য মুদ্রিত করিব — তাহার এখনও অনেক বিলম্ব আছে ।'[৩] XX ১৩০২ সাল থেকে বিভিন্ন মাসিক পত্রে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে । 'ভারতী' ও 'প্রদীপ' পত্রিকায় তাঁর অধিকাংশ কবিতা প্রকাশিত হয় , অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে 'দাসী' এবং 'মানসী' পত্রিকায় কিছু কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। মুখ্যত: 'ভারতী' পত্রিকাতে তাঁর কাব্যরচনার নিদর্শন রয়েছে এবং এখানেই ১৩০২ থেকে ১৩০৭ সালের মধ্যে অন্যূন চব্বিশটি কবিতা প্রকাশিত। ১৩০৭ সালের পর তাঁর কবিতা রচনার নিদর্শন আর পাই না । বহুদিন পর 'মানসী' পত্রিকায় বৈশাখ, ১৩১৮ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ সালে যথাক্রমে 'কবি - গীতি' ও 'অন্বেষণ' নামে দুইটি কবিতা এবং গদ্যে - পদ্যে রচিত একমাত্র প্রহসন 'সুম্মলোম - পরিণয়' শ্রাবণ, ১৩২২ থেকে আশ্বিন, ১৩২২ সাল 'মর্ম্মবানী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । 'ভারতী পত্রিকার শেষ পর্য্যায়ে (১৯১৫ — ১৯২৩) যখন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সেই সময়ে বৈশাখ, ১৩২৩ সালে 'গাজিপুরে গোলাপক্ষেত্র' নামে প্রভাতকুমারের একটি কবিতা প্রকাশিত হয় অবশ্য কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। কবিতাটি সম্পর্কে 'ভারতী'র তদানীন্তন সম্পাদকদ্বয়কে প্রভাতকুমার লিখিছিলেন —

' ভারতী সম্পাদক মহাশয়গণ সমীপেষু । আপনারা জানেন কি না বলিতে পারি না, পূর্বে আমি একজন কবি ছিলাম এবং সে কালে 'ভারতী'তে আমার বহু কবিতা ছাপা হইয়াছিল। ভারতীর চত্বারিংশত্তম জন্মদিন উপলক্ষে, ভারতীর পুরাতন

লেখক হিসাবে আমার কাছেও আপনারা লেখা চাহিয়াছেন। নিম্নে যে কবিতাটি পাঠাইলাম , তাহা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রচিত। কবিতাটি ভারতীতে পাঠাইবার জন্য নকল করিয়া রাখিয়াছিলাম, এমন সময় নূতন ভারতী আসিলে মোড়ক খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের গাজীপুর শীর্ষক একটি কবিতা বাহির হইয়াছে । তাহাতেও গোলাপ ক্ষেত্রের বর্ণনা রহিয়াছে । (আপনারা সেটি দেখিয়াছেন কি ?- না আপনারা উভয়েই তখন বোধ হয় অতি বালক) দেবেন্দ্রবাবুর সে কবিতার তুলনায় আমার কবিতাটি হংসপার্শ্বে বকোযথার মত আমার মনে হইল , তাই সেটি আর ভারতীতে পাঠাই নাই । —লেখক(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)।'

কবিতা যে প্রভাতকুমারের প্রতিভার স্বক্ষেত্রনয় একথা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, তাঁরই নির্দেশে প্রভাতকুমারও গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ধীরে ধীরে সেই পথেই বাংলা সাহিত্যে প্রভাতকুমারের প্রতিষ্ঠা এসেছিল ।

ভাবৈশ্বর্যে অথবা শিল্প প্রকরণে বাংলা কবিতার আসরে প্রভাতকুমারের এমন কোন অবদান নেই যা থেকে তাঁকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রভাতকুমার যে কবি ছিলেন হয়ত বা আধুনিককালের অনেক পাঠক সে কথা বিস্মৃত হয়েছেন। ~~প্রভাত~~ তাঁর অধিকাংশ কবিতাকে গীতিকবিতা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে – কিন্তু সার্থক গীতিকবিতা সৃষ্টিতে যে অন্তর্মুখী কল্পনা, একান্ত আত্মপরায়ণ ভাবের প্রয়োজন প্রভাতকুমারের প্রতিভায় সেই নিগূঢ় মননের অভাব ছিল । তাছাড়া অল্প বয়সে রচিত বলে ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে গীতিকবিতায় যে কাব্য ভাষার প্রয়োজন প্রভাতকুমারের সেটিও ছিল অনায়ত্ত । তবে সহজ সরল ভাবের প্রকাশ সহজ ভাবে ঘটিয়ে কয়েকটি কবিতায় চমৎকারিত্ব এনেছেন ।ভাবরসের দিক থেকে বিচার করলে তাঁর কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারএবং রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি অগ্রজ কবিদের প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী কবিতাগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করে দেখা যেতে পারে ।

(১) প্রেম - প্রীতি বিষয়ক :— অবসান, কামনা, একটি প্রার্থনা, অনন্ত শয্যা, প্রেমের সৌরভ, তার নাম , পরলোকতত্ত্ব, নাম লেখা, অন্বেষণ , ছবি জন্ম, আদর , একটি জ্যোতিষিক প্রশ্ন , জন্মান্তরে, মিলনান্তে, ব্যাপ্তি, মঙ্গলগ্রহ ~~এবং~~ সে আমার, এবং বর্ণমালা ।

(২) প্রকৃতি বিষয়ক :— চির নব, কবি-গীতি, কেন অভিমান, গাজিপুরে ~~[illegible]~~ গোলাপ ক্ষেত্র , অতৃপ্তি , ছবি, শেষদান ।

(৩) তত্ত্ব বিষয়ক :- মহাযাত্রা , মায়াবাদ ,

(৪) গাথা কবিতা :- হোলি-কাহিনী , অকাল মৃত্যু

(৫) অনুবাদ বা ভাবানুবাদ কবিতা :— অতিথি, আকাশ কেন নীল, দেবদূত ও বিক্রমাদিত্য, কবির চান্দ্রবিজ্ঞান, করযোড়ে করি প্রার্থনা তোরে, প্রেম ও আশা, নাম লেখা, প্রেমপঞ্জিকা, এসেছিল গিয়েছে চলিয়া।

(৬) ব্যঙ্গ ও লঘুরসের কবিতা :— অভিশাপ, কাব্যবিজ্ঞান।

(৭) মাতৃভাষা প্রীতি বিষয়ক :— উদ্বোধন, মাঙ্গলিক,

(৮) বিবিধ :— সেকালের প্রতি, আলোক, মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রতি, চন্দ্রের আক্ষেপ। কবিতা হরিণী, একটি কুকুরের প্রতি।

(১) প্রেমপ্রীতি বিষয়ক

প্রভাতকুমার মুখ্যত প্রেমের কবি। মানব - মানবীর সর্বকালের সর্বানুভূতির মধ্যে প্রেমানুভূতিই প্রবল — কিন্তু সাহিত্যে সেই অনুভূতির প্রকাশে যুগে যুগে প্রকারভেদ দেখা যায়। বৈষ্ণবীয় প্রেমের আধ্যাত্মিকতা অথবা কবি-গানের প্রেমচিত্রণে স্থূলতা এই উভয় পথ বর্জন করে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্য প্রেমচিত্র বিশ্লেষণে ও রূপায়ণে এক নূতন পথের সন্ধান পেয়েছে। দেশময় এক নবজাগরণের সাড়া পড়ে যাওয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিমন প্রেমের সহজ সরল অনাড়ম্বর প্রকাশে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। 'ইহার রহস্যময় অনুভূতিকে নানা জটিল ভাবগ্রন্থির মধ্য দিয়া, নানা দুষ্প্রবেশ্য বনবীথির স্বপ্নালোকিত অবসর পথে, জীবনের দুশ্ছেদ্য প্রশ্নসঙ্কুলতার আবরণ জালের অন্তরালে অনুসরণ করাতেই ইহা তৃপ্তিলাভ করে।'[৪] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানবীয় প্রেমের সুরুচিশীল পরিচ্ছন্ন প্রকাশ এই শতাব্দীর বাংলা কবিতায় দেখা যায় অবশ্য ইংরেজ কবি শেলী, কীট্‌স ও বায়রণের প্রভাব এক্ষেত্রে অস্বীকার করার উপায় নাই। নারী রূপ তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেম কবিতার সূচনা হয়েছে মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে এবং সে ভাব পল্লবিত হয়েছে — দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কবিদের সার্থক কবিতার মধ্য দিয়ে। মধুসূদনের 'সখী', গোবিন্দ চন্দ্র দাসের 'রমনীর মন', 'পরনারী', 'শত্রু' ইত্যাদি, দেবেন্দ্রনাথ সেনের — 'অশোকফুল,' 'বকুল' 'যাদু করি এত যাদু শিখিলি কোথায়,' 'দাও দাও একটি চুম্বন' প্রভৃতি কবিতা মানসিক আবেগ সমৃদ্ধ। রূপতৃষ্ণা ও দেহানুগত্য থাকা সত্ত্বেও স্থূল লালসা মুক্ত। অবশ্য সর্বত্র মাঝে মাঝে সংযমের মাত্রার বল্গা আল্গা হয়ে গেছে। এইসময়ে একইসাথে দেখতে পাই আদর্শায়িত আদর্শায়িত প্রেম কবিতার রূপায়ণ। বাস্তব জগতের উর্দ্ধে যে কল্পলোক সেই কল্পনার জগৎ হয়েছে কবির আদর্শ ভূমি সেখানেই কবিপ্রেয়সীর জন্মভূমি এবং ভাব কল্পনায় হয়েছে তার বন্দনা। এই আদর্শ প্রেম কবিতার সূচনা বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সঙ্গীত শতক' কাব্যে 'প্রেমপ্রবাহিনী' এবং 'সারদা মঙ্গল' কাব্যেও তার পরিচয় আছে। অবশ্য সর্বত্র কল্পনার সঙ্গে সার্থক

প্রকাশের সার্থক রূপায়ণ ঘটেনি। ডা: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডা: শ্রীঅরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় এই আদর্শায়িত প্রেম কবিতার কয়েকটি উপবিভাগ করেছেন — 'নারী বন্দনা , নারীপ্রেমের তত্ত্ব ও মাধুর্যের আলোচনা, নারীরূপের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা।'[৫] এই নারী বন্দনার কথা বলেছেন বিহারীলাল 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে, সুরেন্দ্রনাথ 'মহিলা' কাব্যে, দেবেন্দ্রনাথ 'নারী মঙ্গল' কবিতায়, অক্ষয়কুমার 'এষা' কাব্যে এবং রবীন্দ্রনাথ 'মণিকা', 'বলাকা', 'মহুয়া' ইত্যাদি কাব্যে । নারীপ্রেমের তত্ত্ব ও মাধুর্যের কথা আলোচিত হয়েছে বিহারীলালের 'নিশান্ত সঙ্গীত' 'নিশীথ-সঙ্গীত' ইত্যাদি কবিতায় । নারীর রূপপিপাসার তীব্র আর্তি থেকে আদর্শ প্রেমলোকে উত্তরণ ঘটেছে দেবেন্দ্রনাথের 'পরশমণি', 'দীপ হস্তে যুবতী', 'প্রথম চুম্বন' ও 'শেষ চুম্বন' ইত্যাদি কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের সুরদাসের প্রার্থনা কবিতায় সুরদাস নারীর রূপ-পিপাসায় অধীর আঁখির অসহ্য আবেগে বলেছে —

" সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও
জ্বালাময় দুটি চোখ,
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার
সে আঁখি তোমারি হোক ।"

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলা কবিতার রাজ্যে নারী-প্রেম-ভাবনার যে বিভিন্ন স্তরগুলি আমরা জানতে পারি; প্রভাতকুমারের প্রেম ভাবনা মূলক কবিতা আলোচনায় দেখা যাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসমস্ত ভাবের প্রতিফলন সেখানে ঘটেছে ।

প্রভাতকুমারের বয়স তখন সবেমাত্র সতেরো। কৈশোরাতিক্রান্ত কবিমনে নারীরূপ দর্শনে যে বিহ্বলতা জেগেছিল সেই ভাবাবেগ তাঁর প্রথম কবিতা রচনায় প্রেরণা দিয়েছে । কবিতাটি এই —

' কি ক্ষণে দেখিনু তোরে ,
হরে নিলি প্রাণ মন ?
জনমে ভুলিব কিরে
সে হাসি মাখা আনন ?
কেন বা হেরিনু তোরে ?
কি ফল লভিনু হায় ?
পুন: চাহি হেরিবারে
প্রাণ সদা তোরে চায় ।
প্রাণ কেন চায় তোরে ?
কেন ভাবি দিবানিশি ?

কেন বা মনেতে পড়ে

সে চারু বদন হাসি ?

কিছুই না বুঝিতে পারি ,

আশাতে বাঁধিয়া বুক ,

তোর নাম গান করি

আমার অমিত সুখ ।' [৬]

(রচনাকাল ২৬শে বৈশাখ ১২৯৬)

স্পষ্টতই প্রেমিয়মান কবি এখানে নারীর 'হাসি মাখা আনন' দেখে বিমোহিত এবং বার বার সেই 'চারু বদন হাসি' দেখবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছেন কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি কেন তার এই তীব্র রূপ পিপাসা । তবে নারীরূপ যে তার প্রাণ মন হরণ করেছে একথা কবি অনুভব করেছেন ।

'কামনা' [৮] কবিতায় দেখি কবি নারীরূপ চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন । দিবাভাগে চেতনার আলোকে সর্বক্ষণ তাকে চিন্তা করেছেন এবং সেই চিন্তায় তিনি তীব্র সুখ অনুভব করছেন । কিন্তু কবির দুঃখ রাত্রিকালের সুপ্তি তার সেই সুখানুভতি হরণ করে। কবিমন চেয়েছে —

' চেতনা আমার আছেই তাহার

অনুক্ষণ

সুষুপ্তি চাহি করিতে মাত্র

তার স্বপন ।'

মগ্ন চৈতন্যেও কবি নারীরূপমাধুরী অনুভব করতে চেয়েছেন ।

' মিলনান্তে' [৭] কবিতায় মিলনের মধ্য দিয়ে কবির রূপপিপাসা অবসিত। 'নিমেষবিহীন হয়ে আপনা ভুলিয়া' কবি আর নারীরূপে আকৃষ্ট হন না । নারীর কণ্ঠস্বর বা স্পর্শনে তিনি আর পাগল হয়ে ওঠেন না । অবশ্য এই নিরুদ্বেগ অবস্থা মিলনের গভীর আনন্দ সঞ্জাত বলেই কবি অনুভব করেছেন।

' তার হাসি, তার কথা, মোহন চাহনি

তীব্র মদিরার মত দিবস রজনী

করি'পান আছি ঘোর উন্মাদনা জ্বরে ।'

কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন বিরহহীন মিলন প্রিয়া অস্তিত্বেও যেন অবসাদ এনেছে। বিচ্ছেদহীন মিলন সেই যতই সুখদায়ক হোক না কেন বৈচিত্র্যের অভাবে কবিমনে

একঘেয়ে হয়ে পড়েছে।

মিলনের মধ্য দিয়ে নারীরূপ-পিপাসা ক্রমে ক্রমে কবিমন থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। প্রেমের মাধুর্য্যে কবি-মন আকৃষ্ট হয়েছে। এখন থেকে রূপতৃষ্ণা তিরোহিত হয়ে সেখানে ফুটে উঠেছে সত্যকারের অবিনাশী প্রেমে বিশ্বাস। 'প্রেমের সৌরভ' [৯] কবিতায় কবি বলেছেন —

' একরতি পরিমান মৃগনাভি যদি
কক্ষেতে রাখিলে,
বিংশতি বৎসরকাল সেই কক্ষ মাঝে
সে সুগন্ধ মিলে ;
আমার অন্তর কক্ষে রহিয়াছে যাহা
— প্রেম সুমধুর —
কোটি কোটি জন্ম তাহা আমার বিশ্বাস
রাখিবে এ হৃদিখানি গন্ধে ভরপুর।'

আপন হৃদয়ে সৌরভময় প্রেমের জাগরণে কবি-হৃদয় ধন্য হয়েছে। রূপকে অবলম্বন করে রূপাতীতের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। এই প্রাপ্তিতে কবিমন হয়ে উঠেছে ~~রোম~~ রোমান্টিক। তাই কবি বর্ণনায় যখন কোন পবিত্র কোমল প্রণয়ের চিত্র দেখতে পান তখন তিনি মনে মনে কল্পনা করেন সেই প্রেম কাহিনীর নায়ক তিনি স্বয়ং এবং নায়িকা তাঁরই প্রিয়তমা। বাল্মীকির কাল থেকে কাব্য রাজ্যে যে মহাশুভ প্রেমনীতি প্রচারিত হয়ে এসেছে, যে প্রেম লক্ষকোটি কবির হৃদয় মথিত করেছে সে সবকিছুতেই তাঁরই প্রেমের অবিনাশী অস্তিত্ব অনুভব করেছেন।

এই রোমান্টিক কল্পনায় কবি ধূলি ধূসরিত এই পৃথিবী ছেড়ে পাড়ি দিয়েছেন মঙ্গল গ্রহে। 'মঙ্গল গ্রহ' [১০] কবিতায় কবি কল্পনা করেছেন সেখানকার প্রকৃতি যদি 'স্বাদে রূপে গুণে' এই পৃথিবীর মতই হয় অথচ কোথাও কোন মানব বসতি নেই তাহলে কবির কামনা —

' জন্মান্তরে আমরা দুজনে
সেখানে বাঁধিব ঘর।

প্রেম চেতনাকে কবি এই জন্ম থেকে জন্মান্তরে উত্তরণ ঘটিয়াছেন, পূর্ণ রোমান্টিক দৃষ্টিতে 'মঙ্গলগ্রহ' কবিতায় কবি ভেবেছেন —

' প্রকৃতি যেখানে বিছায়ে রেখেছে
মোহন মাধুরী জাল ,
প্রবল সেখানে বসন্ত আর
বর্ষাকাল ,
ফলের ফুলের তরু অসংখ্য ,
গিরির গায়
নিকটে ক্ষুদ্র স্বচ্ছ তটিনী
সতেজ বহিয়া যায় ।
এমন একটি নিভৃত - আলয়
যতনে অন্বেষিয়া ,
লতা পাতা ফুলে রচিব কুটীর
দোঁহে মিলিয়া।
আদিম মানব আদিম মানবী
মোরা দুজনে ,
যুগ যুগ ধরি করিব বসতি
সে নব ইডেন বনে ।'

এখানে দেখতে পাই কল্পনায় তিনি গ্রহান্তরে প্রস্থান করলেও তাঁর প্রেম ভাবনা কিন্তু মানবীর দেহ থেকে বিচ্যুত হয়নি । তার প্রিয়াকে পাশে রেখেই নব ইডেন পরিকল্পনার ইমারৎ গড়ে উঠেছে । ১১

' সে আমার' কবিতায় এই প্রেম চেতনা ব্যক্ত হয়েছে দিনেরাতে, শুধু বসন্তে নয় সর্ব ঋতুতে, সুখে, দুঃখে, সঙ্গীতে, অশ্রুধারায়, যৌবন থেকে জরায়, ইহজীবন থেকে পর জনমে, এই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। সেখানে কবি তৃপ্ত হননি এই প্রেমানুভূতিতে সৌরজগৎও তার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে

'.. সৌরজগতেরো নহে সে কেবল
সে আমার সারা বিশ্ব ময় !!'

কবি তার প্রিয়া- প্রেমকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে অপার আনন্দ অনুভব করেছেন। প্রেমের সে আনন্দ কবি মনে এত গভীর - গূঢ়, ভাষা ও ছন্দে সে আনন্দ প্রকাশের ক্ষমতা তার নেই ।

' যে আনন্দ প্রাণে উঠিছে উছলি
প্রকাশিব তাহা কেমনে ?
ক্ষমতা আমার বালু কণা শুধু

ভাব হিমালয় তুলনে।'

কবিমন প্রেমের ব্যাপ্তিতে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যতই বিচরণ করুক না কেন মনটি কিন্তু তার ধরনীর প্রিয়া মূর্তির মাঝে বাঁধা পড়ে আছে। এবং সেই মানসী প্রিয়ার নিকট সান্নিধ্যে কবি সন্তুষ্ট নন — তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে হৃদয়ের মাঝখানে প্রিয়ার অস্তিত্ব অনুভব করতে চেয়েছেন —

'সে আমার কাছে আছে, তবু যদি দুইটি হৃদয়
দুজনার বাহুপাশে প্রাণ পণে বাঁধা না রহিল,
সমুদ্রের কূলে বসি তবু যদি তৃষ্ণা না মিটিল,
তবে যেন এ মিলন একেবারে বৃথা মনে হয়।
দেবতা নহিত মোরা, অত নাহি সহা যায় প্রাণে,
খেলা থাক, আয় বালা, আয় আয় হৃদি মাঝখানে।'
(অনন্ত শয্যা' ১২)

প্রিয়া - প্রেমের আনন্দানুভূতির মধ্য দিয়ে কবি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন ঈশ্বরকে। বিশ্ব পিতাকে তিনি কোনদিন দেখেননি কিন্তু কবি মনে বাসনা জেগেছে,'ভক্তি দিয়ে প্রেম দিয়ে' হৃদয় ভরে একবার তাঁকে পূজা করার। 'একটি প্রার্থনা'য় [১৩] আবেদন জানিয়েছেন —

'কহ নাথ কহ নাথ, কোথা দেখা দিবে,
কি মূরতি গ্রহণ করিয়া
কি বাসে আবরি অঙ্গ, কোন কন্ঠস্বরে
চিত্তে দিবে সুধা সঞ্চারিয়া ?'

কবিমনের ইচ্ছা —

'আমি কহি এস তুমি, তার রূপ ধরি,
যে আমার প্রণয় প্রতিমা।
তা হলেই আঁখি মোর ডুবিবে তোতে
নাহি লভি সৌন্দর্য্যের সীমা
তা হ'লেই হৃদয়ের সারভক্তি প্রভু
দিতে পারি চরণে তোমার।
তা হ'লেই হৃদয়ের সারাৎসার প্রেম
দিতে পারি পূজা-উপহার।'

রবীন্দ্রনাথ যেমন দেবতাকে প্রিয়ের মধ্যে অনুভব করেছেন প্রভাতকুমারের কবিমনও তেমনিভাবে চেয়েছে তার প্রণয় প্রতিমার মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে। রূপের মধ্যেই তিনি চেয়েছেন অরূপের আস্বাদন । কিন্তু অরূপের আস্বাদন করতে চাইলেও কবিমন বাস্তব জগতের মায়া মমতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি । বরং লক্ষ করি এই পৃথিবীর মানসীকে ছেড়ে যেতে তাঁর মনে বিয়োগ ব্যথার গুঞ্জরণ । কবি জন্মান্তরে বিশ্বাসী, কবির ধ্যানে প্রেম অবিনশ্বর। জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর প্রেয়সীকে লাভ করবেন এ বিশ্বাস তাঁর রয়েছে । তবুও কবি আক্ষেপ করেছেন —

' শব্দ সাগরে একটি মাণিক
নিবিড় মধুর নামটি তার ,
তাহা তো কিন্তু এ জনম সাথে
চলে যাবে হায় পাবনা আর !'

(তার নাম).[১৪]

কবি জ্ঞানত: অনুধাবন করেন 'জানি আমি নাম তুচ্ছ — কিছু না' কিন্তু তাঁর প্রেম বিকশিত হয়েছে দেহ এবং হৃদয়কে ঘিরে । তাই দেহকে ভালবাসতে গিয়ে নামটিকেও ভালবেসে ফেলেছেন ।দেহান্তরে প্রেম রইলেও , নামান্তরে তার কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে ।

মানব প্রেমে গভীর বিশ্বাসী কবি লিখেছেন —

' আমরা পৃথিবী ছাড়ি চলিয়া যে আসি , —
যত কিছু সেখানকার ,
দেহ ও বাসনাভার ,
চিতানলে হয়ে যায় ভস্মরাশি রাশি ।
শুধু থাকে হেমবৎ প্রেম অবিনাশী ।'

(পরলোকতত্ত্ব) [১৫]

প্রেমের অবিনাশী সত্ত্বাকে স্বীকার করলেও বাস্তবের 'দেহ ও বাসনাভার' কবি-হৃদয়কে মুগ্ধ করেছে বার বার। কল্পনার ডানায় ভর করে পরলোকে কবি-আত্মা প্রস্থান করেছে । সেখানকার 'প্রাণমনোরম কুসুম - বাটীকা'র 'মনোরম শোভা' মনমাতানো চন্দনের গন্ধ নিতান্ত দুর্লভ, রাজআকাঙ্খিত' সুখদ্রব্য যেগুলি অতিবড় বিলাসী 'স্বর্গাদপি প্রিয়' বলে মনে করবে এ সমস্তের মধ্যে অবস্থান

করা সত্ত্বেও 'এ জন্মের প্রেয়সীবালার মধুনাম' তিনি ভুলতে পারেননি। বরং 'ছবি জন্ম' [১৬] কবিতায় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন প্রেয়সীকে চুম্বন করতে গিয়ে তিনি যদি ছবি হয়ে যান —

' তাহলে ত চিরদিন অধরে অধর মিলি
এই মত রবে ,
মুহূর্তের মুখসুধা পান করি, অনন্তেও
শেষ নাহি হবে ।
মানব জনমে যাহা কভু হইবার নয় ,
অসম্ভব অতি ,
ছবি জনমেতে যদি তাহা হয় আহা সেই
— সেই — পরাগতি ।'

নারীর দেহ-রূপলাবণ্যকে কেন্দ্র করেই কবি-মনে প্রেম ভাবনা জেগেছে এবং মিলনের আনন্দ, বিরহের ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে সেই প্রেম তিয়াষা ক্রম পর্যায়ে শুদ্ধ হয়ে প্রেমের অবিনাশী শক্তি কবি মনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

নারীভাবনাকে কেন্দ্র করে' আদর' [১৭] কবিতাটি রচিত। কবি - মানসীকে কি ভাবে - রূপে সোহাগ জানাবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি ; কারণ তার মনে হয়েছে যে অনুভূতি অতি অন্তর অন্তরঙ্গ এবং সূক্ষ্ম , জড় জগতের কোন কিছুই সে অনুভূতি প্রকাশে অক্ষম। তাই কবি জানিয়েছেন —

'পুষ্পবিহীন পরিমল যত
ভাবেতে আকুল প্রাণ
ধরিতে পাইনা ছুঁইতে পারিনা ,
কেমনে কী করিব দান ।'

(আদর)

'একটি জ্যোতিষিক প্রশ্ন' [১৮] কবিতায় কবির আকাঙ্ক্ষা — আকাশের গ্রহ-তারার এমন সমাবেশ হোক যাতে মনে হবে রাত্রি যেন স্বর্ণরেখা দিয়ে তার প্রিয়তমার নাম সেখানে লিখে রেখেছে । 'জন্মান্তরে' [১৯] কবিতায় — আকুলভাবে পুনর্জন্মে ইহজন্মের প্রিয়াকে দেখার বাসনা ব্যঞ্জিত হয়েছে ।

'বর্ণমালা' [২০] কবিতায় কবির অভিপ্রায় আমাদের বাঙ্গলা ভাষার বর্ণমালা যদি জীবদেহ ধারণে সক্ষম হত তাহলে কবি যে কয়েকটি বর্ণে

' তার নাম লেখা যায়,
আপনার রক্ত দিয়া,
অস্থি দিয়া মাংস দিয়া, '

সেই কয়েকটিকে সঞ্জীবিত করে নিতেন। এবং সেই বর্ণমালা কয়েকটিকে তিনি নিজ প্রাণ সম রক্ষা করতেন।

প্রভাতকুমারের প্রেমের কবিতাগুলিতে প্রধানত: এই ধূলি ধূসরিত বাস্তব জগতের [illegible] মানবী প্রেমের স্বরূপ প্রকটিত। মানুষী প্রেমের আস্বাদনের নিগূঢ় ইচ্ছা বিভিন্ন ভাবে রূপে প্রকাশিত। অবশ্য মাঝে মাঝে তাঁর প্রেমচিন্তায় জন্ম থেকে জন্মান্তরে, ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীত উত্তরণের আগ্রহ থাকলেও সেই ভাবনার স্থায়িত্ব তাঁর মনে ক্ষণিকের। বরং বলা যায় এই উত্তরণের চেষ্টা স্থায়ীভাবরূপে দানা বাঁধেনি। কবির প্রেম চিন্তায় কোন স্থূলতার প্রকাশ না ঘটলেও, আদর্শায়িত ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের ব্যঞ্জনাও অনুপস্থিত।

(২) প্রকৃতি ভাবনা।

নিত্যদিনের সূর্যোদয় সূর্যাস্তে আকাশের রং ফেরা, ঋতুতে ঋতুতে তরু লতা পাতার রূপ পরিবর্তন, আকাশের পূর্ণচন্দ্রশোভা চিরকাল মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। কবিমনের এই সৌন্দর্যপ্রীতির পরিচয় রয়েছে সংস্কৃত থেকে শুরু করে আধুনিক কাব্য কাল পর্যন্ত। কিন্তু প্রকৃতি বর্ণনা অথবা চিন্তায় যুগ বিশেষে যে তারতম্য এসেছে তা লক্ষণীয়।

বৈষ্ণব কাব্যে প্রকৃতি 'রূপকাত্মক নিসর্গচিত্র মাত্র,' আধ্যাত্মিক অনুভূতির কাব্যময় প্রকাশ বলে বৈষ্ণব কাব্যে প্রকৃতির ভূমিকা সঙ্কুচিত, প্রকৃতি সেখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পটভূমি মাত্র। ঈশ্বরগুপ্তের ঋতু বর্ণনায় ব্যবহারিক সুখ-দু:খের কথা রয়েছে। মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর 'দেবদোল' 'বটবৃক্ষ' বিজয়াদশমী' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা ছাড়া অন্যত্র প্রকৃতির যে বর্ণনা রয়েছে তা আন্তরিকতার স্পর্শহীন, আলঙ্কারিক প্রয়োগ মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে, মানব - চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে বাংলার কাব্যাকাশে প্রকৃতির প্রথম পরিচয় পাই বিহারীলালের 'সঙ্গীত-শতক' কাব্যে, যেখানে তিনি বলেছেন — ' প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি রমনী সনে, যাহার লাবণ্যচ্ছটা

মোহিত করেছে মনে'। এই আত্মলীন নিসর্গ চেতনার সার্থক কাব্যরূপ —বিহারীলালের 'নিসর্গ - সন্দর্শন' ও 'বঙ্গসুন্দরী', পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'সারদামঙ্গলে' ও 'সাধের আসন' কাব্যে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবিতাবলী' এই চিন্তাধারার বাহক। প্রকৃতিকে প্রাণ ময়ী রহস্যময়ী অথবা প্রেয়সী ভেবে তার সঙ্গে হৃদয়ের গভীর যোগ স্থাপনের চেষ্টা রোমান্টিক চিন্তাধারার ফসল এই চিন্তাধারাকে অবশ্য ইংরাজী সাহিত্যের পাঠ অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে প্রকৃতি চেতনার যে বিকাশ লক্ষ্য করা যায় সাধারণ ভাবে সেই চিন্তা ধারাটি চারটি ধারায় প্রবাহিত — (১) প্রকৃতির রূপ বর্ণন (২) প্রকৃতির মাধ্যমে নীতিকথা প্রকাশ (৩) প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ (৪) প্রকৃতির অনুভূতিশীলতা

প্রাণের সমস্ত অনুভূতিগুলিকে প্রকৃতিতে মিশিয়ে নবতর যে চেতনার সন্ধান কবি পেয়েছেন তার কাব্যময় প্রকাশ ঘটেছে বিশেষভাবে দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি - কবিতায় রয়েছে চটুল-কল্পনাবিলাসিতা, প্রগাঢ় ইন্দ্রিয় চেতনা এবং প্রকৃতির বিচিত্র ঋতু রঙ্গের কথা। 'অক্ষয়কুমারের প্রকৃতি-কবিতায় অনুগ্র, অনুচ্ছ্বসিত, বর্ণবিরল পটভূমিতে রোমান্টিক বিষাদের প্রতিমা প্রকৃতি রমনীর সাক্ষাৎ মিলে, আধো আলো ছায়াময়ী সন্ধ্যা, ও রহস্যরূপিনী জ্যোৎস্না যামিনী অক্ষয়কুমারের কবিকল্পনার অনুকূল, আর দেবেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্র-মদিরা - পানে বিভোর অশোকের রঙে, চম্পকের সৌরভে, গোলাপের রক্তরাগে অসহ্য উল্লাসে আত্মপ্রকাশ করে। অক্ষয়কুমার বর্ষা ও সন্ধ্যার কবি, দেবেন্দ্রনাথ গ্রীষ্ম ও দ্বিপ্রহরের কবি।'[২২] প্রকৃতি তার জড়ত্ব মোচন করে প্রাণময়ীরূপে সুন্দরতম প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রচেতনায়। রবীন্দ্র কাব্যে বিধৃত হয়েছে প্রকৃতির প্রতি অসীম অনুরাগের কথা, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে একান্ত আত্মহারা ভাব -। শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত প্রকৃতির মধ্যে তিনি দেখেছেন বিশ্বচৈতন্যকে।

' হই যদি মাটি হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ও ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল কিছুতেই নাই ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে অন্তবিহীন আপনা ॥

বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতিকণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শতকোটি কর হানিছে ॥'
(প্রবাসী)

প্রকৃতির রূপমাধুর্যে কবিকুল চিরকালই যেমন মুগ্ধ হয়েছেন কৈশোর অতিক্রান্ত প্রভাতকুমারের কবিমনও প্রকৃতির রূপে মোহিত হয়েছে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত 'চির - নব' [২৩] কবিতায় এই মুগ্ধতার পরিচয় আছে। প্রভাতের সূর্যোদয়ের 'লোহিত রঙ মাখা' আকাশ, প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজি, দিনান্তের অস্ত উন্মুখ সূর্য, সন্ধ্যায় পাখীর কলতান, রাতের জ্যোৎস্নাভরা অথবা গভীর নিশীথের পূর্বাকাশে ঢলে পড়া চাঁদ, আকাশের গায়ে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মেঘরাশি, সবই কবির কাছে মনোমুগ্ধকর। প্রকৃতির রাজ্যে নিত্যদিন এই রূপরাশির মেলা বসে কিন্তু কবির এই রূপরাশি দর্শনে কোন ক্লান্তি নাই - তবুও কবি ~~xxx~~ বলেন —

'হেরিয়া সেই শোভা
মোহিত হয়ে থাকি,
উথানি উঠে হিয়া,
ভরিয়া যায় আঁখি ।'

'ছবি' [২৫] কবিতায় এই প্রকৃতির রূপ বর্ণনার পরিচয় আছে। প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, নিশীথ এই চার ~~xxxx~~ প্রহরে প্রকৃতির রূপের যে পরিবর্তন আসে, নিছক তারই বর্ণনা এখানে কবি করেছেন। ১৮৯১ সালে রচিত 'গাজিপুরে গোলাপ-ক্ষেত্র' কবিতাটিতে গোলাপ বনের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর মনে হয়েছে —

'যেন হায় প্রেয়সীর প্রেমলিপিখানি,
ফুটিয়াছে ভাব পুষ্প মাধুরী হিল্লোলে।

গোলাপ ফুলগুলি তুলে নিলে—
'কাঁদে কালো ~~গা~~ গাছগুলি গুমরি গুমরি'

অবশ্য এগুলি আলঙ্কারিক প্রয়োগ, গোলাপকে এখানে প্রাণবন্ত মনে হয়নি।

যৌবনে কবি কিন্তু প্রকৃতির এই রূপলাবণ্যে শুধু বিমোহিত হন নাই, ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেমন প্রকৃতিকে তাঁর আত্মার রক্ষক এবং অভিভাবক বলে মনে করেছেন, এই পৃথিবীবাস যেমন তাঁর কল্পনায় প্রবাসযাপন বলে মনে হয়েছে, প্রভাতকবি মনেও দেখি সেই একই ভাবের স্ফুরণ। 'শেষ - দান' [২৪] কবিতায়

কবি বলেছেন —

' স্নেহময়ী প্রকৃতি জননী
— ওগো । মহা জননী আমার ।
আসিয়াছি পৃথিবী প্রবাসে
সাথে লয়ে সে ফুল তোমার ।'

এই ধরার প্রবাস জীবনে প্রকৃতি জননীর দেওয়া ফুলরূপী আশীর্বাদ কবির কাছে রক্ষা কবচ স্বরূপ । কবির কাছে এই বাস্তব জগৎ মরুভূমির মত রুক্ষ শুষ্ক , পদে পদে এখানে রয়েছে শত্রু এ এক মহা ব্যাধির আলয়। প্রকৃতির জননীর স্নেহ কবির জীবনে আশা উৎসাহ প্রদান করেছে, কবির কাছে তাই প্রকৃতি হয়েছে 'মৃতসঞ্জীবনী' । বলাবাহুল্য প্রকৃতিকে জননী রূপে কল্পনা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা পেয়েছি ।

'অতৃপ্তি' [২৬] কবিতায় প্রকৃতিকে জননী কল্পনা করে কবি তার কাছে তৃষিত হৃদয়ের প্রার্থনা জানিয়েছেন । তাঁর প্রাণের তৃষ্ণা প্রকৃতির রূপ, গান, গন্ধ সবকিছুকে সর্বইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা ।

'প্রতিদিন তপনের উদয়াস্ত কালে
মেঘের সর্বাঙ্গ মাখা স্বর্ণবর্ণছটা ;
নিদাঘ সন্ধ্যার নব জলদের ঘটা ;
বিহঙ্গের কলগীতি পুষ্পিত রসালে ,
রজনীতে চন্দ্রোদয় বারিধি হৃদয়ে ,
গিরিশিরে স্ফুট নব মল্লিকা - আঘ্রাণ ;'

এর সবকিছুই কবি প্রাণে মনে অনুভব করতে চেয়েছেন । শুধু অনুভব নয় কবি প্রতিভায় সে অনুভূতি আত্মস্থ হোক এ প্রার্থনাও কবি করেছেন। ভাব এবং ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগে কবিতাটি মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে ।

কবি কল্পনায় বাস্তব পৃথিবীর তাবৎ হাসি উচ্ছ্বাস কলতান প্রকৃতিতে অবাসিত । জগতের আনন্দধারা নিয়েই প্রকৃতি সুন্দর হয়ে উঠেছে। আকাশ, বাতাস, আঁধার-রাতের তারা, উদ্যানে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজি ঝরণার কলতান, পাপিয়া কোকিলের কূজন, পূর্ণিমা রাতে চাঁদের হাসি, কবিকল্পনায় এ সব কিছুই মানুষের আনন্দঘন মুহূর্তগুলিকে ধরে রেখেছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য দর্শনে কবি চিত্ত যখন আকুল হয়ে ওঠে তখন —

' তিল তিল সৌন্দর্য্যের
আকুল আহ্বান জানি,
স্বর্গ হতে মর্ত্যধামে
নামেন কবিতারাণী ।'

(কবির অভিব্যক্তি-বাদ)[২৭]

বাস্তব জগতের রূপ চুরি করে নিয়ে প্রকৃতি সুন্দর হয়ে উঠেছে এ ধরণের চিন্তা দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোক - তরু' কবিতাটিতে রয়েছে। যেমন —

' হে অশোক কোন্ রাঙ্গা - চরণ-চুম্বনে
মর্মে মর্মে শিহরিয়া হলি লালে লাল ?
কোন্ দোল পূর্ণিমায় নব বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ্ প্রকৃতি - দুলাল ?'

অবশ্য প্রভাতকুমারের কবিতায় অশোক তরু'র ভাবগাঢ়তা বা পারিপাট্য দুর্লক্ষ্য ।

'কেন অভিমান' কবিতায় প্রকৃতিতে কবি মানব মনের অভিমান আরোপ করতে চেয়েছেন । কবি একটি বন - তুলসীর ফুল তুলতে গেলে একই মঞ্জুরীতে অবস্থিত কয়েকটি ফুল মাটিতে ঝরে পড়লে তাঁর মনে হয় হয়ত অভিমান বশেই সেইগুলি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে । পাশেই অবস্থিত গোলাপ মল্লিকা, কনকচাঁপা ইত্যাদি ফুলগুলিকে স্পর্শ না করে, কবি মাটিতে লুটিয়ে পড়া বনতুলসী ফুলটিকে সাদরে তুলে তার অভিমান ভাঙ্গাতে চেয়েছেন । কবিতায় ভাবের অগভীরতা এবং ভাষার শিথিল প্রয়োগ বনতুলসীর অভিমানহত রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে । যেমন —

' বন তুলসীর সেই ক্ষুদ্র সাদা ফুলগুলি
বড় তারা অভিমানী গো !
আজ প্রাতে সেই ফুল একটি তুলিয়াছিনু ,
তা দেখিয়া চারি পাঁচটিতে
মুখখানি নত করি মঞ্জরীর কোল হতে ,
ঝরি ঝরি পড়িল ভূমিতে ।
কণক চম্পক ছিল বাঁকা শাখা আলো করি ,
আমি যে গো তাহাদের ভুলি ,
ধূলিমাখা পাতা মাঝে বন তুলসীর ফুল
একটিরে লইলাম তুলি ,
তাহাতে কি হলনাক বাকী সকলের করা
আশাতীত যথেষ্ট সম্মান ?

ঐ রূপে ঐ গন্ধে কি অধিক চায় তারা ?

জানি নাক কেন অভিমান !'

লেখকের প্রকৃতিপ্রীতি কবিতাগুলিতে বিধৃত। তাঁর দৃষ্টি কখনও প্রকৃতির রূপলাবণ্যে বিমোহিত, কখনও তিনি জড় প্রকৃতিতে মানব চৈতন্য আরোপিত করেছেন। আবার কখনও এই প্রকৃতিতে অনুভব করেছেন আত্মার আত্মীয়তা। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুভূতিশীল মননের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রকৃতির বহিঃসৌন্দর্য্য কবির কৌতুহলী মনকে তৃপ্তি দিয়েছে কিন্তু অন্তর্লীন ভাবগূঢ় তন্ময়তার অভাবে প্রকৃতির আত্মার সংবাদ কবির কাছে পৌঁছায়নি।

(৩) তত্ত্ব বিষয়ক কবিতা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে নানা প্রকারের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় বাঙালী মনন উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। ফলতঃ বিবর্তনবাদ, জড়বাদ, মানব-প্রকৃতির সম্পর্ক ইত্যাদি বহুবিধ চিন্তাধারা সাহিত্য রচনায় স্থান পায়। তত্ত্বালোচনা প্রধানতঃ যুক্তি-তর্কবহুলতার বিষয় বস্তু প্রবন্ধ রচনার অনুকূল। কিন্তু কি পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য, কবিপ্রতিভার অলৌকিক ক্ষমতায় শুষ্ক তত্ত্বকথাও সুললিত কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে একদল তত্ত্ববিলাসী কবিগোষ্ঠীর সন্ধান মেলে। আমাদের কাব্য সাহিত্যেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা রচনার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মানকুমারী বসু, প্রভাবতী রায়, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বলদেব পালিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি বহু কবি ও মহিলা কবিদের রচনায় এর পরিচয় পাওয়া যায়

প্রভাতকুমারের রচনাতেও তত্ত্বভিত্তিক কিছু কবিতার নিদর্শন রয়েছে।

হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ যে জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গের যে দুটি পথের কথা ~~বর্ণিত~~ বলা হয়েছে 'মহাযাত্রা' ৩১ কবিতায় সেই পথের কথা বর্ণিত। ভক্তিমার্গের পথ সহজ সরল, নিশ্চিন্ত বিলাসে অপার ভক্তিতে মোক্ষলাভ হয়। ভক্তিই মুক্তির সহজ উপায়, এ পথে —

' নাহি শ্রান্তি নাহি ক্লেশ, অবসাদ-মেঘ ,

নিরাশা - নাগিনী।'

~~XXজ্ঞানXXমার্গের~~

কিন্তু জ্ঞানমার্গের পথ 'সুবিশাল, সুকঠিন, দুরারোহ'। জ্ঞানের আলোকে সব কিছুকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই পথযাত্রা এবং মোক্ষপ্রাপ্তি। কবির আকাঙ্ক্ষা এই জ্ঞানমার্গের পথে বিচরণ করে জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন আলোচনায় ঈশ্বরকে জানতে। শুধু আলোচনায় নয় প্রাণে প্রাণে তিনি তাঁর মহিমাকেও উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর সৃষ্টি সৃষ্ট প্রকৃতি এবং মানুষের সব কিছুকেই কবি তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করে তাঁর মহিমার কথা জেনে তবেই তাঁকে পূজা করবেন, তাঁর আলোকে আলোকিত হয়ে নিজেও মহীয়ান হবেন। কবির ইচ্ছা —

'মহাসৌন্দর্যের মাঝে ডুবিয়া ডুবিয়া
হয়ে যাব পরম সুন্দর,
মহা-মহিমার ছবি দেখিয়া দেখিয়া
প্রতিদিন হব মহত্তর।'

পার্থিব জগতে মোক্ষধামের দিশারী, গুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে কবি বলেছেন —

' তাই আমি নাহি যাব চক্ষুকর্ণ রোধ করি
নাম- জপ - তরণীতে ভক্তি - নদী বাহি,
হে কান্ডারী গুরুদেব চরণে প্রণাম করি,
অত শীঘ্র অধমের মোক্ষে কাজ নাহি।'

পংক্তিগুলি রবীন্দ্রভাবনার কথা স্মরণ করায় —

' ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধকরি যোগাসন, সে নহে আমার।'
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।' ('মুক্তি,' নৈবেদ্য)

'মায়াবাদ'[৪০] কবিতাটি দুইটি অংশে বিভক্ত (ক) সুখীর উক্তি (খ) দুঃখীর উক্তি। শাস্ত্রকারদের মতে এই জগৎ মায়াময়, স্বপ্নবিশেষ। যেহেতু জগৎ স্বপ্ন বিশেষ তাই সুখ অথবা দুঃখ জীবনের সমস্ত অনুভূতিই মিথ্যা। শাস্ত্রকারদের জীবন সম্পর্কে এই মায়াবাদী তত্ত্বব্যাখ্যা শ্রবণে সুখী বলেছে এই জীবনের সব কিছু যদি অভিনয় হয় তবে মিথ্যা কুহকের এ সংসারের সুখশান্তি ভালবাসার অবসান ঘটুক। হৃদয় প্রকৃত সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক এবং সেই আলোকের প্রখরতায় —

' চির অবসিত হোক আনন্দ বিষাদ।

'চির অবসিত হোক আনন্দ, বিষাদ।
বহুক ভীষণ ঝড় উন্মথিত করি
এ সাহারা অগ্নিসিন্ধু চিরদিন ধরি।'

দু:খীর বক্তব্য হে ঈশ্বর, মায়াবাদী তত্ত্বই যেন সত্য হয়। যে জগতে এত দু:খে আমরা কালাতিপাত করি সে জগৎ যেন মিথ্যা হয়। অপ্রাপ্তি জনিত যে হতাশায় আমরা ভুগছি সেই হতাশাও যেন মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয়। মায়াবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী দু:খী বলছে —

' কি আনন্দ কি আনন্দ রে!
এ জগৎ সত্য নহে - নহে।
কি আনন্দ! সত্য নহে আমি
লুটিতেছি তাহার বিরহে।
কি আনন্দ! যে শোক অনলে
এই প্রাণ নিশি দিন দহে,
নাহি নাহি অস্তিত্ব তাহার; —
মায়াবাদী এ জ্ঞান ধন্য হে।'

প্রসঙ্গত: রবীন্দ্রনাথের 'মায়াবাদ' কবিতার কথা বলা যেতে পারে।

আমাদের 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'বৈষ্ণব দর্শনের কাব্যরূপ দিয়েছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এখানে প্রভাতকুমারের কবিতায় কিন্তু তত্ত্বের কাব্যরূপায়ন ঘটে নাই। সাধনমার্গের প্রচলিত দুইরূপ জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তিমার্গ সম্পর্কে সাধারণে যে ভাবে আলোচিত হয়ে থাকে প্রভাতকুমারের চিন্তাধারা তাকেই কবিতার বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করে কিঞ্চিৎ কৌতুকরস পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন। তবে সেখানেও দেখি ভক্তিমার্গ থেকে জ্ঞানমার্গের প্রতি তাঁর জীবনাগ্রহের পরিচয় ফুটে উঠেছে। যে আবেগের গাঢ়তা থাকলে তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা সত্যকারের কাব্যরূপ পায় প্রভাতকুমারের কবিতায় তার অভাব লক্ষণীয়।

(৪) গাথা কবিতা

'প্রদীপ' পত্রিকায় পৌষ, ১৩০৪ সালে প্রভাতকুমারের 'হোলি - কাহিনী' প্রকাশিত হয়। 'হোলি - কাহিনী' তাঁর একমাত্র গাথা কবিতা। পৌষ, ১৩০৪ সালে প্রকাশিত হলেও এর রচনাকাল ২২ ফাল্গুন, ১৩০২ সালের পূর্বেই। কারণ এই তারিখে দিলদারনগর থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখে-

ছিলেন তার অংশবিশেষ এইরূপ —

' আজ সপ্তাহ হইল, আপনাকে কাহিনী নামক ক্ষুদ্র কবিতার পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া, তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে দিতে অনুরোধ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছি, অদ্যাপি তাহার কোনও উত্তর পাইলাম না।....'[২৮] এই কাহিনী কবিতাটি কিছু সংশোধিত রূপ নিয়ে 'হোলি - কাহিনী' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে যে পাণ্ডুলিপিটি'[২৯] পাঠিয়েছিলেন তার অংশবিশেষের প্রতিলিপি নিম্নরূপ, —

কাহিনী

১নং পৃষ্ঠা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

(গোপন প্রচারের জন্য মুদ্রিত)

২নং পৃষ্ঠা ভূমিকা।

এই কয় ছত্র ত কবিতা, তাহার আবার ভূমিকা? কিন্তু ভূমিকার প্রয়োজন আছে। ইহার ছন্দ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। পয়ার ত্রিপদী ইত্যাদি ছন্দের ন্যায় ইহা শুধু পড়িয়া গেলে ঠিক হইবে না। প্রত্যেক শ্লোকের দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ পংক্তির চতুর্থ এবং ষষ্ঠমাত্রা দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে এ ছন্দকে হত্যা করা হইবে। যুক্তাক্ষরের উপর সম্যক্ গুরুত্ব না দিলেও চলিবে না। এই নিয়মগুলি মানিয়া, গানের মত সুর করিয়া পড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাতে যদি ভাল না লাগে, তবে দোষ কবিতারই তাহা স্থির।

ছন্দের ঝঙ্কার গীতিকাব্যের প্রাণ স্বরূপ। ছন্দের সন্ধান বুঝিতে না পারিয়া, অনেকে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয় গীতিকবির উৎকৃষ্ট রচনাগুলিকে উপহাস করিয়া থাকে। এই কারণ-বশতই অনেক সুশিক্ষিত এবং প্রকৃত কাব্যামোদী সহৃদয় ব্যক্তির নিকটও উক্ত কবির চমৎকারিনী প্রতিভার একটি বিস্তৃত অংশ ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে।

৩নং পৃষ্ঠা

মাননীয়

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্ধুবরেষু

প্রিয় রবিবাবু,

আমি যে আপনার কবিতার একজন পরম ভক্ত, এই কথা

ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিবার জন্য আপনাকে এই ক্ষুদ্র কবিতাটি উৎসর্গ করিলাম।

আপনার স্নেহগর্বিত

দিলদারনগর ॥ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।'
দোলপূর্ণিমা, ১৩০২ ॥

দুঃখের বিষয় গোপন প্রচারের জন্য মুদ্রিত করার ইচ্ছা প্রভাতকুমারের থাকলেও কোন কারণ বশতঃ কবিতাটি স্বতন্ত্র কবিতা পুস্তিকা হিসাবে মুদ্রিত হয়নি। দিলদারনগর থেকে ২৪শে ফাল্গুন, ১৩০২ সালে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে জানিয়েছেন ––

' এমনি যদি হইল, তবে কাহিনী আপাতত ছাপাখানায় দিবেন না –– আমি উহা সংশোধন করিব।' ৩০

'প্রদীপে' পাঠাবার আগে প্রভাতকুমার যে কবিতাটিকে সংশোধন করেন, তার পরিচয় পাই কবিতাটির নাম পরিবর্তনের মধ্যে। পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে শুধুমাত্র 'কাহিনী' অথচ 'প্রদীপে' প্রকাশিত কবিতায় 'হোলি - কাহিনী' (গাথা)'। কবিতার বয়ানেও কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে। যেমন, পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে ––

'ফিরিছে, যুবক মথুরা প্রসাদ
ব্যবসা করিয়া।

প্রকাশিত রূপ :––

'ফিরিয়া আসিছে মথুরা প্রসাদ
ব্যবসা করিয়া।'
ইত্যাদি।

যাহোক লেখক স্বয়ং কবিতাটিকে 'গাথা' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। তাই কবিতাটি সত্যকারের গাথা - কবিতা হয়ে উঠেছে কি না সে কথা বিচার্য।

গাথা কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পাশ্চাত্য সমালোচক বলেছেন –– *Ballad is a song that tells a story* অর্থাৎ গাথাকাব্য একটি কাহিনী মূলক গীত। একথা প্রাচীন গাথাকাব্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও আধুনিক গাথা কাব্যের ক্ষেত্রে সর্বৈব প্রযোজ্য নয়। কারণ প্রাচীন গাথাকাব্য গীত হত কিন্তু আধুনিক গাথাগুলি পাঠ্য। প্রাচীন গাথাকাব্য নিরক্ষর গ্রাম্য কবিরা রচনা করেছেন, তাদের কাহিনী মৌখিক। কবিতা ও গান অপরিহার্য হলেও কাহিনী অংশই প্রধান। কাহিনীতে জটিলতা কম, সহজ সরল ভাবেই কাহিনী

বর্ণিত হয়েছে। এসবের সাহিত্যিক মূল্য অনেক ক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আমরা যে গাথা কাব্য পাই সেগুলির উদ্ভব হয়েছে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা এবং তৎ সৃষ্ট নব রসবোধের ফলে। আধুনিক গাথা শিক্ষিত কবিগণের রচনা তাই ভাবে-ভাষায় পূর্ণ সাহিত্যিক মর্যাদা পাবার অধিকারী। আধুনিক গাথাগুলির ভাব ও গঠন অনেকটা ইংরাজী ballad এর অনুকরণে রচিত হলেও এখানকার কাহিনীর পাত্রপাত্রী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধুনিক মানসিকতা সম্পন্ন নরনারী। তাদের কার্য্যকলাপ সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনার মাধ্যমেই ব্যক্ত। কিন্তু পল্লীগাথার নায়ক নায়িকারা বহুলাংশে হৃদয়ের আবেগে তাড়িত।

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে ইংরাজী সাহিত্য প্রভাবিত এই ধরণের সর্বপ্রথম গাথাকাব্য লিখেছেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। তাঁর রচিত 'উদাসিনী' (১৮৭৪) বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম আধুনিক গাথা, আকার এবং প্রকরণের দিক থেকে এটি ইংরাজী ballad এর অনুকরণ। পার্ণেলের 'দি হার্মিট' কাব্যের অনুকরণে 'উদাসিনী'র আখ্যানভাগ রচিত। অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, ইত্যাদি অনেকেই গাথাকবিতা রচনা করেছেন। বিশেষত: রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮ সাল), 'শৈশব - সঙ্গীত' (১২৯১) কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি গাথা-কবিতা স্বর্ণকুমারী দেবীর ইতিহাসাশ্রিত গাথা, 'খড়াপরিণাম' এবং 'প্রেমকাহিনী সম্বলিত করুণ-পরিণতিমূলক' 'সাশ্রু সম্প্রদান' 'মাধের ভাসান' 'অভাগিনী' গাথা কবিতাগুলি প্রকাশিত হবার পর থেকে গাথা কবিতা রচনার ব্যাপক প্রবণতা লক্ষণীয়।

প্রভাতকুমারের 'হোলি - কাহিনী'তে হোলির রাত্রিতে প্রিয়া - মিলন - আশে উন্মুখ নববিবাহিত যুবক মথুরাপ্রসাদের পথিমধ্যে বন্ধুগৃহে মৃত্যুর এক করুণ কাহিনী বিধৃত।

ব্যবসায়ী মথুরা প্রসাদ দীর্ঘ প্রবাসের পর স্বগৃহে নববধূ মিলনে উন্মুখ হয়ে অশ্বারোহনে যাত্রা করেছে। ~~বৎসরকাল~~ বৎসরকাল পূর্বে ব্যবসাক্ষেত্রে আসার সময় নববধূকে বলে এসেছিল —

' বৎসরকাল থাকিনা যেথায়,
হোলির রাত্রে, সখি, পুনরায়
আসিব ফিরিয়া, চুম্বির তোর
চন্দ্রসুধানন।'

ক্রমাগত দশদিন অশ্বারোহনে এসেছে, আর একটি দিন অতিক্রান্ত হলে প্রিয়া-মুখ দর্শন করবে। দিনশেষে মথুরাপ্রসাদ শোণ নদের তীরে উপস্থিত — সন্ধ্যা সমাগত তাই নদীর ওপারে অবস্থিত বন্ধু কিষণ প্রসাদের আতিথ্য গ্রহণ করে। বহুদিন পর বন্ধুকে পেয়ে কিষণ প্রসাদ উল্লসিত, অধিক রাত্রি অব্দি দুই বন্ধুতে বহু গল্প হয় যার অধিকাংশই —

' গল্প কেবল মথুরা প্রিয়ার
স্নেহ ভালবাসা নবীন - হিয়ার
সামান্য কথা তুচ্ছ ঘটনা, —
তাহারি কাহিনী।'

কিষণ প্রসাদ ঘুমিয়ে পড়ে, আগ্রহাতিশয্যে মথুরাপ্রসাদ বিনিদ্র রজনী যাপন করে।

ভোর না হতেই বন্ধুর কাছে মথুরাপ্রসাদ বিদায় প্রার্থনা করে। কিষণ প্রসাদ অভিমানের সুরে বলে —

' বিবাহ করেছ বলে কি বন্ধু
এমনি হতে হয়?
নবপ্রণয়িণী পেয়েছ বলিয়া,
সকল কিছু কি যাইবে দলিয়া?
আমাদের সেই শৈশবপ্রেম,
তাহা কিছু কি নয়?
আজি নহে কাল, এই ত ব্যাপার
মিলিবে প্রিয়া সাথ,
একটি দিনে কি হৃদয় তোমার
বিরহ বজ্রে হবে চুরমার?
সেই কি পড়িয়া মরিয়া যাইবে
ডাকিয়া-'কোথা নাথ'!'

সেদিন হোলি উৎসব। বন্ধুর অনুরোধে সেদিন যাত্রা স্থগিত করতে বাধ্য হয় — উৎসব মাঝে বিষন্ন বদনে যোগদান করে।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে — মথুরাপ্রসাদ কাল - বিসূচিকায় আক্রান্ত হয়। প্রবীন বৈদ্যের শতচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে পরদিন মধ্যাহ্নে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

বন্ধুর মৃত্যুতে কিষণ প্রসাদ অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ে পর বৎসর হোলি উৎসবে আর যোগ দিতে পারেনা; নিদ্রাহীন রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে হঠাৎ সে যেন শুনতে পেল শোন নদের তীরে যেখানে মথুরাপ্রসাদের চিতানল জ্বলেছিল সেখানে কে যেন চিৎকার করে ফিরছে ' যেতে দিলে নারে'। সমস্ত রাত্রি সেই করুণ কান্না বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

' আজিও সেখানে প্রতি বৎসর
হোলি রজনীতে জাগে সেই সুর
তীব্রকাতর আর্ত নিনাদ —
' যেতে দিলে না রে' ।

কাহিনীর শেষাংশে অতিপ্রাকৃতের সংযোজন করে দাম্পত্য প্রেমার্তির করুণ পরিনতি মূলক এই কাহিনীটিকে মর্মস্পর্শী করে তোলার চেষ্টা দেখা যায়।

কবিতাটি কবিজীবনের একটি প্রায় সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন —

'কবিতাটি প্রায় সত্যঘটনায় প্রতিষ্ঠিত — মথুরাপ্রসাদ স্বয়ং কবি এবং কিষণ প্রসাদ তাঁহারই বন্ধু বীরেশ্বর বা অতুল। কবিতার সঙ্গে ঘটনার প্রভেদ এই যে ঈশ্বরেচ্ছায় মথুরাপ্রসাদ এখনও মরে নাই, এবং সেদিন কিষণ প্রসাদের সাধ্য হয় নাই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে। আমার বন্ধু স্বাস্থ্যলাভ উপলক্ষে কৈলোয়ার স্টেশনের দুই মাইল দূরে পল্লীগ্রামে বাস করিতেছিলেন। বাড়ীটা শোন নদের তীরেই ছিল বটে। তিন বৎসরের কথা— দোলের দুই একদিন পূর্বে বাঁকীপুর হইতে আমি সেখানে উপস্থিত হই— অশ্বারোহনে নহে — রেলগাড়ীতে। 'বৎসরকাল' নহে দুইদিন পূর্বে পত্রে লিখিয়াছিলাম, বসন্তপূর্ণিমা রাত্রে আর কোথাও থাকিবনা। বন্ধু কিছুতেই ছাড়িবেন না, মাংসাদি আনাইয়া আহারের সু—উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, আমিও থাকিব না। কোনমতেই তাহাকে আটিতে না পারিয়া অবশেষে বলিলাম — দেখ অতুল, আমি যদি আজ রাত্রে কলেরায় এখানে মরে যাই তবে ভূত হয়ে ঐ শোনের চড়ায় অন্ধকার রাত্রে 'যেতে দিল না রে যেতে দিল না রে' বলে চীৎকার করে ছুটোছুটি করে বেড়াব, তখন মুস্কিলে পড়বে;-তোমার এখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। একথা শুনিয়া' কিষণ প্রসাদ আমার মুখ চাপিয়া ধরিলেন এবং আসিতে দিলেন। আমি তাঁহার স্ত্রীজাতিসুলভ *Sensitiveness* জনিত ভয় দেখিয়া, এই কবিতা লিখিব বলিয়া শাসাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিয়াছি।' ৩১

কবিতাটি লেখকের ব্যক্তি-জীবনের একটি ঘটনাকে গাথা কবিতায় রূপান্তর সাধনে কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। রেলগাড়ীর স্থলে ঘোড়া, শোন নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, রাত্রিকালের নির্জনতা, কবিতাটির পরিবেশ রচনার অনুকূল। শোননদের দীর্ঘবিস্তারী বালুতটে গভীর নিশীথে 'যেতে দিলে নারে' আর্তনাদ কবিতার রোমান্সরসকে ঘনীভূত করে গাথা কবিতার বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছে।

(৫) অনুবাদ কবিতা।

সাহিত্য বিকশিত এবং সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে দুইটি রচনাধারায় — একটি মৌলিক অপরটি অনুবাদ অনুকরণ। অনুবাদ - অনুকরণ মূলক রচনার মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের রস প্রবাহটিকে নিজ নিজ সাহিত্যের ধারা প্রবাহে মিলন ঘটিয়ে, সাহিত্যের পুষ্টি ও সমৃদ্ধ ঘটানোই অনুবাদকের কাজ। অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক যদি মূলরচনার ভাবের সঙ্গে নিজের অনুভূতি মিশিয়ে ফেলেন তবে ভাষান্তরণের মাধ্যমে রচনার ব্যত্যয় ঘটতে পারে। এদিক থেকে অনুবাদক ভাবের ব্যাপারে পরনির্ভরশীল - তাই অনুবাদকালে তার রচনার ভাষায় আড়ষ্টতা আসা সম্ভব। কিন্তু অনুবাদক যেখানে তার সমস্ত সাহিত্যিক সত্তা দিয়ে মূল কবিতার ভাব ও ছন্দের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারেন সেখানে কবিতা রসোত্তীর্ণ হয়ে নির্মিতির পর্য্যায়ে পৌঁছায়। যে অনুবাদক - মূল রচনার ভাব ও ভাষার মাধুর্যকে, মূল সুর ও ছন্দকে অবিকৃতভাবে ভাষান্তরিত করতে পারেন, তিনিই সার্থক। আমাদের বাংলা সাহিত্যে এই অনুবাদ-অনুকরণাত্মক রচনার সংখ্যা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সকলের রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে অনুবাদ-অনুকরণমূলক রচনার সাক্ষাৎ পাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে অর্থাৎ প্রভাতকুমারের কবিতা রচনার সমসাময়িককালে বাংলা কবিতার আসরে যে অনুবাদাত্মক কবিতার সৃষ্টি হয়েছিল তাদের অধিকাংশেরই মূল ছিল ইংরাজী রচনা। বিংশ শতাব্দীর অনুবাদ রচনার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২ - ১৯২২) নাম অমর হয়ে আছে। সত্যেন্দ্র নাথের সদাজাগ্রত কৌতূহলী দৃষ্টি বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রায় সব কিছুকেই অনুবাদ মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যে আপন করে নিতে চেয়েছে। অনুবাদ অনুকরণের অসাধারণ ক্ষমতায় সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী, ফারসী, জাপানি ইত্যাদি বহুভাষা থেকে তিনি গদ্যপদ্য উভয়বিধ অনুবাদ করলেও কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রেই তাঁর পারঙ্গমতা লক্ষণীয়। কবিতার ভাব ভাষা থেকে রূপ ও ছন্দের প্রতি তাঁর অধিক আকর্ষণের ফলে জাপানি থেকে 'তানকা'

ফরাসীর মাধ্যমে 'পান্টুম' সংস্কৃতের 'রুচিরা' 'তোটক' ইত্যাদি বিচিত্র ছন্দ এবং কবিতার স্তবক গঠন রীতি মাধ্যমে তিনি বাংলা গীতি কবিতা রচনায় নূতনত্ব আনয়নের চেষ্টা করেছেন। অনুবাদ মাধ্যমে বিশ্বচিন্তাধারার সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার তাঁর এই প্রচেষ্টার অভিনবত্ব সবত্র সার্থক না হলেও বিস্ময়কর।

প্রভাতকুমার তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা পর্বে কিছু ইংরাজী কবিতার অনুবাদ করেন - তন্মধ্যে কিছু ভাবানুবাদ এবং কিছু আক্ষরিক অনুবাদ আছে। প্রভাতকুমারের প্রাথমিক পর্য্যায়ের এই রচনাগুলিতে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ অনুকরণমূলক রচনার বৈচিত্র্য অবশ্যই আশা করা যায় না তবুও এই ধরণের রচনায় তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় আছে। প্রভাতকুমারের অনুবাদ অনুসরণাত্মক নিম্ন লিখিত আটটি কবিতা রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে।

(১) অতিথি — দাসী, মে, ১৮৯৬।

(২) আকাশ কেন নীল - প্রদীপ, বৈশাখ, ১৩০৫ (Thomas Moore এর Why does azure deck the sky কবিতার অনুসরণে রচিত)

(৩) দেবদূত ও বিক্রমাদিত্য - প্রদীপ, চৈত্র, ১৩০৬ (~~Ley~~ Leigh Haunt এর Abou Ben Adhem কবিতার ভাবানুবাদ)

(৪) কর যোড়ে করি প্রার্থনা তোরে — ভারতী, ফাল্গুন, ১৩০৩ (Sir John Suckling এর 'I prithee send me back my heart' কবিতার অনুসরণে।)

(৫) প্রেম ও আশা — ভারতী, ফাল্গুন, ১৩০৩ (Moore এর Love and hope কবিতার অনুবাদ)

(৬) নাম লেখা — ঐ — ঐ — (Edmund Spenser এর One day I wrote her name &c কবিতার অনুসরণ)

(৭) প্রেম পঞ্জিকা — সাধনা, বৈশাখ, ১৩০২ (Charles Kent এর Love calender কবিতার অনুসরণে।)

(৮) এসেছিল গিয়াছে চলিয়া — সাধনা, আষাঢ়, ১৩০২ (J. R. Lowell এর 'As a twig trembles &c কবিতার অনুসরণ)

ইংরেজ কবি লে হান্ট রচিত Abou Ben Adhem কবিতার ভাবানুসরণে প্রভাতকুমারের 'দেবদূত ও বিক্রমাদিত্য' (চৈত্র, ১৩০৬) কবিতাটি রচিত। লে হান্টের কবিতার Abou Ben Adhem প্রভাতকুমারের কবিতায় 'উজ্জয়িণী-পতি' তে রূপান্তরিত। এছাড়া মূল কবিতার ভাব প্রভাতকুমারের রক্ষিত । মূল কবিতার বক্তব্য মানুষকে ভালবাসলেই ঈশ্বরকে

ভালবাসা হয়। প্রভাতকুমারের কবিতায় দেখা যায় উজ্জয়িনী–পতি বিক্রমাদিত্য দেবদূতকে বলেছেন —

' ভালবাসা ঈশ্বরের প্রতি
নাহি যদি থাকে মম, লিখিও অন্তত:
মানবগণেরে আমি ভালবাসি অতি। '

এই স্থানে মূল কবিতায় রয়েছে —

'I pray thee, then,
Write me as one that loves his fellowmen.'

লে হান্টের Abou Ben Adhem কবিতার শেষাংশে আছে —

'The next night
It came again with a great wakening light,
And showed the names whom love of God had blest,
And lo, Ben Adhem's name led all the rest.'

প্রভাতকুমারের কবিতায় এই অংশের ভাবানুবাদ এইরূপ —

' পরদিন নিশাযোগে আসি পুনরায়
দেবতা বিক্রমাদিত্যে দিলা সমাচার,
' ঈশ্বর - প্রেমিক - জন - নাম তালিকায়
ঈশ্বর লিখিলা নাম প্রথম তোমার। '

প্রভাতকুমার তাঁর 'নাম লেখা' কবিতাটিকে ইংরেজ কবি Edmund Spenser এর One day I wrote her name' নামক কবিতার অনুবাদ বলেছেন। Spenser এর মূল কবিতাটি সনেটের আঙ্গিকে রচিত। প্রভাতকুমারের 'নাম লেখা' কবিতাটি চৌদ্দ পংক্তিতে সনেটের আকারে রচিত হলেও মূল কবিতার ব্যঞ্জনা প্রভাতকুমারের কবিতায় তেমন উপস্থিত হতে পারে নাই। অনুবাদের ভাষাও সর্বত্র সার্থক হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। মূল কবিতায় প্রিয়া হৃদয় যেখানে নশ্বর মানুষকে তার সীমিত শক্তির সাহায্যে অমরত্ব লাভের ব্যর্থ প্রচেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে —

'Vayne man, sayed she, that doest in vaine assey,
a mortal thing so to immortalize,
for I pray selue shall lyke to this decay,
and eek my name bee wyped out lyke wise.'

প্রভাতকুমার এই অংশের অনুবাদ করেছেন —

'ওকি তুমি করিতেছ ? জলরাশি লয়ে
রচিবে কি অট্টালিকা ? যাহা ক্ষণ তরে ,
অমর হইবে তাহা বল কার বলে ?'

বলাবাহুল্য মূল কবিতার ভাব অথবা [illegible] ভাষার ব্যঞ্জনা প্রভাতকুমারের কবিতায় অনুসৃত হয়নি । প্রভাতকুমারের কবিতায়' জলরাশি লয়ে রচিবে কি অট্টালিকা ?'য় যে বৃথা উদ্ভাবনার কথা মনে আসে সেখানে মূল কবিতার ভাব গাম্ভীর্য রক্ষিত নয় । কবিতায় অন্যত্র প্রভাতকুমার লিখেছেন —

' আমি কহিলাম —' প্রিয়া তোমার আমার
এমন প্রণয় , কভু মরণের করে
নাহি যাবে , তবে আমি গঙ্গা কবিতার
বহাইব , তারি মাঝে করিয়া অমর,
রাখিব তোমারে , সখি , যুগ যুগান্তর ।'

এখানে 'গঙ্গা কবিতার বহাইব' এই উপমার মাধ্যমে যে আবেগ প্রকাশিত সেখানে প্রেমের অমরত্ব লাভের প্রগাঢ় আবেগ প্রকাশের সমুচিত বাহন হয়ে উঠতে পারে নাই ।

প্রভাতকুমারের অনুবাদ অনুকরণাত্মক কবিতা রচনায় প্রথাগত পন্হা অনুসরণের প্রচেষ্টা আছে, কবিতার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে তিনি বিশেষ যত্নবান বলে মনে হয় না । অচিরেই তিনি কবিতা রচনার পথ পরিত্যাগ করেছেন তাই এখানে বিশেষ কিছু স্থায়ী স্বাক্ষর তিনি রেখে যেতে পারেন নি ।

(৬) ব্যঙ্গ-কৌতুক-রসাত্মক কবিতা ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জাগরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলার মনিষীবৃন্দ অনেকেই একথা অনুধাবন করেছিলেন যে জাতি গঠনের মূলে নর নারী উভয়ের মিলিত শক্তির বিশেষ প্রয়োজন আছে ।

ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২ - ৫৯) কিছু কবিতায় নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষার প্রতি কটাক্ষপাত থাকলেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে কবিতায় নারী-বন্দনা স্থান পেয়েছে । মহাকাব্যে, কাহিনী কাব্যে এবং গীতিকবিতায় এই সুরের জয়গান ঘোষিত । মাইকেল মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' 'xxxxx মেঘনাদ বধের প্রমীলা

সীতা চরিত্র চরিত্রে, বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'তে, সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা কাব্যে, দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'নারী মঙ্গল' ইত্যাদি কাব্যে নারীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। এই সময়ে ব্যাপক ভাবে নারী স্তুতির কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন —

' জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রহরে বাঙ্গালী বিশেষ করিয়া তাহার গৃহলক্ষ্মীর সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিল — নিজের পুরুষ-মহিমা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খুঁজিয়া পায় নাই, কিন্তু নিজ গৃহের সর্বংসহা স্নেহশালিনী নারীর দিকে চাহিয়া সহসা তাহার বিস্ময় বোধ হইল। অক্ষম অকৃতী পুরুষের পাশে সহচরীবেশে এই শক্তিরূপিনীর সাক্ষাৎলাভ করিয়া সে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত হইয়াছিল। নারীর মধ্যেই সে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা এমন কি পৌরুষ-বোধেরও পরিতৃপ্তি চাহিয়াছে নারীর শক্তি হইতে সে নিজেও শক্তি সঞ্চয় করিতে চাহিয়াছে, নিজের আত্মগ্লানি অক্ষমতার উর্ধে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হৃদয়ের শ্রেষ্ঠবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছে। ইহাই আমার মনে হয় — নবযুগের বাংলাকাব্যে কবিগণের এই নারীস্তুতির প্রধান প্রেরণা।' ৩২

প্রভাতকুমারের 'অভিশাপ' ৩৩ ব্যঙ্গ কাব্য বলে অভিহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এইটি নারী-বন্দনার কাব্য। কাব্যটির শেষ দুই পংক্তিতে রয়েছে—

' সুখশান্তি বঙ্গদেশে ফিরিল আবার
স্ত্রী শিক্ষা মঙ্গল গান গাহিলাম সার।'

কাব্যের কাহিনী অংশ এইরূপ —

বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার হওয়ায় আর্যগ্রন্থকারদের মনে এক ভীষণ ভীতি উপস্থিত। তাঁদের বক্তব্য

'ধর্ম্মগেল কর্ম্মগেল হল সর্বনাশ
ঘুচিল গৃহস্থঘরে সুখশান্তি আশ।'

বালিকারা আর সেঁজুতিব্রত, শিবপূজা করে না। ছয় সাত বৎসর বয়সে 'কথামালা শিশুধারাপাত' পড়ে ফেলেছে। এখানেও তাদের মাতাপিতা ক্ষান্ত না হয়ে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করেছে। মেয়েরা সেখানে' খাতা খুলে লেখে ম্যাপ দেখে অঙ্ক কষে' কোনমতে স্নানাহার শেষ করে স্কুলে যায়। রন্ধনাদি গৃহস্থালীর দিকে নজর নাই — বার তের বছরের আগে কারও আর বিয়ে হয় না। শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে শাশুড়ীকে প্রনাম করতে তারা ভুলে যায়। সেকালের মেয়েরা পুত্রবতী হলে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করত।

নবীনাদের মনে এখন এতে বিরক্তি জন্মায়। মাতৃস্তনদুগ্ধ তার শিশুরা পায় না — বিলাতী বোতলে ভরা গরু গাধার দুধ খেয়ে শিশুদের বুদ্ধিও গরু গাধার মত হচ্ছে। বধূরা তার শ্বশুরশাশুড়ীর সেবা করেনা, ছেলের প্রতি নজর নাই, গোয়ালে যেতে গোবরের গন্ধে তাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

আর্য — গ্রন্থকারদের নারী শিক্ষার প্রতি এই বিরূপ মনোভাবাপন্ন ক্রন্দন-কোলাহল দৈবযোগে মানস সরসী তীরে পৌঁছিলে সরস্বতীর সঙ্গীত আসরে বাধা সৃষ্টি করে। সরোষে তারা অভিশাপবাণী উচ্চারণ করে—

'লিখেছে পড়েছে যাহা বঙ্গকুলবালা,
সমুদয় ভুলে যাক - ঘুচে যাক জ্বালা।'

অমনি বাঙ্গালা দেশের ঘরে ঘরে এক মহা বিপত্তি উপস্থিত হয়। সুরবালা স্বামীকে 'প্রথম - প্রণয় - লিপি' লিখছিল হঠাৎ সে যা লিখছিল সে সবের আর কিছুই পড়তে পারছেনা। সখী তমালিনীকে উষারাণী তার স্বামীর চিঠি পড়তে দিয়েছিল কিন্তু তার এক অক্ষরও সে আর পড়তে পারে না।

'একি পরিহাস ভাই?' তমালিনী কহে,
'এ কোন ভাষায় লেখা বাঙ্গালা ত নহে।
এ বুঝি সঙ্কেত ভাষা - নব আবিষ্কার?
বাঁচিনে বাঁচিনে ভাই ঠাট দেখে আর।'

খাওয়া সেরে শাশুড়ী কমলাকে রামায়ণ বইখানা নিয়ে আসতে বলেন। কমলা রোজ রামায়ণ পড়ে কিন্তু তার পাঠ শাশুড়ীর পছন্দ না হওয়ায় আজ তিনি নিজেই পড়বেন বলে ঠিক করেন। কিন্তু চোখে চশমা এঁটে পড়তে গিয়ে বইয়ের কিছুই পড়তে পারেন না। ভাবলেন চোখের চালসা কেটে গেছে তাই আর বুঝি চশমার দরকার নেই। চশমা খুলে আবার চেষ্টা করেন। কিন্তু

'যথা পূর্ব তথা পর' — দেখিতে না পান।'

সকরুণ সুরে বিলাপ সুরু করেন—

'এতদিনে চক্ষু দুটি গেল একেবারে,
কি ফল আমার আর বাঁচিয়া সংসারে।'

বঙ্গদেশবাসী যত আর্যগ্রন্থকার ছিলেন আবার তারা মহা হাহাকার জুড়ে দিলেন।

'আর না বিক্রয় হয় বহি একখানি,
সহসা বাঙ্গালা দেশে কি হ'ল না জানি।'

যদিও কভু না ছিল অধিক বিক্রয় –
তথাপি মুদ্রন ব্যয় উঠিত নিশ্চয় ।
সম্মুখে আসিছে পূজা - না করিলে আর
ছাপাখানা ঋণ শোধ, পথ চলা ভার ।

বইয়ের ব্যবসায়ীরা মহা অর্থসংকটে পড়েছেন —

' এবে সে দোকানগুলি শ্মশানের প্রায়,
কেহ নাহি একবার উঁকি মেরে চায় ।

রঙ্গালয়ে নাট্যকারেরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন —

'কহে একি দৈবলীলা'। কাতরে কান্দিয়া ।
যদি না রহিল দেশে স্ত্রী শিক্ষা এখন,
কি লইয়া বিরচিত হবে প্রহসন ।
অন্তে প্রহসন লোভে দর্শক - নিচয়,
ধৈর্য্য ধরি দেখে যেত অন্য অভিনয় ।
এখন আসিবে তারা কিবা প্রলোভনে ?
স্ত্রী শিক্ষা উঠিয়া গেল হায় কি কুক্ষণে ।'

যাঁরা স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন তাঁদের পাশে তারা নিজেরাই কষ্ট পেতে লাগলেন, সাথে নির্দোষ গ্রন্থকারেরা কষ্টভোগ থেকে রেহাই পেলেন না ।

মাসিক পত্রিকা পাঠের জন্য উন্মুখ পাঠক সময়মত পত্রিকা পড়তে পারছেনা । পূজা সংখ্যা পড়ে আনন্দে অধীর হবে । কিন্তু, —

'চাহিয়া চাহিয়া পথ আশা হয় ক্ষীণ,
পূজা যে চলিয়া যায় কাটিল আশ্বিন।
কি অপেক্ষায়, এতকাল ভারতীরে সেবি,
আজিকে বিস্মৃত বিদ্যা সম্পাদিকা দেবী ।'

যারা স্ত্রী শিক্ষা প্রচার করেন এমন সাধু সজ্জন গ্রন্থকারদের আকুল ক্রন্দন মানস - সরসী তীরে পৌঁছিলে, সখীদের অনুরোধে সরস্বতীদেবী শাপ প্রত্যাহার করেন এবং বাংলাদেশে আবার সুখশান্তি ফিরে আসে ।

প্রভাতকুমার স্বয়ং এই কবিতাটিকে ব্যঙ্গ কবিতা বলেছেন ।'একটা ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়াছি । তার নাম অভিশাপ।' [১৪] কবিতাটি সম্পর্কে অন্যত্র রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন —'আমার এক বন্ধু তর্ক করিতেছেন, পরিণাম এরূপ

হওয়া উচিত নয়, হইলে artistic হইল না। তিনি বলেন, এই ব্যঙ্গ কবিতার point হইতেছে fact এর সহিত বিরোধিতা, আগাগোড়া অসম্ভব ও অসঙ্গতির সৃষ্টি — তাহার সহিত পরিণামের fact এর সহিত সঙ্গতিটি(আমি যেমন করিয়াছি)মোটেই খাপ খায় না।

এই ত বিবাদ, আপনার কাছে আপিল করিতেছি। বিচার করিয়া বলুন, আমার পরিণাম সঙ্গত না বন্ধুর উপদিষ্ট পরিণাম সঙ্গত।' ৩৫

রবীন্দ্রনাথ এ ব্যপারে কি রায় দিয়েছিলেন জানা যায়নি তবে 'অভিশাপ' কবিতাটি 'ভারতীতে' প্রকাশিত হওয়ার পর প্রভাতকুমার লিখেছেন —

'ভারতী'তে আমার 'অভিশাপ' পড়িয়াছেন কি ? আপনার পরামর্শ মত পরিণাম পরিবর্তন করা আমার সাধ্যায়ত্ত হয় নাই। তথাপি আপ-নার কতকগুলি suggestions এর সদ্ব্যবহার করিয়াছি।' ৩৬

উপরে উধৃত পত্রদুইটির অংশ বিশেষ থেকে একথা বোঝা যায় কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের কিছু উপদেশ প্রভাতকুমার কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু পরিণাম পরিবর্তনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বা বন্ধুটির দেওয়া উপদেশ মেনে নিতে পারেন নি। এবং এই মেনে না নেবার জন্যই কবিতাটি সার্থক ব্যঙ্গরসাত্মক হয়ে উঠতে পারেনি। সত্যকারের ব্যঙ্গরসাত্মক রচনায় উপহাসের জ্বালা নিদারুণ ভাবে বর্তমান। ব্যঙ্গকার কঠোর নির্ম্মম, তিনি ক্ষমাহীন। মানুষের কোন ত্রুটির প্রতি তার সহানুভূতি থাকে না। ব্যঙ্গের কশাঘাতে মুখের হাসি শুকিয়ে যায়। হিউমারে আমরা হাসি এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে বেদনাবোধও অনুভব করি। বেদনাবোধ হলেও এখানে হাস্যরসিকের সমবেদনাশীল দৃষ্টি সকলের এক উদার সমদর্শিতায় ব্যথার জ্বালা আমরা তেমন অনুভব করি না। বৈদগ্ধপূর্ণ হাসির আবেদন বুদ্ধিশীল মস্তকে। এই ধরণের হাসিতে কথার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিকাশ লক্ষনীয়। বুদ্ধিধর্মী বাক্যের উপর হাস্যরস উৎসারিত হয়।

'অভিশাপ' কবিতায় উপহাসের জ্বালা বা তীব্রতা নাই, হাসির সঙ্গে হৃদয়ে কোন বেদনাবোধও আমাদের জাগে না অথবা পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য অনুধাবন করতে গিয়ে আমাদের মস্তিষ্ক পরিচালনা করতে হয় না। বরং এখানে আমরা লক্ষ্য করি নারী শিক্ষার প্রতি বিরূপ আর্য্যগ্রন্থকারদের প্রতি মৃদু ব্যঙ্গবান এবং সেই সঙ্গে সমাবেশ হয়েছে কিছু অস্বাভাবিক ঘটনার ও চরিত্রের, যাদের কার্য্যকলাপ নিয়ম বহির্ভূত ও অতিরঞ্জিত যা নাকি আমাদের মনকে সহজেই সচকিত ও আমোদিত করে তোলে। যেমন —

' কি কুক্ষণে বাঙ্গালায় স্ত্রী শিক্ষার ঢেউ
উঠিয়াছে — বলে আর কাঁদে ভেউ ভেউ ।'

আর্য-গ্রন্থকারের কান্নার সঙ্গে কুকুরের ভেউ ভেউ ডাকের তুলনায় ব্যঙ্গ রয়েছে ঠিকই কিন্তু যখনই ভাবি ভেউ ভেউ করে একটা মানুষ কাঁদছে তখন না হেসেও আমরা পারি না ।

অন্যত্র

' রাখা আছে দুগ্ধ ভরা বিলাতী বোতল ,
তাই শিশু পিয়ে টানি রবারের নল ।
সেকালে মানুষ দুধে শিশু পুষ্ট হ'ত,
বুদ্ধিসুদ্ধি হত তার মানুষেরি মত ।
গাভী ও গর্দ্দভ দুগ্ধ এবে করি পান ,
গো - গর্দ্দভ বুদ্ধিধারী হইবে সন্তান ।'

বোতলে রাখা গরু-গাধার দুগ্ধপানে সন্তানের বুদ্ধি গো-গর্দ্দভের মত হবে, নারী শিক্ষা বিদ্বেষী বিরোধী আর্য্যগ্রন্থকারের এই ধরনের চিন্তাধারায় নিঃসন্দেহে মূঢ়তা রয়েছে । লেখকের ব্যঙ্গবাণ এখানে হৃদয় বিদ্ধ করে। কিন্তু তাদের কান্না দৈবযোগে মানস-সরসী তীরেপৌঁছান, দেবীর অভিশাপ দেওয়া এবং সর্বশেষে অভিশাপ প্রত্যাহার করা এমন একটা আপোষ-মীমাংসা - কল্পনা ব্যঙ্গের তীব্রতাকে স্তিমিত করেছে । বরং এসব কাহিনীর মধ্যে আমরা এক প্রকার কৌতুক অনুভব করি ।তাই রচনাটিকে ব্যঙ্গ মিশ্রিত কৌতুক রসের কবিতা হিসাবে অভিহিত করা অন্যায় হবে না । ' অভিশাপ' এর আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন —' সরল রচনাটির কৌতুক রস স্বচ্ছ ও উপভোগ্য ।' [৩৭] মন্তব্যটি যথার্থ। কবিতাটির কাহিনী পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের হিং টিং ছট্' কবিতাটির পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে ।

দুইটি অংশে বিভক্ত (চন্দ্রের ইতিবৃত্ত এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা') 'কাব্য-বিজ্ঞান' [৩৮] কবিতাটিতে কবি নরনারীর প্রেম সম্পর্কে একটু হাল্কা রসিকতা করার প্রয়াস পেয়েছেন । রসিকতা অনেকটা বালসুলভ । কবিতায় একটি গল্প বলার ঢং লক্ষনীয়। কাহিনীটি এই —

প্রথম কবিতা' চন্দ্রের ইতিবৃত্ত'

বিশ্বরাজ্য যখন নূতন সৃষ্ট হয়েছে সে সময়ে একদিন মন্ত্রী রাজাকে বলে — রাত্রিকাল বিশ্রামের জন্য, তখন আকাশে চাঁদ উঠা অপব্যয় বিশেষ।

মানুষ উদ্যমশীল। দিনে তারা পরিশ্রম করে, রাত্রের আলোয় তাদের প্রয়োজন সামান্য এবং সেই প্রয়োজনটুকু তারা এরণ্ড বা সর্ষের তেলের দ্বারা পূরণ করে নিতে পারবে। মন্ত্রীর কথা শুনে বিশ্বস্রষ্টা 'ভগবান চন্দ্রমারে দিলেন বিদায়'। তার পর যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে রাত্রি ঘোর অমাবস্যায় ডুবে থাকে। অবশেষে একদিন প্রণয় দম্পতি ভগবানের কাছে অনুনয় বিনয় করে চাঁদকে আকাশে উদিত করার অনুরোধ জানায়। অবশেষে 'আকাশেতে আবার হইল চন্দ্রোদয়'। সেই থেকে চাঁদে প্রণয়ীদের একচ্ছত্র অধিকার।

দ্বিতীয় অংশ 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা'য় কবির বক্তব্য — পদার্থ বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি হওয়াতে দেখা যায় বিদ্যুৎ এক নিমেষের মধ্যে এগারো বার পৃথিবী প্রদক্ষিন করে আসছে। তবে কেন প্রণয় - বিজ্ঞানে কোন উন্নতি হবে না। এবার কবিরা আবিষ্কার করেছেন —

'চুম্বনের বিনিময় বিরহী - প্রণয়ী
স্বচ্ছন্দে করিবে এইবার।'

পদ্ধতিটা এই — পূর্ণিমার মধ্যরাত্রে ছাদের উপরে উঠে প্রণয়ী অথবা প্রণয়িনী যেখানে আছেন মানচিত্রে সেই গ্রাম অথবা নগর দেখে সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনবার প্রিয়নাম উচ্চারণ করে 'একটি চুম্বন দিবে বাতাসে ছাড়িয়া'। আবার তিনবার সেইনাম উচ্চারণ করা মাত্রই 'শতটি প্রতিচুম্বন পাবে ফিরাইয়া।' ফিরে পাওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ —

'ধাতু যথা তাড়িতের সু-পরিচালক
সেইরূপ, (আমরা করেছি আবিষ্কার)
প্রণয়ীর চুম্বনের পূর্ণিমা কিরণ।
প্রার্থনীয় পরীক্ষা সবার।'

কবিতাটিতে উদ্ভট কল্পনার চিত্রময়তা লক্ষনীয়।

অসঙ্গতিপূর্ণ কার্যকলাপ এবং উদ্ভট চিন্তাধারা পরিবেশনের গুণে হাস্যরস সৃষ্টি করায় প্রভাতকুমার যে কতখানি সিদ্ধহস্ত ছিলেন রচনা দুই-টিতে তার প্রমান পাওয়া যায়।

(৭) মাতৃভাষা - প্রীতি বিষয়ক কবিতা ।

রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে [৪১] প্রভাতকুমার জানিয়েছিলেন – 'আমি সারাজীবন আমার মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত থাকিব।' মাতৃভাষার প্রতি তাঁর একান্ত অনুরাগ কয়েকটি কবিতাতেও প্রকাশিত হয়েছে ।

'প্রদীপ' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩০৫ সালে। ঐ সংখ্যাটি প্রভাতকুমারের 'উদ্বোধন' নামক কবিতা দিয়ে শুরু হয়েছে। কবিতাটির ছাপার ব্যাপারে একটু বিশেষত্ব আছে। কবিতাটির চারপাশে সুশোভিত লতাপাতার মার্জিনে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টাদের যেমন মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি সবার চিত্র মুদ্রিত হয়েছে । প্রভাতকুমারের কবিতাটিকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছে । কবিতাটিতে 'বহু সাধনার ধন, সাধের বঙ্গভাষা' জননীর প্রতি আকুল আহ্বান জানিয়ে কবি বলেছেন —

'সকলে মিলিয়া জ্বেলেছি প্রদীপ
মা তোরি আরতি তরে ,
ডাকিতেছে আজ সকল ভক্ত
আয় মা করুণা করে'।'

'মাঙ্গলিক' [৪২] কবিতায় নববর্ষের সূচনায় 'সুর - সঙ্গীতে' কবিমন মাতোয়ারা — বিশ্ববাসীকে তার 'নবীন আশার' নবচিন্তায় অংশীদার করতে চেয়েছেন। সেজন্য দেবী বীনাপানির আনুকূল্য লাভের জন্য ভক্ত হৃদয়ের আকুল আকুতি জানিয়েছেন –

' ভকত-হৃদয় কমলবাসিনী
এস মা এস মা বাণী,
সারা বৎসর সেবিব আবার
তোমার চরণ রাণী।'

কবিতা দুইটিতে মাতৃভাষা সেবার জন্য ভক্ত হৃদয়ের গভীর আকুতি সহজ সরল ভাবে প্রকাশিত। শিশু সুলভ সরলতায় কবিমন এখানে মাতৃভাষার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণ বন্দনা করেছেন ।

(৮) বিবিধ।

প্রেম, প্রকৃতি, তত্ত্ব গাথা, ব্যঙ্গ ইত্যাদি কবিতা ছাড়াও বিভিন্ন ভাবরসের আরও কয়েকটি কবিতা প্রভাতকুমার লিখেছেন ।

'সেকালের প্রতি' [৪৩] কবিতায় বর্তমান কালের কবি অতীতের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন - অতীত সম্বন্ধে আমাদের মনে যে সুউচ্চ ধারণা, অর্থাৎ যা গত হয়েছে তা চিরিকালই সুখের - এ তথ্য কি সত্য ? অথবা বর্তমান কাল যাকে আমরা সর্বক্ষেত্রেই অভিশপ্ত বলে ধরে নি, ঠিক তেমনি আজকের অতীত এককালে যখন বর্তমান ছিল তার দেহওকি বর্তমানের অভিশাপ বহন করেছিল ?

বিগতকাল অর্থাৎ যে দিনগুলির সাথে আমাদের একটা নিশ্চিত ব্যবধান গড়ে উঠেছে সে কালকে মানুষ স্বভাবতই কিছুটা রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখে । অতীতের প্রতি এই স্বাভাবিক রোমান্টিক মনোভাবে বর্তমানকালের কবির মনে এক সংশয় জেগেছে ।

সনেট-কল্প এই কবিতাটি প্রভাতকুমারের অন্যতম সার্থক কবিতা। ভাব - ভাষার সার্থক রূপায়ন এখানে ঘটেছে। প্রথম আট পংক্তিতে রয়েছে অতীতের বর্ণনা, শেষের ছয় পংক্তিতে কবিতার বক্তব্য বিষয় বিধৃত ।

মানুষের মন যে চিরকাল আলোকের অন্বেষণ করে আসছে 'আলোক' [৪৪] কবিতার বক্তব্য বিষয় সেই সত্যটি। অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে, অন্ধকার থেকে আলোকে মানুষের যে স্বাভাবিক যাত্রাপথ বিস্তৃত হয় কবি শিশুর আচরণের মধ্যে সেই যাত্রার ধারা লক্ষ্য করেছেন । শিশু অবোধ, তার কাছে আলো অথবা অন্ধকার সমপর্য্যায়ভুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু নিতান্ত শৈশব অবস্থাতেই ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে অন্ধকার দেখলে সে কেঁদে ওঠে। প্রদীপের আলোয় স্নেহময়ী জননীর স্তনসুধাপানে সে সুস্থির হয়। এই আলোকের পিপাসা মানুষের চিরন্তন। তাই পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হলেও বিবেকরূপী আলো তার নির্ম্মূল হয় না। কবির বিশ্বাস ভগবৎশক্তিই এই আলোকের উৎসভূমি।

ভাব এবং ভাষার সংহতিতে সনেটকল্প — এই কবিতাটি সুন্দর হয়ে উঠেছে ।

কবি কালিদাস সংস্কৃতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে বর্ষাগমনে সমস্ত বিরহী হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনাকে একীভূত করে 'মেঘদূত' কাব্য লিখেছিলেন । প্রতি চরণে সতেরোটি অক্ষর সমাবেশে তিনটি যতি বিভাগে বিন্যস্ত এই ছন্দোরীতি যেন বিরহী যক্ষের সমস্ত আর্তিকে ধীর গতিতে

~~প্রকৃতি বিরহী হৃদয়ের~~

যেন বিরহী হৃদয়ের সমস্ত আর্তিকে ধীর গতিতে সার্থক ভাবে প্রকাশ করেছে। কালিদাসের সেই অমর ছন্দের ধ্বনিতে কবি বিস্ময় বিমুগ্ধ, এই ছন্দ শ্রবণে কবিমনে যে ভাবরসের সঞ্চার হয় 'মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রতি' [৪৫] কবিতায় সেই ভাব বিধৃত —

' শুনিলে তোমার ধ্বনি মধুর গম্ভীর ,
মনে হয় নব নীল জলদ ঘটায়
আকাশে গিয়াছে ভরি ; — বিদ্যুৎ ছটায়
সন্ত্রাসিত প্রাণ যেন। উন্মত্ত অধীর
সুশীতল বায়ু বহে। বরনীপমূলে
আরম্ভ হইল নৃত্য ভুবন শিখীর ।'

ছন্দমাধুর্য্যে জলদঘন দিনের কথা কবিমনে পড়ায় তার মনে প্রেমাকাঙ্খা জাগরিত হয় । মনে হয় যেন প্রিয়া তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন — আকুল নয়নে সেই জলভরামেঘ দেখে এক স্বর্গীয় আনন্দানুভূতিতে তিনি ভরপুর হয়ে ওঠেন ।

কবিতাটির প্রথম আট পংক্তি ভাব এবং ভাষা প্রকরণে সুন্দর হলেও শেষের পংক্তিগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল —

'ঝম ঝম শব্দে যেই আরম্ভিবে জল
আমি তার মুখে দিব চুম্বন শীতল'

এখানে ভাব ভাষা উভয়ই সাধারণপর্য্যায়ে নেমে এসে কবিতাটির সুস্থ প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে ।

চাঁদ জন্মলগ্ন থেকেই তার প্রিয়তম সূর্যের পশ্চাৎধাবন করে চলেছে অথচ কোন দিনই তার সান্নিধ্য লাভ ঘটেনি । 'চন্দ্রের - আক্ষেপ' [৪৬] কবিতায় চাঁদের এই অপ্রাপ্তি জনিত আক্ষেপ বিধৃত। তার এই না - পাওয়ার আক্ষেপ অবসিত হত যদি সূর্য্যের কিরণ সবসময়ে চাঁদকে ঘিরে থাকতো । কিন্তু চাঁদের দুর্ভাগ্য এমনই, পূর্ণিমার রাত্রি ছাড়া তাও সে পায় না । চাঁদের আক্ষেপ —

কি হইবে এক বিন্দু বারি
অনন্তের এ মহা-তিয়াষে'।'

সৃষ্টি কর্তা বিধাতার কাছে তাই তার অভিযোগ —

হায় এত উচ্চ পদে কেন,
হে বিধাতা স্থাপিলে আমারে ?
তাই ত অনল জ্বলিছে
চিরদিন মোরে দহিবারে ।'

এই দুর্বিসহ যন্ত্রনার হাত থেকে সে রেহাই পেত যদি —

' আহা যদি হইতাম আমি
পৃথিবীর ক্ষুদ্র তৃণগাছি
যদিও না পাইতাম তারে
হৃদয়ের অতি কাছাকাছি
সারাদিন অবিচ্ছিন্ন সুখে
হাসিতাম কিরণে তাহার'।'

মানব প্রেমের দেহাতীত সুক্ষ্মানুভূতি এখানে ব্যঞ্জিত।

নব নব ভাব সম্পদ নিয়ে কবিতা কবি মানসে ইতস্তত: বিচরণ করে। কখনো সে হৃদয়াঘাতে নির্গত অশ্রু নির্ঝরিণীর পাশে স্তব্ধ, কখনও বা বিহঙ্গের কলতানে প্রস্ফুটিত পুষ্পশোভায় আনন্দস্ফুরিত। আবার কখনও সেই ভাব বাস্তব জীবনের খরতাপে দগ্ধ হয়ে অন্তর্হিত হয়। হরিণীর রূপকের আড়ালে কবি মনের এই ভাব ব্যঞ্জিত হয়েছে 'কবিতা হরিণী' [৪৭] কবিতায়।

'একটি কুক্কুরের প্রতি' (আষাঢ়, ১৩০৬) কবিতায় প্রভাতকুমার তাঁর সমসাময়িককালের রবীন্দ্রনিন্দুকদের প্রতি স্পষ্টতই কটুবাক্য প্রয়োগ করেছেন —

'চিরদিন চন্দ্রপানে চাহিয়া চাহিয়া
এতদিনে কুক্কুর কি হইল পাগল ?
হাসিছে নবীন রবি নভ: উছলিয়া
তাহে কেন কুক্কুরের পরাণ বিকল।'

নাড়িয়া লাঙ্গুলখানি, উর্দ্ধপানে চাহি
ঘেউ ঘেউ ভেউ ভেউ মরে ফুকরিয়া
তবু ত' রবির আলো ম্লান হল নাহি
নাহি হল অন্ধকার জগতের হিয়া।'

সনেটের আকারে বিধৃত এই কবিতাটিতে কবিত্বের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু একান্ত রবীন্দ্র-অনুরাগী প্রভাতমনের অভ্রান্ত নিদর্শন বলে কবিতাটি বিবেচিত হতে পারে। কবিতাটি সম্পর্কে শ্রীপুলিন বিহারী সেন 'প্রভাতরবি' রচনায় বলেছেন —'সাহিত্য পত্রে একটি গল্পে যখন রবীন্দ্রনাথ নিন্দিত হন, তখন রবীন্দ্রনাথের প্রবীণ ও তরুণ অনুরাগী সকলেই ব্যথিত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রভাতকুমার সহজে শান্ত হননি, তার উত্তরে 'প্রদীপে' তীব্র ভাষায় গল্প - লেখককে আক্রমন করে যে কবিতা লিখেছিলেন প্রদীপের সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মত রবীন্দ্রানুরাগীকেও তার প্রকাশ বন্ধ করার নির্দেশ দিতে হয়েছিল। এই নির্দেশ সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়নি, ফলে এই কবিতার তাপ সেদিন বঙ্গসাহিত্য – সংসারে সুদূর প্রসারী হয়েছিল।'[৪৭]

নিজের কবিতা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন — ''আমার কবিতাগুলি সমস্ত আপনাকে দেখাইতে আমার বড় সাধ হয়। তাহাতে কবিত্ব থাকুক নাথাকুক। —' আপনার কথা ষোল কাহন আছে।' আপনি সেইগুলি পড়িলে আমার পরিচয় পাইবেন, এবং আমার বিশ্বাস, আমাকে আরও অধিক ভালবাসিবেন।'[৪৮] প্রকৃতপক্ষে প্রভাতকুমারের কবিতায় যে পরিমানে তাঁর আত্ম পরিচয় বর্তমান তদনুসারে 'কবিত্ব' অনুপস্থিত। কবিতা উপলব্ধির ব্যাপার — অনুভূতিশীল মানুষের মনে নিরন্তর যে ভাবের প্রবাহ বয়ে চলেছে সেই ভাব,'ভাষার মধ্য দিয়ে বিশেষ ব্যক্তির মনোভাব যখন সমবেদনায় অন্যান্য মনে সহজে ছড়িয়ে গিয়ে ব্যঞ্জনা সঞ্চার করে, তখনই বুঝতে হবে ভাষার বিশেষ আস্বাদন-বাহকতার পরিচয় পাওয়া গেল। কবিতার মধ্যে আছে ভাষার এই বিশেষত্ব।'[৪৯] তাই সার্থক কবিতা রচনায় ভাব এবং ব্যঞ্জনাময় ভাষার প্রয়োজন সমধিক।

'হোলি - কাহিনী' এবং 'অভিশাপ' কবিতা দুইটি বাদ দিলে প্রভাতকুমারের অবশিষ্ট কবিতাগুলিকে ব্যাপক অর্থে গীতি কবিতা বলা যেতে পারে। কিন্তু গভীর মনন এবং আত্মপরায়ণ ভাবের অভাব সর্বোপরি কাব্য-ভাষার দুর্বল প্রয়োগ তাঁর অধিকাংশ কবিতাকেই সার্থকতায় উন্নীত করতে পারেনি। 'শেষ দান' কবিতাটির উল্লেখ করা যায় এপ্রসঙ্গে। কবি এখানে প্রকৃতিকে জননী কল্পনা করেছেন। স্নেহময়ী প্রকৃতি-জননীর কোল থেকে পৃথিবী-প্রবাসে আগমনের প্রাক্কালে কবিমন স্বভাবতই বেদনাবিধুর হয়ে উঠেছে। অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে সেই বিদায়ক্ষণ বর্ণনায় লিখেছেন —

'শুকতারা তখনো ডোবেনি
গাছপালা তখনো আঁধার,
বেশীদূর আসি নাই আমি,

শুনিলাম পদশব্দ কার।
দেখিলাম পশ্চাতে জননী
আসিছেন কিসের লাগিয়া
কই ? কিছু মনে ত পড়ে না ,
এসেছি কি ফেলিয়া রাখিয়া ?'

বলাবাহুল্য — 'কই ? কিছু , মনে ত পড়ে না ,
এসেছি কি ফেলিয়া রাখিয়া ?' এই ভাষা কখনই কাব্য ভাষা হয়ে উঠতে পারে নাই । তাছাড়া বেদনামথিত চিত্তের আর্তিও এই ভাষায় সুপ্রকাশিত নয় ।

মানব - মানবীর প্রেম সম্পর্কে রসিকতা করেছেন 'কাব্য - বিজ্ঞান' কবিতায় । কিন্তু সেই রসিকতায় ভাব যেমন অগভীর ভাষাও ততোধিক দুর্বল । বিশ্বরাজ্য সৃষ্টির ঊষাকালে বিশ্বরাজ্যের মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজা অপব্যয়জ্ঞানে চন্দ্রোদয় বন্ধ করে দেন। অবশেষে একটানা অমাবস্যায় ক্লান্ত এক 'প্রণয়ী দম্পতি' বিভুপদে বহু অনুনয়ে চন্দ্রোদয়কে সম্ভব করে ।

' ভগবানে বলিয়া কহিয়া ,
অনেক করিয়া অনুনয়
অভিমত করিল তাঁহার
আকাশেতে আবার হইল চন্দ্রোদয় ।

চন্দ্র ত গিয়াইছিল ,
প্রণয়ীর উদ্‌যোগেতে হইল আবার ।
সে অবধী প্রণয়ীরই সম্পত্তি ওখানা ,
চন্দ্রটাতে তাহাদেরি পূর্ণ অধিকার ।'

কবিতাটির অপর অংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা'য় বিরহী প্রণয়ীর পারস্পরিক চুম্বন বিনিময়ের অদ্ভুত কৌশল কবির ভাবনায় এসেছে । পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতির কৃপায় তড়িৎ নিমেষেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে আর কবির উদ্ভাবনী শক্তিতে প্রণয় বিজ্ঞানে প্রণয়ীর চুম্বন বিনিময়ের অদ্ভুত পন্থা আবিষ্কার করেছেন —

' চুম্বনের বিনিময় বিরহী প্রণয়ী
স্বচ্ছন্দে করিবে এইবার।
পূর্ণিমার মধ্য রাত্রে ছাদের উপরে উঠি,

প্রণয়ী বা প্রণয়িণী আছেন যেখানে ,
মানচিত্রে সেই গ্রাম, নগর অথবা পল্লী
যে দিকে অঙ্কিত , মুখ ফিরি তার পানে ,
তিনবার প্রিয়নাম মৃদু উচ্চারণ করি
একটি চুম্বন দিবে বাতাসে ছাড়িয়া ।
তিনবার সেইনাম আবার করিবা মাত্র ,
শতটি প্রতিচুম্বন পারে ফিরাইয়া ।
ধাতু যথা তড়িতের সু - পরিচালক ,
সেইরূপ, (আমরা করেছি আবিষ্কার)
প্রণয়ীর চুম্বনের পূর্ণিমা কিরণ ।
প্রার্থনীয় পরীক্ষা সবার ।'

উদ্ধৃত কবিতাংশের ভাব- ভাষার দুর্বলতা কাব্যরসিকের কাছে সহজেই ধরা পড়ে ।

ভাব-ভাষার দুর্বলতা সত্ত্বেও কিছু যে রসোত্তীর্ন কবিতা তিনি রচনা করেননি এমন নয় । যেমন মহাযাত্রা , মায়াবাদ, ব্যাপ্তি , চন্দ্রের আক্ষেপ, সেকালের প্রতি ইত্যাদি । 'চন্দ্রের আক্ষেপ' কবিতায় সূর্য্যকিরণ লাভে আজন্ম বঞ্চিত চন্দ্রের আক্ষেপ এই ভাবে বিবৃত হয়েছে —

' আহা যদি হইতাম আমি
পৃথিবীর ক্ষুদ্র তৃণ গাছি ,
যদিও না পাইতাম তারে
হৃদয়ের অতি কাছাকাছি ,
সারাদিন অবিচ্ছিন্ন সুখে
হাসিতাম কিরণে তাহার ।
জীবনের অর্ধভাগ তবু
আলোকিত রহিত আমার ।'

এক যুবক যুবতীর আবেগ বিহ্বল চুম্বনের চিত্র দেখে কবিমনে ইচ্ছা জেগেছে ছবি-জন্মের মাধ্যমে প্রিয়া-মুখ-চুম্বনের অমরত্ব লাভের। ভাবটি এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে —'ছবি জন্ম' কবিতায় —

'শুনসখি আজি এই ছবিখানি গৃহে আনি ,
সাধ যায় মনে ,
তোমারে চুম্বিতে গিয়ে ছবি যদি হয়ে যাই
আমরা দুই জনে ।

তাহলে চিরদিন অধরে অধর মিলি
এই মত র'বে
মুহূর্তের মুখসুধা পান করি, অনন্তেও
শেষ নাহি হবে ।
মানব জনমে যাহা কভু হইবার নয়,
অসম্ভব অতি,
ছবি জনমেতে যদি তাহা হয়, আহা সেই
– সেই পরাগতি ।

রবীন্দ্রনাথের 'ছবি' কবিতার উত্তুঙ্গ কল্পনা অথবা ভাষা-লালিত্য এখানে অনুপস্থিত হলেও কবি চিত্তের আবেগ সরল ভাষায় সুন্দরভাবে এখানে বিধৃত হয়েছে ।

ছন্দের ক্ষেত্রেও প্রভাতকুমারের কবিতার বিশেষ কোন অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয় না । শ্রুতিনন্দন মিলের দৃষ্টান্তও বিরল । কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ প্রয়াস থাকলেও প্রভাতকুমার গতানুগতিক ছন্দেই তার কাব্য নির্ম্মাণ করেছেন । পয়ারই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর কবিতার বাহন।

সামগ্রিকভাবে প্রভাতকুমারের কবিতাগুলি আলোচনায় দেখা যায় তিনি প্রাচীন রীতি এবং ভাবনাকেই কবিতায় অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন এবং সেই চেষ্টা সর্বত্র সার্থক হয়েছে এমন কথাও বলা যায় না । অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন বাংলা কাব্য জগতে রবীন্দ্রনাথ তখন সুপ্রতিষ্ঠিত । বস্তুতঃ 'মানসী' (১৮৯০) কাব্য প্রকাশের পর থেকেই তাঁর প্রতিষ্ঠা ~~হয়েছে~~ এসেছে। রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়েই প্রভাতকুমারের কাব্য জগতে প্রবেশ। তিনি রবীন্দ্রস্নেহচ্ছায়ায় ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর কাব্যশক্তিকে সার্থকভাবে অনুধাবন করা প্রভাত-প্রতিভায় সম্ভব হয় নাই । প্রায় একই সময়ে একই ভাব নিয়ে রচিত প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথের দুইটি কবিতার তুলনায় এ কথা স্পষ্ট হবে ।

১৩০০ সালের আষাঢ় মাসে প্রভাতকুমার 'মিলনান্তে' নামক একটি কবিতা রচনা করে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং অনুরোধ করেন ' 'বিরহান্তে' নাম দিয়া আপনি ইহার একটি বিপরীত ভাবাত্মক সনেট রচনা করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিবেন । তাহা হইলে আপনার একটি কবিতা একসূত্রে গ্রথিত হইয়া থাকিবে, ...'[৫০] রবীন্দ্রনাথ কিন্তু

'মিলনান্তে' নামে প্রভাতকুমারের মত একই ভাবের একটি কবিতা রচনা করে পাঠিয়ে দেন। [৫১] উভয় কবিতার বিষয় বস্তু — দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের পর প্রিয়া মিলনে পূর্বেকার অনুরাগের অনুপস্থিতি। প্রভাতকুমারের কবিতায় দেখি এই অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান চলেছে। কবির ভাবনায় বহুদিন 'মিলন পিঞ্জরে' আবদ্ধ থাকার ফলেই হয়ত মিলনের তীব্রতাবোধ হ্রাস পেয়েছে। তাই প্রিয়ার 'মোহন চাহনি' 'কণ্ঠস্বর অথবা পরশ - আবেশে' পূর্বেকার উন্মাদনা মনে জাগে না। উন্মাদনার অনুপস্থিতিতে কবিমন কেমন অবসাদগ্রস্ত এবং এই অবসাদগ্রস্ততার সুরও কাব্য ব্যঞ্জনার অভাবে পাঠক মনে তেমন অনুভূতি জাগাতে পারে নাই। পূর্ণ পরিচয়ের জন্য কবিতাটিকে উদ্ধার করছি —

মিলনান্তে।

আমি যে তাহার পানে চাহিয়া থাকি না
নিমেষবিহীন হয়ে আপনা ভুলিয়া,
পাগল না হই শুনে তার কণ্ঠবীণা
পরশ-আবেশে আঁখি আসেনা ঢুলিয়া,
সে কি হায় ভালবাসা শুকায়েছে বলে,
লুকায়েছে ইন্দ্রজাল তাই অবসাদ ?
না গো না, অনেক দিন এ হৃদয়তলে
বহেছে সুখ লহরী, আসেনি বিষাদ,
বহুদিন বদ্ধ আছি মিলন পিঞ্জরে;
তার হাসি, তার কথা, মোহন চাহনি
তীব্র মদিরার মত দিবস রজনী
করি পান আছি ভোর উন্মাদনা জ্বরে।
বুকে সে আছে কি ঘুমে, বুঝিতে পারি না;
সহসা যদি সে চুমে, তবু শিহরি না।

বলাবাহুল্য কবিতার এই ভাষাও পাঠক মনে শিহরণ জাগায় না।

পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অনুভব করি মিলনের আনন্দানুভূতির স্বল্পতায় কবিমনের আবেগ মথিত চিত্তের তীব্র আর্তনাদ।

বিরহান্তে।

বিরহ বৎসর পরে, মিলনের বীণা
তেমন উন্মাদমন্ত্রে কেন বাজিলি না ?

কেন তোর সপ্তস্বর সপ্তস্বর্গ পানে
ছুটিয়া গেল না উর্ধ্বে উদ্দাম পরাণে
বসন্তে মানস যাত্রী বলাকার মত?
কেন তোর সর্বতন্ত্রী সবলে প্রহৃত
মিলিত ঝঙ্কার ভরে কাঁপিয়া কাঁদিয়া
আনন্দের আর্তরবে চিত্ত উন্মাদিয়া
উঠিলনা বাজি ? হতাশ্বাস মৃদুস্বরে
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া লাজে শঙ্কাভরে
কেন মৌন হল ? তবে কি আমারি প্রিয়া
সে পরশনিপুণতা গিয়াছে ভুলিয়া ?
তবে কি আমারি বীণা ধূলিচ্ছন্ন তার
সে দিনের মত ক'রে বাজেনাক আর ?

এখানে বলাকার অবারণ চঞ্চল গতিবেগ কবিমনে মিলনের পূর্বস্মৃতির গভীর তীব্রতাকে যেমন উদ্ঘাটন করেছে তেমনি ভাবে সেই অবসৃত অনুভূতির প্রতি ব্যাকুল আহ্বান জানিয়ে মনের আকুতি প্রকাশিত। কবিমনের এই আকুতির অনুরণন জেগেছে পাঠক মনেও । প্রভাতকুমার কবিতাদেহেই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান ঘটিয়েছেন এবং এখানেই কবির সীমাবদ্ধতা । অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে কবিমনের আবেগের তীব্রতা ও ব্যাপ্তি ।

কবিতা দুইটি সনেটের কাঠামোয় প্রকাশিত । রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাবের গাঢ়বদ্ধ নিটোল প্রকাশ সনেটের উপযোগী । সনেটের অবয়বে প্রভাতকুমারের কবিতায় ভাবশিথিলতা লক্ষনীয় ।

কাব্যরচনার মাধ্যমে প্রভাতকুমারের সাহিত্যচর্চা সুরু হলেও কাব্যে কবিতায় তাঁর প্রতিভার সম্যক প্রকাশ হয়নি। গল্প উপন্যাসই তাঁর আপন ক্ষেত্র । অতঃপর এই আলোচনা সেই দিকেই অগ্রসর হবে ।

উল্লেখ পঞ্জী

১। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সালের পত্রাংশ —দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫ পৃ: ১৪৯

২। ঐ ঐ — ঐ ঐ

৩। ঐ ঐ — ঐ ঐ

৪। প্রস্তাবিত এই কবিতাপুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখবার সৌভাগ্য হয় নাই সম্ভবত: সেইগুলি বিনষ্ট হয়েছে।

৫। ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন (ভূমিকাংশ) — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় পৃ: ॥ •

৫। ঐ (ঐ) ঐ ঐ পৃ: ॥৵•

৬। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সালের পত্রাংশ, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫ পৃ: ১৪৯

৭। ভারতী — ভাদ্র, ১৩০৩ ('অবসান' — শীর্ষক কবিতায়' মিলনান্তে' অংশ রচনা করেন প্রভাতকুমার অপর অংশ 'বিরহান্তে' রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা দুইটি পাশাপাশি ছাপা হয়েছিল।

৮। দাসী — অক্টোবর, ১৮৯৬।

৯। প্রদীপ — জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫।

১০। ভারতী — জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪ (কবিতাটি অদ্যাবধি কোন গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হয়নি। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।)

১১। 'মঙ্গলগ্রহ' কবিতাটি আলোচনায় 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর কবিতা' শীর্ষক আলোচনায় গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন — 'বাংলা ১৩০৪ সাল ইংরেজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই বছরেই তাঁর পত্নী ব্রজবালা দেবীর মৃত্যু হয়। 'মঙ্গলগ্রহ' কবিতায় কবির ভিক্ষা জন্মান্তরে তাঁরা দুজনে মঙ্গলগ্রহে ঘর বাঁধবেন। সেখানে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা দেবে না।" (কথামৃত -৫ম বর্ষ ১৯৭৩, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি সংখ্যা - পৃ: ২২, 'কথা ও সংস্কৃতি' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।) মন্তব্যটি ঠিক নয়। কারণ 'মঙ্গলগ্রহ' কবিতার প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪ সাল। ব্রজবালা দেবীর মৃত্যু হয় শ্রাবণ, ১৩০৪ সালে।

১২। প্রদীপ — আষাঢ়, ১৩০ ৫

১৩। প্রদীপ — ভাদ্র, ১৩০ ৫

১৪। প্রদীপ — মাঘ, ১৩০৫।

১৫। প্রদীপ — বৈশাখ, ১৩০ ৬

১৬। ভারতী — মাঘ, ১৩০৫

১৭। ঐ — মাঘ, ১৩০৬।

১৮। ঐ — বৈশাখ, ১৩০ ৬।

১৯। ঐ — শ্রাবণ, ১৩০৬।

২০। ঐ — আষাঢ়, ১৩০৬।

২১। ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন (ভূমিকাংশ)–শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় — পৃ: ১৵.

২৩। ভারতী ও বালক — কার্ত্তিক, ১২৯৭।

২৪। দাসী — জুন, ১৮৯৬

২৫। সাধনা — জুন, ১৮৯৬।

২৬। ভারতী — চৈত্র, ১৩০৩।

২৭। ভারতী — শ্রাবণ, ১৩০৭।

২৮। দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫ — পৃ: ১৫৫

২৯। পাণ্ডুলিপিটি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র সদনে রক্ষিত।

৩০। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৫ — পৃ: ১৫৬

৩১। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ২৪ ফাল্গুন, ১৩০২ সালের পত্রাংশ দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫ — পৃ: ১৫৬।

৩২। আধুনিক বাংলা সাহিত্য (~~প্রথম খণ্ড~~) — মোহিতলাল মজুমদার — পৃ: ১০৬

৩৩। ভারতী — আশ্বিন, ১৩০ ৬। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত প্রভাতকুমারের এইটি একমাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রথম সংস্করণ 'নব - কথা' গল্পগ্রন্থের শেষে কাব্যটির বিজ্ঞাপন ছিল এইরূপ —' অভিশাপ ব্যঙ্গকাব্য 'ভারতী' হইতে পুনর্মুদ্রিত। বহুমূল্য মসৃণ বিলাতী কাগজ। দুই রঙের রঙীন কালিতে ছাপা সুদৃশ্য মলাট। মূল্য দুই আনা, মাশুল দুই পয়সা। ডাকটিকিটে মূল্য লই। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস, প্রদীপ কার্য্যাধ্যক্ষ। ৩ শঙ্কর ঘোষের লেন — কলিকাতা।"

৩৪। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ৬ আশ্বিন, ১৩০ ৬ সালের পত্রাংশ — দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫ পৃ: ১৬৭।

৩৫। ঐ ঐ ঐ ২৫ আশ্বিন, ঐ ঐ ঐ পৃ: ১৬৭

~~৩৬।~~ ঐ ঐ ঐ

৩৬। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ৬ আশ্বিন, ১৩০ ৬ সালের পত্রাংশ — দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫ পৃ: ১৬৭

৩৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) — সুকুমার সেন - পৃ: ৪৬

৩৮। ভারতী — শ্রাবণ, ১৩০ ৪ ।

৩৯। দাসী — সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬।

৪০ । প্রদীপ — পৌষ, ১৩০৪

৪১। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ১২ চৈত্র, ১৩০ ২ সালের পত্রাংশ - দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫ পৃ: ১৫৮

৪২। ভারতী — জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭

৪৩। ভারতী — আষাঢ়, ১৩০৫।

৪৪। ঐ — বৈশাখ, ১৩০ ৩ ।

৪৫। ঐ — জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭।

৪৬। ঐ — মাঘ, ১৩০৫

৪৭। ঐ — বৈশাখ, ১৩০২ ।(৪৭)ক — দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫ পৃ: ১৩৮।

৪৮। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সালের পত্রাংশ দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫ — পৃ: ১৪৯

৪৯। কবিতার বিচিত্র কথা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — হরপ্রসাদ মিত্র পৃ: ৯ —১০।

৫০ । রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ১৬ আষাঢ়, ১৩০৩ সালের পত্রাংশ দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫ পৃ: ১৫০

৫১। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'মিলনান্তে' কবিতাটি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে ১৩০৩ সালের ভাদ্রমাসে 'ভারতী'তে 'বিরহান্তে' নামে প্রকাশিত হয় । কবিতাটির মুদ্রণে বিশেষত্ব এই 'অবসান' শিরোনামায় প্রভাতকুমারের 'মিলনান্তে' এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির মুদ্রণ কালে পরিবর্তিত নাম 'বিরহান্তে' একই সঙ্গে পাশাপাশি মুদ্রিত হয় ।

—

উপন্যাস ।

প্রভাতকুমারের তিরোধানের অব্যবহিত পরে কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন —" .... প্রভাতকুমার ছিলেন খাঁটি কথক - খাঁটি কথা সাহিত্যিক, উপকথা বলার ভঙ্গিটি ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ - এমন করিয়া কথায় কথায় শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইবার শক্তি — পাঠকের কৌতুহলকে শেষ পর্য্যন্ত সঞ্জীবিত রাখিবার কৌশল অতি অল্প সাহিত্যিকেরই আছে । কথা-সাহিত্যের নামে এখন অনেক প্রকার সাহিত্য চলিতেছে । প্রভাতকুমারের মত খাঁটি কথাসাহিত্যিক আজিও দুর্লভ । তিনি কথা সাহিত্যের মধ্যে আর কোন ভেজাল মিশান নাই - কথা সাহিত্যের মারফতে তিনি অন্য কোন কথা শুনান নাই , কথা সাহিত্যের নামে তিনি কোন তত্ত্ব, কোন তথ্য , কোন প্রশ্ন, কোন সমস্যা, সিদ্ধান্ত বা মন্তব্যকে গলাধঃকরণ করিতে বাধ্য করেন নাই । নিছক আনন্দ ছাড়া আর কিছু দেওয়ার চেষ্টা তাঁহার ছিলনা । ' ১

বর্ত্তমানযুগের সমালোচক প্রভাতকুমারের কথাসাহিত্য সম্পর্কে এ মন্তব্যকে সম্পূর্ণাংশে মেনে নিয়ে তাঁর সাহিত্যকৃতির প্রকৃত মূল্যায়নে হয়ত দ্বিধাগ্রস্ত হবেন। কথাসাহিত্য বলতে আমরা উপন্যাস ও ছোটগল্প উভয় রচনাকেই বুঝি এবং বাংলা সাহিত্যের ~~XXXXXXXXXXXX~~ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে উদ্ভূত এই দুই শাখার বিচার এবং মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে একটি সুনির্দ্দিষ্ট মানও পদ্ধতি সঠিক ভাবে আজও ~~হয়নি~~ নির্দ্ধারিত হয়নি। প্রথমত: উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। উপন্যাস বলতে আমরা কি বুঝি ~~X~~ এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —'' গল্প বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম , ... এই গল্প বলিবার বিশেষ একটি ভঙ্গীকে — গল্পের মধ্য দিয়া মানুষের প্রকৃত জীবনের ছবি আঁকিবার চেষ্টা , ঘটনা - ~~XXXXX~~ সংঘাতে তাহার চরিত্র ~~XXX~~ স্ফুরণের উদ্‌যোগ, সামাজিক মানুষের মধ্যে যে অহরহ: একটা আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহারই সূক্ষ্ম আলোচনা, ও এই দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্য দিয়া মনুষ্য জীবন সম্বন্ধে একটা বৃহত্তর ব্যাপকতর সত্যকে ফোটাইয়া তোলা —ইহাকেই উপন্যাস বলা যাইতে পারে ।" ২ উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব আমাদের সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টিকে সম্ভব করে তুলেছিল । ইংরেজী সাহিত্যেও উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপনে বিদগ্ধ সমালোচকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। উইলিয়ম হেন্‌রী হাড্‌সন বলেছেন - 'Plot characters, dialogue time and place of action, style and a stated or implied philosophy of life " ৩ এবং.... 'every novel must necessarily present a certain view of life and of some of the problems of life.' ৪ E.M.FORSTER উপন্যাস প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনায় -'the story, people, The plot fantasy

and prophecy, Pattern and Rhythm'

কে উপন্যাসের অঙ্গ রূপে XX চিহ্নিত করেছেন । অবশ্য তিনি একমাত্র বলেছেন —
~~and prophecy, Pattern and Rhythm~~
'The final test of a novel will be our affection for it, as

it is the taste of our friends and of anything else which we connot define.' "৬৫

স্বদেশ এবং বিদেশের সমালোচকগণের উপন্যাস সম্পর্কে এই মন্তব্যের ভিত্তিতে বোঝা যায় গল্প, চরিত্র, এবং অঙ্কিত চরিত্রের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ জীবনদর্শনের প্রকাশ, উপন্যাস শিল্পের প্রধান অঙ্গ । বর্ণিত চরিত্রের মাধ্যমে যেজীবন দর্শনের পরিচয় আমরা পাই সেই দর্শনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনদৃষ্টি । যেহেতু সাহিত্যিক সামাজিক জীব সেই হেতু যে দেশকাল এবং পরিবেশ থেকে তিনি উদ্ভূত সেই সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক রূপ, রুচি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং শৈল্পিক নিপুণতা - তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে ক্রিয়াশীল । প্রভাতকুমারের সাহিত্য বিচার এবং XXXXX মূল্যায়ণের জন্য এই প্রসঙ্গগুলি স্মর্তব্য ।

প্রভাতকুমারের জীবন আলোচনায় আমরা জেনেছি তিনি জন্মেছেন এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে । বাবা ছিলেন রেলওয়ে কর্ম্মচারী, তাঁর বদলীর সূত্রে প্রভাতকুমারের শৈশবকাল কেটেছে বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের রেল কোয়ার্টারে। প্রথম যৌবনে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন । সরকারী চাকুরী উপলক্ষ্যে গিয়েছেন সুদূর হিমাচল প্রদেশে। রবীন্দ্রনাথ তথা ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল, আবার ওকালতি পড়ার উদ্দেশ্যে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন য়ুরোপে । জীবন তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পুষ্ট, —সরকারী চাকুরী, শিক্ষকতা, উত্তরবঙ্গ এবং বিহার প্রদেশে ওকালতি, পত্রিকা সম্পাদনা, বিভিন্ন মনীষীর স্নেহ সান্নিধ্য, স্ত্রী বিয়োগ, পিতৃবিয়োগ, প্রেমে ব্যর্থতা ইত্যাদি। জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনদৃষ্টিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে ।

রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ এবং নির্দ্দেশে প্রভাতকুমার ১৩০২ সালের প্রথমদিকে গদ্য রচনায় উদ্যোগী হন । রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রপরিবারের সান্নিধ্যে এসে তিনি রবীন্দ্র-অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রথম জীবনের গল্পরচনার দু একটি প্লট রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন । কিন্তু আশ্চর্য্য এই, গভীর ভাবে রবীন্দ্র-অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-অনুগামী হননি । প্রভাতকুমারের প্রথম উপন্যাস 'রমাসুন্দরী' ৬ ধারাবাহিক ভাবে বৈশাখ, ১৩০৯ থেকে আশ্বিন, ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত ভারতীতে প্রকাশিত হয় । সামাজিক উপন্যাস রূপে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে । ৭ রবীন্দ্র-নাথের 'চোখের বালি'র রচনাকাল ১৩০৮ - ০৯। 'চোখের বালি' যখন রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নব পর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় তখন প্রভাতকুমার উপন্যাসটি

বেশ মনোযোগ সহকারেই পড়েছেন। ইতস্ততঃ ভাবে উপন্যাসটি সম্বন্ধে মন্তব্যও রেখেছেন —'' বিনোদিনীর বয়স একটু বাড়ান অত্যাবশ্যক বটে বিনোদিনী মহেন্দ্রর সঙ্গে যেরূপভাবে মেলামেশা করিতেছে, তাহা হিন্দু পরিবারে সাধারণতঃ দেখা যায় না। কচি বউদিদিরা বয়েস-বেশী বড় দেবরের সঙ্গে যদি কথাবার্তা কয়, তাহা অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে। বিবাহের পূর্ব হইতেই মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদিনীর আলাপ ছিল করিলে কেমন হয়?'' ৮ আবার মহেন্দ্রর নাইট ডিউটির খাতিরে বিছানাপত্র নিয়ে মেডিকেল কলেজের ছাত্রের হাসপাতালে বাসা বাঁধাও তাঁর কাছে আপত্তিকর। চোখের বালির মূল কথা শুধু মাত্র ঘটনা বিন্যাস নয় - মানব চরিত্র বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা' বের করে দেখানো।'[৯] বাংলা উপন্যাস সৃষ্টি-ধারায় 'চোখের বালি' এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মানব চরিত্রের অন্তস্থলে প্রবেশ করে রবীন্দ্রনাথ এখানে তার স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। উপন্যাস সৃষ্টির এই নবতম পদ্ধতিতে কিন্তু প্রভাতকুমারকে আকৃষ্ট হতে দেখা গেল না। বস্তুতঃ প্রভাত কুমার যখন উপন্যাস রচনা সুরু করেন অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এবং তার কিছু পরবর্তী সময়েও — উপন্যাস রচনার তিনটি ধারা আমাদের সাহিত্যে বয়ে চলেছিল। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সামাজিক - পারিবারিক উপন্যাস রচনার একটি আদর্শ স্থাপিত করেছিলেন 'বিষবৃক্ষ' (১২৮০), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রজনী' (১২৮৪) রচনার মাধ্যমে। বিশেষতঃ বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনার অনুকরণে প্রচুর উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে রচিত হলেও রচয়িতাগণ বঙ্কিমের সার্থক অনুকারী ছিলেন না। কিন্তু যে জীবনাদর্শ এবং নীতিকথা এই উপন্যাস দুইটিতে প্রকটিত হয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি রচনা ছাড়া এই জীবনাদর্শের ব্যত্যয় দেখা যায় না। এই 'নীতিপ্রধান ও গার্হস্থ্য রোমান্স' ১০ রচনার মাধ্যমে বঙ্কিম দেখাতে চেয়েছেন যে রমনী রূপ-মুগ্ধ প্রবৃত্তিদমনে অক্ষম পুরুষের জীবনের পরিণাম কি ভয়াবহ ক্লেশ-ক্লেদক্লিষ্ট এবং আইনের সম্মতি পেলেও বিধবা - বিবাহ বাঙালীর সংস্কার এবং সামাজিক পরিবেশে কোনপ্রকারেই সুখকর নয়। অন্যভাবে বলা যায় আমাদের বাঙালী জীবনের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন যাপনে সনাতন হিন্দু আদর্শে বিশ্বাসী বঙ্কিম গেয়েছেন পুণ্য বা ধর্মের জয়, পাপের শাস্তি, সতীত্বের মহিমা এবং সনাতন হিন্দু পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা। 'বিষবৃক্ষ' রচনার শেষে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন —'' আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।' ১১ কিন্তু বঙ্কিমের এই ইচ্ছা জটিল মানবমন সমর্থন করেনি। ইংরেজদের আগমনের পর পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধ বিশেষতঃ নারীর স্বাতন্ত্র্য- চেতনা এবং জাগৃতি-বোধ অঙ্কুরিত হয়েছিল, কালক্রমে সেই নারী চেতনা এবং ব্যক্তিত্ব

পল্লবিত হয়ে উঠেছে 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর চরিত্রে। বিনোদিনী নিজের দক্ষতা এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন তাই আশার মত অযোগ্য মেয়ে যে মহেন্দ্রর সংসার-সিংহাসন অধিকার করে আছে ঐ বোধ তাকে পীড়িত করছে। বিনোদিনী বিধবা, তার প্রেম প্রচলিত সমাজনীতির বিচারে বিসর্জিত। কিন্তু প্রেম নীতি-কথা বা নৈতিক বিচারের পথ চেয়ে সর্বত্র চলে না। প্রেমের সেই কুটিল গতিপথের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ 'চোখের বালি'র উপজীব্য বিষয়। অতএব দেখা যায় বঙ্কিম যেখানে প্রেমের মূল্যায়ণ করতে চেয়েছেন সমাজকল্যাণের এবং আদর্শের তাগিদে রবীন্দ্রনাথ সেখানে প্রেমের মূল্যবোধকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন নীতি-নিরপেক্ষ আপন মহিমায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালেই তাঁর সামাজিক পারিবারিক উপন্যাসের রচনাধারাকে পাশ কাটিয়ে আর একটি ক্ষীণ উপন্যাস রচনার ধারা প্রবাহিত হতে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে উচ্চ-বিত্ত-ধনী-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হৃদয়রাজ্যের অধিবাসী নায়ক নায়িকার প্রগাঢ় জীবন পিপাসা তথা প্রেমার্তি রূপায়নে সচেষ্ট হয়েছেন সেখানে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ প্রেম, হিংসা, ন্যায় - অন্যায় ইত্যাদি অতি সাধারণ ঘটনাবলীকে কেন্দ্রকরে কিছু উপন্যাস সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। এঁদের রচনায় জীবনের কোন গভীর আর্তির, প্রেমের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় নাই। প্রাত্যহিক জীবনের একান্ত প্রত্যক্ষ বহুমুখী সমস্যার রূপায়ণ মুখ্য হয়ে উঠেছে। এই ধারায় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণ- লতা' (১৮৭৪)। 'স্বর্ণ লতা'র আগে-'আমাদের এই চির পীড়িত, ধৈর্য্যশীল, স্বজন-বৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্ম্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙ্গালীর কাহিনী' কেউ এমন করে লেখেন নাই। প্রাত্যহিক বাঙ্গালীর ঘরের সুখ দুঃখের কথা নিয়ে লেখা 'স্বর্ণ-লতা' সম্পর্কে ড: সুকুমার সেন বলেছেন -' পুরাপুরি বাস্তবদৃষ্টি লইয়া উপন্যাস রচনা বাঙ্গালায় এই প্রথম। তারকনাথ যে উপন্যাসকে কাব্যের কল্পনা হইতে জীবনের অভিজ্ঞতায় নামাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন তাহা 'স্বর্ণলতার নাম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি হইতেই জানা যায়, —" কথাপি তোষয়েদ্ বিজ্ঞঃ যদ্যসৌ তথ্যবদ্ ভবেৎ।" বঙ্কিমের উপন্যাসে যে বাঙ্গালী জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে তাহা কল্পনা চিত্র, তারকনাথের 'স্বর্ণলতায় যে ছবি আঁকা হইয়াছে তাহা দৃষ্টি-চিত্র। ... রোমান্টিসিজমের রঙীন চশমা পরিয়া তারক-নাথ প্লটের পরিকল্পনা করেন নাই। তাঁহার পাত্রপাত্রীরাও সুদূর কিংবা অদূর অতীতের জীবিকানির্বাহ চিন্তাধারা ক্লিষ্ট প্রণয়রসাতুর কল্পনা স্বর্গ-বাসী নয়। ...... 'স্বর্ণলতায় পাত্রপাত্রীরা সব সাধারণ "পাঁচপাঁচি"

মানুষ, তাহাদের মধ্য দিয়া লেখক কোন উদাত্ত ভাব অথবা সুগভীর তত্ত্ব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই। ..... চরিত্রচিত্রণে কোথাও যে খুঁত নাই এমন কথা বলি না, কিন্তু সে অতিরঞ্জন নয়। স্বর্ণলতার ভাষায় বঙ্কিমের কাব্যশ্রী নাই বটে, কিন্তু তাহা সরল প্রাঞ্জল এবং বর্ণনীয় বিষয়ের একান্ত উপযোগী।" ১২

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের জীবন কাহিনীকে কেন্দ্র করে রমেশ চন্দ্র দত্ত দুইটি উপন্যাস লিখেছেন - 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪)। বর্ধমান জেলার এক সাধারণ পরিবারের সুখ দুঃখের কথা এমন নিখুঁত ভাবে লিখেছেন মনে হয় যেন পাত্র - পাত্রীরা অতি স্বাভাবিক এবং আমাদের অতি পরিচিত। কাহিনীতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিধবা সুধার সাথে কলেজে পড়া শরৎয়ের বিবাহ। কাহিনীগত ভাবে উপন্যাসটিকে বিষবৃক্ষের জবাব বলা যাইতে পারে। শরৎ -সুধার প্রেমের চিত্র অতি সাধারণ - , — মানব হৃদয়ের গভীর রহস্য উদঘাটনে তিনি ব্যস্ত হন নাই। বিধবা বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করা তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য থাকলেও —' শরৎ ও সুধা জীবন - কাহিনী ও প্রীতির সম্পর্কটি এমন করুণ সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হইয়াছে যে, তাঁহাদের বিবাহকে আমরা আর্টের অনুমোদিত ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই গ্রহণ করি, সৌভাগ্যক্রমে সংস্কারের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নই থাকিয়া যায়।' ১৩ 'সমাজ' উপন্যাসে তিনি অসবর্ণ বিবাহের কথা ঘোষণা করেছেন। উপন্যাসদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত ব্যক্তির চরিত্রচিত্রণ অত্যন্ত সজীব ও সুন্দর।

এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবৌ' (১৮৮০), 'যুগান্তর' (১৮৯৫), 'নয়নতারা' (১৮৯৯) উল্লেখ করা যেতে পারে। প্লট রচনায় শৈথিল্য, চরিত্রচিত্রণে অপূর্ণতা সত্ত্বেও সরেস বর্ণনার গুণে উপন্যাসগুলি বেশ উপভোগ্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'যুগান্তরের' সমালোচনায় বলেছেন -' এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্র সৃজন, এমন সরেস হাস্য, এমন সরল সহৃদয়তা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ।' ১৪

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' (১৮৯২), 'কাহাকে' (১৮৯৬) উপন্যাস দুইটি এই পর্যায়ের রচনা। উপন্যাস হিসাবে রচনাগুলিতে বিশেষ কোন শিল্প নিপুনতার পরিচয় না থাকলেও আমাদের সাধারণ পারিবারিক জীবন-চিত্রণ অনেকাংশে নিখুঁত এবং বাস্তবানুগ। 'স্নেহলতা' য় ঘটনা এবং চরিত্রের পরিণতি কিছুটা সঙ্গতিহীন তবে বাঙ্গালী সমাজের আধুনিকতার সমস্যায় কিছু আলোচনা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। 'কাহাকে' উপন্যাসে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ পরিবেশে লালিতা এক মহিলার প্রণয় কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এখানে সমসাময়িক কালের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের বাস্তব রূপের পরিচয় আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরার সঙ্গে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও প্রচুর পার্থক্য রয়েছে।

প্রভাতকুমার যখন উপন্যাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন তখন বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস - রচনা - ধারায় তিনটি প্রবাহকে লক্ষ্য করা যায় । প্রথমত: -বঙ্কিম প্রবর্তিত জীবনাদর্শ এবং চরিত্র চিত্রণ পদ্ধতি, দ্বিতীয়ত: - অংশত: বঙ্কিম আদর্শ - বিমুক্ত রচনার প্রয়াস - যেখানে বাঙালীর সাধারণ পারিবারিক সামাজিক জীবনরূপের প্রাধান্য, তৃতীয়ত: - রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত জীবনাদর্শ এবং চরিত্র চিত্রণের প্রচেষ্টা ।

প্রভাতকুমারের উপন্যাস আলোচনায় দেখা যাবে, তাঁর রচনার ভাবাদর্শে অথবা চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথের গভীর মননশীলতা, সুমহান জীবনাদর্শবোধ অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের মত জীবনবোধে ন্যায়-নীতির প্রাধান্য প্রভাতকুমারের উপন্যাসে সমধিক প্রতিধ্বনিত হয়নি, যতখানি হয়েছে সাধারণ বাঙালীর পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনবোধ । অবশ্য একথা অনস্বীকার্য বঙ্কিমচন্দ্র যখন লেখনী ধারণ করেছিলেন তখন আমাদের জাতীয় জীবন এক ভাবসংকটের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। নবজাগরণের অভিঘাতে এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য - বিজ্ঞান-দর্শনের প্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাচীন সামাজিক আদর্শ ও ঐতিহ্য সমস্তই বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মানব প্রত্যয় ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ স্বীকৃত হলেও সমাজানুগত্য মনোভাব অনেকস্থলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে আচ্ছন্ন করেছে, কখনও বা অশৃঙ্খলিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা ও গভীর জীবনবোধ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করেনি কিন্তু তার স্বেচ্ছাচারিতাও তার পক্ষে সহনীয় বলে মনে হয়নি, তাই তাঁর সমাজ-কল্যাণমুখী দৃষ্টি অন্ধ কুসংস্কারকে বর্জন করে সমাজ কল্যাণের দৃষ্টিকোণথেকেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করেছে। বঙ্কিমের শিল্পলোকে ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিতা, রোহিনী বা কুন্দনন্দিনী নয় । বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রচলিত তথাকথিত সমাজনীতি থেকে কিছুটা মুক্তি পাওয়ায় 'চোখের-বালি'র সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করেছে ।

(ক)

প্রভাতকুমার সর্বমোট পনেরটি উপন্যাস লিখেছেন। তন্মধ্যে বারোয়ারী উপন্যাসের মাত্র নয় থেকে এগারো পরিচ্ছেদ প্রভাতকুমারের, বাকি অংশ অন্যান্য এগারোজন সাহিত্যিকের রচনা এবং শেষ উপন্যাস 'বিদায়বাণী' অসমাপ্ত রেখেই তিনি পরলোক গমন করেন ।

(১)

প্রভাতকুমারের প্রথম উপন্যাস 'রমাসুন্দরী' প্রথমে ভারতীতে ধারাবাহিকভাবে বৈশাখ, ১৩০৯ থেকে আশ্বিন, ১৩১০ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় । ১৩০৯

সালে'সুন্দরী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল পরে লেখক নাম পরিবর্তন করে 'রমাসুন্দরী' রেখেছেন। ১৩১৪ সালে ভাদ্র মাসে'রমাসুন্দরী' পুস্তকাকারে প্রকাশলাভ করে।

বিশালাক্ষী গ্রামের বংশানুক্রমিক জমিদার, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী শ্রীকান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতায় থেকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁর একমাত্র পুত্র নবগোপালের বিয়ের জন্য একটি ডাগর মেয়ের অণ্বেষণ করছেন। পুত্রের বিয়েতে যৌতুক স্বরূপ কিছু জমি জমা নিয়ে জমিদারীর আয়তন স্ফীত করা তার অন্যতম উদ্দেশ্য। সমপর্যায়ের এক জমিদারের মেয়ে দেখা এবং মোটামুটিভাবে বিয়ের কথাবার্তা স্থির হয়ে গেছে। এমন সময় কান্তিচন্দ্রের স্ত্রী কমলাদেবী জানতে পারেন যে গোমস্তা গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যয়ের কন্যা রমাসুন্দরীতে নবগোপালের মন আসক্ত এবং সেখানে বিয়ের কথা নবগোপাল দিয়ে ফেলেছে। কমলাদেবী পুত্রকে ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে অনেক বোঝান - কিন্তু নবগোপাল মত পরিবর্তন করতে স্বীকৃত হয়নি। এ খবর যথাসময়ে কান্তিচন্দ্রের গোচরে আসে এবং তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন - এবং নবগোপালকে আদেশ দেন যে কান্তিচন্দ্র যে মেয়েকে পছন্দ করেছেন সেখানেই নবগোপালকে বিয়ে করতে হবে। নবগোপাল দৃঢ়চিত্তে তাতে অসম্মতি জানায় এবং পিতাপুত্রের বিরোধ দেখা দেয়। পিতার আক্রোশের স্বরূপ নবগোপালের অজানা ছিল না তাই গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের সাথে পরামর্শ করে পশ্চিমে গিয়ে রমাসুন্দরীকে বিয়ে করে। এদিকে কান্তিচন্দ্র প্রচণ্ড আক্রোশে গঙ্গাধরের ঘরবাড়ী ধূলিসাৎ করে। বিয়ের পর নবগোপাল মাকে সব কথা জানায় - মায়ের চিঠিতে কান্তিচন্দ্রের মোজাজের খবর পেয়ে বাড়ী ফিরে আসার বাসনা পরিত্যাগ করে এবং অনুসংস্থানের জন্য চাকুরী নিয়ে কাশ্মীর চলে যায়। বিয়ের পর এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু কান্তিচন্দ্র পুত্রের সঙ্গে কোন আলোচনা করেন নাই। হঠাৎ একদিন নবগোপালের অসুস্থতা জ্ঞাপক টেলিগ্রাম আসায় কান্তিচন্দ্র একমাত্র পুত্রের জন্য বিচলিত হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষনাৎ পুত্রের উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে রওনা হন। কিছুদিন পর নবগোপাল আরোগ্য লাভ করে - পিতাপুত্রের মিলন হয়।

প্রভাতকুমারের জীবনদৃষ্টি মূলত: রোমান্টিক। রোমান্টিক দৃষ্টির বিশেষত্ব এই বুদ্ধি-বিচার যুক্তি জীবনের শেষ কথা নয়, হৃদয়ের আলোতে যাকে সত্য বলে মনে হয় তাকেই গ্রহণ করা। চিরাচরিত প্রথা বা সংস্কারের উপর আস্থা না রেখে ব্যক্তি-প্রাণের সত্যকেই ধ্রুব জ্ঞানে জগৎকে দেখা রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়। এই চিরপরিচিত বিশ্বজগতের মধ্যে অতিপরিচিত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যেটুকু অজানা, যেখানে বিস্ময় লুকিয়ে আছে, রোমান্টিক ভাবুকের আশ্রয়স্থল সেইখানে। রোমান্টিক ভাবনা বাইরের জগৎ নিয়ে খুশী থাকতে পারে না

বাস্তবের অপূর্ণতাকে অন্তরের মাধুরী মিশিয়ে পূর্ণ করে নেয়। ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে সব কিছুর মধ্যে সঙ্গতি পারম্পর্য্য ও সুশৃঙ্খলা দাবী করে, রোমান্টিকতা সেখানে কিছুটা এলোমেলো আপাতদৃষ্টিতে খাপছাড়া। তাই ক্লাসিক শিল্পকলা ভাস্কর্য-ধর্মী, রোমান্টিক শিল্প অনেকাংশে চিত্রধর্মী। আবার রোমান্টিক এবং রিয়ালিস্টিক চিন্তাধারার মধ্যেও একটি সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে। রোমান্টিক ভাবনা বাইরের বস্তুকে অবলম্বন করে অন্তর্জগতে ফিরে আসে আর বাস্তববাদী বাইরের জগৎকে বড় করে দেখেন, বস্তু বা ঘটনাকে তার স্বরূপে রেখেই বিচার, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ণ করেন। প্রসঙ্গত: আদর্শবাদের কথা এসে পড়ে। আদর্শবাদী দৃষ্টি নিজের অন্তরের মহিমা বাইরের জগতে আরোপ করে নূতন জগৎ সৃষ্টি করে। রোমান্টিক দৃষ্টিও একই ভাবে জগৎকে সৃষ্টি করে কিন্তু আদর্শবাদী যেখানে নিজের আদর্শ অনুযায়ী জগৎ সৃষ্টি করে নেয়, রোমান্টিক দৃষ্টি সেখানে রহস্যের জাল গড়ে তোলে। প্রসঙ্গত এই সূক্ষ্ম ভেদাবিচার নিতান্ত বাহ্যিক। বস্তুত সাহিত্য বিচারে একই রচনায় ক্লাসিক্যাল থেকে রোমান্টিক অথবা রোমান্টিক থেকে ক্লাসিক হওয়ার কোন বাধা নেই।

প্রভাতকুমারের রোমান্টিক জীবনদৃষ্টির পরিচয় রয়েছে তার প্রথম উপন্যাস রচনা 'রমাসুন্দরী'তে। কাহিনীর পটভূমিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন আমাদের অতিপরিচিত দৃষ্টি থেকে একটু দূরে 'পিয়ালী নদী যেখানে সুন্দর বনে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার তিন ক্রোশ উত্তরে বিশালাক্ষী গ্রামে। নদী হইতে শুধু বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরচূড়া দেখা যায় মাত্র, গৃহপুঞ্জ ঘনসন্নিবিষ্ট ঝাউ, জিন ও আম্রবৃক্ষে পরিবেষ্টিত।' মন্দির বা গ্রামের ঘরগুলি অতি স্পষ্ট দৃশ্য নয়, ঝোপঝাড়ের আড়ালে রেখে একটু দূরত্ব সৃষ্টি করে তুলেছেন। কাহিনীর নায়িকা রমা চরিত্রের পরিকল্পনায় এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। "রমা বন্যবিড়ালীর মত বৃক্ষারোহন করিয়া থাকে। স্নান করিতে গিয়া পিয়ালী নদীটিকে একেবারে তোলপাড় করিয়া আসে। ছিপ লইয়া পুকুরে মাছ ধরে - এমন কি তীর - ধনুক পর্য্যন্ত ছুড়িতে জানে।" রমা মাঝে মাঝে কোঁচা দিয়ে কাপড় পরে 'সূক্ষ্ম কারুকার্য্যসম্পন্ন' আঙ্গিয়া সর্বদাই তাহার অঙ্গশোভা করে। রমার জঙ্গলে বাস, নতুবা সমাজে মাথা তোলা অসম্ভব হয়ে উঠতো। রমা চরিত্রের পরিকল্পনাতে লেখকের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে। এছাড়া বিবাহের পর রমা নবগোপালের কাশ্মীর যাত্রায় লেখক যে দীর্ঘ পথের বর্ণনা দিয়েছেন সেই পথ-বর্ণনাও রোমান্টিক দৃষ্টি প্রসূত।

লেখকের এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই 'রমাসুন্দরী'র কাহিনী বর্ণনা সর্বত্র সংহতি লাভ করতে পারে নাই। আবার তাঁর সহানুভূতিশীল মানসিক সংগঠন কাহিনীতে পুত্রের অবাধ্যতাকে ক্ষমা করে পিতাকে সস্নেহে নিজ পুত্রকে বুকে টেনে নিতে সাহায্য করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রও রোমান্টিক লেখক, অন্ততপক্ষে তাঁর উপন্যাসগুলিতে সে পরিচয় আছে। কিন্তু প্রভাতকুমারের রোমান্টিক দৃষ্টি থেকে সে দৃষ্টির পার্থক্য প্রচুর। রোমান্টিক দৃষ্টির প্রভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যখন নায়ক নায়িকাকে নির্বাচন করেছেন এমনকি তাঁর সমসাময়িক কালের বাঙালী উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘর থেকেও যে চরিত্রগুলি এসেছে সেখানেও তিনি নিত্য দিনের পরিচিত সংসার থেকে তাদের একটু দূরেই রেখেছেন। 'বিষবৃক্ষের' নগেন্দ্র, কুন্দনন্দিনী, সূর্য্যমুখী এবং কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলাল, রোহিনী, ভ্রমর বাস্তব সংসারের সঙ্গে এদের যোগাযোগ অতি অল্পই। বিশেষত: কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী, রোহিনী, ভ্রমর সবাই যেন হৃদয়ের কারবারী। আপন আপন প্রেম স্বপ্নেই বিভোর। প্রেম চিন্তার বাইরে যে বিশাল কর্মময় জগৎ সংসার সেখানে এদের কার্য্য কলাপ অতি সীমিত। "বস্তুত: বঙ্কিমের উপন্যাসে বাস্তব অনুগতির স্থান কখনই প্রধান নয়। তাঁহার কল্পিত পুরুষ নিজেদের প্রণয় স্বপ্নে মশগুল, হৃদয়ারণ্যে তাহাদের বাস প্রতিদিনকার ঘরকরনার কাজে তাহারা দেখা দেয় না। তাই হৃদয়দ্বন্দ্বের ও প্রণয় ব্যাকুলতার বাহিরে যে বৃহত্ কর্ম ও ভাব-জীবন পড়িয়া রহিয়াছে সেখানে তাহাদের স্থান নাই। মাঝে মাঝে যেটুকু গৃহস্থালির বর্ণনা আছে সেটুকু রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের মত অচল ছবি, নায়ক নায়িকার প্রাণের সংযোগ সেগুলিতে নাই।" ১৫ অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রকে এজন্য যথার্থ মূল্য না দেওয়ার কোন কারণ নাই। বঙ্কিমের উচ্চশিক্ষিত মার্জিত রুচি এবং যুগের দাবিতে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ তৎকালীন সমাজজীবনের একটি আদর্শ বেঁধে দিতে প্রেরণা দিয়েছিল। তাই তাঁর উপন্যাসে গল্পরস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একটি আদর্শকেও স্থান দিতে হয়েছে। অর্থাৎ রোমান্টিক থেকে তিনি আদর্শবাদী হয়ে উঠেছেন। অপরপক্ষে প্রভাতকুমারের জীবনাদর্শে কোন সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা ছিল না - নীতি প্রচার করে জনজীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি গল্প বলতে চেয়েছেন আনন্দ দেবার জন্য, গল্প বলে পাঠককে ভুলিয়ে রাখার জন্য। তাই কাহিনী বলতে গিয়ে যে রোমান্টিক রাজ্যে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সেখান থেকে আমাদের এই বাস্তব পৃথিবী খুব বেশী দূরে নয়। নবগোপাল প্রেমে পড়ে পিতার আদেশ লঙ্ঘন করে রমাসুন্দরীকে বিয়ে করেছে কিন্তু রামায়ণের আদর্শে পিতৃসত্য পালনের জন্য নিজের সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে বনবাসে প্রস্থান করেননি। প্রভাতকুমারের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বর্ণনা এত স্পষ্ট এবং পরিচিত যে বাস্তব জগৎকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্য ভাবে বলা যায় প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গী রোমান্টিক হলেও বাস্তবাভিমুখী। বঙ্কিম যেখানে রোমান্টিক থেকে আইডিয়ালিস্টিক হয়েছেন, প্রভাতকুমার সেখানে রোমান্টিক থেকে প্রায়শ:ই রিয়ালিস্টিক হয়ে পড়েছেন।

রোমান্স লেখকের যতই অতীত-প্রিয়তা, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস থাকুক না কেন বাস্তব জীবনের সঙ্গে একেবারে সম্পর্করহিত তিনি হতে পারেন না - জীবনের সঙ্গে ঐক্য সূত্র হারিয়ে গেলে অবাস্তব কাহিনীতে রচনা পর্য্যবসিত হবে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে রোমান্স সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্বপ্ন, সাধু - সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ-বাণী এবং কিছু অলৌকিক অতিপ্রাকৃতের আশ্রয় নিয়েছেন - বিষবৃক্ষে কুন্দের দুইবার স্বপ্ন দর্শন, কপালকুণ্ডলায় কাপালিকের ধর্ম - সাধনা, নির্জন সমুদ্রতীর, ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানার জন্য দেবীপদে বিল্বপত্র অর্পণ বা আকাশপটে ভৈরবীমূর্তিদর্শন ইত্যাদি আলৌকিকতা থাকলেও বর্ণিত চরিত্রের মূল ধারাটিকে স্পষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত। বঙ্কিমের বিশ্লেষণের নিপুনতায় এগুলিকে উপন্যাসের বিচ্ছিন্ন অংশ মনে হয় না। কিন্তু প্রভাতকুমার রোমান্টিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন ঘটনার আকস্মিকতায় কৌতুককর পরিস্থিতির পরিকল্পনায়।

"রমাসুন্দরী'তে নবগোপালের মনে প্রথম দর্শনজাত প্রেম চিত্রটি আঁকতে গিয়ে নবগোপালের খাঁচা খুলে হঠাৎ পাখী উড়িয়েছেন, নির্জন দুপুরে আমবাগানে রমাকে উপস্থিত করিয়ে তার 'সহবতশিক্ষাবিহীনা' স্বভাবের আকর্ষনীয় পরিচয় দিয়েছেন। ভাবতে কষ্ট হয় না এহেন নির্জন পরিবেশে নব্য যুবক নবগোপাল 'ধরণধারণ ভাবসাব বালিকার মত অথচ দেখিতে নব-যৌবনশালিনীর মত' সুন্দরী রমার রূপে মুগ্ধ হবে। ঘটনার অস্বাভাবিকত্ব আমাদের মনে হয় না বরং পরিবেশটি চিন্তা করলে মনে রোমান্সের শিহরণ জাগে।

উপন্যাসের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভরশীল বর্ণিত চরিত্রের এবং ঘটনা বিশ্লেষণের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের পারঙ্গমতার উপর।'রমাসুন্দরী'তে এই যোগসূত্র খুব সার্থকতা অর্জন করেছে বলে মনে হয় না। লেখকের বাস্তব এবং কৌতুহলী দৃষ্টির সম্মুখে যা পেয়েছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে অনেক সময় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ফলত: ঘটনার গতিবেগকে ব্যাহত করেছে। 'রমাসুন্দরীর ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে যেখানে নবগোপাল পিতা কান্তি-চন্দ্রের কঠোর আদেশ অবহেলা করে রমাসুন্দরীর পানিগ্রহণের জন্য দিন স্থির করতে ব্যস্ত, নিজের প্রেমাকাঙ্ক্ষা এবং পিতৃআদেশ বিরোধিতায় মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত, মহেশপুরের ঘাটে নৌকা ভিড়তেই লাফিয়ে মাটিতে নেমেছে যে নবগোপাল, সেই নবগোপাল রমার বাবা গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গিয়েছে দিনস্থির করার জন্য এবং গদাধর যখন কক্ষান্তরে গেছেন, নির্বিকারচিত্তে "নবগোপাল ইতিমধ্যে কক্ষখানির চতুস্পার্শ্ব ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাইল। যদিও ভিত্তিগুলি মৃন্ময়, মেঝেটি সানে বাঁধা - সদ্য ধৌত বলিয়া বোধ হয়। দেওয়ালে কয়েকটি কুলুঙ্গি, তাহার কোনটিতে একটি গনেশ, কোনটিতে একটি সিঁদুর-চুপড়ী, কোনটিতে বা বটতলার বাঁধা দুইখানি ধর্মকাব্য

রক্ষিত । একটি কোণে একটি বড় বাহারের দ্রব্য ঝুলিতেছিল - তাহা কড়ির আলনা । তাহার অবলম্বনরজ্জু দুইটি শালু দিয়া যোড়া - শালুর উপর গুচ্ছ গুচ্ছ'চিকি' কড়ি বসানো । আলনাটিতে কয়েকখানি লেপ বোধ হয় রক্ষিত আছে, আকারটি হস্তিপৃষ্ঠের ন্যায় । বহির্দেশ পুরাতন ধৌতবস্ত্র দিয়া উত্তমরূপে আবৃত। এই লেপের দুইটি'গলি' পিসীমার পরম গোপনীয় স্থান ।" বলাবাহুল্য কক্ষের এই বিস্তারিত বর্ণনা বাস্তবানুগ হলেও কাহিনীর অগ্রগতির তীব্রতাকে ব্যাহত করেছে । বিবাহের পর কাশ্মীর যাত্রায় দীর্ঘ পথ বর্ণনা কাহিনীর গুরুত্ব এবং চরিত্র বিকাশের পরিপন্থী ।

'রমাসুন্দরী'র কেন্দ্রীয় ঘটনা রমা -নবগোপালের প্রেম সঞ্জাত বিবাহ এবং নবগোপালের পিতা কান্তিচন্দ্রের এইরূপ বিবাহে আপত্তি। নবগোপালের চরিত্রের বলিষ্ঠতা অন্তত প্রেমের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নবগোপাল ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, পুত্রের আদর আবদার সব মা কমলাদেবীর কাছে। পিতার সঙ্গে তার বিশেষ আদান প্রদান নাই । কমলাদেবীর অত্যধিক স্নেহে সে কিছুটা একরোখা, জেদী। নবগোপালের বয়স বিশ বছর এবং'ইংরেজী কয় যেন ইংরেজের মতন,' কিন্তু মনটি অত্যন্ত সরল। ব্যবহার বালকের মত । নবগোপাল মায়ের ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তির আলোকে বিচার করে মায়ের ভুল সংস্কৃত-স্তব উচ্চারণে ভুল ধরে কিন্তু এসবের মধ্যে তার কোন অহমিকা নেই নেহাত মাতা পুত্রের সহজ স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতা পরিস্ফুট । নবগোপাল শিকার করে। অকাতরে অর্থ ব্যয় করে - পাখী পোষার শখ মেটায় । এহেন নবগোপাল প্রেমের ক্ষেত্রে কিন্তু অত্যন্ত বলিষ্ঠ । 'সোমত্ত' মেয়ে রমাকে নিয়ে একা একা জঙ্গলে ঘুরেছে এই কথা প্রকাশ পেলে রমার অপবাদ হবে এবং রমার বিয়ে হওয়ার অসুবিধা দেখা দিতে পারে এরকম অভিযোগ যখন গদাধর চট্টোপাধ্যায় করেন - নবগোপাল স্পষ্টতই বলে সে রমাকে বিয়ে করতে চায় । কৃতকর্মের জন্য তার মনে লজ্জা বা অনুতাপ প্রকাশ পায়নি বরং তার এই চরিত্রের দৃঢ়তায় আমরা মুগ্ধ হই । পিতার আপত্তি হতে পারে একথা ভেবেও সে নিঃসঙ্কোচে বলেছে — 'ভয় আমি কোন জিনিষকে করিনে, এমনকি পিতার ক্রোধকেও না।' আরও আশ্চর্য সে গোপনে বিয়ে করতে নারাজ - গোপনতার মধ্যে যে কাপুরুষতা রয়েছে নবগোপাল সেইটি বরদাস্ত করেনি। যথাসময়ে মাতার গোচরে এসংবাদ দিয়েছে, মায়ের অনুনয় তাকে তার মত থেকে টলাতে পারেনি, পিতার ক্রোধাগ্নি এবং কঠোর আদেশও তার পথ থেকে তাকে বিচলিত করতে পারেনি। নবগোপাল সুদূর অমৃতসরে গিয়ে রমাসুন্দরীকে বিয়ে করেছে। কিন্তু বিয়ের পর নবগোপালের চরিত্রের আর বিশেষ আকর্ষনীয় কিছু নেই। তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীর ধারা অনুযায়ী রমাকে সে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছে, চাকুরী নিয়ে কাশ্মীরে উপস্থিত হয়েছে ।

নবগোপালের চরিত্র পরিকল্পনায় প্রভাতকুমারের বাল্যজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। প্রভাতকুমার তাঁর মাতা পিতার অধিক বয়সের একমাত্র সন্তান। সেজন্য স্নেহ আদর একটু বেশী পরিমানেই পেয়েছিলেন, বিশেষত: মায়ের কাছ থেকে। মা ছিলেন ভক্তিপরায়না দেব-দ্বিজে বিশ্বাসী। উপন্যাসে কমলাদেবীর শিবপূজা, নবগোপালের প্রতি স্নেহ আবার নবগোপালের মাতৃভক্তি আমাদের তাঁর ব্যক্তিজীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যক্তিগতজীবনে প্রভাতকুমার অনেক দু:খ পেয়েছেন কিন্তু মায়ের প্রতি তাঁর xxxxxxxx শ্রদ্ধা ছিল অবিচলিত।

উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র নায়িকা রমাসুন্দরীর। রমাসুন্দরী দেখতে অতীব সুশ্রী। এক হিন্দুস্থানী ধাত্রীর কাছেমাতৃহারা রমা লালিত হয়েছে। কিন্তু সুন্দরী হলে কি হবে "তাহার ধাত্রীর শিক্ষা-বৈগুণ্যেই হউক বা xxxxxx জন্মনক্ষত্রফলেই হউক মেয়েটি ভারি দুর্দান্ত।"[১৬]

১৬ বনবিড়ালীর মত গাছে চড়ে, স্নান করতে গিয়ে পিয়ালী নদীটিকে তোলপাড় করে ফেলে, ছিপ নিয়ে পুকুরে মাছ ধরে, এমন কি তীর ধনুক পর্য্যন্ত ছুড়তে পারে। লছমী তাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসে নিজ হাতে আঙ্গিয়া তৈরী করে কোঁচা দিয়ে কাপড় পরানো অভ্যাস করিয়েছে। লছমী তাকেপশ্চিম দেশীয় রূপকথা, সিপাহী বিদ্রোহের কথা শুনিয়ে প্রাণের মধ্যে এক অজানা উদ্দীপনার সৃষ্টি xxxx করে তোলে। যুদ্ধের কথা শুনে রমা আহার নিদ্রা ভুলে যায়। মহাভারতের যুদ্ধের বর্ণনা সে বার বার শোনে। রমা বাড়ীর কাছে আমবাগানে গাছে চড়ে আম পাড়ে, 'জয় মা কালী' বলে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে। বাঙালী ঘরের কিশোরীর এই পুরুষালী হাব ভাবের সঙ্গে মিশে রয়েছে একটি অপূর্ব সহজ সরল সংকোচহীনতা। নবগোপালের নৌকা থেকে উড়ে যাওয়া পাখীকে রমা জাল পেতে ধরে খাঁচায় পুরেছে এমন সময় নবগোপাল রমার সামনে এসে তার পাখীর xxxx দাবী জানায়। ভ্রূকুঁচকে নি:সংকোচে রমার জবাব-"তোমার পাখী? তুমি কে? পাখীর গায়ে তোমার নাম লেখা আছে?" যুবতী কন্যার মুখে এহেন উত্তর শুনে নবগোপাল আকৃষ্ট হয়েছে। xxxx নবগোপালের একনৌকা পাখী ঘাটে বাঁধা আছে শুনে নির্দ্বিধায় তার সঙ্গে পাখী দেখতে নৌকায় উপস্থিত হয়েছে। নবগোপালের কাছে বন্দুক ছোঁড়া শিখেছে। এমনকি নবগোপালের সঙ্গে শিকার করতে যেতেও কোন দ্বিধাবোধ করেনি। এমন লজ্জাভয় শূন্যা রমা কিন্তু নির্দয় নয় - খরগোস নিরীহ প্রাণী, তাতে আবার যখন ওরা খায় তখনই ওদের শিকার করতে, এহেন অবস্থায় তাদের মারতে তার প্রাণে ব্যথা লাগে। রমনীসুলভ কোমলতাও তার প্রাণে রয়েছে। রমার হৃদয় পাপশূন্যা, তাই নবগোপালের সঙ্গে শিকার করে ফিরে আসার পর গদাধরের কুপিত সুরে সে বিস্মিতা - তবু ও

— তবুও অবোধ সারল্যে বাবাকে বলে নবগোপালকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে আসতে। বিয়ের কথা জানতে পেয়ে রমার গণ্ডযুগল রক্তিম হয়ে উঠলেও চরিত্রগত সরলতায় ইঙ্গিতে জানায়, সে এতে খুশী হয়। রমার চরিত্রে পুরুষসুলভ দুর্দমনীয়তা থাকলেও নারীসুলভ কোমলতার পরিচয় রয়েছে। এই কঠোর - কোমলের মিশ্রণে চরিত্রটি হয়েছে আকর্ষণীয়। অবশ্য বিয়ের পর চরিত্রটি স্বাভাবিকভাবে স্নেহশীলা বঙ্গ বধূতেই রূপান্তরিত হয়েছে।

'রমাসুন্দরী'তে নবগোপাল এবং রমা উভয়ের চরিত্র চিত্রণ বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। প্রভাতকুমারের অন্যান্য উপন্যাসে এ ধরণের চরিত্র চিত্রণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। রমার চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — "... নায়িকা রমাসুন্দরীর বাল্যজীবন তাহার দুর্দান্ত পৌরুষও নারীসুলভ লজ্জা - সংকোচের অভাব তাহার চরিত্র - বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদিগকে কতকটা আশান্বিত করিয়া তোলে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভবিষ্যৎ পরিণতি এই আশা পূর্ণ করে না। বিবাহের পরই রমাসুন্দরী তাহার সমস্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া সাধারণ স্নেহশীলা পত্নীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, ঘটনা - বৈচিত্র্য চরিত্র স্বাতন্ত্র্যকে অভিভূত করিয়াছে।" ১৭ মন্তব্যটি আংশিক সত্য। রমার চরিত্রে নারীসুলভ সংকোচের অভাব থাকলেও সে হৃদয়হীনা নয়। রমা চরিত্র বর্ণনায় দেখেছি নারীর কোমলতা বীজাকারে তার চরিত্রে অন্তর্নিহিত ছিল, নবগোপালের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার পর সেই কোমলতা স্নেহশীলা বঙ্গবধূতে রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র।

শ্রদ্ধেয় সমালোচক প্রমথনাথ বিশী রমা চরিত্রটি সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য করেছেন — 'সে সংসারেরই বটে, গ্রামেই মানুষ, কিন্তু গ্রামের কাছেই সুন্দর বন, সেই সুন্দর বনের প্রভাবে তাহার চরিত্রের একটা দিক মাত্র বিকশিত হইয়াছে, অন্যদিকটার উপরে গ্রামের প্রভাব বর্তমান। তাহার চরিত্রের যে দিকটায় অরণ্যের প্রভাব সে দিকে সে অনন্যসাধারণ, অপর দিকে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নাই।' ১৮

এই সমর্থনে ডা: শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —
" রমার অরণ্য স্বভাব চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আরণ্যক কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সহিত বিবাহের পর জনপদে আসিয়া নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। ফলে লেখক তাহাকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া কাহিনীর ট্রাজিক উপসংহার করিয়াছেন। রমাসুন্দরী নবগোপালের সহিত মানাইয়া লইতে পারিয়াছে, ফলে কাহিনীটির সুখান্তক পরিণতি হইয়াছে। ...... উভয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যই কাহিনীর

পরিণতিকে ভিন্নতর করিয়াছে।" ১৯

বস্তুত: লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য শুধু নয়, উভয় চরিত্রেরক্ষীণতম বাহ্যিক সাদৃশ্য ছাড়া অন্তর্গত মিল নাই। কপালকুণ্ডলা এবং রমার অন্ত: প্রকৃতিতে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। মনুষ্যবসতিহীন, অরণ্যময় বিজন নদীসৈকতে তন্ত্রচারী কাপালিকের সান্নিধ্যে কপালকুণ্ডলার মানসিক সংগঠন হয়েছে। সে সামাজিক রীতিনীতি, বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। এমনকি নবকুমারের সঙ্গে বিবাহ প্রসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে —

" বি - বা - হ !" এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন, বলিতে লাগিলেন, " বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি কিন্তু কাহাকে বলে ' সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে ? " ২০ কিন্তু এ বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলেও বিয়েটা তার কাছে অধিকারীর আদেশ পালন মাত্র মনে হয়েছে। কপালকুণ্ডলাকে প্রতিপালনে কাপালিকের কি উদ্দেশ্য অধিকারীর মুখে এ কথা জানতে পেরে সে প্রাণ-ভয়ে ভীতা হয়েছে এবং রক্ষা পাবার উপায় হিসাবেই বিয়েটা বাঞ্ছনীয় এর বেশী কিছু চিন্তা তার মনে আসেনি। তাছাড়াও প্রকৃতির উন্মুক্ততা এবং কাপালিকের নির্মম জীবন যাত্রা তার অন্তরমধ্যে একটি চির উদাসী, অনুনায়িত কুণ্ঠা ভাবাবেগকে গড়ে তুলেছে। তাই তার বিবাহিত জীবনকে 'সংসার শত আদর প্রলোভনে পোষ মানাইতে পারিল না। অথচ তাহার মধ্যে অসামাজিক বন্যতা বা রমনী সুলভ কোমলতার অভাব কিছুই নাই।' ২২

অপরপক্ষে রমাসুন্দরীর চরিত্রে এহেন কোন উদাসীনতা আমরা লক্ষ্য করি না। প্রচলিত সংসার-বিধির একটু দূরে সে মানুষ হয়েছে বটে কিন্তু তার জীবনাচরণে প্রভাব রয়েছে পশ্চিম দেশীয়া লছমীর, যার জন্ম রাজপুতকুলে। তাই লছমী মারফৎ রমার জীবনে রাজপুতললনাসুলভ একটু পৌরুষ সঞ্চারিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে কোন নির্মম উদাসীনতার পরিচয় নাই। নিজ বিবাহ প্রসঙ্গে তার 'গণ্ডযুগল রক্তিম' হয়ে উঠেছে। সে জানিয়েছে — বিয়েতে সে খুসীই হয়। ভাবতে অসুবিধা হয় না যে রমা সংসার জীবন সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞা বা উদাসীন নয়। স্বাভাবিকভাবেই বিবাহোত্তর জীবনে সে সংসারে প্রতিষ্ঠিতা।

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র নবগোপালের পিতা জমিদার কান্তিচন্দ্রের। কান্তিচন্দ্র বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন এবং জমিদার সুলভ জেদী প্রকৃতির। পুত্রের বিয়েতে কিছু বিষয় সম্পত্তির আয়তন বৃদ্ধির ইচ্ছা পোষণ

করেন, কিন্তু নবগোপাল পিতার পছন্দকৃত পাত্রীকে বিয়ে করতে অসম্মত হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তার কঠোরতা পুত্রকৃত আদেশ অমান্যের ফলশ্রুতি। কিন্তু চিরস্নেহশীল পিতৃ হৃদয়ের কাছে কান্তিচন্দ্র পরাজিত হয়ে পুত্রের অসুস্থতার সংবাদে বিচলিত হয়ে নবগোপালকে আবার বরণ করে নিয়েছেন। কান্তিচন্দ্রের কঠোরতা উপন্যাসে কোন জটিলতার সৃষ্টি করেনি। এই চরিত্রাঙ্কণে প্রভাতকুমার সম্ভবত: তাঁর মাতুল বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করেছেন। বিষ্ণুচরণ বাবু ছিলেন কিছুটা একরোখা এবং বদমেজাজী। প্রভাতকুমার আলিপুর এবং বক্সারে বিষ্ণুচরণের সান্নিধ্যে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

'রমাসুন্দরীতে' একটি চক্রান্ত কুশলী কুটিল চরিত্রের পরিচয় আছে, তিনি " রায়জী ওরফে সীতানাথ রায়, বাবুর বাল্য সখা। জমিদারী কার্য্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, এই ক্ষুদ্র বিশালাক্ষী রাজ্যের সলস্‌বরী। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, চক্রান্ত বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত।" ২৩

'..... তাঁহার আকার খর্ব, দেহখানি স্থূল, বর্ণটি ঘোর কৃষ্ণ, মুখমণ্ডল কেশলেশহীন, মস্তকের সম্মুখ ভাগও তদ্রূপ। রায়জীর চরণযুগল, একটি ছোট ও একটি বড়, সুতরাং একটু খোঁড়াইয়া চলিয়া থাকেন। সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে, কথোপকথনে সাধুভাষাই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন।' ২৪
সীতানাথ অত্যন্ত চতুর এবং সহজেই বোঝে সে কান্তিচন্দ্রের যতক্ষণ সাহায্য করতে পারবে ততক্ষণই তাদের বন্ধুত্ব। মায়ের প্ররোচনায় নিজের মেয়ের বিয়ে নবগোপালের সাথে দেওয়ার ইচ্ছা তার মনে জাগে ঠিকই কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এ সম্বন্ধে আস্থা রাখতে পারেনা, বরং হরিহর চাটুয্যের মেয়ের সাথে নবগোপালের সম্বন্ধ ঠিক করতে পারলে নগদ দুইহাজার টাকা পাবে এটাই তার বেশী লাভজনক মনে হয়েছে। তবু মায়ের উস্‌কানিতে, হরিহর চাটুয্যের মেয়ের সাথে নবগোপালের বিয়ের সম্বন্ধ যাতে না হয় সেজন্য যথেষ্ট কলাকৌশল খাটিয়েছে। শেষপর্য্যন্ত নবগোপাল যখন রমাসুন্দরীকে বিয়ে করেছে, উপন্যাসে তার ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়েছে। একমাত্র গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা উচ্ছেদের জন্য কান্তিচন্দ্রের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে তাকে দেখা যায়।

সীতানাথ কুটিল হলেও তার কার্যকলাপ এমন পাশবিক হয়ে ওঠেনি যাতে তাকে প্রকৃত খল চরিত্র বলে চিহ্নিত করা যায়। সাময়িক স্বার্থের খাতিরেই সে কুটিল পথ বেছে নিয়েছে। সে আশা নির্বাপিত হতেই উপন্যাসে তার আর কোন ভূমিকা দেখা যায় না। লেখক তার প্রায়শ্চিত্তের কোন বর্ণনা দিতেও কুন্ঠিত হয়েছেন।

প্রকৃত পক্ষে প্রভাতকুমারের জীবনের প্রতি যে শান্ত - সমাহিত প্রসন্ন

দৃষ্টি ছিল, লোকচরিত্রের শত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও সেই প্রসন্নতার স্পর্শ থেকে কাউকে তিনি বঞ্চিত করতে পারেননি। প্রভাতকুমারের এই ধরণের চরিত্র প্রায় সব উপন্যাসেই দেখা যায় এবং এদের সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন —" ইহাদের ভিতরে যে সুবিধাবাদ অপরের অজ্ঞতা বা অমনোযোগিতার সুযোগ লইয়া নিজের অবস্থা ফিরাইবার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে তাহাকে তিনি নীতিবাদের কঠোর আদর্শে বিচার করেন নাই, তাঁহার লোক চরিত্র অভিজ্ঞতা ও উপায়-উদ্ভাবন-কৌশল তাঁহার প্রশংসাকেও জাগাইয়া তুলিয়াছে। এই সহানুভূতি, কঠোর নীতি বিচারের অভাব, এই পাপ-পুণ্যের প্রতি অপক্ষপাত সমদর্শিতা ও পাপের প্রতি মৃদু সস্নেহ তিরস্কার তাঁহার উপন্যাসের আকর্ষণের একটি হেতু।' ২৫

সমসাময়িককালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং স্বদেশী আন্দোলনের গতিবিধি সম্পর্কে প্রভাতকুমার যে সবিশেষ পরিচিত ছিলেন তার পরিচয় রয়েছে 'রমাসুন্দরী'র দশম পরিচ্ছেদ : লাঠ্যৌষধি অংশে। ইংরেজের দৌরাত্ম্য এবং অত্যাচারকে শায়েস্তা করতে হলে অত্যাচারের পাল্টা জবাব দেওয়াতেই সম্ভবত: প্রভাতকুমার বিশ্বাসী ছিলেন। অত্যাচার হজম করে শুধুমাত্র কাগজে প্রতিবাদ জানিয়ে অথবা কাঁদুনি গেয়ে অত্যাচার উপশম সম্ভব নয় একথা তিনি বুঝেছিলেন। হরিহরের জবানিতে তিনি যেন এই মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। রংপুরে থাকাকালীন প্রভাতকুমারের নামে 'স্পেশাল কনস্টেবল' নিযুক্ত হয়েছিল, এ সংবাদ জীবনী আলোচনায় আমরা জেনেছি। রমাসুন্দরীর ভূমিকায় লিখেছেন —

"....লাঠ্যৌষধি নামক দশম পরিচ্ছেদে পাঁচ বৎসর পূর্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা তখন বড় দু:খেই লিখিয়াছিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের কৃপায় বাঙালী এখন লাঠ্যৌষধির মহিমা বুঝিয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি।" ২৬ প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা প্রয়োজন উপন্যাসের কাহিনী বিস্তারে এই পরিচ্ছেদটি অযথা সংযোজন বলেই মনে হয়।

'রমাসুন্দরী' উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষন হাস্যরস। কোথাও বা ঘটনা সংস্থাপনে, কোথাও চরিত্রের বিসদৃশ আচরণে, কখনও কখনও ভাষা এবং উচ্চারণ ভঙ্গীর মাধ্যমে এই হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদ যেখানে সীতানাথ রায়ের মা সীতানাথকে নবগোপালের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে নিজ মেয়ের সঙ্গে নবগোপালের বিয়ে দেবার পরামর্শ মনে মনে চিন্তা করছেন - সেখানে আপাত ধার্মিক অথচ কপট মহিলার স্বরূপ সুন্দরভাবে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন —

'ভান্ডারঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে তাহারই আলো খোলা দুয়ার জানালাপথে আসিয়া বারান্দায় পড়িতেছে, সেই আলোকে রায় গৃহিনীকে চেনা যাইতেছে মাত্র — ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না। তাহার অনতিদূরে থাবা পাতিয়া একটি কালো বিড়াল বসিয়া আছে, অর্ধমুদ্রিত নেত্রে মৎস্যচিন্তা করিতেছে।

রায়-গৃহিনী ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্না। আলো অধিক থাকিলে দেখা যাইত, তাঁহার ওষ্ঠ-যুগল ঘন ঘন নড়িতেছে, এখন শুধু মুখনির্গত শব্দটা শুনা যাইতেছে মাত্র সুর মৃদু ও অনুচ্চ —

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" ২৭

এখানে বিড়ালের চোখ বন্ধ করে মাছের ধ্যানে এবং বৃদ্ধার-জপের ভাণ করে ষড়যন্ত্রের চিন্তার দৃশ্যে প্রভাতকুমারের ব্যঙ্গ-নিপুণতার প্রকাশ ঘটেছে। এই কপট বৃদ্ধার মুখে যখন শুনি —" মাখনা, যা দিকিন ঝক করে, হরে ময়রার দোকান থেকে পাঁচ সিকের রসগোল্লা কিনে আন্ দিকিন। বেশ ভাল দেখে বড় বড় দেখে আনিস। কাপড় ছেড়ে হাত ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে যা, হরিনুট দিতে হবে। আর হরে ময়রাকে বলিস, দেবতার সামগ্রী, ওজনে যেন একটু বেশী করে দেয়।" ২৮

চতুর্দ্দিংশ পরিচ্ছেদে সীতানাথের বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত যদু পুরোহিতের বাড়ীতে প্রাণ ভয়ে ভীতা বৃদ্ধার গোশালার কাছে ভূষি রাখার বৃহৎ জালার মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টায় আমাদের সহানুভূতি জাগলেও কৌতুককর পরিস্থিতি হাস্যকর।

সর্বোপরি অমৃতসরের প্রবাসী বাঙ্গালী মুকুন্দলালের বেশভূষা এবং কথাবার্তা। মুকুন্দলালের গায়ে পশ্চিমী 'মিরজাই'। মাথায় মলিন মখমলের টুপী, পায়ে নাগরা, কুর্তা, ধুতিটি কিন্তু বাঙ্গালীর মত কোঁচা করে পরা। নিজে বাঙ্গালী সেটা প্রমান করার জন্য যখন বলে ওঠে "বাবু, হামি একটি বাঙ্গালী হচ্চি" তখন তার কথন ভঙ্গীতে আমরা এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ করি।

প্রভাতকুমারের প্রায় সব রচনাতেই এ ধরণের কিছু না কিছু হাসির খোরাক রয়েছে।

ঘটনা বর্ণনা অথবা চরিত্র ব্যাখ্যা করার জন্য প্রভাতকুমার উপন্যাসে এবং গল্প রচনায় পত্রের ব্যবহার করেছেন। প্রথম উপন্যাস রচনাতেই তার স্বাক্ষর রয়েছে — রমাসুন্দরীকে বিয়ে করার কথা নবগোপাল পত্রমাধ্যমেই কান্তিচন্দ্রকে জানিয়েছে। বিয়ের জায়গা নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে গদাধরের সঙ্গে নবগোপালের পত্রালাপ চলেছে। বিয়ের পর নবগোপাল এবং কমলাদেবীর পত্রালাপ মাতাপুত্রের তথা দুইটি ভিন্ন দৃশ্যপটের সংযোগ রক্ষা করেছে।

" রমাসুন্দরী ' প্রভাতকুমারের উপন্যাস রচনায় প্রথম উদ্যোগ। উপন্যাসের কিছুটা অংশ অন্তত: পক্ষে কাশ্মীর যাত্রা প্রসঙ্গ বৃটিশ মিউজিয়ামে বসে লেখা সে তথ্য আমরা তাঁর জীবন আলোচনায় জেনেছি। কাশ্মীর

যাত্রাপথের প্রত্যক্ষবৎ সুন্দর চিত্র - বই পড়ে লেখা জেনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়েছিলেন – প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া এত নিপুণ বর্ণনা , প্রভাতকুমারের রচনা শক্তির সাক্ষ্য বহন করে । উপন্যাস-শিল্প বিচারের মাপকাঠিতে 'রমা-সুন্দরী ' ত্রুটিহীন একথা বলা যায় না । কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে ত্রুটি সত্ত্বেও রমা নবগোপালের চরিত্র চিত্রণ, সহজ সরল ভাষায় চিত্র এবং ঘটনা বর্ণনা মাধ্যমে হাস্যরসের খোরাক যোগান দিয়ে 'রমাসুন্দরী' সে কালের পাঠককে মুগ্ধ করেছিল ।রবীন্দ্রনাথের মত মানব চরিত্রের গভীর মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ অথবা বঙ্কিমের সুউচ্চ রোমান্টিক কল্পনা কোনটাই তাঁর উপন্যাসে নাই — তবুও সহজ সুরে সহজ কথা বলে তিনি পাঠকের মন ভুলিয়েছেন ।'রমাসুন্দরী' প্রকাশের পর সমসাময়িক কালের সমালোচনায় তার প্রমাণ রয়েছে ।

" প্রভাতবাবু ছোটগল্প রচনায় সিদ্ধ হস্ত ।নভেল রচনাতেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় এই রমাসুন্দরী দিয়াছে । সরল অনাড়ম্বর ভাষায় নভেলের প্রত্যেক চিত্রটি জীবন্ত ও সরসভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে ।লেখকের মানব চরিত্র দেশ ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শক্তি অতি চমৎকার। বাংলা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত বৃত্তান্তটিই অতীব মনোজ্ঞ , তাহার সঙ্গে কৌতুহল পূর্ণ উপাখ্যান যুক্ত হইয়া নভেলখানিকে রম্য করিয়াছে । প্রত্যেক পাত্র পাত্রীর কথাবার্তা ভাবভঙ্গী সুন্দর স্বাভাবিক হইয়াছে । .... বইখানির মধ্যে সরস পরিহাস ও রসিকতা সর্বত্র ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে । .... যাহারা এই বইখানি না পড়িয়াছেন ,তাঁহারা একবার পড়িয়া দেখিলে সুখী ও উপকৃত হইবেন ।'' ২৯

(২)

'নবীন সন্ন্যাসী' প্রভাতকুমারের দ্বিতীয় এবং সর্ববৃহৎ উপন্যাস রচনা। লেখক প্রথমে উপন্যাসটির নামকরণ করেছিলেন 'তপস্যার ফল' এবং তদনুযায়ী 'প্রবাসী'র তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৩১৬ সালের ২৯শে ফাল্গুন' প্রবাসী' তে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিলেন, কিন্তু ইতিপূর্বেই 'প্রবাসী'তে শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'তপস্যার ফল ' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ায় লেখক উপন্যাসটির নাম পরিবর্তন করেন।'নবীন সন্ন্যাসী' এই নামে 'প্রবাসী'তে ১৩১৭ - ১৮ সালে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় । উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশলাভ করে আশ্বিন, ১৩১৯ সালে ।

নাম পরিবর্তনের ইতিহাস টুকু এই সাক্ষ্যই বহন করছে যে লেখক সচেতন ভাবেই সন্ন্যাসী জীবনের তপস্যার ফল অথবা সন্ন্যাসী জীবন

যাপন সম্পর্কে কিছু লিখতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই রচনা যে তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য প্রনোদিত একথা ভেবে নিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তক তালিকায় 'নবীন সন্ন্যাসী' সম্পর্কে বলা হয়েছে —
"A social story intended to warn the young men of Bengal against the pseudo-religious movements which are flooding the provinces."

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মরমিয়া সাধনা এবং ধর্মীয় চেতনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে তদীয় শিষ্য কর্মযোগী বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যে বিরাট ধর্মান্দোলন গড়ে তোলেন - সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু যুবক বিশেষত: বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবক সন্ন্যাস জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাস জীবনের যে উদ্দেশ্য এবং যে ত্যাগ-সংযম -সহিষ্ণুতা, যে দৃঢ় মানসিক প্রস্তুতির উপর এই জীবন প্রতিষ্ঠিত, সেই ভিত্তিভূমি অনেকের মধ্যে না থাকায় কিছুদিন পর অনেকেই ঘরে ফিরে আসে। কিছু ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং শাস্ত্রজ্ঞান লাভই যে সন্ন্যাস-জীবনের মূল এবং শেষ কথা নয় তার জন্য যে সুদৃঢ় মানসিক ভিত্তিভূমি গঠনের একান্ত প্রয়োজন, নইলে সবই বিফল হবে, —'নবীন সন্ন্যাসী'র মোহিত কুমারের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সেই বক্তব্যকেই লেখক ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

কিন্তু এই কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে লেখক অনেক ঘটনার অবতারণা করেছেন যেগুলি মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত নয় অথচ স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে গদাধর চন্দ্র পাল ওরফে গদাই এর কাহিনী সর্বাগ্রে স্মরণীয়। সেকালের পল্লীগ্রামের জমিদারী শাসন প্রথায় সাধারণ পল্লীবাসীর অর্থনৈতিক অভাবগ্রস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে একদল অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি জালজুয়াচুরি, শঠতা-প্রবঞ্চনা, পাপকার্যে সিদ্ধহস্ত, নৈতিক ভাবে অধ:পতিত অথচ আপাত সদাশয় প্রতাপশালী নায়েব গোমস্তা জাতীয় জীবের সৃষ্টি হয়েছিল। জমিদারী পরিচালনায় এরাই ছিল দক্ষিণ হস্ত, এদের প্রচন্ড প্রতাপে এবং কূট কৌশলে একদিকে যেমন পল্লী-জীবনকে দু:সহ করে তুলেছিল অন্য দিকে তেমনি অনেকে জমিদারদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনেও অশান্তি-দুর্ভোগের ছায়া ফেলেছিল। গদাই পাল এই শ্রেণী-চরিত্রের প্রতীক। কাহিনীতে দেখা যায় পূর্বতন ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে কুটিল জাল বিস্তার করে সে একদিকে যেমন নিরীহ সত্যবাদী প্রজা রমণ ঘোষের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত এবং বিপদ্গ্রস্ত করেছে অন্য দিকে আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য জমিদার গোপীকান্ত বাবুর জীবনেও দুর্ভোগ টেনে এনেছে।

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, সংসার ধর্মে এবং বিবাহে অনিচ্ছুক

মোহিতলালের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে তার বড় ভাই জমিদার গোপীকান্তের সঙ্গে মনোমালিন্য এবং শেষ পর্য্যন্ত উভয়ের চারিত্রিক বিশুদ্ধতার প্রশ্ন নিয়ে যখন প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে ঠিক সেই ক্ষণটিতে গোপীকান্তের গৃহে গদাধর চন্দ্রের আবির্ভাব। গদাধরের বাস হুগলি জেলার বারুইপুর গ্রামে; সেখানকার জমিদার রমানাথ বসু মহাশয় ইহাকে একজন অতি প্রিয় পাত্র স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। জমিদারী কার্য্যে গদাই পাল তাঁহার দক্ষিণ হস্তরূপ ছিল। এমন দুষ্কার্য্য নাই যাহা মুনিবের আজ্ঞায় গদাধর সম্পন্ন করিতে না পারিত। দাঙ্গা করিতে, জাল করিতে, মিথ্যা মোকদ্দমা গঠন করিতে, অবাধ্য প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুন্ঠন করিতে, তাহাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিতে - গদাই পাল একেবারে সিদ্ধহস্ত। মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সমস্ত তদ্বিরের ভার তাহারই উপর ন্যাস্ত হইত। আইনও তাহার কিছু কিছু জানা ছিল। দন্ডবিধি আইন, কার্য্য বিধি আইন, প্রজাস্বত্ত বিষয়ক আইন, প্রভৃতির বাঙ্গালা বহি গদাধরের সর্ব্বদা পাঠ্য ছিল। ৩০ এহেন নায়েব গদাই পাল, জমিদারের বে-আইনি মাঙ্গন দিতে অস্বীকার করায় তাঁর প্রজা হাজিপুরের রমণ ঘোষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে ওকালতনামায় নিজে সই জাল করে মামলায় জিতে ডিক্রি-র বলে তার সমস্ত সম্পত্তি নীলামে খরিদ করে নিয়ে তাকে দেশছাড়া করে দিয়েছে। কিন্তু বাজিমাৎপুরের এলাকা নির্দেশের নক্সিপত্র জাল এবং খজনা আদায়ের ব্যাপারে দাঙ্গা হাঙ্গামা - খুনের মামলায় শেষ পর্য্যন্ত জড়িয়ে পড়ে ছয় বছর জেল খেটে সদ্য মুক্তি পেয়েছে। জমিদারের মৃত্যুর পর তার ছেলে যতীন বাবু এহেন কুকীর্ত্তির অধিকারী গদাইকে তার জমিদারীর এলাকা থেকে বের করে দিয়ে উৎপীড়িত রমণ ঘোষকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আর্থিক সাহায্য করেন। গদাই পাল রমণ ঘোষ সংক্রান্ত জাল জুয়াচুরির বিস্তারিত কাহিনী নব্য জমিদার যতীন বাবুর সামনে যখন বর্ণনা করছিল তখন রমণ ঘোষ যতীন বাবুর নির্দ্দেশে পর্দ্দার আড়ালে ছিল - গদাই পালের কাহিনী সে স্বকর্ণে শুনেছে তাই গদাইয়ের আক্রোশ সমস্ত রমণ ঘোষের উপর গিয়ে পড়ে। রমণ ঘোষ এখন থেকে হলো তার বড় শত্রু। উৎখাত হবার পর রমণ ঘোষ গোপীকান্ত বাবুর জমিদারীতেই বসবাস করছিল - তাই গদাই গোপীকান্ত বাবুর অধীনে চাকরী করার অভিপ্রায়ে এসেছে।

গোপীকান্তবাবুর জমিদারীতে 'নাজিরী'র কাজ পেয়েই সে গোপীকান্তবাবুর উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে হাত করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছে। তার প্রিয় পাত্র না হতে পারলে তার আসল কার্য্য সিদ্ধি অর্থাৎ রমণ ঘোষকে

পর্য্যুদস্ত করতে পারবে না। মানবচরিত্রাভিজ্ঞ গদাই যখনই গোপীকান্ত এবং মোহিতলালের মনোমালিন্যের গন্ধটুকু পেয়েছে তখনি তার কুটবুদ্ধি তৎপর হয়ে উঠেছে। এই মনোমালিন্যের আসল কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে অন্ত:পুরের পুরান এবং প্রভাবশালী ঝি হরিদাসীকে হাত করেছে। এ ব্যাপারেও তার ভন্ডামী এবং চাতুর্য্য অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। হরিদাসী বালবিধবা এবং তাকে স্বজাতি জেনে গোপনে তার সম্পূর্ণ পারিবারিক পরিচয় গদাই সংগ্রহ করেছে। অতি সদাশয় সেজে ~~xxx~~ হরিদাসীর শ্বশুরের কাছে তার বাবার ঋণ ছিল এই ঋণশোধের অজুহাতে হরিদাসীকে কাছে ডেকে কিছু টাকা দিয়েছে। হরিদাসীর রূপ-যৌবনের প্রশংসা করে তার সাথে কোনদিন বিয়ে হলেও হতে পারত এবং হলে সে কত সুখী হতো, না হওয়াতে তার কত মনোবেদনা ইত্যাদি সুনিপুণ অভিনয়ের মাধ্যমে হরিদাসীর হৃদয়কে দ্রবীভূত করেছে। তারপর বিধবা বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে হরিদাসীর মনের গোপন আসঙ্গ-কামনাকে জাগিয়ে তুলে তার মনকে জয় করে অন্ত:পুরের দৈনন্দিন খবরাখবর সংগ্রহ করেছে। হরিদাসীর মনের এই দুর্বলতার ~~xxxxxx~~ সুযোগ নিয়ে তার টাকা আত্মসাৎ করতেও গদাইয়ের বিবেকে বাধেনি।

এই হরিদাসী মারফৎ গোপীকান্তবাবুর চরিত্রের অন্ধকার দিকটি, তার বাগান বাড়ীতে যাতায়াত, মদ্য-সংসর্গের কথা, ইত্যাদি জেনে নিয়ে আবার তৎপর হয়ে উঠেছে প্রকৃত ঘটনাকে উদঘাটন করার জন্য। হরিদাসীর কথার সূত্র ধরে সে বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে মালিকে মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে, মালির প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বাচ্চাদের হাতে মিষ্টি খাবার পয়সা দিয়ে সর্বশেষে মালিকে মদ খাইয়ে বেহুঁস করে দরিয়ারপুর মৌজার বেচারাম ঘোষের বিধবা যুবতী স্ত্রী গঙ্গামণি, যাকে গোপীবাবু তার ভোগ লালসা মিটাবার জন্য বাগানবাড়ীতে বন্দী করে রেখেছিলেন তাকে ছেড়ে দিয়ে গোপীবাবুকে বিপদ-গ্রস্ত করেছে। মালিকে দিয়ে রমণ ঘোষের নামে মিথ্যা কথা বলিয়ে, তাকেই সন্দেহ হয় এই অজুহাতে এবং নিজে মোহিতের চিঠি গঙ্গামণির ঘরে ফেলে রেখে গোপীকান্ত বাবুকে বিশ্বাস করিয়েছে যে গঙ্গামণির মুক্তি ~~xxxx~~ মোহিত লাল এবং রমণ ঘোষের যোগসাজসেই হয়েছে। এই ভাবে ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতার সৃষ্টি করে রমণ ঘোষকে জব্দ করার উপায় উদ্ভাবন করেছে। রমণ ঘোষ কর্মোপলক্ষে মোহিতের কাছে ইতিপূর্বে এসেছে। অতএব গোপীবাবুর বিশ্বাস সহজেই সে উৎপাদন করেছে। ইতিপূর্বে দরিয়ারপুরের কিছুদিনের জন্য নায়েবী পদ লাভ করায় রমণ ঘোষকে জব্দ করার বেশী সুবিধা সে পেয়ে যায়। সেখানে গিয়ে দারোগাকে ঘুস দিয়ে হাত করে কেণারামকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করেছে নিজের ঘরে চুরির অজুহাতে থানায় এজাহার লিখতে এবং দারোগার যোগসাজসে কেনারামের কিছু কাঁসা পিতলের জিনিষ রমন ঘোষের

বাড়ীর খড়ের গাদায় রেখে আসতে। দারোগা সাহেবও কেণারামের বাড়ীতে চুরিকে উপলক্ষ্য করে সন্ধান করতে গিয়ে রমণ ঘোষের বাড়ী থেকে সেই চুরির মাল উদ্ধার করে রমণ ঘোষকে হাজতে পুরেছে। গদাই পাল তার প্রতিহিংসা পূরণ করেছে। আবার গঙ্গামণি সংক্রান্ত ব্যাপারে তারই পরামর্শে গোপীবাবু গা-ঢাকা দিয়ে বিদেশে অকারণ কষ্ট পেয়েছেন - গোপীবাবুর অনুপস্থিতিতে নানা ছল চাতুরী - মিথ্যা কথা বলে কাছারি থেকে বেশ কিছু টাকাও সে আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু সব কিছু করেও সে রক্ষা পায়নি। তারই ভাষায় — 'ধম্মস্য সূক্ষ্ম গতি কিনা' - যতীন বাবু মারফৎ তার সব অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে গিয়েছে এবং শেষ পর্য্যন্ত সে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছে।

গদাই পাল, উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় এবং সার্থক চরিত্র। শুধু এই উপন্যাস মধ্যেই নয় প্রভাতকুমার তার সমগ্র উপন্যাসগুলির মধ্যে যে খল প্রকৃতির চরিত্র এঁকেছেন তন্মধ্যে গদাই চরিত্রটি সর্বশ্রেষ্ট বলা চলে। গদাই পালের চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —

" সাধারণত: প্রভাতকুমারের চরিত্রসৃষ্টি অত্যন্ত অগভীর, কিন্তু গদাই - এর চরিত্রের সমস্ত অলিগলি, তাহার মনের সমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অতি সৃচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাহার প্রতিভা বহুমুখী তাহার দৃষ্টি সুদূর প্রসারী, তাহার কর্মশক্তি নব নব প্রণালীতে প্রবহমান। হরিদাসীর সহিত তাহার প্রেমাভিনয়, জমিদার গোপীকান্তবাবুর রহস্যোদ্ভেদ, রমণ ঘোষের প্রতি বৈর -নির্যাতনের জন্য তাহার কৌশল- জাল - বিস্তার - সমস্তই, অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয়। গদাই পাল মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত সর্বাঙ্গে তড়িত -শক্তিতে পূর্ণ— তাহার প্রত্যেক ইঙ্গিত, প্রতি অঙ্গভঙ্গী হইতে প্রাণের উজ্জ্বল দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে।' ৩২ গ্রন্থাকারে 'নবীন সন্ন্যাসী' প্রকাশিত হলে 'প্রবাসী'তে সমালোচক গদাই পাল চরিত্রটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন —" গদাই পালের চরিত্র - চিত্রণ অসাধারণ নৈপুণ্যে জীবন্ত করিয়া তোলা হইয়াছে।" ৩২

গদাই পালের চরিত্র চিত্রণে অসাধারণ নিপুণতা এবং বাস্তবতা থাকলেও বোধ করি একথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রকৃত খল চরিত্র বলতে আমরা যা বুঝি গদাই পালকে লেখক ততটা নৃশংস করে তোলেননি। প্রকৃত খল চরিত্র মানবিকবোধশূন্য অকারণ নিষ্ঠুরতায় তাদের উল্লাস। তাদের চরিত্রগত নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতাই বৈশিষ্ট্য, প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্য না পারে এহেন কাজ তাদের নাই, প্রকৃতিগতভাবেই যেন কঠোর নিষ্ঠুর।

প্রভাতকুমার কিন্তু গদাইকে নিষ্ঠুর ক্রূরতার সেই অতলে নিয়ে যেতে পারেননি যেখানে সে নৃশংসতম মানবিকবোধহীন ভয়ংকর সর্বনাশার প্রতিমূর্তি।

তার জীবনে ভূতের ভয় আছে, আজকালকার ইংরিজীনবীশ কলেজী ছোকরাদের সে বড় ভয় করে। মানুষ সাপকে বাঘকে, ক্ষ্যাপা শেয়ালকে যেমন ভয় পায় সেও তেমনি ভাবে ভয় পায় সোনার চশমা আঁটা অল্প বয়েসী ছোকরাদের। এদের সম্মুখে গদাই বলে" কেন বলতে পারিনে, মনে মনে কেমন একটা আতঙ্ক আছে।" জেল থেকে বেরিয়ে এসে যখন সে দেখে বাড়ীঘর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে এবং লোকমুখে সংবাদ পায় স্ত্রী না খেতে পেয়ে মেয়ে দুটিকে নিয়ে পিত্রালয়ে চলে গেছে এবং সেখানে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে-" এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গদাই পাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।" কোথায় যাবে, কি খাবে, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না। তবুও পেটের জ্বালা বড় জ্বালা-তাই নব্যতন্ত্রের জমিদার পুরাতন প্রভু-পুত্র যতীন্দ্রবাবুর কাছে যাবার আগে" 'দুর্গানাম ও অন্যান্য দেবদেবীর নাম ভক্তিভরে স্মরণ পূর্বক, গদাই পাল যাত্রা করিয়া বাহির হইল।' অনেকসময় গদাই-পালের দেবভক্তি লোকদেখান অভিনয় মাত্র কিন্তু বিপদকালে ভক্তিভরেই সে দেবদেবীকে স্মরণ করেছে।

প্রভাতকুমারের জীবনদৃষ্টিই বোধকরি গদাইপালকে প্রকৃত খল চরিত্র করে তুলতে পারেনি। ব্যক্তি জীবনে স্ত্রীর মৃত্যু, প্রেমে বঞ্চনা ইত্যাদি যে দুরপণেয় ক্ষতগুলিকে তিনি অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে জীবনে এগিয়ে চলেছেন সেই সহনশীলতা এবং মানবজীবন সম্মন্ধে উদার দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে সাহায্য করেছে শত দোষ-ত্রুটি, শঠতা-প্রবঞ্চনা সত্ত্বেও মানুষকে তার সকল কুশ্রীতা নিয়েও মানুষ হিসাবে ভাবতে।

উপন্যাসটির নামকরণের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে একথা মেনে নিতে হয় সন্ন্যাস জীবন প্রসঙ্গই এই উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য। সেই প্রসঙ্গ এখানে রূপায়িত হয়েছে মোহিতলালের চরিত্রের মাধ্যমে। অবশ্য উপন্যাসের নায়ক হিসাবে চরিত্রটি সুপরিস্ফুট এবং সার্থক চিত্রন নয়।

মোহিতলাল জমিদার বংশসম্ভূত উচ্চ শিক্ষিত এম, এ, বি, এল. উপাধিধারী। 'শাস্ত্রচর্চা এবং পূজা আহ্নিকেই দিনের অধিক সময় তার ব্যয় হয়। ওকালতি ব্যবসা তার মনঃপূত নয়, তাই ঘরে বসে তপজপ শাস্ত্রচর্চা নিয়েই আছে। বড়ভাই গোপীকান্ত ইতিপূর্বে কয়েকবার তার বিবাহ দেবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সে বিবাহবিমুখ। বিবাহবিমুখতার প্রধান কারণ সংসারধর্মে অনিচ্ছা এবং বিয়ে করলে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা। তিনি নিঃসন্দেহে সৎচরিত্র এবং আদর্শবান পুরুষ। তার বৈঠকখানায় দেওয়ালে হিন্দু দেবদেবীর চিত্র এবং তাহা ছাড়া বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, দয়ানন্দ সরস্বতী ও রামমোহন রায়েরও আলোকচিত্র দেখা যায়।' ৩৩ আলমারীতে ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃতের নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ। মাঝে মাঝে

তার বৈঠকখানায় সাধু পন্ডিতদের আগমন ঘটে এবং নানা ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা হয়। ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ আক্ষরিক অর্থে মানতে গিয়ে তার ব্যবহারে কিছুটা রুক্ষতা এসে গিয়েছে। সে বিনোদকে সত্য গোপন করা জনিত অপরাধে ভর্ৎসনা করে এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী কিরণবালার নৈতিক পরীক্ষা গ্রহণ মানসে তার বিয়ের কথাবার্তায় গুরুজনের সামনে হেসেছে দেখে রামায়ণ মহাভারতের আদর্শের কথা তুলে তাকে শাসন করতে কসুর করেনি। পাত্রদেখানোর ব্যাপারে পাত্রীপক্ষের সম্মুখে অভদ্রজনোচিত ব্যবহারে জ্যেষ্ঠভ্রাতা গোপীকান্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং উভয় ভ্রাতার মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছে।

মোহিত লাল তপ জপ ধ্যান ধারণা ইত্যাদি নির্জন বনে গিয়ে করার পক্ষপাতী, কারণ তার মতে সংসারের চারিদিকে ঘোর অপবিত্রতা বিরাজমান সেখানে শারীর-তপ-জপ বা বাঙ্ময়-তপ এবং মানস-তপ কোনটাই সম্ভব নয়। সংসারে থেকে সর্ব্বদা পবিত্রতা রক্ষা করা, অহিংসা এবং ব্রহ্মচর্য্যপালন কোনটাই সম্ভব হয়না। তাই সে রবীন্দ্রনাথের সংসারে থেকেও মুক্তির কথা মানে না, মুক্তি ও মোক্ষ চিন্তায় সে বেদান্তের মতাদর্শে বিশ্বাসী।

মোহিত চা পান করে না, স্ত্রীলোকের সঙ্গে একত্রে উপবেশনে অস্বস্তিবোধ করে। তার বন্ধুবর প্রমথনাথের স্ত্রী সুশীলার ভাষায় মোহিত 'অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। যেন শুষ্ক কাষ্ঠং।' কিন্তু এই নীরস মোহিতেরও প্রমথনাথের ভগিনী চিনির মুখে বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষা শুনে মনে চকিতের 'মত একটা আনন্দ খেলিয়া গেল।' চিনির কন্ঠস্বর তার কাছে মনে হয়েছে স্নেহবিজড়িত।' এই চিনির সহজ সরল প্রাণ প্রাচুর্য্যের স্পর্শে বোধকরি মোহিত গদ্যের কাঠিন্য থেকে কবিতার লালিত্যে আকর্ষণ বোধ করেছে। গুরুদাসবাবুর জন্মোৎসবে Many Happy Returns of the day —— মোহিত-চিনির প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত হয়েছে—

'বিধাতা করুন এ দিন আবার
ফিরিয়া আসুক বহু বহুবার।'

যে মোহিতের কাছে মনে হয়েছিল তুচ্ছ আমোদ প্রমোদে এ মূল্যবান মানব জীবন কাটান জীবনের অপব্যয় মাত্র সেই মোহিত কিন্তু গুরুদাসের জন্মদিন উৎসবে যোগদান করেছে, সুশীলার চিত্ত বিভ্রমকর মধুর কন্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়েছে। সুশীলার অনুরোধে

চা খেয়েছে এবং সে চা ' চমৎকার', অভিমানহতা চিনির কাছ থেকে চায়ের পেয়ালা হাত বাড়িয়ে নিয়েছে । সেদিন থেকে মোহিতের মানসিক পরিবর্তন লক্ষনীয় -" রাত্রে শয়ন করিয়া, যতক্ষণ নিদ্রা না আসিল ততক্ষণ মোহিতের মনে কাহার একখানি সুন্দর সুকুমার মুখ বারম্বার দেখা দিয়া দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কৌতুক হাস্যে সমুজ্জ্বল দুইটি বড় বড় চঞ্চল চক্ষু–তাহাতে আবেশের লেশ মাত্র নাই । সেই মুখখানি ও চক্ষু দুইটিকে মোহিত কিছুতেই মন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিল না । আজ সারাদিন ধরিয়া চিনি তাহার পরিজনগণের কাছে যত দুষ্টামি করিয়াছে, যত মিষ্ট কথা বলিয়াছে , সেই দৃশ্য গুলি, মোহিতের মনে পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইতে লাগিল। ক্রমে যখন নিদ্রার আবেশ তাহাকে অল্পে বিহ্বল করিয়া ফেলিল, তখন মনে মনে বলিল ,'মেয়েটি বেশ মিষ্টি । যার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, সে সুখী হবে।' ৩৪

চিনির প্রতি মোহিতের এই মানসিক দুর্ব্বলতায় রাত্রে সে চিনিকে স্বপ্নে দেখেছে - মোহিত বরবেশে সজ্জিত হয়ে বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত - সানাই বেজে চলেছে - চিনির সঙ্গে শুভদৃষ্টি বিনিময় হয়েছে । স্বপ্নোত্থিত মোহিত বেশ কিছুক্ষণ আনন্দে মসগুল হয়ে পড়েছিল কিন্তু অবচেতন মনের এই আবেশকে বেশীক্ষণ স্থান দিতে চায়নি, জোর করে সে আবার তার মানসিক দৃঢ়তাকে ফিরে পেতে চেষ্টা করেছে। পরদিন চিনির জ্বর হয়েছে জানতে পেয়ে তাকে দেখার জন্য মন বেশ উদগ্রীব হয়ে ওঠে -' সে এমন দুর্বল, পূর্বে মোহিত তাহা জানিত না ।' ৩৫ এই দুর্বলতা আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয় যখন মোহিত জানতে পারে চিনির প্রাণের আশংকা রয়েছে । চিনির জন্য শুদ্ধচিত্তে ভগবানের কাছে প্রাণ – ভিক্ষা চেয়ে প্রার্থনায় বসেছে সে – বিগলিত অশ্রুজলে তার পূজা পূতপবিত্র হয়ে উঠেছে।' এ কয়দিন সে লক্ষ্য করিয়াছে, কেহ কথাপ্রসঙ্গে তাহার সম্মুখে চিনির নামোল্লেখ মাত্র করিলে তাহার কাণে যেন বীণার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে । ইহার জন্য সে মনে মনে লজ্জিত - কিন্তু কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না । নিজ চিত্তদৌর্ব্বল্য সে ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছে ।' ৩৬ এবং এই দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলার জন্য সে সংসারাশ্রম ত্যাগ করে গৈরিক বসনে, লোটা কম্বল নিয়ে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় গৃহত্যাগ করেছে ।

গৃহত্যাগ, গৈরিক বসন ধারণেও কিন্তু মনটিকে সে বশীভূত করতে পারেনি, চিনির স্মৃতি মাঝে মাঝে তাকে পীড়িত করেছে । তাছাড়া ভণ্ড সাধুদের সঙ্গ ক্ষুধা পিপাসার কাতরতা তার মনকে ক্রমে বিরক্ত করে তুলেছে । ইতঃমধ্যে একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে কিন্তু তাদের ভণ্ডামি, ইতরতা দেখে মোহিত চমকে উঠেছে । সর্ব্বশেষে বিপত্নীক এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর প্রতি

গভীর ভালবাসার কাহিনী শুনে এবং প্রতিদিন তার জীবনাচরণে বিগত স্ত্রীর স্মৃতির প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা ভালবাসা অর্পণ করে চলেছে । সেই ঐকান্তিক নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে মোহিত গৃহে ফিরে এসেছে । তার মনে বিশ্বাস জেগেছে গভীর প্রনয়ানুভব না থাকলে একান্তমনে ঈশ্বরকে ডাকা যায় না । খৃষ্টানদের প্রার্থনায় আছে– 'Give us this day our daily bread'— ক্ষুৎপিপাসাতুর কাতরতার মধ্য দিয়ে এ কথার তাৎপর্য্য সে এখন অনুভব করে। ভগবান জীবন দিয়েছেন অতএব আহারও দেবেন এ বিশ্বাসে যেন ফাটল ধরেছে । কর্মযজ্ঞের বিশাল প্রাঙ্গন এ সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে যে মোহিত আত্মার মুক্তি-কামনা করেছিল সেই মোহিত ঘরে বাইরে দুই সপ্তাহের জীবন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এমন এক মানসিক অবস্থায় উপনীত যেখানে সে বিশ্বাস করে "— যে কর্ম্মযোগ বিরহিত হইয়া সন্ন্যাসকে আশ্রয় করে সে এখানে দুঃখই প্রাপ্ত হয়। যে মননশীল হইয়া কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে সেই মনুষ্যের অচিরে ব্রহ্মলাভ হয় ।' ৩৭ তাই সে স্থির করেছে সংসারবন্ধনের মধ্যে থেকেই ঈশ্বরলাভ করবে – সকাম উপাসনাই তার কাছে শ্রেষ্ঠতর মনে হয়েছে । ঘরে ফিরে এসে শুভদিনে শুভক্ষণে চিনির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে ।

উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় মোহিত চরিত্রকে কেন্দ্র করে বিবৃত হলেও সার্থক নায়ক হিসাবে পূর্ণ মর্য্যাদা চরিত্রটিকে দিতে আমাদের কুণ্ঠাবোধ হয় । উপন্যাসে মোহিত যেন একটি ভ্রান্ত আদর্শের প্রতীক হিসাবেই চিত্রিত হয়েছে । আদর্শে ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয় কিন্তু সেই আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টায় যে মানসিক দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, সংগ্রামী মনোভাব, অটুট স্থৈর্য্য নায়ক চরিত্রে আমরা আশা করি মোহিতলালের চরিত্রে তার পরিচয় অল্প । সে অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় ভাবালু মাত্র । শাস্ত্রের অনুশাসনে সে বিশ্বাসী কিন্তু বাস্তব কান্ডজ্ঞান রহিত । গোপীকান্তের অভ্যাগতদের সঙ্গে তার ব্যবহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে শাসন ইত্যাদি ছেলেমানুষীর পর্য্যায়ে পড়ে । প্রতিকূল ঘটনায় স্বচ্ছন্দে সে ঘটনাস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে, একমাত্র চিনির প্রতি দুর্বলতার সময় একবার মাত্র তাকে কিছুটা মানসিক দ্বন্দ্বে বিব্রত হয়ে সে স্থান ত্যাগ করিতে দেখা যায়। কিন্তু সে সংগ্রামের চেষ্টাও এত ক্ষীণ যে আমাদের মনে কোন রেখাপাত করে না । সন্ন্যাসীবেশে পথে বেরিয়ে পড়ার পর তার ক্ষুৎ পিপাসায় কাতরতা, তার আদর্শের বিরুদ্ধতায় সামান্য একটু প্রতিবাদ তুলেই সে বিরুদ্ধ মতকেই শেষ পর্য্যন্ত মেনে নিয়েছে ।

বস্তুতঃ লেখক যে দৃষ্টিকোন থেকে সন্ন্যাস জীবনকে দেখেছেন মোহিতলাল হয়েছে তারই প্রতিভূ । ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাতকুমার সন্ন্যাস জীবনের প্রতি অনুকূল ছিলেন এমন কোন পরিচয় নেই বরং তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির

মধ্যে দেখা যায় একটা যেন বীতরাগ ফুটে উঠেছে। 'মনের মানুষের যোগেন্দ্র ,'জামাতা বাবাজী'র পূর্ণচন্দ্র ,'নয়নমণি'র বিনোদ এবং 'ভুলভাঙ্গা'র হরিপ্রিয়া সকলেই সন্ন্যাস জীবনে ঔৎসুক্য দেখালেও গৃহাশ্রমেই ফিরে এসেছে । অবশ্য সন্ন্যাস জীবনের প্রতি তাঁর তেমন সমর্থন না থাকলেও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মত অনেকটা সংস্কারমুক্ত । তাঁর এই মুক্তিধর্মী উদারমতের সমর্থনে তিনটি চরিত্র 'নবীন সন্ন্যাসী'তে পাওয়া যায় । মোহিতলালের বন্ধু প্রমথবাবু , তদীয় পত্নী সুশীলা এবং গুরুদাসবাবু ।

প্রমথবাবুর মতে মানুষ গৃহাশ্রমে থেকেই ধর্মচর্চা করতে পারে । তপস্যা ঘরে বসেও হতে পারে বরং ' সংসারের মোহ, মায়া, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, এ সমস্ত কাটিয়ে উঠে যে তপস্যা, তাই প্রকৃত তপস্যা । বনে গিয়ে তপস্যা, সে ফাঁকি দিয়ে মুক্তি লাভ '। ৩৮ মানুষের মুক্তি সম্পর্কে সে বলেছে — " আমার সহজ বুদ্ধিতে এই মনে হয় , যখন মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মেছি তখন মানুষের এই দুঃখ কষ্ট পাপ তাপ, যদি কিছু মাত্র কমাতে পারি, মানুষের স্বাস্থ্যের জ্ঞানের , সুখের অংশ কিছুমাত্র যদি বাড়াতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক; তবেই আমার কর্তব্য সম্পন্ন হল । ৩৯

সুশীলা দেবীর মতে ঈশ্বর ভক্তি মানে ধূপ ধূনো জ্বালিয়ে মণ্ডা মিঠাই দিয়ে লক্ষবার তার নাম জপ নয়।" তিনি স্নেহ করে, করুণা করে, আমাদের যা কল্যান সাধন করেছেন - তাঁর আশীর্বাদ স্বরূপ তাঁর কাছ থেকে নিত্য যে সকল সুখের সামগ্রী আমরা পাচ্ছি — সেই সকলের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, তাঁর সমস্ত বিধান যে মঙ্গলময় এইটে মনে মনে উপলব্ধি করা — এরই নাম ত ভক্তি ।' ৪০ তার মতে পুত্রকন্যার স্নেহ, স্ত্রীর ভালবাসা সমস্তই ভগবানের করুণা ঃ ।

প্রৌঢ় গুরুদাসবাবুর মতে প্রকৃত সত্যধর্মের সাথে জড়বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই । মানুষের মনের ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য মূর্ত্তি পূজার প্রয়োজন আছে ।

প্রকৃত প্রস্তাবে মোহিতের সন্ন্যাস এবং ধর্ম সম্পর্কে মতবাদগুলিকে খণ্ডন করবার জন্যই এই চরিত্র তিনটিকে উপস্থাপিত করেছেন । উপন্যাসে এদের নিজ নিজ ভূমিকা বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই চিত্রিত হয়েছে ।

মোহিতের প্রাণে প্রেমের গুঞ্জরণ তুলেছে গুরুদাসবাবুর কন্যা এবং প্রমথনাথের ছোটবোন চিনি । কিন্তু চিনির বালিকা সুলভ চপলতা অভিমান ঠিক নায়িকাসুলভ নয় । গ্রামফোন কেনায় মা আপত্তি জানালে তার

চোখ ছল ছল করে উঠেছে — সে এতই অবুঝ। মোহিতের সঙ্গে তার কথাবার্তায় কোথাও প্রেমের গন্ধটি নেই, বৌদির সঙ্গে বাজী ধরে বালিকাসুলভ সরলতায় সে মোহিতের হাতে চা তুলে দিয়েছে। চিনি সপ্রতিভ, তাই তাদের বাড়ীতে নবাগত মোহিতের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আড়ষ্ট হয়ে ওঠেনি। তার সপ্রতিভতা প্রমান করার জন্যই বাবার জন্মদিনে লাল শালুতে- 'Many Happy Returns of the day'— কথা কয়টি মোহিতকে দিয়ে লিখিয়ে নেবার জন্য তার কাছে গিয়েছে। মোহিতের গাম্ভীর্যে তার ঘরে ঢুকতে একটু ভয় ভয় করলেও বৌদির কাছে পাছে ভীতু বলে গন্য হয় তাই একটু জোর করেই মোহিতের কাছে গেছে। মোহিতের জীবন দর্শনের পরিবর্তন হয়েছে চিনির আকর্ষনে, অথচ চিনির চরিত্র মধ্যে মোহিতের প্রতি কোন রকম আকর্ষণের আভাষ বিন্দুমাত্র নাই। তাই উপন্যাস মধ্যে চরিত্রটি অপরিস্ফুট কুঁড়ির মতই বিরাজ করছে।

উপন্যাসে জমিদার গোপীকান্ত বাবুর জমিদারীতে আশ্রয় পেয়ে এবং তার চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গদাই পাল তার কুটজাল বিস্তার করেছে অথচ গোপীকান্তবাবুর চরিত্রটিতে সত্য কারের তৎকালীন জমিদার সুলভ গুণাগুণের পরিচয় আমরা পাই না। জমিদারী পরিচালনায় যে বিষয় কুশলতার বুদ্ধিসম্পন্ন বাস্তবজ্ঞান, যে প্রয়োজন গোপীকান্তের চরিত্রে তা নাই। বরং 'রমাসুন্দরী'র কান্তিচন্দ্রের মধ্যে সে পরিচয় কিছু বিদ্যমান। এখানে গোপীকান্তবাবুর আচার ব্যবহার অতি সাধারণ, আর পাঁচজন বাঙ্গালীর মত। তিনি ভাই মোহিতলালের বিয়ের বন্দোবস্ত করতে চেয়েছেন, তার অভ্যাগতদের সঙ্গে মোহিতলাল অভব্য ব্যবহার করলে তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করে ভাইয়ের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, এমনকি ভাইয়ের চরিত্রে সন্দিহান হয়ে কটাক্ষ করেন। পাল্টা মোহিতলাল গোপীকান্তের চরিত্র সম্পর্কে যখন কিছু দুর্বলতার ইঙ্গিত দেন তখন তিনি একেবারেই নিস্ক্রিয় হয়ে ঘটনাস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। তার চারিত্রিক দুর্বলতার আভাষ রয়েছে অন্য নারীতে আসক্তি, মদ্যপান, বাগানবাড়ী যাতায়াত ইত্যাদিতে। রূপযৌবনসম্পন্না অল্পবয়েসী বিধবা গঙ্গামণিকে তিনি বাগান বাড়ীতে আটকে রেখেছেন অথচ গঙ্গামণিকে কেন্দ্র করে কোন লাম্পট্যের পরিচয় দেননি। গঙ্গামণিকে বাগানবাড়ী থেকে ছেড়ে দিয়ে গদাধর যে কৌশল জাল বিস্তার করেছে সেই কৌশলের শিকার তিনি অতি সহজেই হয়েছেন এবং হাজতবাস করতে হবে এই ভয়েই গৃহত্যাগ করেছেন। কোনরকম অনুসন্ধান বা প্রশ্ন না করেই নবনিযুক্ত গদাধরের পরামর্শে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন বিচক্ষণতার পরিচয় নাই এমনকি অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। স্ত্রী সুলোচনা

স্বামীর চরিত্রের এই দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অবশ্য এই অজ্ঞতার কারণ — 'গোপীবাবু মধ্যে মধ্যে বাগানবাড়ীতে যান বটে - কিন্তু প্রায়ই ত সেখানে রাত্রি যাপন করেন না। জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন গ্রীষ্মটা খুব বাড়িয়াছিল প্রভাতে বাগান বাড়ীতে গিয়া নদীতে স্নান করিতেন, দিবাভাগে সেখানে বিশ্রাম করিতেন, অধিক রাত্রি হইবার পূর্বে প্রায়ই গৃহে ফিরিয়া আসিতেন।' ৪১ গোপীকান্তের পুরু-ষোচিত আস্ফালন স্ত্রীর কাছে - সুলোচনা তার সঙ্গে বাগানবাড়ীতে যেতে চাইলে কঠোরভাবে তর্জন গর্জন করে তাকে নিরস্ত করান।

গৃহত্যাগের পর গোপীকান্তের আচার ব্যবহার আরও কৌতুককর। তার পুলিশ-ভীতি, কোচম্যানের সঙ্গে ব্যবহার, জাহাজে সাধুর সঙ্গে গাঁজা খাওয়া, সন্ন্যাসীর কথায় একমুঠো টাকা বের করে দেওয়া, তারই অসাবধানতায় সন্ন্যাসী কর্তৃক টাকা অপহরণ, গদাধরের সমস্ত বিবৃতিকে নি:সন্দেহে মেনে নেওয়া কোন কিছুই জমিদার সুলভ মনোভাবের পরিচয় বহন করে না।

বস্তুত: সার্থক জমিদার বা অসৎচরিত্র কোন ভাবেই তিনি চিত্রিত হননি। সামান্য চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগে লেখক তাকে কেন্দ্র করে ঘটনাজাল বিস্তার করেছেন মাত্র এবং ঘটনাস্রোতে হাবুডুবু খেতে খেতে মিলনের বেলা-ভূমিতে পরিবার পরিজনের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

গোপীকান্তবাবুর স্ত্রী সুলোচনার 'প্রকৃতিটি বেশ স্নিগ্ধ। রাগিতে তাহাকে প্রায়ই দেখা যায় না। মনে কোন দু:খ হইলে মনেই তাহা লুকাইয়া রাখেন— মুখে প্রকাশ পায় না। পরমাত্মীয় জন ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহার অন্তরের গোপন বেদনার সন্ধান পায় না। আবার হর্ষেও তাহাই। কোন হর্ষের কারণ উপস্থিত হইলে আনন্দে আটখানা হইয়া গড়াইয়া পড়েন না।' ৪২ স্বামী এবং গুরুজনদের প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধা, দেবরের প্রতি প্রীতি ভালবাসা, পুত্রকন্যার প্রতি অগাধ স্নেহ তাকে আদর্শ গৃহিনী-পদে অধিষ্ঠিত করেছে। দেবরের মুখে স্বামীর অপবাদের কথা শুনে মনে তার একটু সন্দেহ উঁকি দিয়েছে বটে কিন্তু 'তিনি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে ভগবান, এ অপবাদ যদি সত্যই হয়, তবে তুমি আমার স্বামীকে দয়া কর - তাঁহাকে সুমতি দাও — তাঁহাকে ভাল কর। এ লজ্জার কথা যেন প্রকাশ না হয়। এ কলঙ্ক তাঁহার জীবন হইতে ধৌত করিয়া দাও। তাঁহাকে রক্ষা কর — রক্ষা কর।' ৪৩

বলাবাহুল্য এ ধরণের আদর্শ চরিত্র সংসার জীবনে আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেও উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে সার্থক হওয়া কঠিন। সুলোচনার আদর্শ স্বভাব না পেরেছে গোপীকান্তবাবুকে তার বিপদের হাত থেকে মুক্ত করতে অথবা উপন্যাসের ঘটনাকে সংযত করে কাহিনীকে সংহতিদান করতে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে সুলোচনা লেখকের মানসলোকের আদর্শ নারীর প্রতিমা। গৃহাশ্রমের প্রতি প্রভাতকুমারের যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল সেইটি মূলত: এই ধরণের আদর্শ নারীমূর্ত্তির আকর্ষণ। এঁদের সংসারে পূর্ণমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, এই ধরণের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে জাগিয়ে তোলার জন্যই বোধ করি প্রভাতকুমার সুলোচনার স্খলিত স্বামীকে লম্পট করে আঁকতে পারেননি। প্রসঙ্গত: 'রত্নদীপ'এ রাখালের স্ত্রী, সিন্দুর কৌটা'য় বকুরাণী' সতীর পতি'তে সুরবালা ইত্যাদি চরিত্র স্মরণযোগ্য। স্বামীর শত অন্যায় সত্ত্বেও পতিভক্তিতে এরা অবিচল।

'নবীন সন্ন্যাসী'তে প্রধান চরিত্রগুলির তুলনায় পার্শ্বচরিত্রগুলি স্ব স্ব ভূমিকায় বাস্তব এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সর্বপ্রথম মনে পড়ে গোপীকান্তবাবুর অন্ত:পুরের সবচেয়ে পুরানো এবং প্রতাপশালী ঝি- হরিদাসী। সে বিধবা, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। চেহারাটি গোলগাল - তাই অন্য দাসীরা তাকে ঠাট্টা করে 'বাতাবী নেবু' বলে ডাকে। সে 'নিতান্তই সরল অর্থাৎ বোকা।' সুচতুর গদাই পাল অন্দরমহলের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য নানা কৌশলে তার মন ভুলিয়ে তাকে বশ করেছে। হরিদাসীর সামনে তার নবীন যৌবনের রূপের প্রশংসা করে, তার বৈধব্যের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে অবশেষে গদাই পালের সঙ্গেই তার বিয়ে হবার সম্ভাবনা ছিল, হলে তারা কত সুখী হতে পারতো ইত্যাদি দু:খ-সমবেদনা জানিয়ে ধীরে ধীরে নিজের প্রতি তাকে আকর্ষণ করেছে। পিতৃঋণ শোধের অছিলায় হরিদাসীর হাতে সে টাকা গুজে দিয়েছে এবং সর্বশেষে বিধবা - বিবাহ সম্ভব একথা জানিয়ে গদাই হরিদাসীর অবদমিত আসঙ্গ -লিপ্সাকে জাগিয়ে তুলেছে। গদাইয়ের প্রতি প্রথমে সে কোন আকর্ষণ বোধ করেনি বরং তার ব্যবহারকে মনে মনে 'মিনষের ধাঁচা' বলে বিদ্রূপ করেছে। কিন্তু নগদ অর্থপ্রাপ্তি, রূপযৌবনের প্রশংসা শ্রবনজনিত দুর্বলতা এবং তার গোপনীয় কামনা গদাইয়ের কাছে আস্তে আস্তে তাকে ঠেলে দিয়েছে। বিধবা বিবাহে তার ক্ষীণ আপত্তি থাকলেও সরলা হরিদাসী তার অবরুদ্ধ কামনা-বাসনাকে সংযত করতে না পেরে বিধবা বিবাহে সম্মতি জানিয়েছে। এই সূক্ষ্ম মানসিক বিশ্লেষণ-পর্বটি অত্যন্ত বাস্তব এবং মনোগ্রাহী হয়েছে। তার বিয়ের কথায় গদাধর যখন বলে - কিন্তু সে কথাটার উত্তর দিলে না তো হরিদাসীর বক্তব্য -

" কোন কথাটার ?''

" আসল কথাটার। বিয়ের কথাটার।"

" সে কথা ওবেলা হবে এখন।" বলিয়া
সলজ্জ হাসি হাসিয়া হরিদাসী প্রস্থান করিল।

সরলা বিধবার গোপন ইচ্ছা প্রকাশের ভঙ্গিটি বড় সুন্দর।

নায়েব হয়ে গদাধর যখন দরিয়াপুর যাবার উদ্যোগ করেছে হরিদাসী ভেবেছে গদাধর হয়ত তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছে। তাই সে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গদাধরের অনুসরণ করেছে। তাকে না বলে গদাধরের গমনোদ্যোগ তার মনে প্রতারণার আগুন জ্বালিয়েছে।- গদাধরের কাছে এ মনোভাব প্রকাশ হতেই গদাধর আবার তার সুনিপুণ অভিনয়ে - তাকে মোহজালে আটকে শান্ত করেছে। গদাধরের প্রতি তার গোপনীয় প্রচন্ড আসক্তি এবং না পাওয়ার হতাশায় সে এক সময় কাশী-বাসিনী হতে চেয়েছে। টাকার লোভে গদাধরের প্রলোভনে সে আকৃষ্ট হয়ে টাকা চতুর্গুন করার আশায় সে দুর্গন্ধযুক্ত মদকে মা কামাখ্যার চরণামৃত বলে পান করেছে, ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের সুখের আশায় পরম বিশ্বাসে সঞ্চিত অর্থ গদাধরের হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু যখনই সে শুনেছে গদাধরচন্দ্র প্রতারক এবং তার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে - সে বুঝে ফেলেছে গদাধর তার সর্ব্বস্ব ঠকিয়ে ফেরার হতে পারে। তাই ওৎ পেতে থেকে রাত্রিতে গদাধরকে তার ঘরে পাকড়াও করে টাকা আদায় করে নিয়েছে। গদাধরের শঠতা বুঝতে পেরেও সে প্রতিহিংসা পরায়ণা হয়নি - গদাধরের যাওয়ার সময় তাকে বলতে শুনি —'সাবধানে পালিও যেন ধরে না ফেলে।"

উপন্যাসের মূল বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে হরিদাসীর চরিত্র কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেনি কিন্তু তার অজান্তে সে গোপীকান্তের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসার অন্যতম কারণ হয়েছে। গোপীকান্তের অন্তঃপুরের খবরাখবর এবং বাগান বাড়ীর সন্দেহজনক পরিস্থিতি বর্ণন, গদাধরকে নব নব কৌশল উদ্ভাবনের সুযোগ করে দিয়েছে। সর্ব্বোপরি গদাধর চরিত্রের সম্যক উপলব্ধির জন্য ~~হরি~~ হরিদাসীর প্রয়োজন অনেকখানি। হরিদাসীর চরিত্র চিত্রণ বাস্তবতায় উজ্জ্বল।

অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রের মধ্যে কেণারাম ঘোষ, দারোগাবাবু, বাগানবাড়ীর মালী এবং তার ছেলে রামদাসোয়া ইত্যাদি চরিত্রগুলি বাস্তবানুগ ও স্বল্পপরিসরে বলিষ্ঠ রেখায় চিত্রিত।

দারোগাবাবু ~~চরিত্র~~ শেফায়েৎ হোসেনের চরিত্রটি অতি-বাস্তব এবং যথাযথ হয়েছে। শিষ্টের দমন এবং দুষ্টপালনে তিনি পারঙ্গম অবশ্য প্রাপ্তি-যোগ ভিন্ন একাজ সম্ভব হয় না। গদাই পালের দেওয়া ঘি এবং উৎকোচ তিনি সহাস্যে গ্রহণ করেছেন নির্বিকারচিত্তে, মনে হয় যেন তার এসব ন্যায্য পাওনা। তিনি মদ্যপ, নির্দয় এবং কটুভাষণে অভ্যস্ত। বাস্তব জীবনে আমরা সচরাচর দারোগার যে চরিত্র দেখতে পাই শেফায়েৎ হোসেন-চরিত্রের মধ্যে তার কোন ব্যতিক্রম নেই। গদাই পালের কাছ থেকে উৎকোচ

গ্রহণ করে, নানা কৌশলে নির্দোষ রমণ ঘোষকে হাজত বাস করাতে তার বিবেকে এতটুকু বাধেনি। এত নিখুঁত চরিত্রাঙ্কন বোধকরি লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল। আইন ব্যবসার সূত্রে এ ধরণের চরিত্রের সংস্পর্শে আসা প্রভাতকুমারের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

কেণারাম সাধারণ গৃহস্থ, ছা-পোষা লোক। ভ্রাতৃজায়া বিধবা গঙ্গামণির উপর পূর্বে সে নানা অত্যাচার করেছে এমনকি দৈহিক লাঞ্ছনাও বাদ পড়েনি। সেই সূত্রে গঙ্গামণির গৃহত্যাগে কেণারামের মনে ভীষণ ভয় ছিল। তার মনের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নায়েব গদাই তাকে ভয় দেখিয়ে, কেণারামকে দিয়ে তার নিজের ঘরেই সিঁদ কাটিয়েছে, কাঁসারিকে দিয়ে তার ভাঙ্গা বাসন মেরামত করিয়ে সেই বাসন দারোগাকে দিয়ে এসেছে, দারোগা আবার সুকৌশলে সেই বাসন রমণ ঘোষের খড়ের গাদায় লুকিয়ে রেখে কেণারামের ঘরের চুরির অজুহাতে রমণ ঘোষের গৃহ তল্লাসী করে বাসন পেয়েছে এবং কেণারামকে দিয়ে সেই বাসন সনাক্ত করিয়ে রমণ ঘোষকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। কিন্তু রমণ ঘোষের লাঞ্ছনা দেখে তার মন ক্ষণিকের জন্য মাল সনাক্ত করণে অপারাগ হলেও তার দুর্বল মন এ সমস্ত জুয়াচুরির তীব্র প্রতিবাদ করতে পারেনি। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত গোপীকান্তের কাছে সব সত্য-কথা ফাঁস করে দিয়েছে - গদাই পালের প্ররোচনায় যে সে এসব কাজ করেছে আদালতে সে সাক্ষী দিতে স্বীকৃত হয়েছে। সাধারণ গৃহস্থের মানসিকতা কেণারামের চরিত্রে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

গোপীকান্তবাবুর বাগানবাড়ীর মালীর চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত এবং সঙ্গতিপূর্ণ। স্বল্প মাইনের চাকুরেকে বেশী মাইনের লোভ দেখিয়ে গদাই সহজেই তার মন জয় করেছে। সে সরল, গদাধরের চালাকী বুঝতে না পেরে গঙ্গামণির খবর বলে দিয়েছে। গঙ্গামণির ঘরের চাবি গদাইকে দেখিয়েছে। গদাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী চাকুরী রক্ষার খাতিরে মিথ্যা কথা বলতেও কুণ্ঠিত হয়নি। স্বল্প বেতনের অশিক্ষিত এই কর্মচারিটির মিথ্যাভাষণেও আমাদের মনের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে।

উপন্যাসে মুখ্য চরিত্র অপেক্ষা গৌণ চরিত্রাঙ্কণে প্রভাতকুমারের এই কৃতিত্বের পরিচয় ছোটগল্প রচনায় তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মূল কাহিনীর সঙ্গে এই গৌণ চরিত্রগুলির যোগাযোগ ক্ষীণ হলেও — সাধারণ জীবনের অল্প পরিসরের মধ্যে তাঁর শিল্প প্রতিভা যে স্বতঃস্ফূর্তি লাভ করে; এখানে তার স্বাক্ষর রয়েছে।

'নবীন সন্ন্যাসী' প্রভাতকুমারের অন্যতম বৃহৎ উপন্যাস। মূল

কাহিনীকে অবলম্বন করে ঘটনার শাখা - প্রশাখা এতদূর বিস্তৃত হয়েছে যে মূল কাহিনীর রসফিকে হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য উপন্যাসের 'বৈদ্যুতিক হিন্দু সভা' নামাঙ্কিত দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, 'উৎসবের আয়োজন' নামধেয় ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ,' একটি ভৌতিক কান্ড ' নামাঙ্কিত চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। - মূল কাহিনী বিবৃতির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশলাভের পর 'প্রবাসী'র সমালোচক লিখেছেন " গ্রন্থবর্ণিত ঘটনা অবান্তর ও অনাবশ্যক ঘটনার দ্বারা অকারণে ভারাক্রান্ত হইয়াছে — আগা ও গোড়ায় একটি সঙ্গতি পর্যান্ত রক্ষিত হয় নাই ৪৪......" উপন্যাসের আসল ভাবটি তাহার কেন্দ্রিকতায় (Unity of action) এবং আসল পটুতা চরিত্র-বিকাশে; এই প্রধান উপাদানের নিতান্ত অভাব আছে এই গ্রন্থে।" ৪৫

উপন্যাসের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি উপন্যাসের মূল বক্তব্য মোহিতলালের চরিত্রকে কেন্দ্র করে বিকশিত হওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মোহিত চরিত্রটি অনেকাংশে নিষ্ক্রিয়, তার চরিত্রের আদর্শ এবং বাস্তবে সেই আদর্শের রূপদানের যে প্রচেষ্টা দুয়ের মধ্যে অনেক অসংগতি রয়েছে। এবং যে অসংগতি অনেক সময় হাস্যকরও বটে। শুধু তাই নয় — আদর্শ রূপায়ণের জন্য ঘটনা প্রবাহের উপর তার কর্তৃত্ব লক্ষ্য করা যায় না বরং সামান্য প্রতিবাদের বুদবুদ তুলে ঘটনা স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে। মোহিতের আদর্শ-চিন্তা এবং বাস্তব-পরিবেশজ্ঞান এ দুয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান —ফলত: উপন্যাসে তার ক্রিয়া কলাপ পরিবেশ বা ঘটনার সঙ্গে বিশেষ সঙ্গতি রেখে এগিয়ে যেতে পারেনি। গোপীকান্তবাবুর চরিত্রও একই পথ অনুসরণ করেছে। সুলোচনা আদর্শ চরিত্র সন্দেহ নাই কিন্তু ঘটনা স্রোতকে সে ভিন্ন পথে মোড় ফেরাতে পারেনি অথচ স্বামীকেপরামর্শ দিয়ে অথবা গদাইচরিত্রের অনুধাবন করে তার কৌশলজাল ছিন্ন করা সুলোচনার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। ফলে ঘটনা স্বেচ্ছাধীন ভাবে এগিয়েগেছে। বরং বলা যায় উপকাহিনীর নায়ক গদাই তার সূক্ষ্মবুদ্ধি, মানব চরিত্র-অভিজ্ঞতা, ভন্ডামি, শঠতা ইত্যাদিকে আশ্রয় করে ঘটনার মোড় আপন ইচ্ছায় ঘুরিয়েছে। তাই তার চরিত্রটি হয়েছে অত্যন্ত জীবন্ত এবং আকর্ষণীয়।

উপন্যাসে, সামগ্রিকভাবে বিচার করলে ঘটনা চরিত্রের অসংগতি হয়ত চোখে পড়বে কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে বর্ণিত চরিত্রগুলির বিশেষত অপ্রধান চরিত্রগুলির আংশিক মাধুর্য্যের দিকও আমাদের বিমোহিত করে। হরিদাসীর সরলতা, তার অবদমিত ইচ্ছার লজ্জারুণ বিকাশ, ব্যর্থতায় ভবিষ্যৎ-সম্বিত জ্ঞান উপলব্ধি এবং নিজেকে সংযত করে গদাইয়ের প্রতি উদার মনোভাব প্রদর্শন অতীব মুগ্ধকর। বাগানবাড়ীর মালীপুত্র রামদাসেয়ার

ক্ষণিক আবির্ভাব তার অভাবিত পয়সা প্রাপ্তিতে আনন্দের প্রকাশ এবং সেই সঙ্গে আরও পাওয়ার লোভে, দক্ষিণ হস্তের পয়সাটি বামহস্তে ধারণ করে পেছনে লুকিয়ে আবার হস্ত প্রসারণ এবং মালী বাধা দেওয়াতে তার 'এজিটেশন' এবং আর একটি পয়সা পাওয়াতে আনন্দে নৃত্য করতে করতে প্রস্থান— অদ্ভুত সুন্দর ভাবে সুচিত্রিত। আশা করি এই কারণেই 'প্রবাসী'র সমালোচক মন্তব্য করেছেন —' তথাপি প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ স্বতন্ত্রভাবে হাস্যে বৈচিত্র্যে ঝলমল করিতেছে — নিপুণ ভাবে অঙ্কিত খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি মনকে মুগ্ধ করিয়া সমগ্রের অভাব ও দৈন্য ভুলাইয়া দেয়।' ৪৬

'প্রবাসী'র সমালোচক এই উপন্যাসটির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এনেছিলেন উপন্যাসে Unity of action এর অভাব। প্রভাতকুমার এই বিরুদ্ধ সমালোচনায় সম্ভবতঃ একটু ক্ষুন্ন হয়েছিলেন এবং 'নবীন সন্ন্যাসী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের কাছে বলেছিলেন —' এখন, এই Unity of action জিনিষটি নাটকেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ, উপন্যাসের নয়। তবে যে সকল উপন্যাস নাটক লক্ষণাক্রান্ত যেমন বঙ্কিমবাবুর — সেগুলিতে Unity of action দেখা যায় বটে, কিন্তু আরও এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে — তাহা চিত্র জাতীয় বলা যাইতে পারে। Dickens এর উপন্যাসগুলি এ জাতীয় উপন্যাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাতে প্লটও ঘোরালো হয় না — বীজকোষ পাপড়ির কোন হাঙ্গামা নাই। আমার 'নবীন সন্ন্যাসী'ও সেইরূপ চিত্র জাতীয় উপন্যাস।' ৪৭

কাহিনীর গঠন অনুসারে উপন্যাসকে দুভাগে আমরা ভাগ করে নিতে পারি — 'The novel of loose plot' অর্থাৎ চিত্রধর্মী উপন্যাস এবং 'the novel of organic plot' অর্থাৎ সুসংবদ্ধ আখ্যানধর্মী উপন্যাস। সুসংবদ্ধ আখ্যানধর্মী উপন্যাসে 'the separate incidents are no longer treated episo dically, they are dovetailed together as integral components of a definite plot pattern......thecharacters and events arranged to occupy their proper place in it' ৪৮ কিন্তু চিত্রধর্মী উপন্যাসে

..the story is composed of a number of detached incidents, having little necessary or logical connection among themselves; the unity of the narrative depending not on the machinary of the action, but upon the person of the hero who, as the central figure or nucleus, binds the otherwise scattered elements together....' ৪৯

। ৪১ লক্ষণীয় এই, সুনির্দিষ্ট কাহিনী পরিকল্পনা থাকাতে 'Organic plot' এ চরিত্র এবং ঘটনা যেখানে নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে, চিত্রধর্মী উপন্যাসে নায়ক চরিত্র স্থানে মধ্যমণি হয়ে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে একত্রিত করে। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন ঘটনার অভাব নেই কিন্তু নায়ক মোহিতলাল ঘটনার উপর প্রভাব বিস্তার করে ঘটনার সামগ্রিক রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। তাই সার্থক চিত্রধর্মী উপন্যাস 'নবীন সন্ন্যাসী'কে বলা দুরূহ।

প্রভাতকুমারের প্রায় প্রতিটি রচনায় হাস্যরসের একটি ক্ষীণ ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলে। 'নবীন সন্ন্যাসী'তে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সে হাস্য রস উৎসারিত হয়েছে কখনও বা বুদ্ধিদীপ্ত কথনে, কখনও বা ঘটনা সংস্থাপনে আবার কখনও নির্মল হাস্য রসের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন পাত্রপাত্রীর বিসদৃশ আচরণে। মোহিত চরিত্রের আচরণে দেখি - মোহিতের বিয়ের ব্যাপারে পাত্রীপক্ষ তাকে দেখার জন্য এলে, দাদা গোপীকান্ত বালক বিনোদকে দিয়ে মোহিতকে ডেকে পাঠিয়েছেন। মোহিতকে ডাকার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বিনোদ বলেছে সে ঠিক জানে না। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে মিথ্যাভাষণজনিত একটা সঙ্কোচ ছিল। মোহিতলাল সেইটুকু লক্ষ করে বলে ---" ছি ছি ছি বিনোদ ! মিথ্যা কথা বললে ? ছি ছি ছি ! বিনোদ নিরুত্তর দণ্ডায়মান। মোহিত আবার বলে -

' প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয়ে পড়নি মিথ্যা বলা বড় দোষ - বড় পাপ ? পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র রাজার ছেলে হয়ে বনে গিয়েছিলেন, পড়নি ? প্রাচীনকালের হিন্দুরা প্রাণ দিয়েছে তবু মিথ্যা বলেনি - এ কথা শোননি ? তুমি সেই হিন্দু সন্তান, তা কি তুমি ভুলে গেলে ? মিছে কথা বলার ভীরুতা, কাপুরুষতা আজ তোমায় কলঙ্কিত করেছে। বড় দুঃখের বিষয় বিনোদ বড় লজ্জার বিষয় - ছি ছি ছি !' ৫০

মোহিতের এই বাক্যবাণ এবং জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে বালক বিনোদ কেঁদে ফেলেছে। মোহিত তবুও নিরস্ত হয়নি, পুনরায় বলেছে -

' কাঁদ। যে পাপ করেছ তা চোখের জলে ধুয়ে ফেলে আবার পবিত্র হও। পাপের কালি কেবল চোখের জলেই ধৌত হয়, অন্য কিছু দিয়ে তা পরিষ্কার করবার উপায় নেই।' ৫১

বলাবাহুল্য বিনোদের এই লঘু পাপে যে নীতিকথা আওড়ে মোহিত গুরুদণ্ডের ইঙ্গিত দিয়েছে সেটা অত্যন্ত অসঙ্গত এবং মোহিতের এই পরিস্থিতি জ্ঞানজনিত অভাববোধের জন্য আমাদের স্বতঃই হাসি পায়। বোকা এবং নিরক্ষর হরিদাসীর বিবাহ এবং চতুর্গুন অর্থপ্রাপ্তি জনিত লোভে পড়ে মা যোগমায়ার চরণামৃত মনে করে সুরা পান, অত্যন্ত কৌতুককর। চরণামৃত ভেবে পাত্রটি মুখের কাছে নিয়ে হরিদাসী বলে—' ওমা ! এ যে দুর্গন্ধ !"

গদাই বলিল, "চুপ চুপ ক্ষেপি! ও কথা বলতে আছে? দূর্গন্ধ নয় — সুগন্ধ সুগন্ধ। কামিখ্যেতে মার প্রতিমার নীচে কুন্ড আছে - সেই কুন্ড থেকে ও চরণামৃত তুলে আনা। সেখানে রাশি রাশি ফুল বিল্বপত্র রাতদিন পড়ছে কিনা-সেই ফুল বিল্বপত্র পচে পচে ও রকম - সুগন্ধ হয়েছে। বাঁ হাতে নাকটি টিপে, ডানহাতে ধরে ঢুক করে খেয়ে ফেল।"

হরিদাসী উপদেশ অনুসারে পান করিয়া বাটি নামাইয়া রাখিয়া, নাক মুখ শিটকাইয়া বলিল, "ম্যাগো: - কি — সুগন্ধ! ছি ছি রাম রাম।" ৫২

গদাই চরিত্রে কাজে এবং কথায় বৈষম্য, ভন্ড সাধুদের আলাপ আলোচনা, বৈদ্যুতিক-হিন্দুসভার উদ্ভট যুক্তি তর্ক ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হাস্য রসের ধারা বয়ে গিয়েছে।

প্রভাতকুমারের সমসাময়িককালে দেশময় এক ধর্ম্মান্দোলন গড়ে উঠেছিল এর মধ্যে একদল প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মকে তার আচার সর্বস্বতা নিয়ে পুন: প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে চলেছিলেন। প্রভাতকুমার প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী ছিলেন না কিন্তু গোঁড়ামীকেও মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেন নি। গুরুদাসবাবুর বক্তব্যের আড়ালে তাঁর মত ব্যক্ত হয়েছে। ধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি — উপন্যাসে 'বৈদ্যুতিক হিন্দুসভা'র বিবরণটি ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যার প্রতি কটাক্ষ সূচিত করেছে। উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেছেন —" বৈদ্যুতিক হিন্দুসভা'র বিবরণ পাঠ করিয়া আমার কোন কোন বন্ধু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন — তাঁহারা বলিয়াছিলেন ইহাতে আমি হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করিয়াছি। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে শাস্ত্রোক্ত বা প্রচলিত কোনওরূপ হিন্দুধর্মকে আমি আক্রমণ করি নাই। — হিন্দু নামধারী বিকৃতমস্তক একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে আমি বিদ্রুপ করিয়াছি মাত্র।''

'নবীন সন্ন্যাসী' রচনাকালে প্রভাতকুমার গয়াতে বসবাস করছিলেন এবং তখন আইন ব্যবসায় লিপ্ত। আইন সংক্রান্ত ধারা উপধারা এবং আইন আদালতের সঙ্গে জড়িত বহু মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় লাভের সুযোগ নিশ্চয় ঘটেছিল। তাদের চরিত্রের বিশেষত্ব, মানসিক প্রবণতা ইত্যাদির অভিজ্ঞতা বোধ করি উপন্যাসের গদাই পাল, দারোগাবাবু, কনেষ্টবল ইত্যাদির চরিত্রগুলিকে বাস্তব এবং জীবন্ত করেছে। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে হিন্দী ভাষার সঙ্গে বিশেষত: তার কথ্য রূপের উপর তাঁর যে

কতখানি দখল ছিল সে পরিচয় রয়েছে উপন্যাসে মালীর ভাষা ভঙ্গীতে — 'তু তো বড়া পাজি বুঝাশুত হ রে ।' অথবা মালীর স্ত্রীর মুখে শুনি — 'xxxxx' আ গে ছৌড়ি — তোরা হাম মারতে মারতে' ইত্যাদি ।

'নবীন সন্ন্যাসী' সম্পর্কে তৎকালীন Bengalee পত্রিকায় মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য । উপন্যাসটির সমালোচনায় Bengalee লিখিয়াছেন ' To such readers who read fiction for pleasure xxkyx only the Book will appeal owing to the volume of genuine honour contained in its pages ....'

(রমাসুন্দরী উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩২১) শেষে সংযোজিত বিজ্ঞাপন অংশ থেকে উদ্ধৃত)। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটিতে হাস্য রস প্রবাহের অসদ্ভাব ঘটে নাই । উপন্যাসটির গঠন-গত ঐক্যের অভাব স্বীকার করে নিয়েও সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৺ মন্তব্য করেছেন 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসটি সুখ-পাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক গদাই পালের চরিত্র ইহাকে উৎকর্ষের উচ্চতর স্তরে লইয়া গিয়াছে ।' ৫৩-ক

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আমাদের বাংলাদেশের জমিদার শাসিত সমাজ ব্যবস্থা, তাঁদের আমলা শ্রেণীর প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় উপন্যাসটিতে উদঘাটিত হয়েছে । এছাড়াও এই সময়ে দেশের যুব সম্প্রদায়ের মনে কিছুটা ব্যাপকভাবে যে সন্ন্যাসগ্রহণ প্রবণতা দেখা দিয়েছিল মোহিতের চরিত্রে তার পরিচয় আছে । একদল তথাকথিত হিন্দু - ধর্ম -প্রেমী যে সেই সময়ে হিন্দু ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যায় মেতে উঠেছিলেন উপন্যাসে বর্ণিত 'বৈদ্যুতিক হিন্দুসভা' বর্ণনার মাধ্যমে সেই পরিচয় বিধৃত হয়েছে ।

সাহিত্য বিচারের মাপকাঠিতে 'নবীন সন্ন্যাসী'কে হয়ত সার্থক উপন্যাস বলা চলে না -' তথাপি ভাষার প্রবাহে, চিত্রের মোহে হাস্যের প্রলোভনে পাঠকের মন' ৫৩ ভোলাতে 'নবীন সন্ন্যাসী' সক্ষম হয়েছিল । লেখকের জীবদ্দশায় তিন বার উপন্যাসটির পুনর্মুদ্রন হয়, হিন্দী মারাঠী xxx এবং গুজরাটী ভাষায় উপন্যাসটির রূপান্তর নিশ্চিতভাবে এর জনপ্রিয়তার নিদর্শন বহন করে ।

পরবর্তীকালে রাজশেখর বসুর (১৮৮০ - ১৯৬০) উপর প্রভাত-কুমারের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাজশেখর বসুর 'বিরিঞ্চি বাবা'র সঙ্গে নবীন সন্ন্যাসীর ভণ্ড সন্ন্যাসী চরিত্রের বাহ্যিক মিল না থাকলেও একটি-অপর চরিত্রটিকে স্মরণ করিয়ে দেয় ।

(৩)

'রত্নদীপ' প্রভাতকুমারের তৃতীয় এবং অন্যতম সার্থক উপন্যাস। ফাল্গুন, ১৩১৯ ~~সালে এই এই সংস্করণে পাঁচটি সুদৃশ্য হাফটোন চিত্র ছিল~~ সাল থেকে ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত 'মানসী'তে ধারাবাহিক ভাবে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ লাভ করে আষাঢ়, ১৩২২ সালে। এই সংস্করণে পাঁচটি সুদৃশ্য হাফটোন চিত্র ছিল।

ই.আই রেলওয়ের খুস্রুপুর ষ্টেশনের ছোটবাবু - পত্নী প্রেম বঞ্চিত ভাগ্য বিড়ম্বিত রাখাল ভট্টাচার্য্য লোভের বশবর্তী হয়ে সন্ন্যাসবেশধারী জমিদারপুত্র মৃত ভবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মবেশ ধারণ করে তার আটলক্ষটাকা আয়ের জমিদারী এবং যুবতী স্ত্রী লাভের আশায় ~~য~~ নদীয়া জেলার বাশুলিপাড়া গ্রামে ~~তার~~ জমিদারগৃহে হাজির হয়ে সেখানকার জমিদার হয়ে বসে। এবং ধীরে ধীরে ভবেন্দ্রনাথের সতী-সাধ্বী বিধবা স্ত্রী ইন্দুমতী দেবীর শুদ্ধ প্রেমের প্রভাবে রাখালের হৃদয়েও সত্যকারের প্রেমের জাগরণ ঘটে এবং সেই প্রেমের প্রতিক্রিয়ায় রাখাল তার ছদ্মবেশ ছেড়ে ইন্দুমতীদেবীর কাছে আত্মপরিচয় দানে কৃতকর্মের অনুশোচনার ~~মধ্য~~ মধ্য দিয়ে সবকিছু পাওয়ার মুহূর্তে স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ করে কি ভাবে চলে আসে তারই এক রসঘন কাহিনী 'রত্নদীপ' উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে।

কাহিনী রচনায় জাল প্রতাপচাঁদের বিখ্যাত ~~মামলার~~ মামলায় দূরাগত ছায়া অনুসরণের চেষ্টা দেখা যায়। এছাড়া যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রসন্নকুবেরের উইল' ৫৪ উপন্যাসটির সঙ্গে 'রত্নদীপ' এর কাহিনীগত সাদৃশ্য আছে বলে কথিত।

'রত্নদীপে' প্রভাতকুমারের উপন্যাস - রচনা প্রতিভা অনেকাংশে পূর্ণতর এবং প্রতিষ্ঠিত। তাঁর উপন্যাস প্রধানত: ঘটনা বিন্যাস এবং বৈচিত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু রত্নদীপে ঘটনাবৈচিত্র্য থাকলেও তা অনেক সংযত এবং চরিত্রচিত্রণ অনেকাংশে যথাযথ। এখানে ঘটনা বিন্যাস যেমন ~~xxx~~ আমাদের ঔৎসুক্য অক্ষুন্ন রেখেছে তেমনি চরিত্রমাধুর্য্যে ও আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না।

কাহিনীর নায়ক রাখাল। তারই ঘাত - প্রতিঘাতে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পরিবর্তনের কাহিনী উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। রাখাল খুস্রুপুর রেল ষ্টেশনের ছোটবাবু। বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার ময়নামতী গ্রামে বয়স আনুমানিক ত্রিশ, শ্যামবর্ণ, সুশ্রী যুবাপুরুষ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে রেলে চাকুরী নিয়েছে, পাঁচ বছর ধরে চাকরী করছে বেতন পায় মাত্র পাঁচিশ টাকা তবে মাঝে মাঝে 'টাকাটা সিকাটা' উপরি যে না পায় তা নয়। শৈশবে বাবাকে হারিয়েছে, বিধবা মা অতিকষ্টে তাকে কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়েছে বিয়ে দিয়েছেন কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই মা মারা যান। রাখাল বিবাহিত কিন্তু সন্তানমুখ এখনও

দর্শন [redacted] করেনি । রাখাল বিবাহিত কিন্তু স্ত্রী-প্রণয়-বঞ্চিত । 'স্বামী ও স্ত্রীর প্রণয় ভালবাসার কথা রাখাল উপন্যাসেই পাঠ করে, বন্ধুবান্ধবের মুখে গল্প শোনে — নিজ জীবনে সে রসাস্বাদন কখনও করে নাই।' ৫৫ উনিশ বছর বয়েসী স্ত্রী লীলাবতী বেশীর ভাগই পিত্রালয়ে থাকে, রাখালের সঙ্গে সরকারী বাসায় থাকার তার অনিচ্ছা, বহু সাধ্যসাধনা করে ইতঃপূর্বে তাকে একবার এনেছিল কিন্তু দিন পনেরো থেকে কান্নাকাটি করে স্ত্রী পিত্রালয়ে চলে গেছে । রাখালকে চিঠিপত্রও খুব কম লেখে এবং যদিও বা লেখে অত্যন্ত মামুলী ধরণের, স্বামীর প্রতি কোন অনুরাগের চিহ্নমাত্র সেখানে নাই । রাখাল মনে করে স্ত্রীকে কিছু-দিন কাছে এনে রাখলে হয়ত তার মনে অনুরাগের সঞ্চার হবে এবং তাদের জীবনও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। স্ত্রীকে আনার উদ্দেশ্যেই সে একসপ্তাহের ছুটির দরখাস্ত করেছিল কিন্তু সাহেব ছুটি মঞ্জুর করেন নাই। অগত্যা অন্যান্য রেল কর্মচারী যা করে অর্থাৎ [redacted] মিথ্যা পীড়ার ভান করে 'সিক রিপোর্ট' দিয়ে সে গ্রামে গেছে লীলাবতীকে আনতে । স্ত্রীকে আগেই সে তাদের গ্রামের বাড়ীতে আনিয়ে রেখেছিল পাছে [redacted] শ্বশুরালয়ের কুমন্ত্রনায় সে না আসে । এত আশা বুকে নিয়ে সে বাড়ী গেছে কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখে লীলাবতী নাই। সেদিন ভোর থেকেই তাকে পাওয়া যাচ্ছেনা । সন্দেহ হয়েছে হয়ত বা বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছে নতুবা পিত্রালয়ে চলে গেছে। অনুসন্ধানে জানতে পারে গভীর রাত্রে লীলাবতীকে অন্য একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে গ্রাম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে এবং একথাও জেনেছে সেই রাত্রেই [redacted] তার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের জমিদারের ছোটভাই নবীন নিরুদ্দেশ হয়েছে । একই দিনে লীলাবতী এবং নবীনের নিরুদ্দেশের খবর [redacted] জেনে স্বভাবতই তার মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে যে তার স্ত্রী অন্য পুরুষে আসক্ত এবং চরিত্রহীন ।

মনের ব্যথা মনেই চেপে রেখে রাখাল চাকরী স্থলে এসেছে—কিন্তু সেখানেও দুর্ভাগ্য তার জন্য অপেক্ষা করছিল — এসে শুনে তার অনুপস্থিতিকালে ইনস্পেক্টার সাহেব এসেছিলেন এবং রাখালের পীড়ার ভান করে পালিয়ে যাবার জন্য এক মাসের নোটীশে তার কর্মচ্যুতি ঘটিয়েছেন ।

দুর্ভাগ্য সর্বনাশা মূর্তিতে রাখালের সম্মুখে উপস্থিত। চাকুরী গেলে এমন কোন আশ্রয় নেই যেখানে সে থাকতে পারে, এমন কোন আত্মীয় নেই যে তাকে সান্ত্বনার কথা শোনাবে । স্ত্রীর কলঙ্কজনিত অপরাধে দাদা বৌদির কাছে যেতেও তার প্রবৃত্তি হয়নি । চাকুরীর [redacted] মেয়াদ আর মাত্র দুই দিন আছে । চিন্তা [redacted] করে কোন কুলকিনারা পাচ্ছেনা। 'জীবনটা তাহার কাছে অতি বিস্বাদ অতি তিক্ত হইয়া পড়িয়াছে । এক এক সময় নৈরাশ্যের প্রাবল্যে তাহার ইচ্ছা করিত দূর হউক , সংসার ধর্মে আমার কোন প্রয়োজন নাই —আমি সন্ন্যাসী

হইয়া যাইব। সন্ন্যাসী হইয়া কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, আহারের অভাব হইবে না।' ৫৬

এহেন মানসিক অবস্থায় নাইট ডিউটিরত রাখালের সম্মুখে এক অভাবনীয় সৌভাগ্য লাভের সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে। রাত্রের প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে এক সদ্যমৃত সন্ন্যাসীর দেহ নামিয়ে তার হেপাজতে রাখতে হয়েছে। মৃত সন্ন্যাসীর করুণ পরিণতির কথা চিন্তা করতে করতে তার দুর্ভাগ্যের কথাও তাকে পীড়িত করেছে। কিন্তু সন্ন্যাসীর দেড়া মাশুলের কামরায় ভ্রমন জেনে সে ভেবেছে সন্ন্যাসী হয়তবা অর্থশালী কিন্তু দুদিন পরে সে তো পথের ফকির। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে সে ভেবেছে এ সন্ন্যাসীর কাছে হয়ত অনেক টাকা থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু টাকা থাকলে কিছু পুলিশে হাতড়িয়ে নেবে কিছু সরকারের ঘরে জমা হবে। অপর পক্ষে সে যদি টাকাগুলি আত্মসাৎ করে তবে দুর্ভাগ্যের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। মৃত সন্ন্যাসীর অর্থের কি প্রয়োজন। এই কুচিন্তা থেকেই সে সন্ন্যাসীর বাক্স থেকে অর্থের থলি এবং গেরুয়াবস্ত্রে বাঁধা একটি দপ্তর আত্মসাৎ করে। পরদিন যথারীতি সন্ন্যাসীর সৎকার হয় এবং উপস্থিত সবাই আবিষ্কার করে মৃত সন্ন্যাসী এবং রাখালের অদ্ভুতভাবে চেহারাগত সাদৃশ্য রয়েছে।

সন্ন্যাসীর দপ্তর থেকে পাওয়া তাঁর জীবনপঞ্জী এবং চেহারাগত সাদৃশ্যের সুযোগ ভাগ্যহত রাখালকে আরও গূঢ়তর পাপ পথের প্রলোভনে আকর্ষণ করে। আপন মনে বলে —" আমি যার এ বিষম প্রলোভন দমন করা আমার সাধ্য নয়। লক্ষটাকা আয়ের জমিদারী যুবতী স্ত্রী একটা মিথ্যা কথার দ্বারাই আমি লাভ করতে পারি। যে এতক্ষণ চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে — তার বয়স তার গায়ের রং তার চেহারা — সমস্তই আমার মত। ষোলবৎসর অদর্শনের পর কার সাধ্য আমার জুয়াচুরি ধরে ? তার জীবন চরিত আমার হাতে — তাতে প্রত্যেক খুটিনাটি কথাটি পর্য্যন্ত লেখা আছে। সেখানা আমি মুখস্ত করে নিলে, কার সাধ্য আমায় সন্দেহ করে ? রাখাল তুমি মর — তুমি মর - মরে ভবেন্দ্র হয়ে জন্মগ্রহণ কর।' ৫৭

জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ - লালসায় লালায়িত রাখালের মন ক্রমেই পাপ পথে পা বাড়িয়েছে। চাকুরী শেষে এলাহাবাদে গিয়ে সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করেছে, কাশীতে এসে গিরি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের সম্প্রদায়ের বিশেষ আচার আচরণ জেনে নিয়েছে এবং মৃত সন্ন্যাসী নদীয়া জেলার বাশুলিপাড়া গ্রামের জমিদার শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ষোল বৎসর যাবৎ গৃহত্যাগী গিরি সন্ন্যাসী ভবেন্দ্রনাথের জীবন চরিত। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে মৃত ভবেন্দ্রের নামে নিজেকে পরিচিত করিয়ে বাশুলিপাড়ায় চিঠি লিখে

তার সন্ন্যাস জীবন পরিত্যাগ করে গৃহে ফেরার কথা ঘোষণা করেছে। ইত্যবসরে মুসলমান-ফকির বেশে বাশুলিপাড়ায় উপস্থিত হয়ে গ্রামের অবস্থা সরজমিনে তদন্ত করে সম্ভাবিত খবরাখবর নিয়েও এসেছে । অবশেষে একদিন জাল ভবেন্দ্র হয়ে বাশুলিপাড়ায় জমিদারের পুরাতন বিশ্বস্ত দেওয়ান রঘুনাথ মজুমদারের সঙ্গে ভবেন্দ্রনাথের গৃহে উপস্থিত হয়ে অন্ত: পুরমধ্যে সাদরে গৃহীত হয়েছে ।

দীর্ঘ ষোল বছর পর ভবেন্দ্রের গৃহে প্রত্যাবর্তনে সামান্য একটু সংশয়ের অবকাশ থাকলেও রাখালের সুনিপুন অভিনয় দিনের খুঁটিনাটি সাধারণ ঘটনার উল্লেখে, (যে ঘটনার উল্লেখ বাইরের কারও পক্ষে জানা প্রায় অসম্ভব) ভবেন্দ্রের মাতা রাণীমা, দেওয়ানজি রঘুনাথ মজুমদার এমনকি ভবেন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রমতি দেবীও রাখালকে চিনতে পারেনি । ফলত: অল্পদিনের মধ্যেই রাখাল প্রজাদের কাছে জমিদার, প্রতিবেশীর কাছে ভবেন্দ্র , রাণীমার কাছে পুত্র এমনকি ইন্দুমতী ওরফে বউরাণীর কাছে স্বামী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কিন্তু 'শীতকালের দিন স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াও জলের ধারে বসিয়া লোক যেমন একটু বিলম্ব করে।' ৫৮ রাখালও তেমনি ব্রত পালনের অছিলায় বৌরাণীর স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেছে । রাখাল সন্ন্যাসী বেশে ব্রত পালনের জন্য হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে বৌরাণী থেকে পৃথক ঘরে বৈঠকখানার উপরতলায় আশ্রয় নিয়েছে । বৌরাণী যখন তাকে স্বামী জ্ঞানে প্রনাম করতে এসেছে তখন তার অশ্রুসজল XXXXX পবিত্র চোখ দুটি দেখে রাখালের 'মস্তকের কেশ হইতে পদনখাগ্র অবধি যেন একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ বহিয়া গেল।' ৫৯ বউরাণীর মুখ থেকে যখন রাখাল শুনতে পেল রাখালের সন্ন্যাস ব্রতে স্ত্রীমিলনের যে বাধা আছে সে বাধায় বৌরাণীর কোন কষ্ট নাই - দিনান্তে রাখালকে একবার দেখতে পেলেই সে সন্তুষ্ট , রাখাল আশ্চর্য্য হয়ে গেল । রাখাল দেখলো —

" বউরাণীর মুখখানি স্নেহে সরলতায় পবিত্রতায় যেন ঝলমল করিতেছে । রমনীর মুখে এমন দিব্য জ্যোতি: সে পূর্বে ত কখনও দেখে নাই। স্ত্রী লোকের মধ্যে এতটা কোমলতা, এতখানি স্নেহভক্তি তাহার পক্ষে একেবারেই নূতন ।' ৬০ বউরানীর এই স্নেহে সরলতায় ভরা মুখখানি একদিকে রাখালকে যেমন আকৃষ্ট করেছে অন্য পক্ষে পবিত্রতায় পুণ্য জ্যোতিতে ভরপুর মনটি বউরাণীর প্রতি তার XXXX শ্রদ্ধাসম্ভ্রমবোধকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলেছে , তারই অজান্তে । দেওয়ানজি আস্তে আস্তে জমিদারীর কাগজপত্র রাখালের হাতে তুলে দিয়ে নিজে XXXXX নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন। জমিদারীর সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্কে জমা আছে শুনেই রাখাল ও হতবাক হয়েছে । বৌরাণীর সঙ্গ রাখালের কাছে লোভনীয় হওয়ায় মাঝে মাঝে অন্দরের বাগানে উভয়ে ভ্রমন করেছে — দেওয়ানজির কথায় -'দুটিতে জোটের পায়রার

মত অষ্টপ্রহর এক সঙ্গে আছে । ব্রত করছেন না আমার মুণ্ড করছেন। স্ত্রীকে ছুঁতে বারণ — কিন্তু এ যে ছোঁয়ার বাবা । এর চেয়ে যে ছোঁয়া ভাল ছিল । স্ত্রীই এখন জপতপ - স্ত্রীই এখন ছোকরার ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছে।' ৬১ ইত্যমধ্যে বৌরাণী অসুস্থ হয়ে পড়ায় রাখাল প্রাণপনে তাকে সেবা যত্ন করেছে কিন্তু মিথ্যা ব্রতের খাতিরে বৌরাণীকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থেকেছে এবং তার এই মনঃকষ্টের কথা বৌরাণীকে জানালে বৌরাণীর বক্তব্য-' আমি তোমার ধর্মের সহায় না হয়ে কি অধর্মের কারণ হব ?'৬২ কিন্তু মৃত্যু উপস্থিত হলে বৌরাণী রাখালের ব্রত ভঙ্গ করে দিয়ে তারই কোলে মাথা রেখে মরবে এ কথা বললে, রাখাল দেখে-' বৌরাণীর মুখে হাসি, চোখে জল — সেই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া রাখাল মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিল । কিন্তু তাহা অল্পক্ষণের জন্য মাত্র, ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ে একটা বেদনার সঞ্চার হইল । সে বেদনা আত্ম-গ্লানি প্রসূত — নিজের প্রতি ধিক্কার জনিত ।' ৬৩

বউরাণীর গভীর ভালবাসা, রাখালের প্রতি অগাধ বিশ্বাসে তার অভি-মানাহত মুখখানি বউরাণীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে রাখালের বিবেকে বেধেছে । অসুস্থ বউরাণীকে তিন দিনের জন্য রেখে সহরে কালেক্টার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যেতে ও মন চায়নি — কিন্তু দেওয়ানজির অনুরোধে তাকে যেতে হয়েছে, তার যাত্রা পথে বারবার মনে হয়েছে বউরাণীর কথা । সে কায়মনে প্রার্থনা করেছে বউরাণী ভাল হয়ে উঠুক কিন্তু সেইসঙ্গে আবার মনে হয়েছে — 'আমাকে ভগবান দয়া করবেন কেন ? আমি যে মহাপাপী । ফুলের মতকোমল নির্মল যে, গঙ্গাজলের মত স্নিগ্ধ পবিত্র যে - তারই আমি সর্বনাশ করতে বসেছি — ভগবান আমায় কৃপা করবেন কি ?' ৬৪

এধরণের সৎ-অসৎ এর মানসিক দ্বন্দ্বে রাখাল যখন জর্জরিত, তার মনের এই দোদুল্যমান অবস্থায়-সাধারণ গ্রাম্য মুসলমান হবিবুল্লা, যে তার পুত্রস্নেহে পালিত ভেড়াটিকে বাঁচাতে গিয়ে জমিদারের রোষানলের পরোয়া করেনি, নিশ্চিত বিপদ তুচ্ছ করেও তার স্নেহের পাত্রটিকে বাঁচাতে চায়, তার উক্তি —' যারে পেয়ার করি তার গলায় ছুরি দিতে দিমু ক্যান' ৬৫ এই কথা কয়টি রাখালের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে । শেষ পর্যন্ত সে নিশ্চিত স্থির করেছে তার ভাগ্যে যা হোক বউরাণীকে সে সমস্ত সত্য ঘটনা বলবে, ভালবাসার বুকে সে ছুরিকাঘাত, বিশ্বাসের স্থলে সে প্রতারণা করবেনা। কৃত অপরাধের জন্য বউরাণীর কাছে শত সহস্র ক্ষমা চেয়ে, চিরবিদায় গ্রহণ করবে ।রাখালের হৃদয়ে সান্ত্বনা এই — 'আমার পূজার প্রতিমাখানিকে আমি অপবিত্র করিলাম না, যাহাকে পূজা করিবার জন্য বুকের সিংহাসন পাতিয়া-ছিলাম তাহাকে কলঙ্কিত করিলাম না — ইহাই আমার ভাবী জীবন আলো করিয়া রত্নদীপের মত জ্বলিবে ।' ৬৬

বউরাণীর অগাধ ভালবাসার স্পর্শে রাখালের হৃদয়ে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এক পত্রে বউরাণীকে সে তার সমস্ত ছলনার কথা জানিয়ে হৃদয়ের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে রিক্ত অথচ পবিত্র হয়ে উঠেছে। অবশ্য জন্মদরিদ্র রাখাল, বিপুল সম্পত্তির প্রলোভনকে, বউরাণীর পবিত্রতাকে অক্ষুন্ন রেখে, ধর্ম্মপথে অটল থাকায় শেষপর্য্যন্ত সমস্ত শাস্তি থেকে রেহাই পেয়েছে এবং অন্তঃপুরবাসী সুরবালা ওরফে তারই বিবাহিতা স্ত্রী লীলাবতীকে সঙ্গে নিয়ে বিদায় হয়েছে। ভাগ্য বিড়ম্বিত রাখালের যে প্রবৃত্তি জীবনের সংকটময় মুহূর্তে পৌঁছে অভাবনীয় সুযোগের প্রলোভনে পড়ে পাপ পথে পা বাড়িয়ে সৌভাগ্যের স্বর্ণদুয়ারে পৌঁছোতে তাকে সাহায্য করেছে সেই প্রবৃত্তি আবার পবিত্র-হৃদয়ের প্রেমস্পর্শে তাকে প্রেরণা দিয়েছে দৃঢ়যুক্তির সবল আঘাতে হৃদয়ের সমস্ত দুর্বলতাকে চূর্ণ করে শুচিশুদ্ধ প্রেমকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে। মানবজীবনের এই পরিবর্তন স্বাভাবিক বলেই মনে হয় অন্ততঃপক্ষে রাখালের জীবনের ক্রমপরিবর্তিত ঘটনা পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। রাখাল-চরিত্রচিত্রণে এবং ঘটনা সংস্থাপনে লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য্য।

রত্নদীপের নায়ক রাখাল নায়িকা বাশুলিপাড়ার জমিদারীর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারিনী শ্রীমতি ইন্দুমতী দেবী ওরফে বউরাণী। বউরাণীর বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর, আট বৎসর বয়সে বাশুলিপাড়ার জমিদার-পুত্র ভবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় - কিন্তু বিয়ের অল্পদিন পরেই স্বামী নিরুদ্দেশ হন। তার নিখোঁজ স্বামীই মৃত শ্রীশ্রীমোহান্ত ভজনানন্দ গিরি যার মৃত দেহ রাখাল গাড়ী থেকে নামিয়েছিল।

বউরাণী নিষ্ঠাবতী, পরোপকারী এবং অত্যন্ত পরদুঃখকাতরা কিন্তু নিঃসঙ্গ। তাঁর এই পরদুঃখকাতর মন লীলাবতী ওরফে সুরবালাকে মৃতকল্প-অবস্থায় স্নানের ঘাট থেকে উঠিয়ে এনে সেবায় যত্নে প্রাণদান করেছে, অভাগিনীর কষ্ট-চিন্তা করে নির্বিচারে অন্তঃপুরে জায়গা দিয়েছে। পাছে মনে কষ্ট পায় সেইজন্য তার পূর্বপরিচয়ও খুটিয়ে জিজ্ঞাসা করেননি এমনকি দাসীদেরও সে ব্যাপারে প্রশ্ন করতে বারণ করেছেন, তাকে সঙ্গ দেবার জন্য একজন সমবয়েসী নিষ্ঠাবতী হিন্দু-বিধবাকে খোঁজ করেছেন এবং সেই সুত্রেই কূট অভিনেত্রী কনকবালার বিধবাবেশে তার কাছে আগমন। কিন্তু কনকবালা তার প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠতে পারেনি কারণ কনকবালার মধ্যে তিনি সাধ্বী পতিব্রতা হিন্দুরমণীর অন্তরবাসিনী তপস্বিনী মূর্ত্তিকে দেখতে পাননি। তারপর আবার যখন শুনলেন কনকবালা তার দাদার আগ্রহে বিধবা বিবাহেরও পক্ষপাতী তখন তিনি তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেছেন অবশ্য সেজন্য তিনি অনুতপ্তা।

কিন্তু এসব বউরাণীর বাহ্য পরিচয়। তার আন্তরিক পরিচয়ের কথা লেখক উপন্যাসের প্রারম্ভেই দিয়েছেন —

" অহমিহ স্থিতবত্যপি তাবকী
ত্বমপি তত্র বসন্নপি মামক:।
ন তনুসঙ্গম এব সুখসঙ্গমো
হৃদয় সঙ্গম এব সুখসঙ্গম:।" ৬৭

আমি এখানে থাকলেও আমি তোমার, তুমি সেখানে বাস করলেও তুমি আমারই দেহের সান্নিধ্যই বড় কথা নয়, হৃদয়ের সান্নিধ্যই প্রকৃত পাওয়া, এই জীবনাদর্শেই বিশ্বাসী বউরাণী - তার বিবাহিত জীবনের অস্পষ্ট স্মৃতি এবং মাত্র সাত দিনের জন্য দেখা নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর মুখখানি অস্পষ্ট রেখায় হৃদয়ে অঙ্কিত করে অতি সঙ্গোপনে সেই স্মৃতিটুকু বহন করে চলেছেন। ~~বিয়ের~~ বিয়ের রাতের কড়িগুলি সযত্নে রেখেছেন — নি:সঙ্গ মুহূর্তে সেইগুলি তার পরম ~~নির্ভরতা~~ নির্ভরতা। যতদিন আশা ছিল তাঁর স্বামী বেঁচে আছেন, গৃহে ফিরবেন ততদিন তাঁকে পৃথিবীর মানুষ বলেই ভাবতেন — গৃহস্থালীর মধ্যে তাঁর পরিত্যক্ত সবকিছুতেই তাঁকে কল্পনা করে নিতেন। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর যখন কেটে গেল, স্বামী গৃহে ফিরলেন না, আত্মীয় স্বজন এমনকি মা-বাবাও তাঁর স্বামীকে মৃত বলে ধরে নিয়েছেন তখন বউরাণী —" স্বামীকে পৃথিবীর মানুষ বলিয়া আর কল্পনা করিতেন না। মনশ্চক্ষে এই গৃহে ঐ বাগানে আর তাঁহাকে দেখিতেন না, — স্বর্গে, যেখানে দেবতারা দেহান্তে পুণ্যাত্মারা বাস করেন, রামায়ণে মহাভারতে যে অমরাপুরীর বর্ণনা আছে — সেইখানেই যেন স্বামীকে বিরাজিত দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মস্তক আলোকময় কিরীটমন্ডিত, সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন পবিত্র দীপ্তি বাহির হইতেছে। ..... স্বামী যেন সেই অমরলোকে, বউরাণীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। যখন সময় হইবে, এ পৃথিবী হইতে যখন ছুটি পাইবেন, এ দীর্ঘ বিরহের অবসান হইবে, স্বামী তখন নিজ পুণ্য বলে তাঁহাকে সেখানে লইয়া যাইবেন —দুজনের পুনর্মিলন হইবে।' ৬৮ বউরাণীর জীবনের এই অতি-পবিত্র স্বর্গীয়দ্যুতিতে পরিপূর্ণ এক-নিষ্ঠ স্বামী-প্রেম-চিন্তা, তাঁকে পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও এক অপার্থিব জগতে প্রতিষ্ঠা করেছে।

তাই দেখি ভবেন্দ্রর ছদ্মবেশে রাখাল যখন স্বামীরূপেই তার কাছে এসেছে, তার ব্রতের কথা জানিয়ে বউরাণী থেকে দূরে থেকেছে তখন বউরাণীর মনে নারীসুলভ একটু অভিমান হলেও তিনি স্মিতহাস্যে সব কিছু মানিয়ে নিয়েছেন, পীড়িতা বউরাণীকে রাখাল স্পর্শের অক্ষমতা জানালে অভিমানহতা বউরাণী তাঁর মন:কষ্টকে প্রাণপনে দমন করে জানিয়েছেন —'তা কি হতে পারে?

আমি কি তা হতে দিতে পারি ?' ৬৯ কখনই নয় । আমি তোমার ধর্ম্মের সহায় না হয়ে কি অধর্ম্মের কারণ হব ?'৬৯ এই সুকঠিন আত্মসংযমক্ষমতা, স্বামীর প্রতি গভীর অপার্থিব ভালবাসা তাকে পার্থিব জগতের মালিন্য থেকে অনেক দূরে পবিত্র-প্রেমের সিংহাসনে স্থাপিত করেছে । স্বামীরূপী রাখাল যে প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁর স্বামী নয় একথা জানতে পেরেই পৃথিবীর সব সুখভোগ চিন্তা থেকে তিনি বিদায় নিয়ে তাঁর মনোজগতের সেই স্বামীস্মৃতি-বিজড়িত অপার্থিব প্রেমের জগতে ফিরে গিয়েছেন, যেখানে বিয়ের কড়িগুলি হয়ে উঠেছে তার কাছে এক একটি মানিক ।

বউরাণীর চরিত্রচিত্রণে একদিকে তাঁর বিষাদ-করুণ কোমলতা অন্যদিকে কুলিশ কঠোর সংযম ও পাতিব্রত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়ে লেখক তাঁর চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা সপ্রমান করেছেন। বউরাণীর চরিত্রসৃষ্টি প্রভাতকুমারের শিল্পকুশলতার অন্যতম উজ্জ্বল স্বাক্ষর। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করেছেন —' এই উপন্যাসে প্রভাতকুমার নিজ স্বভাবসিদ্ধ বিশ্লেষণ গভীরতার অভাবকে অতিক্রম করিয়াছেন— বৌরাণীর জীবনের করুণ ব্যর্থতার সূক্ষ্ম উপলব্ধি ও সুন্দর চিত্র আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। নিজ স্বামীজ্ঞানে রাখালের প্রতি তাঁহার যে ভাবপ্রবাহ তরঙ্গিত হইয়াছিল, ভুলভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই সেই উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সংহরণ করা মনস্তত্ত্ব-সম্ভব কি না, আলোচনার দিক দিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু যাহাদের অশান্ত প্রবৃত্তি চিরজীবনব্যাপী কঠোর আত্মদমন দ্বারা বশীকৃত হইয়াছে, এক মুহূর্তের মধ্যে চিরাভ্যস্ত সংযম-শাসন মানিয়া লওয়ার মধ্যে তাহাদের অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই ।প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা যেমন মৌলিক সত্য, সংযমের অনুল্লঙ্ঘনীয় অনুশাসনও সেইরূপ আর একটি অবিসংবাদিত সত্য ।' ৭০

প্রভাতকুমারের উপন্যাসে ঘটনাপ্রবাহে জটিলতা সৃষ্টি করতে দুইএকটি দুষ্ট প্রকৃতির লোকের উপস্থিতি প্রায়শঃই লক্ষনীয় । ' রত্নদীপ ' এ তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভাগ্যবিড়ম্বিত রাখাল প্রলোভনকে জয় করতে না পেরে মনের এক দুর্বল মুহূর্তে বউরাণী এবং তাঁর অর্থসম্পদকে পেতে চেয়েছে, এই উপন্যাসে খগেন ঠিক তা নয় । সে সজ্ঞানে সুস্থমস্তিষ্কে বউরাণী এবং তার অগাধ সম্পত্তিকে আত্মসাৎ করে বিলাসবহুল উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের সুদৃঢ় ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করতে চেয়েছে । খগেন্দ্র অত্যন্ত সুপুরুষ, ধনী পিতার ব্যভিচারী সন্তান । পিতার মৃত্যুর পর অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হয়েও বর্তমানে নি:স্ব কিন্তু অর্থলালসা তার মনে রাবণের চিতার মত জ্বলছে । মনের সেই অর্থলোলুপ প্রবৃত্তি তাকে ইতঃপূর্বে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আত্মসাৎ করার

ইন্ধন যুগিয়েছে ।সেখানে ব্যর্থ হওয়ায় খবরের কাগজে প্রকাশিত বিধবা বউরাণীর সহচরী প্রয়োজন এই সংবাদে আকৃষ্ট হয়ে, বউরাণীকে বিয়ে করে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে । থিয়েটারের অভিনেত্রী কনকলতাকে অর্থলোভ দেখিয়ে বশীভূত করে বউরাণীর সহচরী হিসাবে xxxxx কনকলতাকে নিয়োগ করিয়েছে ।কনকলতাকে নিয়োগ করার উদ্দেশ্য, নানা ছলে - বলে - কৌশলে বৌরাণীর মনের খবরটি জেনে তাঁর মনের উপর অধিকার বিস্তার করে ধীরে ধীরে বিধবা বিবাহে বউরাণীর মনকে আকর্ষণ করা এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজের রূপের রূপের বাহারে বৌরাণীকে মুগ্ধ করে তাকে বশীভূত করা । কনকলতা এ কাজে একটু দ্বিধা প্রকাশ করলে কনকলতাকে তার জীবনদর্শনটি বলেছে —'জানো, চোরের মধ্যেও বিশ্বাস বলে একটা জিনিষ আছে, নইলে কি চোরের ব্যবসা চলে ।' ৭১

কিন্তু তার এই কুমতলব বউরাণীর স্বামীপ্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তি-প্রস্তরে অচিরাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে । কিন্তু ভবেন্দ্ররূপী রাখালের দীর্ঘকাল পরে আগমন-সংবাদ তার খগেনের মনে সন্দেহ জাগিয়েছে তাই সে তন্ন তন্ন করে ভবেন্দ্রর আসলরূপকে অনুসন্ধান করে — ভবেন্দ্র যে মৃত এ সংবাদ সংগ্রহ করে — ভবেন্দ্রবেশী রাখালের কাছে উপস্থিত হয়ে একলক্ষ টাকা এবং মাসে মাসে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উপর দু'হাজার টাকার একখানি চেক দাবী করেছে । কিন্তু রাখালের টাকা দিতে অস্বীকৃতি এবং কনকলতার তাকে টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যর্থতার জন্য সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।অবশেষে টাকা যখন সে পাবেই না বলে স্থিরনিশ্চিত হয়েছে তখন ব্যর্থতার প্রচণ্ড আক্রোশে কনককে ধাক্কা দিয়ে ভূতলশায়িনী করেছে এবং বউরাণীর জীবনে কলঙ্ক আরোপের জন্য রাখালের প্রকৃত পরিচয় সর্বসমক্ষে উন্মত্তবৎ ঘোষণা করেছে ।

খগেনের একমাত্র xxxxx উদ্দেশ্য অর্থ প্রাপ্তি, বউরাণীর প্রতি আকর্ষণের অন্যতম কারণ তাঁর অগাধ সম্পত্তি । রাখালের উপর তার কোন বিদ্বেষ ছিল না, অর্থ পেলেই সে প্রস্থান করতো।কিন্তু যখন দেখেছে অর্থ-প্রাপ্তি সম্ভব নয় তখন তার সমস্ত কূট কৌশলজনিত পরিশ্রমের ব্যর্থতায় প্রচণ্ড হতাশা এসেছে এবং বউরাণীর জীবনে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা তার মনের হতাশা জনিত আকস্মিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন মাত্র ।

'নবীন সন্ন্যাসী'তে দেখেছি কূটকৌশলী গদাইয়ের ক্রিয়াকলাপ মূল কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল না, কিন্তু রত্নদীপ' এখগেনের ভূমিকা মূল কাহিনীবিন্যাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।রাখালের

শ্রী লীলাবতীর নিরুদ্দেশ হওয়ার প্রকৃত কারণ, অন্তঃপুরে সুরবালা ওরফে লীলাবতীর এবং রাখালের প্রকৃত সম্বন্ধ ইত্যাদি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কাহিনীর জট খুলেছে। লেখক-মনে গভীর মানবপ্রীতির ফলে খগেন নিরেট খল চরিত্র হয়ে উঠতে পারে নাই।

খগেনের কুমতলবের সাহায্যকারিনী কনকবালা জীবিকার্জনের জন্য অভিনয়কে বেছে নিয়েছিল। বলাবাহুল্য এই জীবনের নারীর চারিত্রিক শুচিতা বা পবিত্রতা সেকালে খুব কমই দেখা যেত। কলকাতায় বাড়ী এবং নগদ টাকার লোভেই সে বৌরাণীকে হাত করার জন্য খগেন্দ্রকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। বউরাণীর সহচরী হয়ে তাঁর পাশে থেকে ধীরে ধীরে বউরাণীর মনের প্রকৃত গতিকে সে অনুধাবন করেছে, থিয়েটারের গান বা বিধবা বিবাহের চিন্তা বউরাণীর কাছে অসহ্য- এ সংবাদ খগেন তথা পাঠককে সেই পরিবেশন করেছে। বৌরাণীর মনের কথা জানতে গিয়ে সে তাঁর বিরাগভাজন হয়েছে ঠিকই কিন্তু বৌরাণীর প্রতি তার একটা সম্ভ্রমবোধ জেগে উঠেছে। ভবেন্দ্রবেশী রাখালের স্বরূপ জানতে পেরেও বউরাণীর কলঙ্ক যাতে না ছড়িয়ে পড়ে সেইজন্য বউরাণীকে লেখা রাখালের পত্রটি সে গোপন করেছে, বা অন্য কারও কাছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে কথা প্রকাশ করেনি। বউরাণীর প্রতি রাখালের ভালবাসায় সে মুগ্ধ, প্রেমিক রাখালের যে রূপ সে দেখেছে তাতে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাকে ভক্তি নিবেদন করেছে। অভিনেত্রীর বিড়ম্বিত জীবনে সত্যকারের প্রেমের পরশ অকল্পনীয়, প্রেমের স্পর্শে মহিমান্বিত রাখালের পাদস্পর্শও তার কাছে মহাপুণ্য বলে মনে হয়েছে। তাই বৌরাণীকে লেখা রাখালের চিঠি পড়ে বলেছে —'আপনার সেই চিঠি পড়ে অবধি আপনার পায়ের ধুলো নেবার জন্য আমি ছটফট করছিলাম। মানুষ যে এমন সাচ্চা এমন ত্যাগী হতে পারে, তা আমার ধারণাই ছিল না। আমি আপনাকে প্রেম জানাতে আসিনি রাখালবাবু, ভক্তি জানাতেই এসেছিলাম। কিন্তু অঙ্গার: শতধৌতেন — তার ময়লা যাবে কোথা বলুন? ওরই মধ্যে দুষ্টামি বুদ্ধিও এল, ভাবলাম একটুখানি অভিনয় করে নিই। হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি, আমি নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা টিধবা কিছুই নই — আমি একজন অভিনেত্রী। মুখে রং মেখে কলকাতার পেশাদারী থিয়েটারের স্টেজে দাঁড়িয়ে প্রেম করে করে আর প্রেমের গান গেয়ে গেয়ে আমার মুখে রক্ত উঠে গেছে রাখালবাবু! আমার প্রকৃত পরিচয় এখানে কেউ জানে না — আজ আপনি জানলেন।''৭২ কনকের বিড়ম্বিত জীবনের এই ইতিহাস যেমন করুণ তেমন মর্মস্পর্শী।

প্রসঙ্গত: স্মরণ করা যেতে পারে প্রভাতকুমার ছিলেন অভিনয় - কলা - -রসিক এবং প্রায়শই তিনি অভিনয় দেখতে যেতেন। অভিনেত্রী জীবনের সমস্যা এবং তাদের ব্যক্তিগত সুখ দু:খের কথা তাঁর পক্ষে জানা খুব অসম্ভব নাও হতে পারে । এ ধরণের কোন অভিনেত্রী জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই চরিত্রটি সৃষ্টির অন্তরালে থাকা অসম্ভব নয়।

দেওয়ান রঘুনাথ মজুমদারের চরিত্রটির বিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ববর্তী দুইটি উপন্যাসের আলোচনায় আমরা দেখেছি জমিদারের নায়েব - দেওয়ান জাতীয় কর্ম্মচারীগণকে সাধারণত: স্বার্থান্বেষী এবং অর্থলোলুপ রূপে কিন্তু এখানে রঘুনাথ মজুমদার বউ-রাণীর পরিবারে আত্মীয়বৎ তাঁদের সুখ দু:খ ভালমন্দের অংশীদার । দেওয়ানজি জমিদারী কার্য্যে অভিজ্ঞ এবং সেই অভিজ্ঞতাই হয়ত তাকে সবকিছুকে সরল ভাবে চিন্তা করতে দেয় না। তাই তিনি কিছুটা সাবধানী প্রকৃতির এবং সন্দেহ পরায়ণও বটে । কিন্তু তার এই প্রকৃতি সর্বত্র অমূলক নয়।— বউরাণীর প্রতি অগাধ স্নেহ এবং এই জমিদার বংশের প্রতি আনুগত্যের ফলে তাঁদের মঙ্গলচিন্তাও তার এই মানসগঠনে কার্য্যকরী হয়েছে। তাই ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া সুরবালার ওরফে লীলাবতীর গলার পিছনে দড়ির দাগ আছে শুনে কোন আত্মহত্যা অথবা খুনের ঘটনা কিনা এবং পাছে বউরাণী এসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন এই আশংকায় পুলিশে খবর দিতে চেয়েছেন ।। দীর্ঘদিন পরে ভবেন্দ্রর আগমন - সংবাদ-জনিত পত্র পেয়ে তিনি রাণীমার সামনে সংশয় প্রকাশ করেছেন, বড়লোকের সম্পত্তির লোভে জাল ভবেন্দ্রও হতে পারে, অতএব বিচার বিবেচনা করেই এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া উচিত ।সংশয়ের একমাত্র কারণ কোন অসাধু ব্যক্তি ভবেন্দ্রর ছদ্মবেশে এ সংসারে প্রবেশ করে কুলে কলঙ্ক লেপন না করে। ভবেন্দ্ররূপী রাখাল যখন বউরাণীর সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন জমিদারীর আয় -ব্যয় - হিসাব - নিকাশ রাখালের হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন। কিন্তু জমিদারীর কাজে রাখালের অনীহা দেখে তাকে আকৃষ্ট করার জন্য কয়েক দিনের জন্য কাজের অছিলায় তিনি অন্যত্র যেতে চেয়েছেন, যাতে রাখাল তার অবর্তমানে চাপে পড়ে জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম শিখে নেয় । রাণীমা - বউরাণীর সুখ-দু:খের সদা অংশীদার এই দেওয়ান চরিত্রটি উপন্যাসে যথাযথভাবে চিত্রিত হয়ে উপন্যাসের আকর্ষণ বাড়িয়েছে ।

দারোগা চরিত্র চিত্রণেও এই উপন্যাসে কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। এখানে দেখি দারোগা বাবু শিক্ষিত এবং নব্যতন্ত্রের । তিনি পান খান না, পানদোষও তার নেই এবং বে-আইনী না করে লোকের বিপদে যতদূর

সম্ভব তিনি সাহায্য করেন ।

উপন্যাসে রাখাল-পত্নী লীলাবতী ওরফে সুরবালার চরিত্রটি তেমন সুপরিস্ফুট বা সুচিত্রিত হয়নি । কনকের কথায় লীলাবতী সতী সাধ্বী তবে কিছুটা নির্বোধ। কিন্তু নির্বোধ হলেও কেন যে সে রাখালের ঘ র করতে চায়নি , রাখাল তাকে নিজের কাছে নিয়ে এলেও কেন যে সে পিত্রালয়ে যাবার জন্য কান্নাকাটি করেছে লেখক তার কারণ বিশ্লেষণ করেন নি । নবীন অথবা অন্য কারও সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত এমন কোন ইঙ্গিতও তার চরিত্র সম্পর্কে নাই বরং নবীন যখন তাকে অপহরণ করেছে - তখন নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য সে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করতে গেছে । বউরাণীর কাছে থাকাকালীন রাখালকে সে দেখেছে এবং এও জেনেছে রাখাল বউরাণীর প্রতি আসক্ত অথচ স্ত্রী হয়ে স্বামী সম্পর্কে তার কোন ঔৎসুক্য নেই, কোন অনুসন্ধানের চেষ্টাও এ ব্যাপারে তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না । তার দুর্ভাগ্যের জন্য মুখ্যতঃ সেই দায়ী। তাই আমাদের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত । লেখক সর্বশেষে অবশ্য ~~XXXX~~ তাকে স্বামীর সঙ্গে মিলিত করে ~~XXXXXXXX~~ দিয়েছেন এ যেন সৃষ্টিকর্ত্তার নেহাতই করুণা -। কাহিনীতে রাখালের স্ত্রী-প্রেম-বঞ্চিত-জীবন এবং বউরাণীর মনোজগতের আংশিক চিন্তাধারা প্রকাশের জন্যই সে যেন উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে ।

বছিরদ্দি চৌকিদার, সৈরভীর মা, নীলমণি রজক এক কথাওয়ালা ঠাকুর ইত্যাদি ছোট ছোট চরিত্রগুলি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জলতর রেখায় চিত্রিত হয়েছে ।

প্রভাতকুমারের অন্যান্য উপন্যাসের মত শতদুর্ঘটনা সত্ত্বেও ইতস্তত:-ভাবে হাস্যরস 'রত্নদীপে' ছড়িয়ে আছে এবং সেগুলি প্রায়শঃই অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে। এপ্রসঙ্গে এলাহাবাদের এক কথাওয়ালা ঠাকুরের আচার ব্যবহার, কথাবার্তা স্বতঃই মনে পড়ে ।

গরীব পান্ডা এক কথাওয়ালা ঠাকুরের বড়াই সে এক কথার বেশী দু কথা বলে না । তার ধারণা বাংলা দেশের সকলেই তার নাম জানে ~~XXXX~~ যেহেতু তার কাছে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত একটি সার্টিফিকেট আছে এবং এক কথাওয়ালা ঠাকুর এই নামে টেলিগ্রাম করলেই তার কাছে পৌঁছে যায় - কিন্তু পোষ্ট অফিসে কিছু ফি দিলেই যে সাঙ্কেতিক ~~XXXXX~~ ঠিকানা রেজিষ্টারি হয়ে থাকে সে ভাবে দর্শনার্থীরা সে কথা জানেনা। তার শাস্ত্র অাওড়ে প্রয়াগে মাথা মুন্ডনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ সর্বোপরি তার বক্তব্য -' যা কিছু কিরিয়া করম আমি সব আপনাকে করিয়ে দিব - আপনার সওয়া পাঁচ টাকা খরচ হবে । বস্, এক কথা - পাঁচ টাকা চারি আনা ।

সোয়া
যদি আপনার কাছে আমি পাঁচ টাকা চারি আনা চাই, আপনি আমায় বলবেন তুমি এক কথাওয়ালা ঠাকুর নও, তুমি দুই - কথাওয়ালা ঠাকুর আর আমার দুই কাণ ধরে আমার দুইগালে দুই চড় মারবেন।' ৭৩ কিন্তু কাজ সারতে ছয় সাত টাকা খরচ হওয়ার পরও যখন সে দক্ষিণার জন্য হাত বাড়িয়ে গাল মন্দ খাওয়ার পরেও বিনীত হাস্যে বলে —'মনে ত করি যে এক কথাই ঠিক রাখি কিন্তু পেট যে মানে না বাবু। পোড়া পেটের দায়ে দুই কথা হয়ে যায়।' ৭৪ তখন আমরা বিরক্ত হলেও না হেসে পারি না। সৈরভীর মা, নীলমণি রজক ইত্যাদির অজ্ঞতা জনিত অকারণ ভীতির প্রকাশ হাস্যোদ্রেককারী।

সন্ন্যাস জীবনের প্রতি প্রভাতকুমারের বিরূপ ধারণার পরিচয় রয়েছে মৃত ভবেন্দ্রর দিনলিপিতে।—'স্থির করিয়াছি এ ব্যর্থ সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহাশ্রমে ফিরিয়া যাইব।

.... কত সময় ভাবিয়াছি, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া আমি কি ভাল করিয়াছিলাম? আমার আধ্যাত্মিক জীবন যেরূপ পরিণতি প্রাপ্ত হইবে আশা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই ত হইল না। এদিকে পুরাদস্তুর বিষয়ী হইয়া উঠিয়াছি। মঠের বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। নিজের চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হই নাই। তবে কেন এ ভূতের বোঝা বহিয়া মরি?' ৭৫ অথবা রাখালের উক্তি —' সন্ন্যাসী হইব? বড় কষ্টের জীবন।' ৭৬

নারীর সতীত্ববোধ এবং একনিষ্ঠতার প্রতি লেখকের শ্রদ্ধাবোধ যে কত গভীর তার পরিচয় রয়েছে — বউরাণী, লীলাবতীর চরিত্রাঙ্কণে। কনকবালা ভিন্ন পথের পথিক হলেও পুরুষের প্রকৃত প্রেমকে সে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। তাই বউরাণীকে দেখি রবিবাবুর সঙ্গীতই তাঁর অধিকতর প্রিয়। রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে রমেশ দত্তের 'সংসার', দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' ইত্যাদি রচনার উল্লেখ প্রভাতকুমারের বিস্তৃত অধ্যয়নের পরিচয় বহন করছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর রোহিনী গোবিন্দলালের উল্লেখ তাঁর বঙ্কিম-প্রীতির কথা স্মরণ করায়।

কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বসিয়ে চরিত্রগুলিকে বাস্তবতাদানে জীবন্ত করে তুলেছেন।

বউরাণীর ঝিয়ের মুখে শুনি —' যেওনি মা যেওনি। ওটা কোন জানোয়ার?' অন্যত্র মুসলমান দরিদ্র প্রজা হবিবুল্লার মুখে শুনতে পাই —' ঠাউর সেলাম। আপনি ত হেঁদুদের সাধু, আপনি কন ত। আমি এই ভেড়াটি আপনার পুতের মত পেলেছি পুষেছি। নিজে না খেয়ে ওকে খাওয়াইয়েছি। খাইয়ে

এত বড়টা করেছি। আমার পেয়ারের জানোয়ার, আমি দিমু ক্যান হুজুর ? নিয়ে গিয়ে ওকে জবা করবে।' ( ) এধরণের আঞ্চলিক কথ্য ভাষার ব্যবহার ইতিপূর্বেও তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা গেছে।

কাহিনী ব্যাখ্যান এবং কাহিনীর যোগসূত্র স্থাপনে চিঠিপত্রের ব্যবহার 'রত্নদীপে'ও রয়েছে। ভবেন্দ্ররূপী রাখালের চিঠি, খগেন - কনক-বালার চিঠিপত্র বিনিময় এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। চিঠিপত্রের ব্যবহার এখানে সুপ্রযুক্ত।

চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাবর্ণন এবং কাহিনীর সংযত উপস্থাপনে প্রভাত-কুমারের উজ্জ্বল শিল্প প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে 'রত্নদীপ'। কাহিনী বর্ণনে আদ্যোপান্ত পাঠকের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে তিনি এখানে সক্ষম হয়েছেন। উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করছে প্রভাতকুমারের জীবৎকালেই এর তিনটি সংস্করণের প্রকাশ। এছাড়া পণ্ডিত জনার্দণ ঝা 'রত্নদীপ' এর হিন্দী অনুবাদ এবং আকাদমী পুরস্কার প্রাপ্ত ভার্গবরাম ভিটল বরেরকরের উপন্যাসটির মারাঠী ভাষায় অনুবাদ, জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করে। শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন এবং নাটকখানি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর 'রঙমহলে' প্রথম অভিনীত হয়েছিল। স্বর্গত দেবকী কুমার বসু মহাশয় 'রত্নদীপের' ছায়াচিত্র পরিচালনা করেছিলেন।

(৪)

'জীবনের মূল্য' প্রভাতকুমারের উপন্যাস রচনার ধারাবাহিকতায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। উপন্যাসটি 'মানসী' পত্রিকায় শ্রাবণ, ১৩২২ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এবং 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় মাঘ, ১৩২৩ সালে শেষ হয়েছে। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ প্রকাশলাভ করে ফাল্গুন, ১৩২৩ সালে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর মতে প্রকাশকাল ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে।

উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় প্রভাতকুমার লিখেছেন — ' এই আখ্যায়িকার মূল ঘটনাটি সত্য। এক বুড়া কোন প্রকার স্বপ্ন না দেখিয়াও, বাস্তবিকই বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়াছিল ; কথা দিয়া কন্যাপক্ষ অবশেষে অন্য এক ব্যক্তিকে আনিয়া মেয়ের বিবাহ দিতেছিল, বুড়াবর সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া সেখানে যায়, এবং বিবাহ সভায় পৈতা ছিড়িয়া পুস্তক বর্ণিত মতে অভিশাপও দিয়াছিল। মেয়েটি কিছুদিন পরে বিধবা হইয়া যায় —এবং বুড়ার মনে অত্যন্ত অনুতাপও হয়। কয়েক বৎসর হইল ঘটনাটি আমি শুনি এবং তখন হইতেই মনে মনে ইহাতে ডালপালা লাগাইতে আরম্ভ করি। টাকার থলি হাতে করিয়া মেয়েটির নিকট বুড়ার যাওয়া প্রভৃতিও প্রকৃত ঘটনাস্বরূপ শুনিয়াছিলাম, অথবা ও অংশ আমার মনোরূপ জঙ্গল হইতে আহৃত ডালপালা মাত্র, তাহা এখন আর স্মরণ করিতে পারিতেছি না। শেষের দিকটা, আমার মনে ' সত্য মিথ্যা একাকার, মেঘ আর গিরির মতন' হইয়া গিয়াছে।' ৭৭

প্রভাতকুমারের উপরিউক্ত বক্তব্য অনুসারে একটি সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে' জীবনের মূল্য' এর কাহিনী রচিত হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনীটি এইরূপ — বেশ ধনী, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর এক বৎসর পর জগদীশ বাড়ুয্যের চৌদ্দ বৎসরের মেয়েকে দেখে চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করেছে এবং একরাত্রে স্বপ্ন দেখে তাঁর প্রথমা স্ত্রী মৃত্যুর পর প্রভাবতী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং অনুরোধ করছে আবার তাকে বিয়ে করতে। গ্রামের একদল স্বার্থান্বেষী এবং তথাকথিত পন্ডিত গিরিশচন্দ্রের স্বপ্ন দর্শনের অপব্যাখ্যা করে এবং নানা প্রকার চাটুকারিতার মাধ্যমে তাঁর সুপ্ত কামনাকে উত্তেজিত করে তোলে। এই অসম বয়সের বিবাহে বাড়ুয্যে পরিবারের কিছুটা অনিচ্ছা এবং আপত্তি থাকলেও শেষ পর্য্যন্ত এই বুড়ো বরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হয়, কারণ — জগদীশবাবু গিরিশচন্দ্রের কাছে খাতক ছিলেন এবং প্রভাবতীর বিয়ের যাবতীয় খরচ গিরিশচন্দ্র বহন করতে রাজি ছিলেন। যথারীতি বিয়ের দিন

ধার্য্য হয়ে যায় কিন্তু প্রভাবতীর কলেজে পড়া দাদা এই বিয়েতে ঘোর আপত্তি জানায় এবং চেষ্টা করে তারই এক কলেজের বন্ধুর সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলে। বিয়ের লগ্নে গিরিশচন্দ্র এই খবর পেয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে এবং বিবাহ বাসরেই উপস্থিত হয়ে পৈতা ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে আসে যে এক বৎসরের মধ্যে প্রভাবতী বিধবা হবে। এবং আদালতে নালিশ করে জগদীশ বাড়ুয্যের বাস্তুভিটা নীলাম করে তাকে গৃহছাড়া করে।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে গিরিশচন্দ্র জানতে পারে গৃহহারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অনাথ ব্রাহ্মন জগদীশচন্দ্র বড় করুণ ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এবং কন্যা প্রভাবতীও বিধবা হয়েছে। গিরিশচন্দ্রর মনে এ সংবাদে নিদারুন অনুশোচনা জাগে এবং তাঁর কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কিছু টাকা সে প্রভাবতীকে দিতে যায়। কিন্তু প্রভাবতী সেই টাকা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে – জীবনের মূল্য অর্থ দিয়ে নির্ধারণ করতে সে রাজি হয়নি।

কাহিনী পরিকল্পনায় তেমন কোন নূতনত্বের পরিচয় নাই। কারণ ইতঃপূর্বে বৃদ্ধের তরুণী কন্যা বিবাহ সমস্যা বিষয়ক রচনার পরিচয় রয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের' বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) প্রহসনে, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের' ফোকলা দিগম্বর' (১৩০৭), রমেশ চন্দ্র দত্তের 'সমাজ' (১৮৯৪) উপন্যাসে। উল্লেখিত রচনাগুলির মূল সমস্যা এক হলেও (অর্থাৎ তরুণী বিবাহে বৃদ্ধদের লোভ) সমস্যা রূপায়নে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অসম বয়সের বিবাহ একটি সামাজিক অন্যায় এবং এ ধরণের অন্যায় করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে এই উদ্দেশ্যেই মনে হয় এগুলি রচিত হয়েছে। তাই দেখি' বিয়েপাগলা বুড়ো'র রাজীব মুখোপাধ্যায় বিধবা মেয়ে নাতি ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও যখন বিয়ের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে' তখন গ্রামের ছেলেদের হাতে অশেষ লাঞ্ছিত হয়েছে। পুত্র কন্যা-পৌত্র-দৌহিত্র থাকা সত্ত্বেও 'ফোকলা দিগম্বর'এর দিগম্বর, স্ত্রী জগদম্বা কর্তৃক সর্বসমক্ষে বিবাহ-বাসরে অপদস্থ হয়েছে,' সমাজ' এর তারিনী বাবু তরুণী ভার্য্যার পরিচর্য্যা করেও বিড়ম্বিত জীবন যাপন করছে।

'জীবনের মূল্য' এর গিরিশ মুখোপাধ্যায় অনেকাংশে রাজীব দিগম্বর, তারিনী চরিত্রেরই উত্তরসুরী। কন্যার পিতার সাধারণত: অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে একদল অর্থশালী ব্যক্তি তাদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করার জন্য বহুবিবাহ, অসম - বিবাহ নির্বিচারে করে চলেছিল। বিশেষত: আমাদের বাংলাদেশের গ্রামীন এবং পুরুষ শাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় কৌলীন্যের অজুহাতে এ ধরণের বিবাহের দৃষ্টান্ত সমগ্র

উনবিংশ শতাব্দীতে অপ্রচুর হবে না । একদিকে কৌলীন্যজনিত সামাজিক সংস্কার অন্যপক্ষে অভিভাবকের অর্থনৈতিক বিড়ম্বনায় পড়ে কত তরুণী যে এভাবে ব্যর্থজীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে কে তার ইয়ত্তা রাখে? কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এবং স্ত্রীশিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটায় এ ধরণের সামাজিক কুসংস্কারে আঘাত হানে এবং অসম বিবাহ অথবা কৌলীন্যপ্রথার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় । সাধারণ মানবিক বোধেও পুরুষ এই সংস্কারের অসারতা উপলব্ধি করেছে । প্রচলিত সংস্কারাচ্ছন্ন পুরুষ-মনে ভোগবাসনাই প্রবল ছিল এবং এজন্য তাকে বিড়ম্বনা কম সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু যখনই পুরুষমন ভাবতে শিখেছে এই ভাবধারা অন্যায় তখনই তার সুস্থ মনে পাপবোধ জনিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। তাই মনে হয় গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের মনের অনুশোচনা সেই পাপ বোধেরই প্রতিফলন। এখানেই পূর্বসূরীদের থেকে গিরিশ চরিত্রের পার্থক্য । ডা: শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'দীনবন্ধুর রাজীবলোচন, রমেশচন্দ্রের তারিনী, ত্রৈলোক্যনাথের জনার্দন এবং প্রভাতকুমারের গিরিশ ইহারা সকলেই বিয়ে পাগলা বুড়ো হইলেও গিরিশের চরিত্রটি একটু ভিন্নধর্মী। রাজীবলোচন, তারিনী এবং জনার্দন তাহাদের স্রষ্টার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত কিন্তু গিরিশ সহানুভূতি ধন্য ।'[৭৮] এই ভিন্ন ধর্মীতা শুধুমাত্র বোধকরি লেখকের সহানুভূতি নয়, এই ভিন্নতা কালের অনিবার্য্য পরিনতি ।

'জীবনের মূল্য' উপন্যাসটির কাহিনী বিয়োগান্তক । কাহিনীর পরিণতি মিলনান্তক অথবা বিয়োগান্তক হবে এ নিয়ে লেখকের মনে যে সংশয় ছিল তার পরিচয় পাই কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'জীবনের মূল্য'এর পান্ডুলিপির একাংশে লেখা লেখকের মন্তব্য থেকে । তিনি লিখেছেন

(১) বিধবা হইল । অনেক কষ্টে পড়িল । বৃদ্ধ অর্থ সাহায্য করিতে গেল সে প্রত্যাখ্যান করিল ।

(২) মেয়ে বিধবা হইল না । শাস্ত্র (স্বপ্নতত্ত্ব ও ব্রহ্মশাপ) মিথ্যা হইল দেখিয়া বৃদ্ধ চটিয়া টিকি কাটিয়া ফেলিয়া পাঁউরুটি কিনিয়া খাইল ।

লেখকের জীবনালোচনায় আমরা দেখেছি কাহিনীর পরিণতি বিয়োগান্তক করতে তিনি স্বভাবতই কুণ্ঠিত ছিলেন । তবুও কয়েকটি রচনায় বিয়োগান্তক পরিণতি আমরা পাই । যেমন 'দেবী,' 'কাশীবাসিনী' ইত্যাদি; গল্পে 'রত্নদীপ'এর বউরাণীর চরিত্রের পরিনতি বিয়োগান্তক । কিন্তু এই পরিণতিগুলি স্বাভাবিক এবং কার্য্য কারণ সম্মত তাই আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কিন্তু এখানে প্রভাবতীর

~~জীবনের করুণ পরিণতিতে আমরা হৃদয়ে গভীর বেদনাবোধ অনুভব করলেও~~

জীবনের করুণ পরিণতিতে আমরা হৃদয়ে গভীর বেদনাবোধ অনুভব করলেও কাহিনীর পরিণতি যেন অনেকাংশে কৃত্রিম বলে মনে হয়। কারণ প্রভাবতীকে সহায় সম্বলহীনা করতে গিয়ে লেখক তার স্বামী রাজকুমার, দাদা হরিপদ, বাবা জগদীশ বাঁড়ুয্যে এবং মাকে পর্য্যন্ত মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছেন। অল্পদিনের ব্যবধানে পর পর এতগুলি আকস্মিক মৃত্যু কেমন যেন অস্বাভাবিক এবং কাহিনীর পক্ষে কৃত্রিম বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর মন্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয়।

" জীবনের মূল্য' উপন্যাসে তিনি একটি অবিমিশ্র ট্রাজিডি রচনা করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তদুপযুক্ত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও আবেগ গভীরতা না থাকাতে এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারে উপর্য্যুপরি যে কয়েকটি দৈব-দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহারা একেবারে আকস্মিক — কোনরূপ মনস্তত্ত্বমূলক কার্য - কারণ - শৃঙ্খলায় গ্রথিত নয়। সুতরাং এই সম্পূর্ণ দৈবাধীন বিপদ্ পরম্পরা আমাদের মনে কোন গভীর রেখাপাত করিতে পারে না, এক প্রকার বিস্ময়বিমূঢ় হতবুদ্ধিভাবছাড়া কোন গভীরতর চিন্তাধারা বা সহানুভূতির উদ্রেক করে না।' ৭৯

ডা: সুকুমার সেন উপন্যাসটির কাহিনীবিস্তার ও প্লট রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন —' প্লট রচনা নিশ্ছিদ্র, কাহিনীবিস্তার তাঁহার গল্পের মতই নিটোল।' ৮০ শ্রদ্ধেয় ডা: সেনের এ মন্তব্যকে সর্বাংশে মেনে নেওয়া যায় না। কাহিনীতে সতীশ-চরিত্রের ভূমিকা গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের লালসায় ইন্ধন যোগান দেওয়া। এই ইন্ধন যোগান দিতে সতীশ অবিশ্রান্ত ভাবে পুরাণ-উদ্ভটের শ্লোক আওড়ে নিজেকে ভাঁড়ের পর্য্যায়ে নামিয়ে এনেছে। শ্লোকের মধ্য দিয়ে হাস্যরস পরিবেশিত হলেও এই হাসির ফোয়ারা কাহিনীর করুণ রস সৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে। এছাড়াও কাহিনীর বিস্তারের জন্য অনেক সময় যেন গল্প বলার আয়েসী ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মদ খাওয়া প্রসঙ্গ। এছাড়া ষোড়শ পরিচ্ছেদের রাজা ও মন্ত্রী প্রসঙ্গ কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল না। উপন্যাসের নায়ক গিরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বয়স এখন পয়তাল্লিশ বৎসর। কিঞ্চিত জমিদারী আছে — টাকা কর্জ দিবার ব্যবসায়ও করিয়া থাকেন। গ্রামের মধ্যে ইনি একজন সম্পন্ন ব্যক্তি। একে একে দুইবার সংসার করিয়াছিলেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী, দুইটি শিশুপুত্র রাখিয়া ভবধাম পরিত্যাগ করেন। ছেলে দুইটি এখন বড় হইয়াছে, কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, দুইটি ছোট ছোট মেয়ে

রাখিয়া আজ প্রায় এক বৎসর হইল গত হইয়াছেন। গৃহে গিরিশ চন্দ্রের পিসি-মাতা আছেন আর কেহ নাই — তিনিই কন্যা দুইটিকে লালনপালন করিতেছেন।৮১

এহেন গিরিশ চন্দ্র প্রতিবেশী জগদীশ বাঁড়ুয্যের ডাগর মেয়ে প্রভাবতীকে' কোকিল পেড়ে শাড়ী' পরা, স্নানসিক্ত এলোচুলে ডালা হাতে করে পাতিলেবু পাড়া অবস্থায় দেখে মুগ্ধ হয়েছে। সারাদিন মনটার মধ্যে কেমন 'আঁচড় পাঁচড়' অনুভব করেছে এবং সেইরাত্রেই প্রভাবতী ওরফে পটলিকে শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখেছে- তার প্রথম পক্ষের বিগত স্ত্রী প্রভাবতীর রূপ ধরে তাকে অনুরোধ করছে আবার বিয়ে করতে কারণ সেজন্মে তার কোন সাধ মেটেনি। তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিয়োগ এবং প্রভাবতীর জন্মবৎসরের সঙ্গে সাদৃশ্য, উপরন্তু ভট্টাচার্য্য কৃত এই স্বপ্নদর্শনের পুরাণসম্মত ব্যাখ্যা এবং সে ব্যাখ্যা গিরিশচন্দ্রের মানসিক অবস্থার অনুকূল ইত্যাদি সবকিছু ধীরে ধীরে তাকে প্রভাবতীর দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে। তার মনের গোপনীয় এই লালসায় নানারূপ ইন্ধন যোগান দিয়েছে সতীশ। একদিকে প্রভাবতীর রূপের লালসা অন্যদিকে ভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যায় ছিল এই ধরণের বিয়ে হলে সে অবশ্যই ধনশালী হবে। তাই এই কামিনী-কাঞ্চনের চিন্তা তাকে প্রভাবতীকে পাবার জন্য আরও উন্মুখ করে তুলেছে। অবশ্য তার দ্বিতীয় পক্ষের দুই মেয়ে পুটু - বুচির এই বিয়ের কথায় মন বিশেষ প্রসন্ন হয়নি। বুচি এ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রকে অভিযোগও করেছে, অভিযোগ শ্রবণে গিরিশচন্দ্রের মনও বিমর্ষ হয়েছে কিন্তু তার লালসাকে সে এদের দুর্গতির কথা ভেবেও দমন করতে পারেনি। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র রাজীবলোচনকে দেখেছি নিজের মেয়েদের উপর অত্যাচার করতে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তুলনামূলকভাবে অনেক মার্জিত — তার কলেজে পড়া দুইটি ছেলে আছে তাই নিজের বুড়ো বয়েসে বিয়ের ব্যাপারে তিনি মনে মনে একটু অসোয়াস্তি বোধ করেছেন। সেইজন্য তাদের গুডফ্রাইডের ছুটিতে বাড়ী না আসা অথবা গ্রীষ্মের ছুটিতে পুরীতে যাওয়া কোনটাতেই তেমন বাধা দেননি। এসব সমস্যাকে কেন্দ্র করে গিরিশচন্দ্রের মনে একটা দ্বন্দ্বের অবকাশ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু প্রভাতকুমারের নায়ক নায়িকার মনের জটিলতা বা সমস্যার জট তেমনভাবে অতি অল্প ক্ষেত্র ব্যতীত পাকিয়ে উঠতে পারে নাই। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নি:সংশয়ে সতীশের চাটুকারিতায় বিশ্বাস স্থাপন, অনেকাংশে অস্বাভাবিক। গিরিশ সহজ সরল এমন কথা বলা যায় না বরং দেখি বেশ সাবধানী - ভট্টাচার্য্য কৃত স্বপ্নদর্শনের ফলাফল না জেনে সে আগেভাগেই ভট্টাচার্য্যের প্রাপ্তিযোগ সম্পর্কে নির্দ্দিষ্টভাবে বাগ্‌বদ্ধ হয়নি। প্রণয় চিন্তার মধ্যেও সে সুদের হিসাব ভোলে না। এহেন লোক সতীশের সমস্ত কথাকে নির্বিচারে মেনে নেওয়াতে চরিত্রটির স্বাভাবিকতা ক্ষুন্ন হয়েছে।

যাহোক প্রভাবতীর মায়ের কিছুটা অমত সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে প্রভাবতীর বিয়ের দিন শেষ পর্য্যন্ত স্থির হয়েছে। স্বভাবতঃই গিরিশচন্দ্র তার আসন্ন বাসনা তৃপ্তির সম্ভাবনায় কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে চেয়েছে। বিয়ে হলে জগদীশচন্দ্রের বাড়ি-বন্ধকীর দলিলটি সে ফেরৎ দিতে চেয়েছে, প্রভাবতীর বিয়ের সমস্ত ব্যয়ভার সে নিজেই বহন করতে স্বীকৃত হয়েছে, এমনকি মেয়েকে দুইহাজার টাকার অলংকার দেবে এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।

গিরিশ বিয়ের জন্য সব দিক থেকেই প্রস্তুত হয়েছে। সে রেলগাড়ীতে যেতে যেতে হৃদয়রূপ আকাশপটে পটলিরূপ পূর্ণচন্দ্রের ধ্যান করতে করতে কলকাতায় গিয়ে প্রভাবতীর জন্য অলংকার গড়াতে দিয়ে এসেছে। নিজের জন্যও ভাল ভাল জামা-কাপড় কিনেছে। ফিরে এসে যখনই দেখেছে প্রভাবতীর অন্যত্র বিয়ে হচ্ছে তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সেই বিবাহ বাসরে গিয়ে যজ্ঞোপবীত ছিঁড়ে বৎসর না ঘুরতেই প্রভাবতী বিধবা হবে বলে অভিশাপ দিয়ে এসেছে। অপরিতৃপ্ত আকাঙ্খার ব্যর্থতাজনিত ক্ষোভ তার মত দুর্বলচিত্ত মানুষকে যে উত্তেজিত করে তুলবে এটাই স্বাভাবিক। এই ব্যর্থতার আক্রোশ মিটাতে তার মত দুর্বলচিত্ত মানুষের পক্ষে যা করা স্বাভাবিক সে তাই করেছে —জগদীশচন্দ্রের নামে কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করে দিয়েছে।

কিন্তু এই অভিশাপ দেওয়া বা জগদীশচন্দ্রের ভিটামাটি বাজেয়াপ্ত করা কোনটাই তার উদ্দেশ্য ছিল না। মানুষ হিসাবে সে সরল সহজ না হতে পারে সে সাবধানী কিন্তু স্বভাবত: কুটিল বা হিংসা-পরায়নও নয়। তাই দেখি কালক্রমে তার ক্রোধের উপশমের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মনে অনুশোচনাও জেগেছে। অবশ্য গিরিশ চরিত্রের সেই অনু-শোচনার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লেখক দেন নাই। কিন্তু আমরা দেখি এই দুর্বলচিত্ত মানুষটির মনে জগদীশচন্দ্রের বিদেশে পান্থশালায় শোচনীয় অকালমৃত্যুর সংবাদ শ্রবণে পরিবর্তন এসেছে। তাকে ভাবতে দেখি 'আহা, কেন ব্রাহ্মনের উপর অতটা জুলুম করলাম — নইলে হয়ত এমনটা ঘটতো না।' ৮২ তাই দেখি জগদীশের বাস্তুভিটা জমিজমা ডিক্রীকরে দখল পেয়েও গিরিশ সে দিকে বহুদিন যায়নি। 'বাড়ীটার কথা মনে পড়িলেই তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিত। মনে হইত যাহার সাতপুরুষ ও বাড়ীতে বাস করিয়া গিয়াছে, সে আজ কোথায়! আমি যদি নালিশ না করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় আজিও ঐ বাড়ীতে সপরিবারে সে বাস করিত। হায় হায়, কেন এমন কাজ করিয়াছিলাম।' ৮৩ আবার দেখি যে প্রভাবতীকে সে বৈধব্যের অভিশাপ দিয়েছিল তার অমঙ্গল চিন্তায় সে কাতর হয়েছে —

'..... মনে মনে তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল — পটলিকে যে অভিশাপ দিয়াছি — তাও ত ফলিয়া যাইতে পারে ! — আহা, তা যদি হয় তবে ত বড়ই অন্যায় হইবে। রাগের মাথায় তখন এরূপ অভিশাপ দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহার কোনও অনিষ্ট হয় এমন ইচ্ছা ত আমার ছিল না। সে ছেলেমানুষ, সে কোন দোষের দোষী নহে ! — হে ভগবান, তাহার যেন কোনও রূপ অমঙ্গল করিও না।' ৮৪ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জগদীশ বাঁড়ুয্যের ঘরবাড়ী মেরামত করে তার ছেলের নামে রেজিষ্ট্রী করে দিয়েছে।

এর পর সত্য সত্যই বিয়ের একবৎসর অতিক্রম হতে না হতেই প্রভাবতী বিধবা হয়েছে। এ সংবাদ যখন গিরিশচন্দ্রের গোচরে এসেছে তখন থেকেই তার অন্তরাত্মার ক্রন্দন শুরু হয়েছে। তাই যদুবাবুকে সে বলেছে — 'প্রভাকে আমি অভিশাপ দেওয়াতে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। — কিন্তু সে অভিশাপ, প্রভার কপাল পুড়িয়ে এসে, আমাকে আজ এই আট বছর যে কি পোড়ান পুড়িয়েছে, তা ত আপনি শোনেননি। আমায় যত বুড়ো আজ আপনি দেখছেন, বয়সে আমি তত বুড়ো নই যদুবাবু, মনের কষ্টে কষ্টে আমি এমন বুড়ো হয়ে পড়েছি। আমার খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই, একটা কচি মেয়ে যে কোনও দোষের দোষী নয়, যে আমার কোন অনিষ্ট করেনি — তার এই সর্বনাশ আমি কেন করলাম ! — ক্রোধ মানুষের একটা রিপু ! রিপু এক মুহূর্তের মধ্যে আমাকে কি হিংস্র পশুই করে ফেলেছিল ! হিংস্র পশু কি বলছি — তারও অধম। সাপ — কেউ তার গায়ে হাত না দিলে কামড়ায় না। বাঘ — যাকে খাবার, তাকে একেবারেই গিলে ফেলে, সারাজীবন ধরে কাউকে দগ্ধে মারে না।' ৮৫ এই অনুশোচনাই তাকে প্রভাবতীর কাছে পাঠিয়েছে কিছু অর্থ সাহায্য এবং বাড়ীর দলিলখানি দেওয়ার জন্য। কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও অনুশোচনা আন্তরিক। কিন্তু লেখক তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার অনুশোচনারূপ প্রতিক্রিয়ার পর্বটি ক্রমপরম্পরায় বিবৃত করেন নি। তাই চরিত্র চিত্রণ সম্পূর্ণভাবে সার্থকতা অর্জনে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে নাই।

উপন্যাসের নায়ক গিরিশচন্দ্র হলে প্রভাবতীকে নায়িকা বলে স্বীকার করতে হয়। কারণ উপন্যাসের মূল সমস্যাটি তারই জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে তার বিচরণ ক্ষেত্র সীমিত এবং একমাত্র শেষ অধ্যায় ছাড়া তার ক্রিয়াকলাপ প্রায়শই উহ্য রয়ে গেছে।

জগদীশবাবুর একমাত্র মেয়ে প্রভাবতী। প্রবীন গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে হবে শুনেই তার মন ভীষণ খারাপ, শরীর খারাপ হয়েছে এবং সখীদের কাছে ভাবী বর সম্পর্কে উচ্চারণ করেছে — 'হুতুম খুমো'' ঘাড়ে গন্দানে' হতভাগা মিনসে' ইত্যাদি। এই অসম বিয়েতে তার ভীষণ আপত্তি, কিন্তু জগদীশবাবুর হীনাবস্থায় উপায়ান্তরই বা কোথায়? বিয়ের সব কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে, এমন সময় দাদা হরিপদ বাড়ীতে এসে বোনের এই অবস্থা দেখে এই বিয়েতে প্রতিবাদ জানায় এবং নিঃসম্বল দরিদ্র-বন্ধু রাজকুমারের সঙ্গে প্রভার বিয়ে দেয়।

বিয়ের রাত্রেই প্রভাবতীর জীবনে এক অভিশাপ নেমে এসেছে। গিরিশ চন্দ্র তাঁর লালসাতৃপ্তির ব্যর্থতা জনিত আক্রোশে প্রভাবতীকে অচিরাৎ বৈধব্যের অভিশাপ দেন। বিয়ের অব্যবহিত পরে স্বামীর সঙ্গে সে পশ্চিমে চন্দ্রগড় চলে যায়। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির বিধানেই হোক আর বৃদ্ধ ব্রাহ্মনের অভিশাপেই হোক সে একবৎসরকাল মধ্যেই স্বামীহারা হয়। ইতিপূর্বে তার বাবার মৃত্যু ঘটেছিল এবং অল্পকিছুদিনের ব্যবধানে দাদা এবং মাকেও হারায়। প্রভা বিদেশে - সহায় সম্বলহীনা হয়ে পড়ে। ইত্য-বসরে তার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। প্রতিবেশীর আনুকূল্যে সে কলিকাতায় — এক বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ নিয়ে কায়ক্লেশে দিন যাপন করছিল। অবশ্য গৃহকর্ত্তার অযাচিত স্নেহে সে ধন্যা হয়েছে। এমন সময় কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাগ্রস্ত গিরিশচন্দ্র তার সন্ধানে এসে তার কর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রভাবতীর এবং তার পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলকামনায় কিছু অর্থ এবং পৈতৃক ভিটার দলিল প্রভাকে দান করতে চায়।

ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে প্রভাবতী তখন 'বিষাদের একখানি 'প্রতিমা'য় রূপান্তরিত হয়েছে, সে যেন পৃথিবীর লাভ-ক্ষতির উর্দ্ধে এক প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী সত্তা। তাই দেখি বৃদ্ধের এই অযাচিত দানে রোষে ঘৃণায় অপমানে তার অশ্রুবারি ঝরে পড়লেও দীপ্তকণ্ঠে সে বলেছে — 'কি! আপনি যাকে মেরেছেন, তার জীবনের এই মূল্য ধরে দিতে এসেছেন আমায়? আপনার ঐ টাকা আমি স্পর্শ করবো? অসময়ের কথা কি বলছেন আপনি? যদি খেতে না পেয়ে মরেও যাই — আমার ছেলেটাও যদি আমার চোখের সামনে খেতে না পেয়ে মরে যায়, তবু আপনার টাকা, বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখ দিয়েও স্পর্শ করবনা।' ৮৬

প্রভার ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেই এই ধরণের মানসিক দৃঢ়তায় আমরা মুগ্ধ হই ঠিকই কিন্তু এই মনোভাবের প্রকাশ মনে হয় লেখকের উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং আকস্মিক। প্রভার ব্যক্তিত্বের কোন

পরিচয় উপন্যাসে না দিয়ে, তার দৃঢ় মানসিক সংগঠনের কোন ক্ষেত্রভূমি প্রদর্শন না করাতে পরিণতি অস্বাভাবিক মনে হয়। বস্তুত: লেখক চেয়েছিলেন ট্র্যাজেডি রচনা করতে কিন্তু তদুপযুক্ত, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও আবেগ গভীরতা না থাকাতে এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।' ৮৭

প্রভাতকুমারের প্রায় সব উপন্যাসেই আমরা দেখি, নায়ক নায়িকার চরিত্র অপেক্ষা বিশেষ ধরণের পার্শ্ব চরিত্রগুলিই সুপরিস্ফুট। 'জীবনের মূল্য' উপন্যাসেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এমন একটি চরিত্র, স্থানীয় স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, মোসাহেবী বৃত্তিতে পারদর্শী, ধূর্ত স্বার্থপর সতীশ দত্ত। সংস্কৃত নানাবিধ পুরাণের এবং উদ্ভট শ্লোক তার অধিগত, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সর্বদাই আওড়ে থাকেন। বিশেষ করে পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের মন বোঝার তার অদ্ভুত ক্ষমতা থাকাতে সেই পরিস্থিতিতে মানানসই শ্লোক আওড়ে তার মন বশ করে নিজের কাজ সহজেই হাসিল করে নেন।

গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রভাবতীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়েছে ঠিকই কিন্তু এ সম্বন্ধ যতটা প্রভাবতীর পিতার আর্থিক অসুবিধার সুযোগে ততটা তাদের ইচ্ছা মত নয়। এধরণের অসম বিবাহে প্রভাবতীর স্বাভাবিক অপছন্দ রয়েছে এবং পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে বুড়ো গিরিশের এধরণের ইচ্ছার বিরূপ সমালোচনাও হয়েছে। স্বভাবতই গিরিশ বিরুদ্ধ আলোচনায় ক্ষুব্ধ। গিরিশচন্দ্রের এই মানসিক অবস্থায় তার পক্ষ অবলম্বনে তাকে সমর্থন জানালে নিশ্চয় সে খুশি হবে, এবং হওয়াটা স্বাভাবিক জেনেই ধূর্ত সতীশ নানা মিথ্যা ভাষণে স্বকপোলকল্পিত কাহিনী বর্ণনে গিরিশের মনের সন্তুষ্টি বিধানে প্রবৃত্ত হয়েছে। প্রভাবতী গিরিশের প্রতি বিরূপ এবং তাকে 'হতভাগা-মিন্সে' 'হুতোম থুমো' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছে, প্রতিবেশী গিরিশের বয়সের উল্লেখ করে বনে যেতে বলেছে এবং এই কথাগুলি অবলম্বন করেই সতীশ গিরিশের কাছে ব্যাখ্যা করেছে, বৃদ্ধ মহাদেবের জন্য গৌরীর যে প্রতীক্ষা প্রভাবতীর প্রতীক্ষাও তদ্রূপ, আর প্রতিবেশীগণ যে গিরিশকে বনে যেতে বলেছেন সেইটি তার মতে এক অর্থে ঠিকই। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি উদ্ধার করেছে —

'পুষ্পবাণভয়তো মনোমৃগ:
সংবিবেশ নবযৌবনে বনে।
তত্র দৃষ্টিবিশিখৈর্যেন হন্যতে
কাতরে তব কৃপা ন জায়তে।।'

এখানে নায়ক নায়িকাকে বলছেন কন্দর্প-বাণের ভয়ে আমার মনরূপ মৃগ তোমার নবযৌবনরূপ বনের মধ্যে প্রবেশ করে আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু সখি, তুমি এমন নিষ্ঠুর যে, সে বেচারিকে নয়নবাণের দ্বারা বিদ্ধ করছ। এখানে গিরিশ মুখোপাধ্যায়কে মনরূপ মৃগের xxx স্থলে বসিয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করবার তুলনা দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন গিরিশচন্দ্র নায়িকার নবযৌবনরূপ সত্যই বনে প্রবেশ করছেন। বলাবাহুল্য এহেন xxxx xxxxx তুলনা তথা স্তাবকতায় গিরিশচন্দ্র xxxxxxx আনন্দিত হয়েছেন এবং ফলস্বরূপ সুকৌশলে সতীশ বিনা হ্যান্ডনোটে পাঁচশত টাকা গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বের করে নিয়েছে। প্রচুর মিথ্যাভাষণ, কল্পিত-কাহিনী বর্ণনে গিরিশচন্দ্রের মানসিক অবস্থানুযায়ী শ্লোক আওড়ে সে তাকে সদা সর্বদা তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেছে। ফলত: কিছু সুযোগসুবিধা এবং প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে। মিথ্যা স্তাবকতা xxx করলেও তার মধ্যে কোন হিংস্রতা ছিল না। বরং গিরিশচন্দ্রের প্রতি তার সহানুভূতিশীল মনের পরিচয়ও আমরা পাই। তাই কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত এবং মানসিক যন্ত্রনাকাতর গিরিশচন্দ্রের পাশে বসে তার স্তাবকতা করে পাপবোধকে লাঘব করতে চেয়েছে।

চরিত্রটির মূল কাহিনীর সঙ্গে বিশেষ কোন xxxxxx যোগাযোগ না থাকলেও সরস-লঘু শ্লোক উচ্চারণ এবং অবস্থানুযায়ী xxxx বিশ্লেষণের ভঙ্গি উপন্যাসে কৌতুককর হাস্য রসের যোগান দিয়েছে।

সংসারে সমস্যাজর্জরিত কন্যাদায়xxx গ্রস্ত দরিদ্র পিতার প্রতীক উপন্যাসের জগদীশ বাঁড়ুয্যের চরিত্রটি। সহায় - সম্বল -আত্মীয় -স্বজনহীন জগদীশবাবু সুন্দরবনের চাকুরিটি ছেড়ে পৈতৃক ভিটাখানি আঁকড়ে কায়ক্লেশে স্ত্রীপুত্র কন্যা নিয়ে কোনক্রমে সংসার যাত্রা নির্বাহ করছেন। পুত্রকে xxx কলেজে পড়ানোর সংস্থান নাই, সে নিজের চেষ্টায় কলিকাতায় থেকে পড়ে। কন্যা প্রভাবতীর বয়স হয়েছে কিন্তু বিয়ে দিতে পারেননি। উপরন্তু পেটের দায়ে অর্থঋণ, এমনকি বসতবাটীখানি গিরিশচন্দ্রের কাছে বন্ধক রেখেছেন। এহেন অবস্থায় মেয়ে প্রভাবতীর বিয়ে xxxx বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দিলে কন্যার বিবাহ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় ভার থেকে অব্যাহতি, বাড়ী বন্ধকীর দলিলখানি ফেরৎ ইত্যাদি প্রলোভনে পড়ে নিজেই বিবেকের বিরুদ্ধে মেয়ে বিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন। তাই দেখি যুবক রাজকুমারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হবার পর তার আনন্দমূর্তি দেখে তিনিও আনন্দিত বরং নিজের সুখ সুবিধার জন্য মেয়েকে বলিদান করেন নি ভেবে আনন্দ পেয়েছেন। অন্য দিকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েও যখন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেন নাই সেই নিজ বাক্য-খেলাপ জনিত সংকোচ

তার মনে দেখতে পাই। শেষ পর্য্যন্ত প্রবল আক্রোশে যখন গিরিশচন্দ্র তার নামে কোর্টে নালিশ করে তার পৈতৃক ভদ্রাসন থেকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করেছে তখন তার ভবিষ্যৎ সহায়সম্বলহীনতার কথা বিবেচনায় তিনি সবিশেষ চিন্তিত হয়ে ভেবেছেন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিলেই হয়ত ভাল করতেন। জীবনের এই সংকটময় সমস্যায় বিব্রত হয়ে গিরিশচন্দ্রের হাতে পায়ে ধরে মামলাটি তুলে নেবার জন্য অনুরোধ করতে গিয়ে তিনি যখন অপমানিত হয়েছেন তখন তার আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হয়ে গিরিশচন্দ্রকে ধিকৃত করেছে, জামাইয়ের অন্নদাস হয়ে থাকতে তাকে বাধা দিয়েছে এবং সম্পূর্ণ ভাবে নিঃসম্বল এই বৃদ্ধ বাঁচার প্রচণ্ড আকুতিতে চাকুরীর চেষ্টায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে জমিদারের অতিথিশালায় অসুস্থ হয়ে এক করুণ মৃত্যু বরণ করেছেন।

চরিত্রটি বাস্তবানুগ। বৃদ্ধের করুণ মৃত্যু সংবাদ শুনেই গিরিশ-মুখোপাধ্যায়ের মনোভাবে পরিবর্তন এসেছে।

হরিপদ এবং রাজকুমারের চরিত্র দুইটি নব্যপন্থী কলেজে পড়া উদারমনোভাবাপন্ন যুবকের ভাবধারা বহন করেছে। এদের উদার চিন্তায় আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু চরিত্রদুইটি সুপরিস্ফুট নয়। এদের আকস্মিক মৃত্যু কেমন যেন উপন্যাসের পরিনতির পক্ষে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের পাশাপাশি হাস্য রসের একটি ক্ষীণ হলেও প্রবহমান ধারা আমরা ইতঃপূর্বে লক্ষ্য করেছি। এখানেও হাস্য রসের পরিচয় রয়েছে সতীশ চরিত্রের অবিশ্রান্তধারায় শ্লোক উচ্চারণে এবং ব্যাখ্যায়, সর্দ্দিতে আক্রান্ত, শব্দের বিকৃত উচ্চারণকারী মাধব চক্রবর্তীর কথোপকথনে, 'ন' এর উচ্চারণ তার মুখে 'ল'এর মত শুনায়। তাই যখন গিরিশ মুখোপাধ্যায় কে ডাকতে গিয়ে বলেন — 'শুলে যাল' এবং গিরিশচন্দ্র কৃত্রিম কোপে শুলে যাওয়ার প্রতিবাদ করেন, তখন তাকে আবার বলতে শুনি —

' ওগো লা লা — শূলে যেতে বলিলি। বললাব শুলে যাল। ...... প্রলাপ, আসুল - উঠে বসুল।। বলি এই প্রাতঃকালে হন হন্ করে চলেছিলেন্ কোথায় ? ' ৮৮

উচ্চারণ বিকৃতি এখানে হাস্য রসের উপকরণ।

প্রভাতকুমার রচনায় ঘটনা পরিবেশ তাঁর পরিচিত জগৎ থেকে খুব বেশী দূরে উপস্থাপিত করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এখানে ঘটনাস্থল পল্লীগ্রাম হলেও এ ধরণের সমস্যাকে নিয়ে পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ যেতুমুল

বিতর্ক রেষারেষি উপস্থিত হয় উপন্যাসে সে সব চিত্র অনুপস্থিত। বোধ করি পল্লীগ্রাম সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় তিনি সুকৌশলে সে সব চিত্র এবং মানসিকতাকে পরিহার করেছেন। উপরন্তু দেখি হরিপদ, রাজকুমারকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে পড়িয়েছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁর পরিচিত বক্সারের চন্দ্রগড়ে উপস্থিত করিয়েছেন। নিজে আইন সংক্রান্ত ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন হরিপদ রাজকুমারের চরিত্রেও এই আইন পড়ার ঝোঁক দেখি। কলিকাতার চৈতন্য লাইব্রেরীর তৎকালীন কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, উপন্যাসে সেই চৈতন্য লাইব্রেরী থেকে আনিত পুস্তকের উল্লেখ পাই। সাধু সন্ন্যাসীর ভণ্ডামির প্রতি তাঁর কটাক্ষের পরিচয় রয়েছে উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদে।

'জীবনের মূল্য' উপন্যাসে পর্য্যন্তরে সামাজিক সমস্যার কথা বিধৃত হয়েছে। কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার অর্থনৈতিক অসহায়তা এবং সেইসূত্রে নিষ্পাপ অল্পবয়স্ক কন্যাদের ধনীবৃদ্ধের লালসাগ্নিতে নিক্ষেপ করার বাধ্যতা বিশেষত: বাংলাদেশের পল্লীসমাজে দূষিত ক্ষতরূপেই বিদ্যমান ছিল। আমাদের পল্লীগ্রামের নানা সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' বামুনের মেয়ে' পল্লীসমাজ' উপন্যাস। সেখানে শরৎচন্দ্রের মধ্যে দেখি সামাজিক কুসংস্কার ও অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সমাজের নিষ্ঠুরতার উলঙ্গ প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রভাতকুমার কিন্তু সামাজিক রীতি নীতি সংস্কার অথবা সমস্যার বিশ্লেষণের দিকে যাননি, সমাজের নিপীড়ন থেকে উদ্ভূত ঘটনাকে বিবৃত করেই তিনি যেন ক্ষান্ত হয়েছেন। এখানে গিরিশচন্দ্রের অন্যায় লালসার প্রতিবাদ করতে দেখি মাধব চক্রবর্তীকে কিন্তু সেই প্রতিবাদ অচিরেই স্তিমিত হয়ে গেছে তার বিকৃত উচ্চারণের হাসির হুল্লোড়ে।

প্রকৃতপক্ষে প্রভাতকুমারের জীবনদৃষ্টি কোন সমস্যার গভীরে অথবা মানবচরিত্রের অন্ত: প্রদেশে প্রবেশ করে জীবনকে বিচার বিশ্লেষণের কাঠ-গড়ায় উপস্থিত করাতে চায়নি। তিনি সমাজ ব্যবস্থার প্রবল প্রবাহের মধ্যে তার অসঙ্গতিকে অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে কখনও বা কৌতুক অনুভব করেছেন আবার কখনও মৃদু কটাক্ষপাত করেছেন কিন্তু জীবনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রায় সর্বত্রই। আর এই কারণেই সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও 'জীবনের মূল্য' সত্যকারের ট্র্যাজিক রচনা হয়ে উঠতে পারেনি।

(৫)

প্রভাতকুমারের পঞ্চম উপন্যাস রচনা 'সিন্দুর কৌটা,' সুবৃহৎ আকৃতির দিক থেকে 'নবীন সন্ন্যাসী'র পরেই এর স্থান। উপন্যাসটি ১৩২৩ সালের ফাল্গুন থেকে ১৩২৫ সালের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তক তালিকানুযায়ী মতে উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশ কাল ২০শে মে, ১৯১৯।

'সিন্দুরের কৌটা' হিন্দু সধবা নারীর কাছে পরম পবিত্র এবং পাতিব্রত্যের প্রতীক স্বরূপ। তাই উপন্যাসের নামকরণ থেকেই বোঝা যায় রচনার উদ্দেশ্য হিন্দু নারীর আদর্শ পাতিব্রত্যের এবং পতিপ্রেমের চিত্রাঙ্কণ। আদর্শ প্রেমের ভাবদ্যোতক লর্ড মিল্টনের কবিতার দুইটি পংক্তি উপন্যাসের আরম্ভেই উদ্ধৃত করেছেন —

'Love has no thought of self:
Love sacrifices all things to bless the thing it loves.'[৮৬]

উপন্যাসে বকুরাণীর চরিত্রের মাধ্যমে এই আদর্শটিকে রূপায়িত করা হয়েছে।

উপন্যাসের কাহিনী অংশ এইরূপ — কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল বিজয়কুমার বসু, বয়স ছাব্বিশ সাতাশ, সুপুরুষ, সুদর্শন, সৎস্বভাব এবং গভীর-ভাবে পত্নীপ্রেমিক। পূজার ছুটিতে পশ্চিমে বেড়াতে বেরিয়ে জব্বলপুরের ডাকবাংলোতে ওঠেন। সেখানে আগে থেকেই এক দেশীয় খৃস্টান দম্পতি মি: এবং মিসেস পল ছিলেন। মি: পল জাতিতে মাদ্রাজী, তিনি অসৎ চরিত্র, ঠকবাজ এবং মাতাল। মিসেস পল জাতিতে বাঙ্গালী, ডাকনাম সুশী। মি: পল সারাদিন চাকরীর অজুহাতে বাইরে বাইরে কাটান তাই সুশীর সঙ্গে বিজয়-বাবুর ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সুযোগ বুঝে একদিন মি: পল সুশীকে অসহায় অবস্থায় একলা ডাকবাংলোতে ফেলে রেখে গা ঢাকা দেয়, স্বাভাবিক পরোপকারবৃত্তি এবং সহৃদয়তার বশে বিজয়বাবু সুশীর কষ্টলাঘবের চেষ্টায় মেতে ওঠেন। কিন্তু এই অবাধ মেলামেশায় উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয় — বিজয়বাবু বিবাহিত জেনেও সুশী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিজয়-বাবুও গৃহে তার সতীসাধ্বী স্ত্রী বকুরাণীর কথা স্মরণ করেও নিজেকে সংযত করতে পারেন না - তিনি বকুরাণীকে সুশী সংক্রান্ত ঘটনার কথা বললে কিছুটা অভিমানবশেই বকুরাণী বিজয় বাবুকে সুশীকে বিয়ে করার পরামর্শ দেন। ঘটনাচক্রে বিজয়বাবু অসুস্থ হয়ে পড়লে বকু-রাণীই স্বামীর মানসিক শান্তি এবং মঙ্গলকামনায় সুশীকে ডেকে আনে এবং শেষ পর্য্যন্ত স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে আনন্দিত চিত্তেই সতীন নিয়ে ঘরকন্না করে।

গৃহে পতিপ্রেমিক বিবাহিত স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পুরুষের অন্য নারীতে প্রণয়াসক্তি, তৎজনিত মানসিক অশান্তি ভোগ এবং সর্বশেষে সাধ্বী স্ত্রীর পতিসুখের জন্য তাঁরপ্রণয়াস্পদের সঙ্গে বিবাহ প্রদানের কাহিনী ইতঃপূর্বে আমরা পেয়েছি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে' । বস্তুত: 'বিষবৃক্ষ' এবং 'সিন্দুর-কৌটা'র কাহিনীর পরিণতি এক না হলেও 'সিন্দুর কৌটা'তে বিষবৃক্ষের সাক্ষাৎ প্রভাব আছে এ কথা স্বীকার্য্য । বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথ নৌকা-ভ্রমনে বের হয়ে ভগ্নগৃহে অসহায় কুন্দনন্দিনীকে পেয়েছে, এখানে বিজয় XXXXX পশ্চিম ভ্রমনে গিয়ে অসহায় অবস্থায় সুশীকে আবিষ্কার করেছে । নগেন্দ্রনাথ এবং বিজয় উভয়েই পত্নীপ্রেমিক এবং পরোপকার মনোবৃত্তি সম্পন্ন পুরুষ । স্ত্রী চরিত্রে তফাৎ এইটুকু কুন্দনন্দিনী কুমারী, সুশী অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী । উভয়েই নিষ্পাপ মন নিয়েই অসহায় স্ত্রীলোকের উপকার করতে চেয়েছে। তাই দেখি ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে উভয়েই আপন
পত্র লিখেছে। এই পরোপচিকীর্ষাবৃত্তি যখন আকর্ষণে রূপান্তরিত হয়েছে তখন উভয়েই আপন আপন স্ত্রী-
আপন স্ত্রীকে^সম্পর্কে দ্বিধায় পড়েছে । উভয়েই দেখি-অন্যায় বোধ থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সংযত করতে পারেন নি-ফলত: অশান্তি উভয়েই ভোগ করেছেন । চরিত্রগত পার্থক্য এইটুকু-নগেন্দ্রনাথের মধ্যে যে তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচয় আছে বিজয় XXXXX কুমারের মধ্যে সেইটি XXXXXXXXX XX অত্যন্ত মৃদু । সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথের সুখের জন্য কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে নিজেকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে কিন্তু বকুরাণী স্বামীর সুখের জন্য সুশীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে সতীন নিয়ে সহাস্যে ঘর করেছে - অবস্থার কিছু পার্থক্য থাকলেও 'সিন্দুর কৌটার' সৌদামিনী চরিত্র 'বিষবৃক্ষের' কমলমণিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। উভয় ঔপন্যাসিকই আদর্শ সতীত্বের জয়গান গেয়েছেন ।

'সিন্দূর কৌটা'য় বিষবৃক্ষে'র XXX ছায়াপাত ব্যতিরেকে সম-সাময়িক কালের প্রখ্যাত অধ্যাপক আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্তের আংশিক প্রতিফলন রয়েছে । 'পুরাতন প্রসঙ্গ' এর লেখক শ্রদ্ধেয় বিপিন বিহারী গুপ্তের কাছে স্মৃতিচারণকালে তিনি বলেছেন -

'প্রভাতকুমারের 'সিন্দুর কৌটা' পড়িয়াছ ? প্রভাত দেখছি মনোগ্য-মিষ্ট নয়? ও প্লটটা কি প্রভাত আমার জীবন কাহিনী হইতে লইয়াছে ? পাইল কোথা হইতে? কিন্তু যাহাই হউক, 'সিন্দুরকৌটা'র মি: বোসের প্রশংসা আমি করি না । আমার অসংযত চিত্তবৃত্তি কিসের নেশায় নাচিয়া উঠিয়াছিল ? পরিণীত শিক্ষিত যুবক কেন দারান্তর গ্রহণের জন্য আত্মহারা হইল!' ১০

'সিন্দুর কৌটা' মূলত: ঘটনা প্রধান উপন্যাস, চরিত্রগুলি যেন ঘটনা স্রোতের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আপন পরিণতির দিকে স্বচ্ছন্দে চলেছে। চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবে ঘটনার প্রবাহে অবরোধ ঘটিয়ে নিজ ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বিন্দুমাত্র চেষ্টা চরিত্রগুলিতে লক্ষ্য করা যায় না। উপন্যাসের একমাত্র আকর্ষণীয় বিষয় ছিল বিজয়-সুশীর অসামাজিক প্রণয় কাহিনী চিত্রণ। এধরণের অসামাজিক প্রণয়ে যে প্রচন্ড মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিকভাবে উচিত ছিল বিজয় কিংবা সুশীর জীবনে তা নেই। বিজয়ের মনে বকুরাণী সম্পর্কে সামান্য একটু দ্বিধা দেখা দেয় অথবা সুশীর মনেও এ ধরণের বিবাহে নীতিগত সমর্থন সম্পর্কে সংশয় - থাকলেও কোথাও সে সংশয়ের তীব্রতা অনুভব করা যায় না।

উপন্যাসের নায়ক বিজয়। তিনি 'সুদর্শন, সৎস্বভাব, বিদ্যাবান'। হাইকোর্টে ওকালতি করতে যান বটে কিন্তু অর্থোপার্জ্জন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য নয় কারণ তাঁর প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি রয়েছে। তিনি বিবাহিত এবং রূপে গুণে তার যোগ্যা স্ত্রী বকুলবালিকা ওরফে বকুরাণীর সঙ্গে তার গভীর প্রণয় বিদ্যমান। বিবাহের পূর্বে উভয়ের পরিচয় ছিল এমনকি ভাবী বধূকে উদ্দেশ্য করে বিজয় কবিতা রচনাও করেছিলেন।

পুজার ছুটিতে বিজয় বেড়াতে গিয়েছে পশ্চিমে। জব্বলপুর ষ্টেশনে নেমেই স্ত্রীর উদ্দেশ্যে সেখানে পৌঁছানোর তারবার্তা পাঠিয়ে তবে উঠেছে সেখানকার ডাকবাংলোতে। ~~বিxxঅসমেয়xxসুxতীxস্ত্রীxসুশীরxক্রমাগত~~ এ হেন স্ত্রী-পরায়ণ কর্ত্তব্য বোধ সম্পন্ন বিজয়ের জীবনে পরিবর্তন এসেছে এই ডাকবাংলোতে মি: পলের যুবতী স্ত্রী সুশীর ক্রমাগত ~~সংসর্গে~~ সংস্পর্শে এসে। মি: পল কাজের অছিলায় সারাদিনই প্রায় বাইরে বাইরে কাটান রাত্রে যখন ফিরে আসেন তখন তিনি মত্তাবস্থায়। সুশীর জীবনের নি:সঙ্গ দিনগুলিতে সঙ্গ দেবার জন্য মি: পল স্বেচ্ছাবৃত হয়ে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে বিজয়ের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। সুশীকে একা একা এইভাবে কোথাও নিয়ে যেতে বিজয়ের মধ্যে একটু সংকোচ দেখা দিলেও সে সহজেই এই সংকোচ কাটিয়ে ওঠে। সংকোচ কাটিয়ে উঠলেও তার মনে একটা সংশয় দেখা দেয়, সুশীর সঙ্গে এভাবে মেলামেশা হয়তো বা বকুরাণী ভাল মনে নিতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে সুশীর প্রতি সে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছে এবং সেই আকর্ষণে যে কিছুটা অন্যায় এবং অসামাজিকতা মিশে আছে সে বোধ থাকা সত্ত্বেও বিজয় তার চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবে নিজেকে সংযত করতে পারেনি। সুশীর প্রতি বিজয়ের এই দুর্বলতার সুযোগে বোধ করি পলসাহেব সুশীকে অসহায় অবস্থায় ডাকবাংলোতে ফেলে গা - ঢাকা দিয়েছে। ফলশ্রুতি হয়েছে আরও জটিল। অসহায় সুশীর চিন্তায় বিজয় বিভোর

হয়েছে , সুশীর বিড়ম্বিত জীবন কাহিনী শুনবার পর তাকে পরিত্যাগ করে যাবার কথা সে আর চিন্তা করতে পারেনি । সুশীর প্রতি যে দুর্বলতা এতদিন তার মনে বীজাকারে ছিল পল সাহেবের অনুপস্থিতিতে এবং সুশীর অসহায়তার সুযোগে সেইটি অঙ্কুরিত হয়েছে । সুশী সম্পর্কে বকুরাণীকে ইতঃপূর্বে লিখলেও এখন স্পষ্ট করে সব কথা সে বকুরাণীকে লিখতে পারেনি স্বাভাবিক সংকোচে ।

অবশেষে সুশীকে সে কলকাতায় এনে হোটেলে রেখে তার ( ) পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করেছে এবং ভেবেছে সুশীর জীবনের ব্যবস্থা কোথাও করে দিতে পারলেই সে নিষ্কৃতি পাবে । সুশীর প্রতি বিজয়ের আকর্ষণ বকুরাণীর প্রতি সে যে অন্যায় করেছে সে বোধ তার মনে হয়েছে। বকুরাণী প্রচণ্ড অভিমানে হয়ত তাকে কিছু বলে না কিন্তু 'বিবাহিত ধর্মপত্নীর প্রতি সে যে ঠিক ন্যায় আচরণ করিতেছে না , তাহাও সে উপলব্ধি করে ।' ১১ কিন্তু বিজয়ের এই উপলব্ধি ব্যক্তিত্বহীন পুরুষের স্বীকারোক্তি মাত্র - মনের এই অন্যায় প্রবৃত্তিকে দমন করার কিছুমাত্র চেষ্টা তার মধ্যে দেখা যায় না । 'এই কয়টা দিন বইত নয়' — এই অজুহাতেই সে ক্রমাগত সুশী-সঙ্গের জন্য লালায়িত হয়েছে । তাই এই পরোপকারবৃত্তি মনে হয় সঙ্গ লালসার নামান্তর । বরং দেখা যায় সুশী তাকে তার এই ধরণের অন্যায় কাজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেছে। সুশীকে বিয়ে করার আইনমত উপায় থাকলেও সুশী বলেছে —' মানুষের আইনে যদি না - ও বাধে ঈশ্বরের আইন ত আছে । যাকে তুমি বিবাহ করেছ, যার চিরদিনের সুখদু:খের ভার তুমি নিয়েছ, জীবনের একমাত্র অবলম্বন জেনে নিজেকে যে তোমার হাতে সমর্পণ করেছে, তাকে তুমি এত বড় আঘাত যদি কর, তবে ধর্মে বাধবে না ?' ১২ সুশীর এই নৈতিক সাবধানবাণী উচ্চারণের পরেও বিজয় যুক্তি দেখিয়েছে - হিন্দু মেয়েদের কাছে পতি পরম দেবতা, স্বামী তাদের ভোগের সামগ্রী নয় পূজার অঙ্গ বিশেষ। বলাবহুল্য বিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষিত বিজয়ের এ ধরণের চিন্তাধারা যেমন অবান্তর তেমনই হাস্যকর, আরও হাস্যকর হয়েছে যখন নিজের স্ত্রীর কাছে সুশী সংক্রান্ত তার দুর্বলতার কথা বলে এই দুর্বলতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বছরখানেকের জন্য দূরে নির্জনে কোথাও বসবাস করে পড়েপিটিয়ে মনটাকে সোজা করে নিয়ে তবে দেশে ফিরবে বলেছে । বকুরাণী স্বামীর কাছে এ ধরণের কথা শুনবার পর সুশীকে বিয়ে করে সুখী হবার পরামর্শ তাকে দিয়েছে । কোন নারীর পক্ষে স্বামীর এ ধরণের কার্য্যকলাপে মত দেওয়া বাস্তব জগতে অস্বাভাবিক বলে মনে হয় ।

উপন্যাসে শেষ পর্য্যন্ত এই অবাস্তব ঘটনাকেই ঘটিয়ে দেওয়া

হয়েছে। সুশী প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হয়েছে এবং শুভদিনে পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে বিজয়- সুশীর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হয়েছে। বকুরাণীও সুশীকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছে।

নিজের বিবাহিত স্ত্রী বর্তমানে অন্যের বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ এবং সেই আকর্ষণে অন্যায় জড়িয়ে আছে এই বোধে থাকা সত্ত্বেও বিজয় যেভাবে কিছু অবাস্তব দুর্বল যুক্তির সাহায্যে ক্রমানুয়ে সেই পথে এগিয়ে গেছে তাতে তার ব্যক্তিত্বহীনতা এবং দুর্বল মানসিকতার পরিচয় সুপরিস্ফুট। অথচ এই অসামাজিক প্রেমকে কেন্দ্র করে নায়ক চরিত্রে যে প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুটনের অবকাশ ছিল লেখক সেই পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। অবশ্য প্রভাতকুমার তাঁর অধিকাংশ নায়ক চরিত্র চিত্রণে এই পথই অবলম্বন করেছেন। 'তিনি হৃদয়ের গভীর স্তরে, তীব্র চিত্ত বিক্ষোভের ঘূর্ণীর মধ্যে কদাচিৎ অবতরণ করেন।' ১৩ বিজয় চরিত্র সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর এই মত যথার্থ বলেই মনে হয়।

উপন্যাসের নায়িকা বকুরাণীর চরিত্রটিও সুচিত্রিত নয়। সে যেন সনাতন হিন্দু আদর্শে লালিতা হিন্দুনারীর পতিভক্তির প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। অথচ লেখক তাকে আঁকতে চেয়েছেন বিংশশতাব্দীর সূর্য্যমুখী করে। সূর্য্যমুখী ও বকুরাণী উভয়েই স্বামী - সোহাগিনী উভয়েই স্বামীর সুখে সুখী, স্বামীর দুঃখে দুঃখী। স্বামীর সুখের জন্য সূর্য্যমুখী আত্মত্যাগ করে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে স্বামীর বিয়ে দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু আত্মত্যাগের নামান্তরে আত্মবঞ্চনার হাহাকারে সে নিজেকে স্বামীর সংসার থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। স্বামীকেই যখন সে ত্যাগ করতে পেরেছে তখন সেই ত্যাগের রিক্ততাকে সংসারের কোন কিছু দিয়েই সে পূরণ করে নিতে চায়নি। এখানেই সূর্য্য-মুখী চরিত্রের বাস্তবতা রক্ষিত এবং সার্থকতা অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বকুরাণীও স্বামীর সুখের জন্য তাঁর ভালবাসার পাত্রী সুশীলাকে স্বামীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই ত্যাগের জন্য তার মধ্যে কোনরূপ বিকারের চিহ্ন নাই -- বরং সুশীকে সাদরেই সে বরণ করে নিয়েছে। বকুরাণীর এই নির্বিকার চিত্ততায় রক্ত মাংসের মানুষ বলে তাকে মেনে নেওয়া কষ্টকর। বকুরাণীর মনে নারীসুলভ অভিমান আছে কিন্তু সে অভিমান এত সাধারণ পর্য্যায়ের যে স্বামী - স্ত্রীর মধ্যে এ যেন প্রাত্যহিক ঘটনা বিশেষ। সুশী তার জীবনে এত বড় সর্বনাশের কারণ জেনেও তার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতার চেষ্টা নাই, এমন কি কোন গভীর মানসিক অশান্তি বা দ্বন্দ্বের পরিচয়ও তার চরিত্রে পাই না। হয়ত বিজয়ের প্রতি তার ভালবাসা অতলান্ত, তার স্বামী-প্রেম নীতির দিক থেকে হয়ত বা নিখুঁত

হিন্দু নারীর আদর্শ কিন্তু উপন্যাসশিল্পের উপজীব্য চরিত্র সে হয়ে উঠতে পারেনি।

ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য সম্পর্কে প্রভাতকুমার কি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। শত সুযোগ থাকলেও তিনি 'রত্নদীপের' বৌরাণীর চরিত্রে কোন কলঙ্ক লেপন করেননি। মনে হয় এই গভীর শ্রদ্ধাবোধ তাঁর বকুরাণীর চরিত্রকে অতি উদার কল্পলোকবাসিনী করে তুলেছে।

উপন্যাসে সুশী চরিত্র চিত্রণেরও তেমন কোন শিল্পকুশলতার পরিচয় নাই- বরং উপন্যাসের প্রথমে তাঁর যে পরিচয় আমরা পেয়েছি এবং ঘটনা সংঘাতের মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের যে বিকাশ দেখানো হয়েছে, উভয়ের মধ্যে কিছুটা অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়।

সুশী সুন্দরী, বাঙ্গালী খৃষ্টান। বিয়ে হয়েছে কিম্ভূত-কিমাকার মাদ্রাজী খৃষ্টান পল সাহেবের সঙ্গে, যে সাহেবের চরিত্রে না আছে কোন আকর্ষণীয় গুণ না সে অর্থশালী। সুশী যে বিপদগ্রস্থ হয়ে তাকে বিয়ে করেছে এমন কথা নয় কারণ বাল্য কালে অসহায় অবস্থায় পড়লেও পিতৃবন্ধু যোড়াশির্জার চৌধুরী সাহেব তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং স্নেহের চোখেই দেখেছেন। সুশী শিক্ষিতা এবং তৎকালীন বাঙ্গালী হিন্দু মেয়ের মত পর্দানসীন নয়। এহেন সুশী কেন যে পলসাহেবকে বিয়ে করেছে তার কোন উপযুক্ত কারণ উপন্যাসে বিশ্লেষণ করা হয়নি তাই এই 'Beauty and the beast' এর মিলন অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। এই মিলন যে প্রেমঘটিত এমন কথা মনে করাও কষ্টকর। কারণ সুশীর নেকলেশ চুরির ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে – পল সাহেবকে সে পুলিশের হাতে দিতে চেয়েছে। এমনকি স্বামী হিসাবে পল সাহেব যে তার প্রেম-ভালবাসা -শ্রদ্ধা কোনদিন পেয়েছে এমন পরিচয়ও নেই। বরং প্রথম থেকেই তাকে দেখি বিজয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনে সচেষ্ট, পল সাহেব যেন উপলক্ষ মাত্র। বিজয়ের স্ত্রী - কন্যা বর্তমান এবং সে পত্নীপ্রেমিক একথা জানবার পরও সুশীর বিজয়কে আকৃষ্ট করার চেষ্টায় তার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। যদি একথা মেনে নিতে হয় যে যেহেতু বিজয় অসময়ে সুশীকে অযাচিতভাবে সাহায্য করেছে তাই তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধের জন্য সুশী বিজয়কে দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি তবুও প্রশ্ন কে সেই কৃতজ্ঞতা বোধের প্রকাশ সুশীর জীবনে কোথায়? বরং দেখি নিজের সুখ, সুবিধা, ভবিষ্যৎ চিন্তায় সে বিজয়কে হাত-ছাড়া করতে চায়নি। তাই তাকে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর বলেই মনে হয়। যদি ধরে নেওয়া যায় বিজয়কে সে আন্তরিকভাবে ভালবেসে তাকে দূরে

সরিয়ে দিতে পারেনি, কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন থাকে প্রকৃত প্রেম ত্যাগেই মহান হয়ে ওঠে, ভোগে নয়। সুশীর মধ্যে এ ধরণের মনোবৃত্তিও নেই। সব ছেড়ে বর্মায় যাবার ইচ্ছা প্রকারান্তরে সূক্ষ্ম অভিমান জানিয়ে বিজয়কে আরও কাছে আকর্ষণ করার অছিলা মাত্র। সত্যই যদি সে বিজয়কে ভাল-বেসে তার পারিবারিক সুখ শান্তির কামনা করত তাহলে বকুরাণীর হাতে চা খেয়ে এসেছে দেখে তার এত অভিমানের কোন কারণ ছিলনা। তারপর সুশীর xxx গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে বিজয়ের জন্য অধীর প্রতীক্ষা, শ্রান্ত বিজয়ের মাদ্রাজ গিয়ে পল সাহেবের দ্বিতীয় বিবাহের খোঁজ খবর নিয়ে xxx সুশীর অন্যত্র কোথাও ব্যবস্থা করার উদ্যোগে তার অভিমান সূচক কথাবার্তা নিশ্চয় তার প্রেমের উদারতার কথা স্মরণ করায় না। তার নিজের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে কোন স্ত্রী তার স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহে মত দিতে পারে, অথচ সে বিজয়কে বলেছে —

......." তুমি যদি বোঝ বকুরাণীর প্রতি কোনও অন্যায় করা হবে না, সে মনে xxx আঘাত পাবে না, তাহলে আমার বাধা কিছুই নেই। তুমি যদি আমায় একান্ত তোমার নিজের করে নাও, আমি যদি তোমায় সুখী করবার, তোমায় সেবা করবার অধিকার পাই, তবে তোমার অন্য স্ত্রী, তোমার ছেলে মেয়ে, তোমার আত্মীয় স্বজনের রক্তচক্ষু — এ সকল কিছুই আমার কাছে বাধা নয়। সে সুদিন আমার যদি আসে, ঈশ্বর আমার ভাগ্যে এত সুখ যদি লিখে থাকেন, তবে তার চেয়ে আমার জীবনে আর কিছুই বেশী স্পৃহনীয় নেই xxx বিজয় — ইহলোকেও নয়, পরলোকেও - নয়।' ১৪

সুশীর এই উক্তি আত্ম-সর্বস্ব-প্রেমের নামান্তর। প্রকৃত পক্ষে সুশী যে ধর্মীয় সংস্কার এবং সামাজিক পরিবেশে লালিত হয়েছে সেখানে বিবাহ বন্ধনের গুরুত্ব ঠিক সনাতন হিন্দু মতাদর্শের মত নয়, সেখানে জীবনসঙ্গী এবং বিবাহ প্রায় সমার্থক। কিন্তু হিন্দু নারীর কাছে xxx বিবাহ জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার বিশেষ। খৃষ্টান সুশীর পক্ষে বিবাহের এই গুরুত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, সেইজন্য বিবাহিত বিজয়ের সঙ্গে তার ব্যবহারে একদিকে যেমন রয়েছে xxxxxxxx সঙ্কোচহীন শিথিলতা অন্য দিকে আছে xxx xxx xxx স্বার্থপর প্রেমচিন্তা। কিন্তু লেখক চেয়েছেন তার মধ্যে একটি গভীর প্রেমবোধের চিত্র আঁকতে। সেইজন্য সুশী-চরিত্র অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে।

প্রভাতকুমারের প্রায় সব উপন্যাসেই একটি করে দুষ্ট প্রকৃতির চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ প্রায়শই কাহিনীতে কিছুটা জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা করে বিদায় নিয়েছে। এখানেও তেমন একটি চরিত্র—

সুশীর স্বামী মাদ্রাজী খৃষ্টান পল সাহেব। পল সাহেবের চেহারা যেমন কদাকার চরিত্রটি তেমনি কদর্য। সে প্রচন্ড মিথ্যাবাদী এবং প্রতারকও বটে। তার পূর্ব বিবাহের কথা গোপন করে সে সুশীকে বিবাহ করেছে, কিন্তু সুশীর জীবনের ভরণপোষণের দায়ভার নিতে তাকে বিশেষ দেখা যায় না, বরং নিজের অক্ষমতার অজুহাতে তাকে একা অসহায় অবস্থায় ডাকবাংলোতে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে তার বিবেকে বাধেনি। এমনকি নিজ স্ত্রীর নেকলেসটি পর্যন্ত চুরি করতে সে দ্বিধা বোধ করেনি। সে মদ্যপ, স্ত্রী তার কাছে যেন অর্থউপার্জনের একটি উপায় বিশেষ। সুশীকে সে বিজয়ের হাতে তুলে দিতে ইতস্তত: করেনি বরং বলা যায় সুশীকে কৌশলে বিজয়ের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিয়ে সে কিছু টাকা আদায়ের ফন্দী করেছে। এমনকি টাকা পেলে সে সুশীর উপর সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করে দলিল লিখে দিতেও প্রস্তুত। সে আত্মসম্মানবোধহীন-তাই নিজ জীবনের কুকীর্তির কথা, অল্প বয়সের উত্তেজনায় অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে পলায়ন ইত্যাদি কাহিনী নিজ মুখেই বিবৃত করেছে। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন দেশীয় খৃষ্টান সমাজে যে ব্যাভিচারী জীবনযাপন পদ্ধতি ইতস্তত: ভাবে দেখা যেত পল সাহেব তাদেরই একজন। এদের কোন দৃঢ় সামাজিক বা নৈতিক বন্ধন ছিল না।

পলসাহেবের চরিত্রাঙ্কণ স্বল্প পরিসরে অত্যন্ত জীবন্ত, কিন্তু উপন্যাস কাহিনীতে সে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পারেনি। উপন্যাসের সৌদামিনী, বিজনকুমারী, বিপিনবাবু, চৌধুরী সাহেব ইত্যাদি চরিত্রগুলি নিজ নিজ ভূমিকায় বেশ জীবন্ত। বিধবা সৌদামিনীর বকুরাণীর দু:খে সমবেদনা জ্ঞাপন এবং সুযোগ পেয়ে রঙ্গ রসিকতায় তাকে ভুলিয়ে রাখা, বিপিনবাবু - চৌধুরী সাহেবের উদার চিত্ততার পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই। এই ধরণের নিত্য-সাংসারিক জীবনের ছোট ছোট চরিত্র চিত্রণে লেখকের যে পারদর্শিতা আছে-একথা অস্বীকার করা যায় না।

এতৎসত্ত্বেও 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাস-শিল্প বিচারে তেমন সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এখানে প্রধান চরিত্রগুলি সুপরিস্ফুট নয়। অসামাজিক প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা, হৃদয়ের যে দ্বন্দ্ব সংঘাত, বিরুদ্ধ প্রতিবেশের মধ্যে নিজেদের প্রেমাদর্শকে অটল রাখার দৃঢ় প্রচেষ্টা - এখানে নায়ক নায়িকার জীবনে তেমন কোন দ্বন্দ্ব সংগ্রামের পরিচয় নাই। 'বিষবৃক্ষ'এর অনুকরণে 'সিন্দুর কৌটা'র কাহিনী রচিত হলেও 'বিষবৃক্ষ'এর চরিত্র চিত্রণের বলিষ্ঠতা অথবা কাহিনী রচনার সংহতি এখানে অনুপস্থিত। সেই হিসাবে 'সিন্দুর কৌটা' বিষবৃক্ষের অক্ষম

অক্ষম অনুকরণ মাত্র বলা যায় ।

এখানে কাহিনী রচনায় প্রভাতকুমারের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি বিবাহিত খৃষ্টান মহিলাকে হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন, অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তাকে হিন্দু করিয়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয় বিবাহিত পুরুষের স্ত্রী বর্তমানে অন্য নারীতে আসক্তি এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহের মাধ্যমে সেই নারীকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেওয়ায় মনে হয় পুরুষের একাধিক পত্নীতে প্রভাতকুমারের হয়তো আপত্তি ছিল না ।

'সিন্দূর কৌটা'য় এই ধরণের প্রেম - কাহিনী রচনা সমসাময়িক কালে ব্যঙ্গবাণে তাঁকে বিদ্ধ করেছিল । শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী তাঁর 'পোলাও' ব্যঙ্গ কাব্যের 'প্রথম হাঁড়ী' অনুচ্ছেদে (পৃঃ ১২) প্রভাতকুমার সম্পর্কে লিখেছেন —

By the by প্রভাত কুমার
এখন যিনি রাজার মিতে,
মত্ত থাকেন কাব্য চর্চায়
মত্ত থাকেন নৃত্য-গীতে।
বিলাতী প্রেম গোলাপ জলে
যত্ন করি মিশিয়ে
বঙ্গনারীর কোমল হৃদয়
দিচ্ছেন ভায়া বিষিয়ে ।
'সিন্দূর কৌটা'র য়ুয়ানি প্রেমের
মন মাতানি ছন্দে
সুশী ছুঁড়ী তান ধরেছে
কতই মহানন্দে ।"

প্রভাতকুমারের জীবনালোচনা - প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি তিনি ছিলেন কাহিনী রচনায় মিলনাত্মক পরিণতির পক্ষপাতী, এখানে বিজয়-সুশী চরিত্রদুইটির মুখে উপন্যাসের পরিণতি সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য শুনতে পাই

'সুশী বলিল —" আচ্ছা বিজয়, তুমি মিলনান্ত উপন্যাস ভালবাস না বিয়োগান্ত ?"
বিজয় বলিল, ' মিলনান্তক।
সুশী বলিল, " আশ্চর্য্য ত! আমিও মিলনান্তক ভালবাসি। বিয়োগান্তক উপন্যাস আমার দু'চক্ষের বিষ! ইচ্ছে করে বইখানি টুকরো টুকরো করে

ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দিই । ১৫

'সিন্দুর কৌটা'র প্রথম সংস্করণ ও তৃতীয় সংস্করণে কিছু কিছু পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন প্রথম সংস্করণের জেনকিন্স চরিত্রটির নাম তৃতীয় সংস্করণে হয়েছে ডিক্রুজা। (একবিংশ পরিচ্ছেদ)

উপন্যাস শিল্পের বিচারে 'সিন্দুর কৌটা'তে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও তৎকালীন পাঠক সমাজে যে বইটি সমাদর লাভ করেছিল তার প্রমান লেখকের জীবৎকালের মধ্যে উপন্যাসটির তিনটি সংস্করণের প্রকাশ।

—

(৬)

তৎকালীন ভারতীর যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় একটি উপন্যাস কাহিনীকে বারজন লেখকদ্বারা লিখিয়ে 'বারোয়ারী উপন্যাস' শীর্ষক নামে বৈশাখ থেকে চৈত্র ১৩২৭ সালে' ' ভারতী'তে প্রকাশ করেন। উপন্যাসটি বৈশাখ, ১৩২৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই উপন্যাসের নয় থেকে এগারো পরিচ্ছেদ প্রভাতকুমারের রচনা। শ্রাবণ, ১৩২৭ সালে 'ভারতী'তে প্রভাতকুমারের রচিত অংশ প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য লেখকগণ ছিলেন সর্বশ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র কুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং প্রমথ চৌধুরী।

উপন্যাসটির প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছে —' বারজন সাহিত্যিক মিলিয়া এই উপন্যাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'বারোয়ারী'। আসল গল্পের সহিত এই নামের কোন সংস্রব নাই। এই ধরণের উপন্যাস - গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যে এই বোধহয় প্রথম। ভারতী মাসিক পত্রিকার উদ্যোগে ইহার সৃষ্টি।

এই উপন্যাসে যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের লিখন-ভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য যথাসম্ভব বজায় রাখা হইয়াছে।'

প্রকৃত পক্ষে যৌথ উদ্যোগে এই ধরণের উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা 'ভারতী' পত্রিকাতেই আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। 'কোন বিলাতী পত্রিকায় একাধিক লেখকের সমবায়ে ধারাবাহিকভাবে উপন্যাস রচনা '১৬ দেখে স্বর্ণকুমারী দেবী ছয়জন লেখকের রচনা সমৃদ্ধ 'নববর্ষের স্বপ্ন' উপন্যাসটি 'ভারতী' পত্রিকাতেই ১২৯৯ সালে প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম লেখিকা ছিলেন সরলা দেবী।

চূড়ামনিযোগে কলকাতায় গঙ্গাস্নান করতে এসে একটি বিবাহিতা সুন্দরী যুবতী মেয়ে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে জীবনে নানা দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত কিভাবে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তারই কাহিনী 'বারোয়ারী উপন্যাসে' বিধৃত হয়েছে।

উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনায় দেখি হারিয়ে যাওয়া মেয়ে কমলা কলিকাতায় থেকে কলেজে পড়া জনৈক জমিদারপুত্র ক্ষিতীশের

আশ্রয়ে রয়েছে। সৎস্বভাবের এই ক্ষিতীশ, বহু পরিশ্রমে কলকাতায় থেকে কলেজে-পড়া, কমলার গ্রামের জমিদারপুত্র এবং তাদের প্রতিবেশী হরেন্দ্রনাথকে খুঁজে এনে কমলাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেবার চিন্তা করছে ।

প্রভাতকুমারের লেখা নবম দশম এবং একাদশ পরিচ্ছেদে দেখি ক্ষিতীশ-হরেন্দ্রর সামান্য ভুল পরিকল্পনার জন্য কমলার জীবনের দুর্ভোগ দীর্ঘায়িত হয়েছে । কমলা মাসাধিককাল ক্ষিতীশের আশ্রয়ে মেস বাড়ীতে আছে। এমত অবস্থায় কমলাকে গ্রামের বাড়ীতে পাঠালে হয়ত কোন প্রশ্ন দেখা দিতে পারে- এই অনুমানে তারা সিদ্ধান্ত করেছে, আগে কমলার বাবাকে চিঠি লিখে তাকে সমস্ত কথা জানিয়ে কলকাতায় এনে তাঁর হাতেই কমলাকে সমর্পণ করবে । পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা চিঠি লিখেছে কিন্তু গ্রামে কমলা এবং হরেন্দ্রর নামে কুৎসা রটনা হওয়ায় উভয়ের পিতা তাদের অনুসন্ধানেই কলকাতায় আসায় সেই চিঠি বহু বিলম্বে ফেরত আসে। হতাশ হয়ে অবশেষে তারা সাব্যস্ত করেছে কমলার প্রকৃত অবস্থা বলে লক্ষ্ণৌ প্রবাসী কমলার স্বামীর কাছেই কমলাকে পৌঁছে দেবে । এই উদ্দেশ্যে তারা লক্ষ্ণৌ রওনা হয়ে গেছে ।

এদিকে হরেনের পিতা হরেনকে মেস বাড়ীতে না পেয়ে চাকরের মুখে হরেন-কমলার ট্যাক্সিতে যাওয়ার কথা শুনে তাদেরই সম্পর্কে রটিত কুৎসাকেই বিশ্বাস করেছে। ঘটনাচক্রে ক্ষিতীশের বাড়ী হাওড়া যাওয়ার মুখে এক ঘোড়ার গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল এবং সেই গাড়ীতে কমলা হরেন উভয়ের পিতাই ছিল। কিন্তু ক্ষিতীশ তাদের চিনতে না পারায় - কমলাকে নিয়ে তারা লক্ষ্ণৌ রওয়ানা হয়ে গেছে। প্রভাতকুমারের বর্ণনায় কমলার প্রতি ক্ষিতীশের সামান্য দুর্বলতার কথা ধরা পড়েছে কিন্তু ক্ষিতীশের সঙ্গে দাদা সম্পর্ক পাতিয়ে কমলা সেই জটিলতার সহজ সমাধান করে নিয়েছে ।

প্রভাতকুমার রচিত এই তিন পরিচ্ছেদে হরেন্দ্র-ক্ষিতীশের ভ্রান্ত পরিকল্পনার জন্যই কমলার বিড়ম্বিত ভাগ্য কাহিনী নূতন পথে মোড় ফিরেছে।

প্রভাতকুমারের রচনায় যে স্বভাবসুলভ হাস্য পরিহাস লক্ষ্য করা যায় এখানেও তা উপস্থিত । কমলার জীবনে এই গভীর দুর্যোগের মধ্যেও বহুদিন পরে হরেন কমলাকে দেখে এবং বিপদের কথা জেনেও তাকে লঘু চপল ভঙ্গিতে উদ্ভট প্রস্তাব দিয়েছে। কমলাকে সে বলেছে —' কমলি, তুই আর দেশে ফিরে কি করবি, বিলেত যা । রবিবাবুর বই পড়ে পড়ে সাহেবরা এখন খুব বাংলা শিখে ফেলেছে — বিলেত গিয়ে হিন্দু রমণীর উচ্চাদর্শ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়া — ।'১৭

বলাবাহুল্য জীবনের শত দুর্যোগের মধ্যও এই ধরণের লঘু হাস্য পরিহাস প্রভাতকুমারের রচনার বৈশিষ্ট্য।

(৭)

প্রভাতকুমারের ষষ্ঠ উপন্যাস রচনা 'মনের মানুষ' । উপন্যাসটি 'মানসী ও মর্মবাণী'তে ধারাবাহিকভাবে ফাল্গুন, ১৩২৭ থেকে শ্রাবণ, ১৩২৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল । পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১০ ই আগষ্ট, ১৯২২ সালে ।

অপরিণত বয়সের দুইটি তরুণ-তরুণীর হৃদয়ে গোপনে কি ভাবে প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল-সেই নবীন বয়সের ভাবালু প্রেম সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের অভিঘাতে কি ভাবে অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যায় এবং প্রেম সম্পর্কে তাদের জীবনের কৌতুককর ভাব, ভাবনা ও পরিণতি 'মনের মানুষ' উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় ।

নবীন বয়সের গোপন প্রেমের প্রতি জীবনদেবতার অভিশাপ ইতোপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ-শৈবলিনী, শরৎচন্দ্রের দেবদাস-পার্বতী চরিত্রে । প্রেম এদের জীবনে মিলনের রাখীবন্ধনের সূত্র ধরে তার আকাঙ্ক্ষিত পরিণতির পথে যেতে পারে নি সত্য, কিন্তু জীবনের অমূল্য সম্পদের মত অতি সঙ্গোপনে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে আপন মহত্ত্বের কথা জীবনব্যাপী প্রচার করেছে । দেবদাসের চরম উচ্ছৃঙ্খলতায় জীবনাচরণ, পার্বতীর সতীত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেও দেবদাসের প্রতি অনুরাগ– তাদের প্রেমের মহত্ত্বকে ঘোষণা করেছে । কিন্তু প্রভাতকুমারের দৃষ্টিতে নবীন বয়সের প্রেম একটি পারস্পরিক আকর্ষণ, অপরিচিতের প্রতি কৌতূহল মাত্র । অল্পবয়সের এই আকর্ষণ ছেলেখেলায় পর্যবসিত হয়েছে ।

কাহিনীর নায়ক কুঞ্জলাল, গরীবের ছেলে । অতিকষ্টে খুড়ার অর্থ-সাহায্যে কলিকাতায় মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়নকালে সেই স্কুলের প্রফেসর ডাঃ ক্ষেত্রমোহন সরকারের বাড়ীতে যাতায়াতসূত্রে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা পনেরো বৎসর বয়স্কা ইন্দুবালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে । এই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে 'একটু প্রণয়' এ পরিনত হয় । কিন্তু প্রণয়ের ব্যাপার অতি গোপনে সংঘটিত হয়েছিল। দুজনের মধ্যে এ ব্যাপারে মুখে মুখে বিশেষ কথাবার্তার সময় ও সুযোগ হতো না তাই উভয়ের বক্তব্য চিঠিতে লিখে আপন আপন হৃদয়ের কথা উভয়ের নিকট ব্যক্ত করেছে । প্রেমিক কুঞ্জলাল তার মেসের বাসায় বসে বেশ দীর্ঘাকৃতির প্রেম পত্র রচনা করতো এবং ইন্দুবালাও সাধ্যানুসারে ইংরাজী বাংলা নানা উপন্যাস ঘেটে সেই পত্রের উপযুক্ত জবাব দিত । পত্রযোগেই তাদের প্রেম এমন একটি পর্যায়ে উপস্থিত হয় যেখানে উভয়ে 'স্থির করিয়াছিল, পরস্পরকে না পাইলে তাহারা কেহই বাঁচিবেনা, যদি উভয়ের মিলন হয় ত উত্তম, । যদি পিতামাতার দুর্লঙ্ঘ্য বাধাবশতঃ ইহলোকে তাহাদের মিলন

না হয়, তবে তাহারা কুমার ও কুমারী ব্রত ধারণ করিয়া পরলোকে মিলনাশায় ইহজীবন যাপন করিবে।' ১৮ নবীন প্রণয়ীযুগলের এই সুউচ্চ আদর্শবাদীতা জীবনে রক্ষিত হয়নি বরং দেখা যায় অভিভাবকের সামান্য একটু আপত্তিতেই উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং সব পারস্পরিক প্রণয়-চিন্তা ভুলে গিয়ে জীবনে মিলনের অন্যপথে ধাবিত হয়েছে।

পরীক্ষায় পাশ করার পর কুঞ্জলাল ডা: সরকারের কাছে ইন্দুবালার পাণি প্রার্থনা করাতে তিনি বিস্ময়ে হতবাক। ডা: সরকার বিলাৎ ফেরৎ এবং সমাজের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। এমতাবস্থায় মেয়ে ইন্দুকে কুঞ্জলালের মত গরীব নেটিভ ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে দিতে স্বীকৃত হননি। গৃহিনীও ইন্দুবালার সঙ্গে কুঞ্জলালের একটি বারের জন্য সাক্ষাৎ করার প্রার্থনা না-মঞ্জুর করায় সে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে। অবশ্য ডাক্তার গৃহিনী-এ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে কুঞ্জলাল যদি বিলাত গিয়ে ডাক্তারী পাশ করে আসতে পারে তবে বিয়েতে তাদের কোন আপত্তি নাই। কুঞ্জলালের আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় সে গ্রামের বাড়ীতে ফিরে সাধারণভাবে ডাক্তারী ব্যবসা শুরু করেছে।

গ্রামে আসার পর প্রথম প্রথম ইন্দুবালাকে সে কয়েকটি চিঠি লিখেছিল কিন্তু কোন উত্তর পায় নাই। ওষধ কেনার জন্য মাঝে মাঝে তাকে কলকাতায় থেকে যেতে হত, সেই সময়ে ডা: সরকারের খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করতো। কালক্রমে সে চেষ্টাও বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামের বাড়ীতে তার বিধবা জ্যেঠাইমা এবং জ্যেঠাইমার মৃতা বোনের সহায়সম্বলহীনা মেয়ে কিরণ - এই নিয়ে তার সংসার। এর পর চার বৎসর অতীত হয়েছে। কুঞ্জর মন থেকে ইন্দুবালা প্রায় বিদায় নিয়েছে। এমন সময় একদিন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্যোতিষীর কাছে নিজের ভাগ্য গননা করাতে গিয়ে যখন শোনে ইন্দুর আশা তার ত্যাগ করা উচিত নয় তখনই আবার ইন্দুকে ফিরে পাওয়ার আশা তার মনে প্রবল হয়ে ওঠে। ইন্দুর প্রেম সম্পর্কে নানা কল্পনার জাল মনে মনে বুনেছে — ইন্দু যেমন তারই আশায় অপেক্ষা করে করে আজ শীর্ণকায়, রোগশয্যায় মৃত্যুপথযাত্রী হয়েছে। নানা উদ্ভট কল্পনায় ভরপুর মন নিয়ে সে সেইদিনই ডা: সরকারের বাসায় হাজির হয়েছে — কিন্তু সেখানে ডা: সরকারের উদাসীন অভ্যর্থনা এবং ইন্দুর উপেক্ষা ছাড়া তার কপালে কিছুই জোটেনি। বরং ব্যারিষ্টার সিন্হার সঙ্গে ইন্দুকে দেখে তার মন সংশয়ের দোলায় দুলেছে এবং ইন্দুর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত সংশয়ের মীমাংসা করতে চেয়েছে, কিন্তু উপায় নাই দেখে মনে মনে অস্থির হয়ে পড়েছে।

এদিকে কুঞ্জর জ্যেঠাইমা কিরণের সঙ্গে কুঞ্জর বিয়ে দেওয়ার গোপন ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করেন এবং কুঞ্জকে একবার সে প্রস্তাবটি করেছিলেন তিনি সুকৌশলে একবার কিরণকে কুঞ্জর সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন - এবং তার ফল ভালই ফলেছে। কিরণের সঙ্গে কয়েকদিন একত্রে থাকায়, কিরণের যত্ন এবং গিন্নিপনায় কুঞ্জ একটু মুগ্ধ হয়েছে। ক্রমে ইন্দু এবং কিরণের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত ভাল সেই বিচারে লিপ্ত হয়ে মনে করেছে — ইন্দু হয়ত চার বৎসর আগেকার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, হয়ত বা ছেলেবেলাকার ছেলেখেলা ভেবে সে এখন অবজ্ঞার হাসি হাসে।' তাই যদি হয়, তবে আর মিছামিছি আলেয়ার পিছনে ছুটাছুটি কেন? তার চেয়ে জ্যেঠাইমার প্রস্তাবটা একটু ভাবিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। কিন্তু একটা বিষয়ে মনে খটকা হয়, আমার ত উহাকে বেশ ভালই লাগিতেছে — কিন্তু আমাকে কি উহার তেমন লাগিবে? বয়সে যে অনেক তফাৎ। কোথায় ১১ কোথায় ২৫।" ১১ কিরণের প্রতি তার মন যখন একটু আকৃষ্ট হয়েছে হঠাৎ একদিন বটানিক্যাল গার্ডেনে ইন্দুবালার সঙ্গে কিরণ সহ কুঞ্জের দেখা। কুঞ্জ অস্বোয়াস্তি বোধ করেছে — এদিকে ইন্দু কিরণবালার কাছ থেকে কুঞ্জ সম্পর্কে খবরাখবর শুনে বুঝতে পেরেছে কুঞ্জই কিরণবালার ভাবী বর। এরপর কুঞ্জের সঙ্গে ইন্দুর ব্যবহার কিছুটা হেঁয়ালিপূর্ণ হয়ে উঠেছে — ইন্দুর ব্যবহারে আন্তরিকতার অভাব নেই অথচ 'দুই নৌকায় পা দিওনা বলে শাসনও করেছে। এরপর কুঞ্জর মনে এসেছে দ্বিধা, কিরণকে তার ভাল লেগছে অথচ ইন্দুবালাকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেছে না এই প্রকার এক মানসিক দ্বন্দ্বের মুহূর্তে তথাকথিত দৈব উপায়ে সমস্যার সমাধানকারী আলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন নিগমানন্দ স্বামীজির ঔষধ সেবনে তিনদিন অচৈতন্য অবস্থায় থাকার পর ডা: সরকারের চিকিৎসা এবং কিরণের সেবাযত্নে আরোগ্যলাভ করে। কিছুদিন পর সংবাদপত্রে ইন্দুবালার বিয়ের খবর জানতে পেরে নিজে কিরণকে বিয়ে করে সব সমস্যার সমাধান ঘটিয়েছে।

প্রভাতকুমারের 'প্রণয়-পরিনাম' গল্পে কৈশোর-প্রেমের এক কৌতুককর পরিণতি এঁকেছেন, এখানে কুঞ্জ চরিত্রের মধ্যেও দেখি তরুণ বয়সের প্রেমের উত্তাল ভাবাবেগ এবং হাস্যকর বিসদৃশ পরিণতি, প্রকৃতপক্ষে প্রভাতকুমারের দৃষ্টি তরুণ-তরুণীর পারস্পরিক আকর্ষণকে প্রেমের আখ্যায় ভূষিত করতে চায়নি, এ যেন নিছক অজানার প্রতি স্বাভাবিক কৌতূহল। অপরিণত বয়স্কের জীবনের কল্পনাবিলাসিতা মাত্র। কুঞ্জর প্রেমে কোন দৃঢ়তা নাই, নাই কোন গভীর মহত্ত্ববোধ। প্রেম সম্পর্কে এক লঘু-তরল দৃষ্টি তাকে ইন্দুবালার অভিভাবকের সামান্য আপত্তি উত্থাপনেই দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

অথচ ইন্দুকে পাবার সত্যকারের প্রাণের তাগিদ থাকলে তার পক্ষে কষ্ট স্বীকার করে বিলাত যাওয়া অন্তত্পক্ষে নিজেকে ইন্দুর উপযুক্ত করে গড়ে তোলায় সে সচেষ্ট হত। পক্ষান্তরে উপন্যাসের নায়িকার অনুসরণে ইন্দুবালাকে চিন্তা করে সে দিবাস্বপ্ন দেখেছে মাত্র। ইন্দুবালার মনের কথা জানবার জন্য তার স্বামীজির অলৌকিক ক্ষমতার উপর বিশ্বাস স্থাপন অথবা জ্যোতিষীদের কথায় তার কৈশোর প্রেমের স্মৃতিজাগরণ ইত্যাদি আচরণ চরিত্রটির প্রেম ভাবনাকে অসংগতিপূর্ণ ও কৌতুককর করে তুলেছে। আধুনিক বিলাত ফেরৎ সমাজের সঙ্গে পরিচিত, ডাক্তারী পাশ করা একটি শিক্ষিত যুবকের পক্ষে এই ধরণের চিন্তা - ভাবনা কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

ইন্দুবালাকে কেন্দ্র করে কুঞ্জর প্রেম-চিন্তা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ইন্দুবালার প্রেমেও কোন গভীর বোধের পরিচয় অন্তত: কুঞ্জ সম্পর্কে নাই। পনেরো বৎসর বয়সে কুঞ্জর সঙ্গে পত্রমারফৎ তার যে প্রেমের পরিচয় পাই সেখানেও রয়েছে উপন্যাসের নায়িকার অনুসরণে কাল্পনিক প্রেমের ইঙ্গিত। অভিভাবকের অমতে কুঞ্জর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার চেষ্টা অথবা গ্রামে ফিরে যাবার পর কুঞ্জর সঙ্গে কোন যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা সে করেনি। ইন্দু পর্দানসীন মেয়ে নয়, সেকালের বিলাত ফেরত সমাজের একজন শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে প্রেমে আন্তরিকতা থাকলে প্রেমাস্পদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এমন কোন দু:সাধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু ইন্দুর চরিত্রে সে ধরণের কোন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে কুঞ্জ যখন তাদের বাসায় এসেছে সে না দেখার ভাণ করে সিংহ সাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। আবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে কুঞ্জর সঙ্গে কিরণকে দেখে তার যেন নারীসুলভ কৌতুহল জেগে উঠেছে। কিরণকে নিজ গৃহে নিয়ে আদর অভ্যায়ন, কুঞ্জ-কিরণের ভাবী সম্পর্ক আবিষ্কার ইত্যাদি এই কৌতুহলেরই অংশবিশেষ। তারপর কিরণকে নিয়ে কুঞ্জর সঙ্গে সাক্ষাৎ, জুতা খুলে মাদুরে বসে আন্তরিক ভাবে কুঞ্জর সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্যে একটু অভিমানের সুর, পিতার অমতে কুঞ্জর সঙ্গে সাক্ষাৎ ইত্যাদিতে মনে হয় পূর্বদিনের প্রেমের স্মৃতি হয়ত বা তার মনে জাগরূক। কিন্তু উপন্যাসে কোথাও এমন পরিচয় নাই যেখান থেকে অনুমান করা যায় সত্যই কুঞ্জর প্রতি তার আকর্ষণ আছে। বরং দেখি নৌকাডুবি থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত অসুস্থ যোগেন্দ্র-নাথের সেবা করতে গিয়ে তার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে। কুঞ্জ সম্পর্কে মনোভাবের কথা এক চিঠিতে যোগেন্দ্রনাথকে সে জানিয়েছে —

'আমার বয়োবৃদ্ধির সহিত, তাহার স্মৃতিও আমার মনে দিন দিন বিলীন হইতে লাগিল। ছেলেবেলায় সেই কথা মনে পড়িলে তাহাকে ছেলেখেলা

বলিয়াই আমার মনে হইত, নিজের সে সময়ের মূঢ়তায় হাসিই পাইত।' ১০০ ইন্দুর এই উক্তি কুঞ্জ সম্পর্কে তার প্রেমভাবনাকে উদ্ঘাটন করেছে।

নবপ্রণয়ী যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে কুঞ্জ সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তিতে তার চরিত্রের সত্যপ্রিয়তার অভাব থাকলেও মনে হয় যেন কুঞ্জ সম্পর্কে তার অতীতের মেলামেশার কথা প্রকাশিত হয়ে তার বিবাহিত জীবনে কোন সংশয় সৃষ্টি না করে, তারই পূর্ব ব্যবস্থা সে অবলম্বন করেছে। কিন্তু ছলনাময়ী এ কথা ভাবতেও সংকোচ বোধ হয়। কারণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কুঞ্জর অবর্তমানে সিংহ সাহেবের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। প্রকৃতপক্ষে ইন্দুবালার চরিত্রটিকে লেখক সার্থক এবং সম্পূর্ণ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। তার বক্তব্য এবং কার্যকলাপের মধ্যে অসঙ্গতি থাকাতে স্পষ্টভাবে তার সত্যকারের পরিচয় পাওয়া যায় না।

গ্রাম্য মেয়ে কিরণবালার চরিত্রটি বরং সুচিত্রিত। তার বয়সোচিত কৌতুহল, জ্যেঠাইমার পরামর্শে কুঞ্জকে ভাবী স্বামীজ্ঞানে সেবা যত্ন, তার সঙ্গে আচার ব্যবহার এবং কথোপকথনের মধ্যে নিষ্পাপ গ্রাম্য বালিকা-বধূর সজীব চিত্র পাই।

ডা: সরকার তদীয় গিন্নী, মণিমালা, ব্যারিষ্টার সিনহা ইত্যাদি চরিত্রগুলির মধ্যে তৎকালীন বিলাত ফেরত সমাজভুক্তদের আচার-ব্যবহার-রুচি-বিবাহ সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যা ইত্যাদির পরিচয় আছে। বোধ করি প্রভাতকুমার নারীর স্বাধীন চিন্তা এবং অবাধ মেলামেশার তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না। উপন্যাসে বিলাত ফেরত সমাজের ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা সম্পর্কে দু:খ করে ডাক্তার গৃহিনী বলেছেন —' আজকালকার মেয়েদের দেখছই ত দিদি, ধরণই আলাদা হয়েছে। আমাদের ও বয়সে যত সুখ-দু:খের কথা, যত শলা-পরামর্শ, সব মা-মাসির সঙ্গেই হত, এরা এখন হয়েছেন স্বাধীন।' ১০১ আবার মিসেস দত্ত বলেছেন —' স্বাধীন হয়ে ত সুখের সীমে নেই। আমাদের সময়ে আমাদের সমাজে মেয়ের বিয়ে ত এত শক্ত ছিল না ভাই! দিন দিন হয়ে উঠলো কি? হিন্দু সমাজের লোকেরা বলে যে মেয়ের বিয়ে দেওয়া তাদের পক্ষে ভারি কঠিন হয়ে উঠেছে। আমরা ত দেখি যে, তাদের চেয়ে আমাদের আরও কঠিন। তাদের বাড়ী বাঁধা দিয়ে হোক, জমিজমা বেচে হোক টাকাটা সংগ্রহ হলেই মনের মত পাত্র একটি জুটিয়ে নিতে পারে। আমাদের মধ্যে যাঁদের টাকার গাদা আছে, তাঁদেরও ত কত মেয়ে খুবড়ী হয়ে বসে রয়েছেন।' ১০২ তৎকালীন বিলাত ফেরৎ সমাজে যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশার সুযোগে পারস্পরিক মনের আদান প্রদানের ফলে উদ্ভূত প্রণয় সমস্যায় যে বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা হিন্দু সমাজের তুলনায় জটিলতর হয়ে উঠেছিল এখানে তার

পরিচয় আছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় প্রভাতকুমার নিজে বিলাত-ফেরত তাই সমস্যার বাস্তব উপলব্ধি তার থাকা স্বাভাবিক।

ইতঃপূর্বে নবীন সন্ন্যাসী'র আলোচনায় দেখেছি সন্ন্যাস জীবনে প্রভাতকুমারের অনিচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে — এখানেও যোগেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস জীবনের অবসান ঘটিয়েছেন ইন্দুবালার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। বলাবাহুল্য সেই বিবাহ কিছুটা প্রণয় ঘটিত।

'মনের মানুষ'এর কাহিনী সুগঠিত নয়। অনেক অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করেছে মাত্র। কুঞ্জলালের ঔষধ সেবনের পর স্বপ্নদর্শনের বিশদ বিবৃতি — (দ্বাবিংশ থেকে অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ) মূল কাহিনীর পক্ষে অপ্রয়োজনxx অপ্রয়োজনীয়। লেখকের বর্ণনা গুণের রমনীয়তায় স্বপ্নদর্শনের কাহিনীটি বেশ কৌতুককর এবং উপভোগ্য হয়েছে। কাহিনীর পক্ষে xxx অবান্তর হলেও অমূল্য দত্তের চরিত্রটি হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। xxব তার সাধু ভাষায় কথনভঙ্গি xxx বেশ কৌতুককর। রচনার দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও কাহিনীতে অবিরাম কৌতুকরসের প্রবাহ 'মনের মানুষ'কে উপভোগ্য করেছে।

(৮)

প্রভাতকুমারের সপ্তম উপন্যাস রচনা 'আরতি'। কোন সাময়িক পত্রিকায় এইটি প্রকাশিত হয়নি। ১৩৩১ সালে 'কমলিনী সাহিত্য মন্দির', ১৪৪, আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা, পুস্তকাকারে এইটি প্রকাশ করেন। আরতি' প্রভাতকুমারের সর্বাধিক প্রচারিত উপন্যাস। প্রথম সংস্করণে মুদ্রণ সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। উপন্যাসটির সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

'আরতি' ঘটনা প্রধান উপন্যাস। লক্ষ্ণৌ শহরের সম্পদশালী বিখ্যাত উকীল হরেন্দ্র লাল চট্টোপাধ্যায় এবং তদীয় পত্নী আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করলে তাঁদের সন্তানগণ আরতি - নরেন্দ্র অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। এই সুযোগে হরেন্দ্রবাবুর এক জ্ঞাতি ভাই কুচক্রী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় আরতি-নরেন্দ্র-সুরেন্দ্রর জন্ম সম্পর্কে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে অশেষ দুঃখের মধ্যে ফেলে। অবশেষে সেই কলঙ্ক মিথ্যা প্রমানিত হওয়ায় তারা সম্পত্তি ফিরে পায়। একদিকে উপন্যাসে এই কাহিনী যেমন সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে অন্যদিকে চিত্রিত হয়েছে দুশ্চরিত্র মদ্যপ স্বামী কর্তৃক অবহেলিত এবং মিথ্যা জন্ম- কলঙ্ক সূত্রে শ্বশুরালয় থেকে বিতাড়িত আরতি তার স্বামীর জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তে সেবা-যত্ন-প্রেমের দ্বারা স্বামীর হৃদয় জয় করে কিভাবে সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে-তার কাহিনী। আরতির স্বামী-প্রেম বর্ণনাই হয়ত লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল — অন্ততপক্ষে উপন্যাসের নামকরণের কথা চিন্তা করলে তাই মনে হয়। 'নবীন সন্ন্যাসী'তে দেখেছি মূল কাহিনী থেকে উপকাহিনীর প্রাধান্য, 'সত্যবালা' 'সুখের মিলন' ইত্যাদিতে এই একই কাহিনী-রচনারীতি অনুসৃত হয়েছে। 'আরতি'তেও লেখক উপকাহিনীর প্রাধান্যই দিয়েছেন।।

কাহিনী রচনায় লেখক অনেক আকস্মিক ঘটনা উপস্থাপিত করেছেন। উপন্যাসের প্রথমেই আরতি-নরেন্দ্রকে অসহায় করতে গিয়ে মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে তাদের পিতামাতার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে এবং নবম দিনেই অজ্ঞাতকুলশীল পঞ্চানন লক্ষ্ণৌ হাজির হয়ে অচিরাৎ পরম সুহৃদ এবং আত্মীয় হিসাবে আরতি - নরেন্দ্রর সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতা একটু অস্বাভাবিক বলেমনে হয়। আরতি - নরেন্দ্রর জন্ম - কলঙ্ক স্খালন করতে লেখক আরতিকে দিয়ে তার মায়ের গহনার বাক্স থেকে বহুকালের পুরাতন একখানি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়েছেন, পিতামাতার বিবাহের সাক্ষী হিসাবে অতিবৃদ্ধ অধ্যাপক দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এর সঙ্গে নরেন্দ্রর যোগাযোগও আকস্মিক। আরতির স্বামী-প্রেম প্রকাশের জন্য আহত বিনোদকেও ঘটনাচক্রে আরতির বাসস্থানেই আসতে

হয়েছে। কাহিনী বিস্তারবিশ্লেষণের জন্য এই ধরণের আকস্মিক ঘটনার প্রাচুর্য আমাদের বিশ্বাসবোধকে আহত করে।

কাহিনীর নায়ক নরেন, বয়স একুশ বৎসর, দুই তিন বার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর বাড়ীতেই বসে ছিল। পিতার প্রচুর সম্পত্তি তাই জীবিকার্জনের জন্য তাকে দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। সংসার সম্পর্কে সে অনভিজ্ঞ, কিছুটা নিরীহ প্রকৃতির। সম্পূর্ণ অপরিচিত পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে তার ব্যবহার, অবনীবাবুর সাবধানবাণী উচ্চারণ সত্ত্বেও পঞ্চাননবাবুর উপর তার আস্থা স্থাপন ইত্যাদিতে মনে হয় সে সরল প্রকৃতির যুবক। কিন্তু এই পঞ্চাননবাবুই সুকৌশলে যখন তাদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় ফেলেছে তখন সে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত কর্মতৎপর। তার আত্মসম্মানবোধ তাকে রামসদয়বাবুর বাড়ীতে অন্নদাস হয়ে থাকতে দেয়নি। আবার সামান্য কেরাণীর চাকরি করার জন্য সবার কাছে ধরণা দেওয়া, এমনকি স্নেহ যত্ন পাওয়া সত্ত্বেও রায়বাহাদুরের বাড়ীতে সে বেশীদিন থাকেনি। নিজের চেষ্টায় মোটর চালনা শিখে শেষ পর্য্যন্ত নিজে মোটর কিনে নিজস্ব আয়ে সে আরতি এবং নিজের সংসার চালনার উপায় করে নিয়েছে। নরেনের সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহশীল হৃদয়ের পরিচয় রয়েছে আরতির সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণে, অচেনা অবস্থায় বিনোদের প্রতি কর্তব্য বোধে, এমনকি যে পঞ্চাননবাবু তাদের সমস্ত দুর্ভোগের কারণ তাকেই আবার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাপনার মধ্যে। তার চরিত্রের সদ্গুণগুলির উপহার স্বরূপ শুধু যে সে সম্পত্তি ফিরে পেয়েছে তা নয়, বিলাতে পাঠিয়ে শেষ পর্য্যন্ত লেখক তাকে ইঞ্জিনিয়ার করিয়ে এনেছেন।

প্রকৃতপক্ষে নরেন চরিত্রটিকে লেখক একটি নির্দোষ আদর্শ যুবক হিসাবে চিত্রিত করেছেন। এই আদর্শকে রূপায়িত করতে ভাগ্যদেবী সদাই শত অসুবিধা সত্ত্বেও তার উপর প্রসন্ন হয়েছে এবং এই কারণেই তার জীবনের উত্থান-পতন, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য এমনকি সংগ্রামও আমাদের বাস্তববোধকে কিছুটা পীড়িত করে।

আরতি চরিত্রের মাধ্যমেও লেখক চেয়েছেন হিন্দু নারীর পতিভক্তির সুউচ্চ আদর্শকে রূপদান করতে। আরতি ধনী পিতার একমাত্র কন্যা, পনের বৎসর বয়স্কা, কলিকাতার ধনী পরিবারেই তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু আরতির স্বামী মদ্যপ এবং জঘন্য চরিত্রের। আরতি সন্তান-সম্ভাবিতা তাই পিতৃগৃহে এসেছে। এমন পরিস্থিতিতে তার পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ ঘটেছে। সহায় সম্বলহীন অবস্থায় দাদা নরেনের সঙ্গে একটু আশ্রয়ের জন্য যখন স্বামীগৃহে এসেছে তখন

স্বামী-শ্বশুড়ী উভয়েই তার উপর চরম অমানুষিক ব্যবহার করেছে। জীবনের এই অসহায় অবস্থাতেও গলবস্ত্র হয়ে স্বামীকে সে প্রনাম করে স্বামীগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। কারও বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই। আহত অবস্থায় স্বামীকে দেখে শহরের বড় ডাক্তার আনিয়েছে। মনেপ্রাণে সেবাযত্ন করে স্বামীকে সুস্থ করে তুলেছে। হয়ত এই সেবাযত্ন স্বাভাবিক মানবতাবোধ সম্পন্ন। কিন্তু স্বামী তাকে ভালবাসেনা জেনেও কোন নারীর পক্ষে স্বামীর জন্য প্রাণপাত করার মধ্যে যতখানি আদর্শবাদের কথা প্রচারিত ততখানি বাস্তববোধসম্পন্ন নয়। তাই দেখি আরতি তার স্বামীর পীড়নের কথা ভুলেছে, সতীত্বের আদর্শে মুগ্ধ বিনোদও আরতিকে বরণ করে নিয়েছে। আরতি বিনোদের এই মিলনকে অতি স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেওয়া কষ্টকর।

'আরতি' উপন্যাসে কূটকৌশলী চরিত্র পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। সুকৌশলী প্রৌঢ়বয়স্ক এই ব্যক্তিটি আরতি - নরেনের জীবনকে দুর্দশাগ্রস্থ করে তোলার মূল কারণ। মৃত হরেন্দ্রবাবুর জ্ঞাতিভাই পরিচয়ে নরেনের সংসারে প্রবেশ করে কপট স্নেহের অভিনয়ে নরেনের মনে পরমাত্মীয়ের প্রতীতি জন্মিয়ে কৌশলে সমস্ত সম্পত্তির ফিরিস্তি নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত নরেনের পিতামাতার সম্পর্ক বৈধ ছিল না অতএব তাদের সন্তানসন্ততি জারজ প্রতিপন্ন করে নিজেই হরেন্দ্রবাবুর সমস্ত সম্পত্তিদখল করেছে। শুদ্ধাচারবেশী এই কপট লোকটি সদ্য পিতৃমাতৃহারা আরতি - নরেনকে পথে বসাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু তার এই নির্মমতা সহ্য করতে না পেরে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ লেখক তাকে XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX পথের ভিখারী করেছেন। নরেনের মাতা পিতার বিবাহ, বিধবা-আইন অনুসারে সুসম্পন্ন হয়েছিল সেইটি প্রমানিত হওয়ার পর নরেন তার পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পেয়েছে। - এই বৃদ্ধটি কিছুদিন সুখভোগের পর সমস্ত সহায় সম্বল হারিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত নরেন-সুরেনের দাক্ষিন্যে আবার তার অন্নের সংস্থান হয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধের কূট স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি। তাই 'সে নিজগৃহে ও সম্পত্তিতে পুন: প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল - দেবেনা! না দেওয়া অমনি মুখের কথা কিনা? XX ব্রাহ্মণকে ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করলে, ধর্মে কি সইবে? ব্রহ্মশাপে উচ্ছন্ন যেতে হবে না!' ১০৩ পঞ্চানন এমন অকৃতজ্ঞ।

আমরা ইতঃপূর্বে এই প্রকৃতির চরিত্রাঙ্কণে প্রভাতকুমারের নিপুনতার পরিচয় পেয়েছি - নবীন সন্ন্যাসী'র গদাই 'রত্নদীপের' খগেন ইত্যাদি চরিত্রে। তবে তুলনামূলক ভাবে পঞ্চানন চরিত্রটি ততটা সুপরিস্ফুট নয়, কিন্তু জীবন্ত।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের শ্বশুর সত্যেন্দ্রবাবুর উদার-চরিত্রের মাধুর্য্য, বৃদ্ধ অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক এবং জমিদার দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, খুব মনোজ্ঞ, সুখকর এবং সুচিত্রিত।

দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রচিত্রণে লেখকের 'অলকা' গল্পের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কেদারনাথ সরকারের চরিত্রটিকে মনে করিয়ে দেয়। ঘটনা সমাবেশেও দেখি — উভয়েই হেদুয়ার তীরে সন্ধ্যাযাপনরত, কাহিনীর নায়কের সঙ্গে এখানেই তাঁদের মিলন হয়েছে। কেদারনাথের কন্যা অলকার সঙ্গে নায়কের বিয়ে হয়েছে, এখানে নরেনের সঙ্গে রায়বাহাদুরের দৌহিত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। বিশ বৎসর আগেকার 'আর্য পত্রিকায়' কেদারবাবুর বিয়ের সংবাদ পেয়েছি এখানে তেমন হরেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় এবং সরোজকুমারী দেবীর বিধবা-বিবাহ-সংবাদ বহু বৎসরের পুরাতন 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা থেকে পেয়েছি।

উপন্যাসে লেখকের বিধবা-বিবাহ-সমর্থনের সংবাদ আছে। নরেন্দ্র-আরতির মাতা সরোজকুমারী বাল বিধবা ছিলেন। 'ধর্মের কল' গল্পেও লেখক বিধবা মনোরমার বিয়ে দিয়েছেন। বোধ করি বিধবা বিশেষত: অল্প-বয়স্কা বিধবা বিবাহে প্রভাতকুমারের আপত্তি ছিল না। বিধবা বিবাহে আপত্তি না থাকলেও অসবর্ন বিবাহে লেখকের সমর্থন ছিল এমন উল্লেখ তাঁর গল্প কাহিনীতে পাওয়া যায় না।

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে লেখক উদার দৃষ্টির পরিচয় দিলেও সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। সমাজের প্রচলিত আইন সংস্কারকে তিনি কোন সময়েই আঘাত করতে চাননি। এখানে দেখি মাতাপিতার কলঙ্কের জন্য ভাগ্যহতা আরতি তার শাশুড়ী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে এবং মানবিকতার দাবি নিয়ে শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করেছে — 'বাপমায়ের কথা আমি কিছুই জানি নে মা -! কিন্তু আমায় যে আপনি ত্যাগ করবেন, আমার কি দোষ?' [১০৪] শাশুড়ী ঠাকুরাণের উত্তর — 'দোষ গুণের কথা ত হচ্ছেনা, সমাজ বলে একটা জিনিষ আছে ত, সেই সমাজকে না মেনে চলা কি আমাদের মত গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব?' [১০৫] মানবিকতার চাইতে সামাজিক সংস্কারকেই লেখক এখানে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী। হৃদয়-সত্যের বিচারে আরতি নির্দোষ, তবুও পিতামাতার কলঙ্কের জন্য অযৌক্তিক ভাবে সামাজিক বিধি নিষেধের বলি তাকে হতে হয়েছে। শাশুড়ী ঠাকুরণের উক্তির মধ্যেই নিহিত আছে সমাজের অধিকাংশের মতামত। প্রভাতকুমার অধিকাংশের এই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আঘাত দেননি বলে জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরিশ্রম বিমুখ বাঙ্গালী সত্যকারের পরিশ্রমের মূল্য যে দিতে শেখে নাই এবং কায়িক শ্রমজনিত উপার্জনের প্রতি তাদের শুধু বিমুখতা নয়, উন্নাসিকতাও আছে। ফলত: তারা যে শোচনীয় জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে সে সম্পর্কে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মোটর চালক পাঞ্জাবী যুবক অযোধ্যা সিং এর উক্তিতে —

" .... এই সব বাবুরা মনে করেন, যে ২০/২৫ টাকা মাহিনায় কেরাণীগিরি বা মাস্টারী করে, সে ভদ্রলোক, আর যে মোটর চালায়, অথবা একজন দক্ষ মিস্ত্রী বা কারিগর, অথবা একটি দোকান করিয়াছে সে মাসে ১০০ ৲ রোজগার করিলেও, ছোটলোক। বাবু আপনিও বাঙ্গালী, রাগ করিবেন না, এই জন্য ই বাঙ্গালী জাতির এত দুর্দশা — কেরাণীগিরিই তাহাদের ভরসা।' ১০৬

প্রভাতকুমারের উপন্যাসের দোষত্রুটি সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হয়, তাঁর উপন্যাসগুলি-প্রায়শই সুখপাঠ্য 'আরতি' ও তার ব্যতিক্রম নয়। এই সুখপাঠ্যতার কারণ স্বরূপ বলতে হয় বিবিধ ঘটনা সংগঠন অথবা আকস্মিকতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর বর্ণনীয় বিষয় এবং ভঙ্গী উভয়ই সহজ সরল। 'কাজকর্ম না থাকিলে, চিত্তবিনোদনের পক্ষে উপন্যাসের চেয়ে ভাল জিনিষ আর কি আছে ?' ১০৭ মনে হয় অবসরযাপন এবং আনন্দদানের জন্যই তার উপন্যাস রচনা — তত্ত্ব বা তথ্য দিয়ে তিনি আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করতে চাননি।

বাংলা উপন্যাসে প্রেম-কাহিনী উপস্থাপনায় প্রচলিত বর্ণনাভঙ্গীর প্রতি মৃদু কটাক্ষ 'আরতি'তে রয়েছে। দশম পরিচ্ছেদের শুরুতেই রায়বাহাদুরের গৃহ এবং পরিবারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন —

' প্রচলিত প্রথা অনুসারে, এই বৃদ্ধের গৃহে একটি মাতৃহীনা কন্যা বা দৌহিত্রী থাকা দরকার — যাহার বয়স বৎসর তেরো চৌদ্দ, যাহার গায়ের রং ইন্দুরের মত পরিষ্কার, যে এই বয়সেই ইংরাজী, বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের রস গ্রহণে সমর্থা, এবং যে হার্মোনিয়ম বাজাইয়া যখন তখন রবিঠাকুরের গান গাহিয়া থাকে। কিন্তু নরেন এমন দুর্ভাগা যে বৃদ্ধের সেরূপ কোন কন্যা বা দৌহিত্রী কিছুই নাই।' ১০৮ বলা বাহুল্য তিনি নিজেও প্রেম চিত্র বর্ণনায় কিছুটা এই প্রথার অনুসরণ করেছেন। এখানে নরেন্দ্রের বিয়ে হয়েছে রায়বাহাদুরের গ্রামের বাড়ীতে বসবাসকারী 'ফুটফুটে রং'এর চটপটে দৌহিত্রী বীণারাণীর সঙ্গে।

(১)

'সত্য বালা' উপন্যাসটি ফাল্গুন, ১৩২৯ থেকে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল পর্যন্ত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ইতঃপূর্বে উপন্যাসটির দুইটি পরিচ্ছেদ 'লামাকুমারী' এই নামে ১৩১৩ সালের বৈশাখ - আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সত্য বালার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩১ সালে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকামতে প্রথম সংস্করণের প্রকাশ কাল ১৬ই এপ্রিল, ১৯২৫।

উপন্যাসটির কাহিনী স্পষ্টতই দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে রয়েছে বিলাত ফেরত সমাজের স্বচ্ছলতার মধ্যে লালিতা ব্যারিষ্টার মি: ঘোষের সুন্দরী কন্যা সত্য বালা এবং কবি কিশোরীমোহন নাগের প্রেমচিত্র। সত্যবালার প্রতি আকৃষ্ট ও লুব্ধ বাঙ্গালী সিভিলিয়ান মি: মল্লিকের ঈর্ষাকাতরতার কাহিনী এবং নরহত্যার ভয়ে ভীত হয়ে কিশোরীমোহনের তিব্বতে পলায়নের বৃত্তান্ত। দ্বিতীয়াংশে কিশোরীমোহনের তিব্বতের পথে যাত্রা, তিব্বতী কন্যা নিনাকে কিশোরীর বিবাহ, পরিশেষে জ্বরবিকারে কিশোরীর মৃত্যু ও নিনার পুত্রকন্যাসহ কলিকাতায় আগমন এবং প্রেম-তপস্বিনী সত্য বালার সঙ্গে নিনার পরিচয় ও সুখকর মিলন সংবাদ।

কাহিনীর মুখ্য উপজীব্য বিষয়-সত্যবালার গভীর প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটন। সত্যবালার প্রেমের গভীরতাকে উপলব্ধি করাতে গিয়ে লেখক সমাজে আকর্ষণীয় এবং যে কোন মেয়ের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয় পাত্র সিভিলিয়ান মি: মল্লিককে এনেছেন। কিন্তু পিতামাতার ইচ্ছা এবং মল্লিকসাহেবের আকর্ষণের চেষ্টা সত্ত্বেও সত্যবালা তার প্রেমে অচল অনড় থেকে কিশোরীকেই চেয়েছে। সত্যবালার এই প্রেম চিত্রণ করতে লেখক কিশোরীর তিব্বত যাত্রাপথের যে সুদীর্ঘ বর্ণনা, নিনার অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় অথবা নিনা কিশোরীর বিবাহ বর্ণনার চিত্র এঁকেছেন মূল কাহিনীর সঙ্গে সে সমস্তের যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। বরং লেখকের সুযোগ ছিল সত্যবালা কিশোরী এবং মি: মল্লিকের মধ্যে একটি ত্রিভুজ প্রেমচিত্র অঙ্কণের। সত্যবালাকে কেন্দ্র করে এদের সূক্ষ্ম প্রেম এবং ঈর্ষানুভূতির পরিচয়ের মাধ্যমে সত্যবালার প্রেমের সত্য কারের পরিচয় প্রদানে কাহিনীকে আকর্ষণীয় করার সুযোগ লেখক উপেক্ষা করেছেন।

কাহিনীর নায়ক কিশোরী। সে কবি, এবং তার মনের গোপন বাসনা বিলাত ফেরৎ সমাজে একটু মেলামেশা করা। বন্ধু হেমের তদারকিতে সে বিলাতী পোষাক পরে বিলাতী আদপ - কায়দা রপ্ত করতে সচেষ্ট হয়েছে এবং হেমচন্দ্র মারফৎ সে বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার মি: ঘোষের পরিবার তথা সত্যবালার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। বিলাতী আদপ - কায়দায় অপটু এই

কিশোরী কিন্তু দার্জিলিং ভ্রমনে গিয়ে সত্যবালার কবিতা রসিক মনটিকে আবিষ্কার করে, উভয়ে নিভৃত কাব্যালোচনায় ব্যাপৃত হয়ে অল্পদিনের অবসরেই প্রেমে পড়েছে । সত্যবালার প্রতি কিশোরীর আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল এবং অনুরাগও অকৃত্রিম, তার পরিচয় রয়েছে সত্যবালার দেখা পাওয়ার আকুল প্রতীক্ষায়, মল্লিক সাহেবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণতায় এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টায় । মল্লিক সাহেব অথবা ঘোষ পরিবারকৃত অপমান সে নি:শব্দে সহ্য করেছে অনেকাংশে সত্যবালার মুখ চেয়ে। সত্যবালার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য সবকিছুই নির্দ্ধারিত, এমনকি তিন আইনের সাহায্যে বিয়ের নোটীশ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এমন সময় গভীর রাত্রে সত্যবালার সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়ে মল্লিক সাহেবের ভৃত্য মংলুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিজের প্রাণের দায়ে তাকে গভীর খাদে ফেলে দেওয়াতে গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে সেই রাত্রেই আত্মগোপন করেছে ।

গ্রেপ্তারের ভয়ে তিব্বতে আত্মগোপনের পর সত্যবালা সম্পর্কে তার নিষ্ক্রিয়তা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় । কিশোরীর প্রেমে যদি বিন্দুমাত্র গভীরতা থাকতো তবে তার পক্ষে নিনার সান্নিধ্যে এসে সহজেই আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না । যে সত্যবালা তার জন্য আপন গৃহে অপমানিত, এত লাঞ্ছিতা হয়েছে সেই সত্যবালার প্রেমের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধে অন্তত: সে নিনাকে বিয়ে করার পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকতে পারতো । কিন্তু কিশোরী সত্যবালাকে ফিরে পাওয়ার কোন চেষ্টাই করেনি । বরং মনে হয় সে নিনার সান্নিধ্যে অচিরেই তার রূপযৌবন এবং অফুরন্ত ধনভাণ্ডারের প্রতি লুব্ধ হয়েছে। কিন্তু লেখক তার চরিত্রে সে ধরণের কোনলুব্ধতার পরিচয় দেন নাই। নিনাকে যে সত্যই সে ভালবেসেছে এমন পরিচয়ও নাই বরং তাকে বলতে শুনি —' নিনা কি আমায় ভালবাসিতেছে ? কিন্তু উহার সে ভালবাসা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে। আমি যে উহাকে ভালবাসিতে পারিবনা — আমি যে অন্যের !" অতএব দেখা যায় যে নিনাকে সে ভালবাসেনি তাকেই সে বিয়ে করেছে এবং যে সত্যবালা তার জন্য এতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছে তার প্রতি সে অকৃতজ্ঞ হয়েছে । চিন্তা এবং কাজের এই ধরণের বৈপরীত্য কিশোরীর চরিত্রটিকে কিছুটা অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য করে তুলেছে । প্রকৃতপক্ষে লেখক প্রেমিক কিশোরীর সার্থক রূপদানে ব্যর্থ হয়েছেন । তার চরিত্রের পূর্বাপর বিকাশ কার্য্য কারণ সম্পর্কায়িত হয়ে বিকশিত হয়নি ।

নায়িকা সত্যবালার চরিত্রটি আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। তার প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং কিশোরীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমের মহিমায় আমরা মুগ্ধ। ধনীর ঘরের দুলালী, বিলাত ফেরত অভিজাত্যপূর্ণ সমাজে প্রতিপালিত হয়েও সে ভাল-

বেসেছে সাধারণ অবস্থার কবি কিশোরীকে । প্রেমের মূল তার প্রাণের গভীরে তাই অতি সহজেই উপেক্ষা করেছে লোভনীয় সিভিলিয়ান পাত্র মি: মল্লিককে। এমনকি তার স্বাধীন ব্যক্তিত্বে হস্তক্ষেপের জন্য মি: মল্লিকের ব্যবহারকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করতে দ্বিধাবোধ করেনি । অভিভাবকের রক্তচক্ষু এবং নিপীড়ন কিশোরীর চিন্তা থেকে তাকে বিচ্যুত করতে পারেনি । কিশোরীর আত্মগোপনের পর সে তারই জন্য অপেক্ষা করেছে এবং আজীবন কুমারী থেকে তার প্রেমের প্রদীপটিকে প্রজ্বলিত রেখেছে ।

সত্যবালার প্রেমের উত্তুঙ্গ শিখরের পাদদেশে প্রবাহিত হয়েছে নিনার ধীরে প্রবাহিনী প্রেমের মন্দাকিনী । এই তিব্বতী রূপসী আপন মনেই পিতৃপরিত্যক্ত মঠে নি:সঙ্গ জীবন যাপন করছিল । ভগবান বুদ্ধে বিশ্বাসী , সেবাপরায়ণা এই মহিলাটির কোমল হৃদয় সহজেই বিগলিত হয়েছে অসুস্থ কিশোরীকে দেখে । তার আন্তরিক সেবা যত্নের মধ্য দিয়ে, ক্রমাগত কিশোরীর সান্নিধ্যে তার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে । কিশোরীর প্রতি তার প্রেম সহজ সরল আন্তরিক । প্রেমের ব্যাপারে তার মধ্যে কোন কুটিল প্রশ্ন নাই -- কিশোরীর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমনের ইচ্ছা প্রকাশ অথবা কম্বল ক্রয়ের জন্য তার কাছ থেকে টাকা নেওয়া ইত্যাদি ব্যবহারে তার চরিত্রের সরলতা পরিস্ফুট। হৃদয়ের সহজ বিশ্বাসেই সে তার পৈতৃক ধন সম্পত্তি বিদেশী কিশোরীকে দেখিয়েছে । কিশোরীকে তার ভাল লেগেছে -- তাই নানা অজুহাতে তাকে সে ছাড়েনি। শেষ পর্যন্ত কিশোরী তাকে বিয়ে করেছে, দীর্ঘ কুড়িটি বৎসর স্বামীর সংসার করার পর কিশোরীর মৃত্যুকালীন অনুরোধের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনার্থে সে কলিকাতায় এসে সত্যবালাকে অনুসন্ধান করে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে । নিনার প্রেম এবং স্বামীভক্তি উভয়ই নিখাদ ।

উপন্যাসের মি: মল্লিকের চরিত্রটি পরাধীন ভারতবর্ষের অধিকাংশ বাঙ্গালী সিভিলিয়ানদের বিকৃত মানসিকতার পরিচয় বহন করছে । মি: মল্লিক উচ্চপদাধিকারী তাই 'বেঙ্গলী পয়েট' কিশোরীর প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত সৌজন্যের প্রকাশ অথচ হেমচন্দ্রের কাকা যেহেতু ডিস্ট্রিক্ট জজ তাই তার সঙ্গে ব্যবহার সম্ভ্রমপূর্ণ। উচ্চপদাধিকারী তাই অত্যন্ত আত্মসচেতন অথচ ব্যক্তিত্বহীন । সত্যবালা কিশোরীর প্রতি আকৃষ্ট জেনেও তাকে বিবাহের আশায় যে ভাবে সত্যবালার পেছন পেছন ঘুরেছে তাতে তাকে হীনচরিত্রের বলে মনে হয় । তবে চরিত্রচিত্রণ বেশ জীবন্ত এবং বাস্তব । শ্রদ্ধেয় সনৎ কুমার গুপ্ত জানিয়েছেন এই চরিত্রটি অঙ্কণের প্রেরণায় ছিল তৎকালীন এক বদ-মেজাজী বাঙ্গালী সিভিলিয়ান । 'এই ব্যক্তি তাঁর অব্যবস্থিত স্বভাবের জন্য জীবনে শান্তি পান নাই । তাঁর প্রাত: স্মরণীয় দানবীর পিতাও তাঁকে

কোন সম্পত্তি দেন নি। প্রথম জীবনে এক বিদুষী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে বিবাহের সূচনায় আশাহত হন।১০৯ উপন্যাসের মি: মল্লিকের চরিত্রও অনেকাংশে অনুরূপ।

ইত:পূর্বে 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসে দেখেছি স্ত্রী জীবিত থাকতেও পুরুষের পুনরায় বিবাহ তিনি সমর্থন করেছেন, এখানেও অনুরূপ মতের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বিলাত ফেরত, প্রভাতকুমার কিছুদিন দার্জিলিং সহরে 'লুইস জুবিলী স্যানিটোরিয়মে' থেকে কোর্টে ওকালতি করেছিলেন। দার্জিলিং সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকায় উপন্যাসে এখানকার মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যায়। তিব্বতের পথের বর্ণনায়, বোধি- লেখক শরৎচন্দ্র দাস প্রণীত' লাসা ও মধ্যতিব্বত ভ্রমন' গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন কারণ উপন্যাসে এই বইখানির উল্লেখ আছে।

'সত্যবালা' উপন্যাস হিসাবে হয়ত সর্বাঙ্গসুন্দর নয় এবং প্রভাতকুমারের উপন্যাস-শিল্প-পারদর্শিতার কোন উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে না। কিন্তু রচনার সুখপাঠ্যতা অস্বীকার করা যায় না।

(১০)

'প্রতিমা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩৫ সালে। আকৃতির দিক থেকে উপন্যাস হলেও প্রকৃতির বিচারে অনেকাংশে বড়গল্প বলাই বোধকরি শ্রেয়। কাহিনীর ব্যাপ্তি অথবা চরিত্র চিত্রণের গভীরতা উভয়ই এখানে অনুপস্থিত। আধুনিককালের শিক্ষিত নারীর জীবন-ভাবনা নায়িকাচরিত্রে আরোপিত হয়ে কাহিনীতে সামান্য অভিনবত্ব আনলেও ঘটনা পরিবেশে অবিশ্বাস্যতা মিশে থাকায় কাহিনীরস তেমন ভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেনি।

কলকাতার মেসার্স ক্লড এন্ড ব্ল্যাকওয়েল কোম্পানীর কেরাণী জীবী কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সতেরো বৎসরের সুন্দরী মেয়ে প্রতিমা প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করায় কেদারবাবু বাড়ীতে প্রীতিভোজের আয়োজন করেছেন। সেখানে প্রতিমার বিয়ের কথাও উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু পাত্রপক্ষের দাবী মেটাতে অক্ষম কেদারবাবু শেষপর্যন্ত মেয়েকে বেথুনে ভর্তি করে দিয়েছেন এবং মেয়ের বাড়ী থেকে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য তাকে কলেজ

হোস্টেলেই রেখেছেন। প্রতিমা যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে তখন হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে উপর্যুপরি তার পিতা এবং মাতা একইদিনে পরলোক-গমন করলে অসহায় প্রতিমা কেদারবাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয় ভৈরব চক্রবর্তীর গৃহে স্থান পায়। প্রতিমাররূপেগুণে মুগ্ধ ভৈরববাবু বিলাতে উচ্চশিক্ষালাভার্থে প্রবাসী কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিমার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। প্রতিমার ফটোগ্রাফদর্শনে সুরেন্দ্রনাথ প্রতিমাকে মনে মনে বধূরূপে বরণ করে এবং প্রতিমাও সুরেন্দ্রনাথের ফটোদর্শনেই স্বামীত্বে বরণ করেছে। কিন্তু গোলযোগ দেখা দিল যখন গৃহেবসবাসকারী ভৈরববাবুর বিপত্নীকপুত্র খগেন প্রতিমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইল। বিবাগী পুত্রকে বসে আনার জন্য ভৈরববাবু এবং তাঁর স্ত্রী, প্রতিমাকে এই বিয়েতে সম্মত হতে অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রতিমা নারাজ। খগেন্দ্রর অত্যাচারের ভয়ে শেষপর্যন্ত প্রতিমা ভৈরববাবুর আশ্রয় ত্যাগ করে বোর্ডিংয়েথেকে পড়াশুনা শুরু করে। কিন্তু খগেন্দ্র সুকৌশলে একদিন মিথ্যা কথায় প্রতিমাকে বাড়ী আনবার অজুহাতে এক বাগানবাড়ীতে উপস্থিত করে। সেখানে তাকে বিয়ের প্রস্তাবও করে, কিন্তু প্রতিমা সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে অসম্মত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ভৈরববাবুর আশ্রয়ও তাকে হারাতে হয়। এরপর প্রতিমা আশ্রয় পেয়েছে তার কলেজের এক বান্ধবী শোভনার গৃহে। শোভনার দাদাও বিলাত প্রবাসী। শোভনার সহায়তায় এবং তার দাদার মারফৎ প্রতিমা সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সুরেন্দ্রনাথ প্রতিমার প্রকৃত অবস্থা জানতে পেরে ছলনা করে বিলাতে এক মেমকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে ভৈরববাবুকে পত্রমারফৎ জানালে কুলমান রক্ষার্থে ভৈরববাবু প্রতিমাকে সাদরে গৃহে নিয়ে আসেন এবং যথাসময়ে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে দেন। মনের দুঃখে খগেন বর্ম্মায় চলে যায়।

কাহিনীতে দুর্ভাগ্য এবং সৌভাগ্য উভয়ই অযাচিতভাবে নেমে এসেছে। প্রতিমার মাতাপিতার মৃত্যু যেমন আকস্মিক তেমনি আকস্মিকভাবেই প্রতিমার মৃত পিতার কর্মস্থল থেকে তার অর্থপ্রাপ্তি ঘটেছে। দুশ্চরিত্র খগেন একাকী বাগান-বাড়ীতে প্রতিমাকে পেয়েও কেন যে মহৎ উদারতায় তার প্রতি সম্ভ্রমশীল হয়ে উঠেছে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

সুরেন্দ্রর ফটো দেখেই তাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করা, মিঃ কুন্ডের সঙ্গে প্রতিমার করমর্দণ অথবা নিজ প্রেমাস্পদের কথা তাকে অকপটে জানান ইত্যাদি ব্যবহারে প্রতিমার চরিত্রে অতিমাত্রায় আধুনিকতা প্রকটিত এবং কিয়দংশে অবিশ্বাস্যও বটে। এছাড়া প্রীতিভোজ সভায় দেখি প্রতিমা ব্রাহ্মণ বংশজাত

হয়েও তার কায়স্থ পিতৃবন্ধুর পদধূলি গ্রহণ করেছে। এব্যাপারে প্রতিমার বাবা কেদারবাবু বলেছেন —" নাও নাও মা, ওঁরও পায়ের ধুলো নাও! হলেই বা কায়েথ, পিতৃবন্ধু যে — পিতৃতুল্য আপনারা সকলেই।'১১০ সে যুগে এতখানি উদারতা দুর্লভ বলেই মনে হয়।

প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিমার চরিত্রের একনিষ্ঠতা এবং শিক্ষিতা নারীর স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের ইচ্ছা উপন্যাসের কাহিনী অংশে একটু চমক সৃষ্টি করলেও সামগ্রিক ভাবে উপন্যাসটি পাঠক মনে তেমন কোন রেখাপাত করে না।

(১১)

'সুখের মিলন' উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৩৩৪ সাল। প্রকাশক ইস্টার্ন ল হাউস'। ইতিপূর্বে প্রভাতকুমারের 'চোখে চোখে' নামক একখানি উপন্যাস ইস্টার্ন ল হাউস প্রকাশ করবেন বলে বিজ্ঞাপিত করেছিলেন সেই উপন্যাসটি পরিবর্তিত নাম 'সুখের মিলন' নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এছাড়াও উপন্যাসটির রচনায় যে বিদেশী লেখকের ছায়াপাত ঘটেছে, ভূমিকায় লেখক সেকথা অকপটে স্বীকার করেছেন।

'আমার প্রণীত 'চোখে চোখে' নামক একখানি উপন্যাস, ইস্টার্ন ল হাউস প্রকাশ করবেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন — ইহাই সেই উপন্যাস, নামটুকু মাত্র পরিবর্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ফাঁদ রচনার কৌশলটি বিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাস লেখক ফার্গাস হিউমের একটি গল্প হইতে আমি গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।'১১১

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩৩৪।

উপন্যাসটি স্পষ্টতই দুইটি কাহিনী অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে এদেশীয় খ্রীষ্টান, চক্রবর্তী সাহেবের তরুণী কন্যা বেলা এবং বৃদ্ধ হ্যারি বনার্জীর প্রেম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বৃদ্ধ হ্যারি সাহেবের অগাধ সম্পত্তিতে আকৃষ্ট হয়ে রূপ যৌবন সম্পন্না বেলা জনৈক খোসলা নামক যুবকের প্রেমপাশে আবদ্ধ

হলেও সম্পত্তির লোভে হ্যারি সাহেবের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাকে শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করেছে। কিন্তু হ্যারি সাহেব এই গুপ্ত প্রণয়ের স্বরূপ আবিষ্কার করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। প্রেম-প্রতারিত হ্যারি সাহেব তার আক্রোশ মেটাতে শেষ পর্য্যন্ত বেলা-খোসলাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত হয়েছে হ্যারি সাহেবের হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ভাগনে শান্তি এবং প্রতিবেশী ঊষার প্রণয় এবং মিলন কাহিনী।

উপন্যাসের অধিকাংশে শান্তি-ঊষার প্রণয় কাহিনী বর্ণিত হলেও সে বর্ণনায় কোন বিশেষত্ব বিশেষ নাই, বরং বেলা এবং খোসলার প্রেম-কাহিনী অধিক আকর্ষণীয়। বিয়ের পর ঊষার যে চিত্র পাই সেখানে লেখকের হিন্দু গৃহবধূর আদর্শ অত্যন্ত প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। 'শাশুড়ী পছন্দ করিবেন না বলিয়া, ঊষা তাহার মেম-সাহেবিয়ানা পনেরো আনাই পরিত্যাগ করিয়াছে। ইংরেজী কথাও কয় না, টেবিলে আহারও করে না, তবে স্বামীর সঙ্গে থিয়েটারে বা সার্কাসে যাইতে হইলে জুতা মোজা পরে বটে, এবং পিয়ানো বাজাইয়া গানও করে। আধুনিক রুচির গান শ্বশ্রূঠাকুরাণী ভাল বুঝিতে পারেন না বলিয়া, ঊষাকে রামপ্রসাদী এবং ঠাকুরদেবতার অন্যান্য গানও শিখিতে হইয়াছে।' [১১২] প্রাক্ বিবাহ জীবনে অনেকাংশে হিন্দু সংস্কার বর্জিত ঊষার এই পরিবর্তন খুব স্বাভাবিক বোধ হয় না, উপরন্তু শান্তি - ঊষার প্রেমপর্ব মোটেই সুচিত্রিত নয়।

বেলা-খোসলার প্রেমচিত্রণ কিছুটা আকর্ষণীয় হলেও বেলার প্রতারক প্রবৃত্তির নীচতায় মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। নিতান্ত সম্পদের লোভে নিজেকে হ্যারি সাহেবের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতেও যার বাঁধেনি তাকে ঠিক সুস্থ রুচিসম্পন্না বলে মনে করা কষ্টকর। তাই খোসলার সঙ্গে তার প্রেমে কৃত্রিমতা আছে বলে মনে হয়। এই সম্পদলোভী প্রণয়ীযুগল শেষ পর্য্যন্ত হ্যারির কূটজালে পা দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। লেখক যেন চরিত্র-দুটির মাধ্যমে পাপের উপযুক্ত শাস্তি বিধানই এখানে করেছেন। অবশ্যই এ ধরণের শাস্তিবিধান প্রভাতসাহিত্যে ব্যতিক্রম।

উপন্যাসে হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে হ্যারি বনার্জির চরিত্রকে অধিকতর আকর্ষণীয় বলা যায়। রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও খ্রীষ্টান কন্যাকে ভালবেসে যৌবনে তিনি ধর্মত্যাগ করেও তাকে বিয়ে করেছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চাকুরী সূত্রে বর্ম্মায়

গিয়েছেন, প্রভূত অর্থ উপার্জন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কৃত কর্মের জন্য তিনি ত্যাজ্য পুত্র হয়েছেন কিন্তু নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন। আবার বেলা কর্তৃক প্রতারিত হলে তিনি তাকে কঠোর শাস্তিদানও করেছেন। তার মানসিক দৃঢ়তা বরং কিছুটা আকর্ষণীয়। মৃত্যুর পর উইল করে নিজ দরিদ্র ভাগ্নে শান্তিকে সম্পত্তি দান, এবং আয়া রোজিনাকে অর্থসাহায্য তার উদার হৃদয়ের পরিচয় বহন করে। রোজিনার চরিত্রটিও বেশ স্বাভাবিক এবং প্রাণবন্ত।

কাহিনী অংশে একমাত্র হ্যারি সাহেবের হীরকখন্ড অধিকরণ জনিত পাঠকের ঔৎসুক্য সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অন্যান্য অংশে সাধারণ প্রেমকাহিনী বর্ণিত। তৎকালীন দেশীয় খ্রীশ্চিয়ান সমাজের কুরুচিকর প্রবৃত্তির পরিচয় উপন্যাসে রয়েছে — বেলা চরিত্রের নীচতায়, হ্যারি বনার্জির প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর আয়া রোজিনার সঙ্গে অবাধ মেলামেশায়। অর্থলোলুপতার জন্য বেলার পিতা বেলাকে বৃদ্ধ হ্যারি সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দিতেও আপত্তি করেন নি। দেশীয় খ্রীশ্চানদের এই ধরণের মনোভাব ইতিপূর্বে লেখক 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসের পল সাহেবের চরিত্রেও অংকন করেছেন।

রূপকথা উপন্যাসটি প্রভাত প্রতিভার কোন নূতনতর ইঙ্গিত বহন করে না।

(১২)

'সতীর পতি' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে 'মাসিক বসুমতী'তে, বৈশাখ ১৩৩৩ থেকে ভাদ্র, ১৩৩৫ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল ।

অভিনয় কলায় দক্ষ এক গ্রাম্য যুবক কলিকাতা সহরে চাকুরীর সন্ধানে এসে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গাহাঙ্গামার কবলিত হয়ে কি ভাবে একজন রঙ্গালয়ের সুন্দরী অভিনেত্রীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে তার কৃতজ্ঞতাভাজন এবং প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে নিজ স্ত্রী কন্যাকে ভুলে বিপথে গমন করেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত তারই একবন্ধুর সহায়তায় ও অভিনেত্রীর মহৎ উদারতায় কিভাবে সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারই কাহিনী 'সতীর পতি'তে বিধৃত হয়েছে ।

উপন্যাসের নামকরণের দিক থেকে চিন্তা করলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কোন সতী সাধ্বী স্ত্রীর পতিপ্রেম বর্ণনাই হয়ত উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় । কিন্তু উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে রঙ্গালয়ের বহুভোগ্যা নটীর জীবনে সত্যকারের প্রেমানুভূতির জাগরণ এবং শেষপর্য্যন্ত প্রেমাস্পদের মঙ্গলার্থে মিথ্যা ছলনায় নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে রোগভোগের পর মৃত্যুবরণ। সে মৃত্যুকালে তার কষ্টোপার্জিত সমস্ত সম্পত্তি প্রেমাস্পদকে দান করে তাকেই সুখী করতে চেয়েছে । এই মৃত্যুবরণ, নামান্তরে আত্মহননের মধ্যে দিয়ে সে তার জীবনের প্রেমের জয়গানই গেয়েছে । উপন্যাসে সতীত্বের বর্ণনা যে নাই এমন নয় — সতীসাধ্বী সুরবালা তার বিপথগামী স্বামী হীরালালকে ফিরে পেয়েছে ঠিকই কিন্তু তার ফিরে পাওয়ার পিছনে অভিনেত্রীর উদারতা-দাক্ষিণ্য যতখানি অনুরূপ সতীত্বের মহত্ব সুরবালার চরিত্রে চিত্রিত হয়নি। বস্তুতঃ সুরবালার জীবনে পতিপ্রেমের অংশটি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত না হওয়ায় উপন্যাসের নামকরণে সার্থকতা সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় । বোধকরি লেখকের মনে এমন ধারণা ছিল যে সতীত্বের একটি অলক্ষ্য শক্তি আছে এবং সে শক্তিবলেই প্রকৃত সতী তার পতিকে ফিরে পেতে পারে । ইতঃপূর্বে হিন্দুনারীর সতীত্বের প্রতি লেখকের অগাধ শ্রদ্ধা আমরা লক্ষ্য করেছি — তাঁর মনের সেই বিশ্বাস এখানে নামকরণের ক্ষেত্রে যতটা কার্য্যকরী হয়েছে উপন্যাসের কাহিনী-বর্ণনে অথবা চরিত্র-চিত্রণে ততটা সুপরিস্ফুট নয় ।

কাহিনী রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ কান্তের উইলে 'এর প্রভাব আছে। অবশ্য সেখানে গোবিন্দলাল সাধ্বী স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও রূপসী রোহিনীতে আকৃষ্ট হয়ে নিজ বিবেকের কশাঘাতে জর্জরিত হয়েছে। কিন্তু দুর্নিবার ভোগ বাসনাকে জয় করতে না পেরে বিধবা রোহিনীকে নিয়ে প্রসাদপুরে পলায়ন করেছে তার ভোগবাসনার চরিতার্থতা ঘটালেও শেষ পর্য্যন্ত সন্দেহবশে রোহিনীকে হত্যা করেছে। স্ত্রী ভ্রমরও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এবং গোবিন্দলালকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সংসারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখানে দেখি হীরালাল স্ত্রী কন্যা বর্তমানেও রেবতীর প্রেমে পড়েছে, তারই আকর্ষণে ছুটি কাটাতে দার্জিলিঙ্গে গেছে। স্ত্রী - পরিবারের কথা মনে পড়লেও আত্মদমনের চেষ্টা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব তার মধ্যে বিশেষ নাই। চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবে সে অনেকাংশে ঘটনার দাস হয়ে পড়েছে এবং ঘটনার আঘাতেই স্ত্রী কন্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। 'কৃষ্ণ কান্তের উইল' এর নিশাকরের ভূমিকা এখানে পালন করেছে হীরালালের বন্ধু বিপিন বাবু। অঘটন-ঘটন পটীয়সী বিধবা রোহিনীর ভূমিকায় দেখি অভিনেত্রী বহুভোগ্যা রেবতীকে। এখানে উভয় চরিত্রের নামকরণেও সাদৃশ্য রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও উভয় উপন্যাসের রসাবেদন ভিন্ন। গোবিন্দলাল পাপী এবং পাপের ফলভোগ করলেও পাঠকের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত নয় কিন্তু হীরালাল চরিত্রটি আমাদের মনে কোন বিশেষ রেখাপাত করে না। বরং ভ্রষ্টা রেবতীর প্রেমে আন্তরিকতা এবং আত্মত্যাগ আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে ভ্রমর চরিত্রের তুলনায় স্থল কোনক্রমেই সুরবালা হয়নি। ভ্রমর তার মান - অভিমান, দোষগুণ মিলিয়ে সজীব রক্তমাংসের মানুষ, সুরবালা লেখকের মনের সাধ্বী স্ত্রীর নির্জীব প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

কাহিনীর নায়ক হীরালাল ডাগর চোখ সুশ্রী চেহারার পুরুষ। বিবাহিত এবং এক কন্যার জনক। ম্যাট্রিক দুবার ফেল করে পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে গ্রামে আড্ডা দেয়, তাস খেলে এবং সখের অভিনয় করে। সংসারে অসচ্ছলতা আছে তাই চাকুরীর সন্ধানে কলকাতায় রওয়ানা হয়ে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার ভয়ে আত্ম রক্ষার্থে মুসলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করায় গেঁড়াতলায় এক মুসলমানদের আড্ডায় গিয়ে হাজির হয়েছে। অভিনয়ের পাঠ মাধ্যমে কিছু কিছু মুসলমানী ভাষা সে শিখেছিল, অভিনয়ের প্রয়োজনে দাড়িও রেখেছিল তার সঙ্গে মুসলমানের পোষাক থাকায় কেউ তাকে হিন্দু বলে চিনতে পারেনি। সে পরোপকারী তাই মুসলমানদের আড্ডায় বন্দী রেবতীকে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও মুক্তি দিয়েছে। সে সৎচরিত্রের যুবক তাই একাকী রেবতীর গৃহে রাত্রিযাপনে আপত্তি জানিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত রেবতীর অনুরোধ সে অবশ্য এড়াতে না পেরে তার ঘরেই থেকেছে। এই ক্রমাগত সান্নিধ্য এবং রেবতীর আন্তরিক আদর যত্নে এবং অভিনয় কলায় দক্ষতা অর্জনে ক্রমেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। রেবতীর দৌলতেই সে রঙ্গমঞ্চে একশত টাকার চাকুরী পেয়েছে সেইজন্য তার প্রতি কিছুটা কৃতজ্ঞতাও বটে। এই কৃতজ্ঞতাবোধ এবং রেবতীর আন্তরিক ব্যবহারে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আকৃষ্ট হলেও স্বল্পদিনের মধ্যে স্ত্রীকন্যাকে প্রায় ভুলে যাওয়া অন্ততপক্ষে যে স্ত্রী সতীসাধ্বী এবং যাদের ভরণ-পোষণের জন্যই সে কলকাতায় এসেছে তাদের সম্পর্কে অল্পকাল মধ্যে এই দায়িত্বহীনতা এবং বিস্মৃতি ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। বিপিনবাবু এসে তার এই দুর্বলতা সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও রেবতীর অসুখের সংবাদ পেয়েই তার কাছে গিয়েছে এবং এই রোগশয্যায় সেবা যত্নের মধ্য দিয়ে রেবতীর কাছে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। অথচ হীরালাল সম্পর্কে বিপিনবাবু বলেছেন — 'রেবতীকে আমি বিশেষ দোষ দিতে পারি নে। কারণ ওরা খাঁটি মানুষের সঙ্গ বড় একটা পায় না, অথচ পাবার জন্য মনের মধ্যে একটা পিপাসা থাকে — এটা মানুষের প্রকৃতি। তোমার মধ্যে একটা খাঁটি মানুষ পেয়েছে, তোমার উপর ওর একটা শ্রদ্ধা জন্মেছে — আর দিনের পর দিন একসঙ্গে বসা দাঁড়ানো, একত্র কাজ করা এই সব সুযোগে সেই শ্রদ্ধাটুকু ভালবাসায় পরিণত হয়েছে।' কিন্তু তার ক্রিয়া-কলাপে 'খাঁটি মানুষের' পরিচয় নাই অন্ততপক্ষে রেবতীর সঙ্গে ঘনিষ্টতার পর তার বিদ্যার পরিধি এবং বিজ্ঞ বাচনভঙ্গীর মধ্যেও অসামঞ্জস্য রয়েছে। দুবার ম্যাট্রিক ফেল করা হীরালালকে বলতে শুনি —' একেই বলে from sublime to the rediculous'। রেবতীর সঙ্গে দার্জিলিঙ্গে যাওয়া, সেখানে স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে একত্রে বসবাস ইত্যাদি তার চরিত্রের 'খাঁটি মানুষের' পরিচয় বহন করে না। সুরবালাকে স্বপ্নে দেখে তার মন খারাপ হয়েছে — কিন্তু তার প্রতি এমন অন্যায়ের জন্য তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব যা আমরা 'কৃষ্ণ-কান্তের উইল' এর গোবিন্দলালের মধ্যে দেখেছি অথবা একদিকে নীতিবোধ-বিবেক অন্য দিকে প্রবৃত্তির হাতছানি এই উভয়ের মধ্যে টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের যে স্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে পারতো লেখক সেইসব চিত্তবিক্ষোভের পরিচয় না দিয়ে হীরালালের পরিনতিকে কিছুটা অস্বাভাবিক করে ফেলেছেন। হীরালালের চরিত্রটি যতটা রেবতীর উদারতা ও লেখকের সহানুভূতিলাভে ধন্য হয়ে স্ত্রীকন্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ততটা বাস্তব জগতের চরিত্র হয়ে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

কাহিনীর নায়িকা কলিকাতার রঙ্গালয়ের বিখ্যাত অভিনেত্রী রেবতী চরিত্রটি বরং হীরালালের তুলনায় অনেক বেশী আকর্ষণীয় এবং সুচিত্রিত। সে রঙ্গালয়ের অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী, মদ্যপ এবং চরিত্রহীনা। অর্থের বিনিময়ে সতীশকে সঙ্গ দিয়েছে। বলাবাহুল্য এধরণের চরিত্র সমাজজীবনে সত্যকারের সহানুভূতিবঞ্চিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই দেখি - করিম গুণ্ডার আস্তানায় অসহায়ভাবে তাকে ফেলে সতীশ পালিয়েছে। তারই হাতে সতীশলাঞ্ছিত হবার পর রেবতীর পিছনে করিম গুণ্ডাকে লেলিয়ে দিতেও তার বিবেকে আটকায়নি। প্রকৃতপক্ষে রেবতীর মত চরিত্রের নারীর জীবনে এই ধরণের অভিজ্ঞতাই বেশী। এই কদর্য্য লাঞ্ছিত জীবনে যখন সে দেখেছে হীরালাল সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এবং স্বাভাবিক সহানুভূতির বশে ঝুঁকি নিয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে তখন তার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব না জেগে পারেনি। রেবতী নটী হলেও নারী — সত্যকারের প্রেমের পরশ যে কোন নারী চিত্তকেই উদ্বেলিত করতে পারে। অমানুষিক জীবন পরিবেশে উচ্ছৃঙ্খল হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যখনই সে নির্লোভ হীরালালের সহৃদয়তার পরিচয় পেয়েছে তখন তার সাহচর্য্য তাকে যে আকর্ষণ করবে এটা তেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কিন্তু সে তার অসংযমী চিত্তবৃত্তিকে ত্বরিতে সংযত করতে পারেনি। হীরালালের সঙ্গে পরিচয়ের পরেও তাকে দেখেছি মদমুর্গী খেতে কিন্তু অতিথিকে অভুক্ত রেখে সে খেতে পারেনি। হীরালালের সঙ্গ কামনা সে করেছে কিন্তু সেই কামনায় বর্ব্বরোচিত উন্মাদনা নাই, বরং দেখি কর্ত্তব্যবোধে শান্তশ্রীমণ্ডিত। হীরালালের স্ত্রী-পরিবারের প্রতি তার কর্ত্তব্যবোধ এবং মমতায় রীতিমত অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। তাই সে হীরালালকে বলতে পেরেছে-"আমি মূর্খ মেয়েমানুষ। ভালবাসা পাপ কিনা, তা জানিনে। কিন্তু কারু মন্দ করা, কারু মনে কষ্ট দেওয়া, নিশ্চয়ই পাপ। সুরবালা তোমার বিবাহিতা স্ত্রী — তোমার উপর সম্পূর্ণ অধিকার তারই। আমি তার স্বামীটিকে কেড়ে নিচ্ছি — তা আমি তাকে যতই ভালবাসিনা কেন — এটা নিশ্চয়ই পাপ। তবে, ভালবাসা যে পাপ নয়, সেটাও ঠিক।" সে অনেক পুরুষের সংস্পর্শে এসেছে, তাদের লালসার পরিতৃপ্তি ঘটাতেই তার জীবন ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু সত্যকারের ভালবাসার মর্ম্ম বুঝতে পেরেছে হীরালালের সঙ্গ পেয়ে। তার উক্তিতে —" ভালবাসা যে কি জিনিষ, তা ত আমি আগে জানতামনা! আগে বুঝতাম স্বার্থ সিদ্ধি - বাসনা পরিতৃপ্তি। তোমাকে পেয়ে, এতদিনে আমি সত্যি ভালবাসা যে কি, তার স্বাদ পেয়েছি। সেই ভালবাসার আগুনে, আমার মনের সব কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এখন আমার কি মনে হয় জান? — আমি স্বচ্ছন্দে, সতীকে তার পতি ফিরিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারি।" (একবিংশ পরিচ্ছেদ)

হীরালালের প্রতি রেবতীর ভালবাসার চিত্র লেখক ধীরে ধীরে বিকশিত করে তোলেননি ঠিকই — কিন্তু আকার ইঙ্গিতে রেবতীর গভীর প্রেমানুভবের পরিচয় দিয়েছেন। সত্যকারের প্রেম হৃদয়কে উদার মহৎ হতে সাহায্য করে — আপন কার্যসিদ্ধি নয়, প্রেমাস্পদের মঙ্গলই তার কাম্য হয়ে উঠে। সুরবালাকে স্বপ্নে অসুস্থ দেখে হীরালালের মন যখন চঞ্চল হয়েছে — নিজের কষ্ট হবে জেনেও হীরালালকে সে স্ত্রীকন্যার কাছে যাবার পরামর্শ দিয়েছে। হীরালালকে সে বলেছে —'তুমি আমায় ভালবেসেছ — আমার জীবন ধন্য হয়েছে, যা আমার পাবার নয়, তাই আমি পেয়েছি — কিন্তু তাই বলে তুমি তোমার মাকে, স্ত্রী কন্যাকে ভাসিয়ে দেবে, এটা আমি নিশ্চয়ই চাই নে,' ....(ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ) এই খানেই রেবতী চরিত্রের সত্যকারের প্রেমের মহিমা বিকশিত হয়েছে। হীরালালকে বিদায় দিয়ে বাড়ীতে ফিরে এসে সে গুমরে কেঁদেছে। রেবতী একথাও হৃদয়ঙ্গম করেছে হীরালালকে সে যতই ভালবাসুক না কেন, তার সঙ্গ যতই লোভনীয় হোক না কেন — স্ত্রী-কন্যা থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিলে সে তাদের প্রতি অবিচারই করবে। তাই হোর্ম্মসজী সম্পর্কে বিপিনবাবুর মনে মিথ্যাধারণার সৃষ্টি করিয়ে নিজের চরিত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেই কলঙ্ক লেপন করে হীরালালের মন থেকে নিজেকে সে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। এরপর সমাজে নিন্দিতা অবহেলিতা অথচ আপন প্রেমে মহীয়সী এই নারী ভগ্নহৃদয়ে রোগকবলিত হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়েছে। উইল করে নিজের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি প্রেমাস্পদকে দান করে শ্মশানে প্রস্ফুটিত এই কুসুমটি দেব-পূজায় শাস্ত্রনিষিদ্ধ হওয়ায় নীরবেই ঝরে পড়েছে। চরিত্রটি সম্পর্কে ডাঃ শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন-'রেবতী চরিত্রটি সুপরিস্ফুট হয় নাই। মনে হয় লেখক যাহা চাহিয়াছেন সে তাহাই করিয়াছে।'১১৩ উপরের আলোচনা থেকে এই মন্তব্যের সম্পূর্ণ সত্যতা মেনে নেওয়া কষ্টকর।

উপন্যাসে সতীত্বের ধ্বজা উড়িয়েছে হীরালালের পত্নী সুরবালা — কিন্তু চরিত্রটি সুচিত্রিত হয়নি। অভিনয়ের আসরে হীরালাল অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করবে জেনে সে হীরালালের অভিনয় দেখতে যায়নি-তার মন এতই স্পর্শকাতর। এই স্পর্শকাতরতা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। বাস্তব জীবনে হীরালাল যখন রেবতীর প্রেমে পড়েছে তখন নিজের সর্বনাশ জেনেও সে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য স্ত্রীসুলভ কোন অস্ত্র প্রয়োগ করেনি, এমনকি বিপথগামী স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য তেমন কোন চেষ্টা তার মধ্যে দেখা যায় না। ঘরে বসে চোখের জল ফেলেই সে হীরালালকে ফিরে পেয়েছে। এই ফিরে

পাওয়ার মধ্যে রেবতীর দাক্ষিণ্য যতখানি তার সতীত্বের গৌরব ততখানি প্রকাশিত নয়। বস্তুত: চরিত্রটি নিষ্ক্রিয় হওয়ায় আমাদের দৃষ্টি তেমনভাবে আকর্ষণ করে না।

হীরালালের প্রকৃত বন্ধু এবং সত্যকারের হিতৈষী গ্রামের জমিদারের বড় ছেলে বিপিনবাবুর চরিত্রটিও নিষ্প্রভ। লেখক তাকে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র নিশাকরের ভূমিকায় এখানে অবতীর্ণ করিয়েছেন। বিপিনবাবু নিশাকরের মতগীতবাদ্য প্রিয় না হয়ে অভিনয়রসিক হয়েছেন। জমিদারী পরিদর্শনের কাজে মাঝে মধ্যে বাইরে গেলেও বেশীর ভাগ সময় ব্যয় করেন পরোপকারার্থে। রেবতীর মোহজাল থেকে হীরালালকে উদ্ধার করতে উপন্যাসে সে নিয়োজিত। এই উদার কার্য্যে তাকে কোন কূটকৌশল অবলম্বন করতে হয়নি। নেহাত ভালমানুষের মতই সে কিছু নীতি কথা এবং উপদেশ হীরালালকে দিয়েছে। সাময়িকভাবে রেবতীর কাছ থেকে দূরে হীরালালকে সরিয়ে রাখলেও তার মনের উপর কোন গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বরং দেখি রেবতীর উপর তার একটু সহানুভূতিই রয়েছে। বলাবাহুল্য বিপিনবাবুর কার্যকলাপে নিরীহ ভালমানুষী মিশে থাকায় উপন্যাস কাহিনীতে কোন জটিলতার সৃষ্টি করেনি। অথবা হীরালালের মোহমুক্তিতে তার অবদান যতখানি সেই তুলনায় রেবতীর উদারতাই বেশী কার্য্যকরী হয়েছে।

করিম সেখের ভয়ংকর প্রকৃতির কথা উপন্যাসে উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু তার পরিচয় কোথাও নাই। বরং দেখি এই ভয়ংকর গুন্ডার মনে রেবতীর প্রতি লালসা জন্মেছে, কিন্তু সেই লালসা অচিরাৎ শুদ্ধ প্রেমেই রূপান্তরিত। ছদ্মবেশে রেবতীর বাসায় এসে তার প্রতি যে ব্যবহার অথবা রঙ্গালয়ে রেবতীর অভিনয় দেখে ফুলের তোড়া প্রদান কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয়। চরিত্রটি চিত্রণে অসঙ্গতি রয়েছে। বরং চরিত্রহীন মদ্যপ সতীশের চরিত্রটি জীবন্ত। স্ত্রী ঘরে থাকা সত্ত্বেও রেবতীর প্রতি তার নীতি-বিগর্হিত আকর্ষণ তার কামনাকলুষিত মনের পরিচয় দেয়। এই ধরণের কলুষিত মন যে রেবতীকে অসহায় ফেলে পালিয়ে যাবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। আবার রেবতী গুন্ডা কবলিত হয়ে মারা গেছে এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে উদ্যোগী হয়ে রেবতীর হাতেই লাঞ্ছিত হয়েছে এবং লাঞ্ছিত হয়ে রেবতীর প্রতি প্রতিশোধ নিতে করিম গুন্ডাকে ডেকে এনে রেবতীর জীবন সংকটাপন্ন করতেও সে দ্বিধাবোধ করেনি। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সে নির্বিকার অসৎ প্রকৃতির বলেই চিহ্নিত হয়েছে। অবশ্য রেবতী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তবে তার জন্য শোক প্রকাশ অথবা জাল উইলের খসড়া তৈরীর ব্যাপারে

সামান্য অতিরঞ্জন থাকলেও চরিত্রটি জীবন্ত। স্বল্পপরিসরে রমেশের মাতাল রূপটি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

প্রভাতকুমারের উপন্যাস সাধারণত: ঘটনা প্রধান, গভীর চরিত্র-বিশ্লেষণের দিকে তিনি বিশেষ মনোযোগ দেন নাই —'সতীর পতি'ও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার বিস্তৃত বিবরণ কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য ছিল না - বরং নানা ঘটনার উপস্থাপনে কাহিনীর গতি-বেগকে তিনি শ্লথ করেছেন।

উপন্যাস রচনাকালের সমসাময়িক কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের অনেক সংবাদ এখানে বিবৃত হয়েছে। যেমন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীদের সম্পর্কে সাধারণের ধারণার পরিবর্তন বিশেষত: অভিনেত্রী জীবনের শুধু কলংকময় দিক নয় তার শিল্পী সত্বার মূল্য দর্শক দিতে স্বীকৃত হয়েছে। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে নাট্যকার অমৃতলাল বসুর যে অভিনয় স্কুলের কথা বলা হয়েছে তার বাস্তব সত্যতা রয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র নিমে দত্তের ভূমিকায় গিরিশ ঘোষ, ভুনীবাবুর অভিনয়ের উল্লেখ রেবতীর মুখে শুনতে পাই। এছাড়া বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের পুন: পুন: উল্লেখ লেখকের বঙ্কিম - রবীন্দ্র-প্রীতিকে স্মরণ করায়।

' সতীর পতি' প্রভাতকুমারের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য রচনা নয়। তবে তৎকালীন অভিনেত্রী জীবনের পঙ্কিলতার মধ্যেও রেবতীর হৃদয়ে যে প্রেম-পঙ্কজকে তিনি বিকশিত করেছেন তার নি: স্বার্থ আত্মত্যাগের মহিমায় আমরা অভিভূত না হয়ে পারি না।

(১৩)

' গরীব স্বামী' প্রভাতকুমারের দ্বাদশ উপন্যাস রচনা। উপন্যাসটি ফাল্গুন, ১৩৩৩ থেকে মাঘ, ১৩৩৬ সাল পর্য্যন্ত 'মানসী ও মর্ম্মবানী''তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ২৫শে এপ্রিল, ১৯৩০।

'গরীব স্বামী'র কাহিনী অতিমাত্রায় কাল্পনিক এবং প্রভাতকুমারের অন্যান্য উপন্যাস কাহিনী থেকে ভিন্ন ধর্মী। অমিতবিত্তশালী সুশিক্ষিত ত্রিশ বৎসর বয়স অবধি অবিবাহিত দেবেন্দ্রবাবুর মনে মনে ইচ্ছা দশ এগারো বৎসরের একটি মেয়ে সংগ্রহ করে তাকে গড়ে পিটে নিজের মনের মত করে লেখাপড়া শরীরচর্চ্চা আদব কায়দা শিখিয়ে তবে তাকে বিয়ে করবেন। এই মনোমত পাত্রী নির্বাচনের জন্যই একটি ক্যামেরা নিয়ে সাইকেলে চড়ে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। কোন এক গ্রামের দরিদ্র গৃহস্থ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের নয় বৎসর বয়স্কা ঊষাকে পছন্দ হওয়ায় তিনি সপরিবারে মধুবাবুকে কলকাতায় নিয়ে এসে তার জন্য বসতবাটী ক্রয় করে, তার সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করে তাকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং একথাও আইন সঙ্গতভাবে দলিল করে দিয়েছেন যে ঊষা শিক্ষাদীক্ষার পর যদি তার মনের মত না হয় অথবা বিয়ের পূর্বেই দেবেনবাবুর মৃত্যু হয় তবে তার অন্যত্র বিয়ে দিতে পারবেন এবং বিয়ের যাবতীয় খরচ তার এষ্টেট বহন করবে। ঊষাকে মনোমত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি তাকে দুইজন স্বদেশী এবং দুইজন বিদেশী শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে দার্জিলিংয়ে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, শরীর চর্চার জন্য ঘোড়া কিনে দিয়েছেন। অর্থাৎ সব রকম ব্যবস্থাই তার মনোমত করেছেন। কিন্তু পাঁচ বৎসর শিক্ষার পর যখন ঊষা তার মনের মত হয়ে উঠেছে তখন দেখা গেল ঊষা দেবেনবাবুকে পছন্দ না করে বাইশ তেইশ বছরের তরুণ বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার চারু ব্যানার্জীকে ভালবেসে ফেলেছে। আশাহত দেবেনবাবু অবশ্য এতে অনুদার হননি। চারু ব্যানার্জীর সঙ্গে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ঊষাকে তিনি দার্জিলিং সহরে একটি বাড়ী ও নগদ দশহাজার টাকা দিয়েছেন এবং নিজে বিলাতে গিয়ে কিছু দিনের মধ্যেই এক হিন্দুধর্মে অনুরাগী মার্কিন মহিলাকে বিয়ে করে স্বদেশে ফিরেছেন।

অতিমাত্রায় কল্পনাশ্রয়ী দেবেনবাবুর এই পরিকল্পনা যে পাঠকের কাছে অবিশ্বাস্য হবে স্বয়ং কাহিনীকার এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের জবানীতে দেবেনবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলিয়েছেন —'তুমি বাবাজি যা প্রস্তাব করেছ, তা বেদে নেই কোরাণে নেই। শুধু আমার কথা বলি কেন? বাঙ্গালী ভদ্রঘরে, তাদের চৌদ্দ পুরুষেও এরকম কাজ করা দূরে থাকুক, এ কথা কেউ শোনেও নি।' এই অশ্রুতপূর্ব কাহিনী 'গরীব স্বামী'র বিষয়বস্তু হওয়াতে কাহিনী বর্ণনায় প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটি অবাস্তবতার সুর ধ্বনিত হয়েছে।

কাহিনীর নায়ক দেবেনবাবুর অঢেল টাকা সাংসারিক দায়দায়িত্ব অথবা জীবিকার্জনের কোন দুশ্চিন্তা তার নেই। একটি অল্প বয়স্ক মেয়েকে নিজের মন মত করে গড়ে তবে তাকে বিয়ে করার যে পরিকল্পনা তিনি করেছেন – মনের সেই উদ্ভট খেয়ালে তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবেই আস্থাবান। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিজে অবিবাহিত থেকে তার খেয়ালীপনাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। নিজের খেয়ালের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তার মনে কোন দ্বন্দ্ব নাই – মেয়েটিকে পছন্দমত তৈরী করার পর যদি তাকে বিয়ে করতে সে অস্বীকৃত হয় অথবা বিয়ের পূর্বেই নিজের মৃত্যু হয় তবে মেয়ের অন্যত্র বিয়েতে তার আপত্তি নাই। এমনকি বিয়ের সমস্ত খরচও তার এষ্টেট বহন করবে-এমন দলিলও তিনি করে দিয়েছেন। তিনি উদ্ভট খেয়ালী কিন্তু প্রকৃতিতে সৎ। সাইকেলে চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনেক মেয়েই তিনি দেখে বেড়িয়েছেন কিন্তু কোন কুচিন্তা তার মনে দেখা দেয় নাই, কাউকে তিনি ঠকাতেও চাননি। তিনি যে স্বভাবতই খেয়ালী শুধু এই বিয়ের ব্যাপারেই নয় তার জীবনের অন্যত্রও সে পরিচয় লেখক দিয়েছেন। মানুষের শরীরের কোথায় কি আছে এইটুকু জানার জন্য তিনি তিন বৎসর ডাক্তারী পড়েছেন এবং সেই জ্ঞান লাভ হলে তিনি ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। এই ধরণের অবিশ্বাস্য খেয়ালীপনাতেই তার জীবন গড়ে উঠেছে।

তার মনোনীতা ঊষাকে পেয়ে তিনি মনে করেছেন 'ইস্পাত ভালই পেয়েছি, এখন গড়ে নিতে পারলেই হয়।' তার এই চিন্তা ধারার মধ্যেই একটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে। বঙ্কিমের ভবানী পাঠকের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালনে তিনি প্রফুল্লকে নিয়োগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু ঊষার ভবিষ্যত্ জীবন সম্পর্কে এধরণের কোন মহৎ ব্রত পালনের ইঙ্গিত নাই। অথচ ভাবরাজ্যে ঊষাকে এমন সুউচ্চে স্থাপন করেছেন যেখানে তার তুলনাস্থল অত্যন্ত অসম। ঊষাকে মনের মত করে গড়তে গিয়ে সে অকাতর অর্থব্যয়ে দেশী বিদেশী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করে, দার্জিলিং সহরে রেখে তাকে ~~[illegible]~~ মানুষ করেছেন। কিন্তু তারই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিতা হয়ে ঊষা তাকে পছন্দ না করে ভালবেসেছে তরুণ বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার চারু ব্যানার্জীকে। দেবেন্দ্রনাথ মনে দুঃখ পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আশা ভঙ্গে অনুদার হয়ে ওঠেননি। বরং দেখি অতিমানবিক উদারতার সঙ্গে ঊষার বিয়েতে তিনি যৌতুক স্বরূপ দশহাজার টাকা এবং দার্জিলিং এর বাড়ী 'ডেজি ভিলা' তাকে উপহার দিয়েছেন, তাঁর এধরণের ক্রিয়াকলাপে বাস্তবতা কতখানি রক্ষিত হয়েছে নির্ণয় করা কষ্টকর। অবশ্য বিয়ের অব্যবহিত পরেই নিজে ইউরোপে গিয়ে হিন্দু ধর্মে

~~অম্বুবাসী একজন মার্কিন মহিলাকে সাথে করে~~

অনুরাগী একজন মার্কিন মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন এবং প্রথাগতভাবে তাকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিতা করে বিয়ে করেছেন।

উপন্যাসের নায়িকা ঊষা কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এর মত কল্পনাবিলাসী নয় বরং সে বাস্তবিকা। প্রথম যখন উপন্যাসে তার সাক্ষাৎ পাই তখন সে নেহাৎ চপলমতি সরলা বালিকা, পুতুল নিয়ে খেলা করে, পড়াশুনার কথায় মাষ্টার মহাশয়ের বেত্রাঘাতের ভয়ে সে ভীতা। দেবেনবাবুর সঙ্গে রবিনসন্ ক্রুশো সিনেমা দেখে তার দেওয়া বেলুন পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু দেবেনবাবুর শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষিতা হয়ে পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তার জন্মান্তর ঘটেছে। বাংলা ভাষা সে প্রায় ভুলেই গেছে। ইংরাজী, ফরাসী ভাষায় সে দক্ষ হয়েছে, পিয়ানো, বেহালা বাজাতে শিখেছে সে একা একাই ঘোড়ায় চড়ে দার্জিলিং এর রাস্তায় ভ্রমন করে। তার আত্মনির্ভর স্বাধীনচিত্ততা তাকে জীবনসঙ্গী নির্বাচনেও সহায়তা করেছে। চারু ব্যানার্জীর তারুণ্যের চপলতায় তার তরুণ মন আকৃষ্ট হয়েছে ক্রমে প্রেম, অবশেষে পলায়নের মধ্য দিয়ে তারই সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে সে অটল এবং দৃঢ় হলেও নীতির বিচারে তাকে স্বার্থপর বলেই মনে হয়। দেবেনবাবু কি উদ্দেশ্যে তারজন্য এত অর্থব্যয় করছেন সে কথা তার জানা থাকা সত্ত্বেও সে নির্বিকারচিত্তে চারুর প্রতি আকৃষ্টা হয়েছে - এ ব্যাপারে তার মনে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত না হওয়াতে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি সে অকৃতজ্ঞ বলেই মনে হয়, কিন্তু চরিত্রটির স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করা যায় না।

ঊষার প্রেমিক বিলাত ফেরত বাইশ তেইশ বৎসরের ব্যারিষ্টার চারু ব্যানার্জী প্রকৃতিতে বেশ সপ্রতিভ। 'রুকমপুরা' ভবনে ঊষার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরে তাকে দেখি নিজের আগ্রহাতিশয্যে সে ঊষার সঙ্গে আলাপ করেছে। তার সপ্রতিভতার সঙ্গে আন্তরিকতা মিশে তরুণী ঊষার মন সহজেই জয় করেছে। চারু সম্পর্কে ঊষার মনোভাব —' সে লোকটিও কিন্তু বেশ কেমনভদ্র, কেমন মিষ্টভাষী'। তার সৌজন্য বোধ, বাঙ্গালা ভাষা প্রীতি, ঊষার প্রতি আন্তরিকতা বেশ স্বাভাবিক এবং বয়সানুসারে সঙ্গত। সুতরাং ঊষা যে দেবেনবাবু থেকে তার প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হবে এতে কোন সন্দেহ নাই। দেবেন্দ্রর মত উচ্চশিক্ষিত অর্থশালী সে নয়, অথবা উদার মহত্ত্ব তার মধ্যে নাই। কিন্তু তার বাস্তবজ্ঞান অতি প্রখর, তাই দেখি প্রেমের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার ক্ষীণ ঈর্ষাসুলভ দুর্বলতা এবং ঊষার সঙ্গে পরিনয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার আগ্রহ তার অত্যন্ত প্রবল। এই বাস্তবজ্ঞানই প্রেমের ক্ষেত্রে তাকে জয়ী করেছে।

xউষxx উষার পিতা মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রটি তীক্ষ্ণ বিষয়-জ্ঞান সম্পন্ন সাংসারিক মানুষের পরিচয় বহন করছে। গ্রামে বস বসবাস-কারীএই দ দরিদ্র ব্যক্তিটির কিন্তু অর্থের লোভ কম নয়। অর্থ এবং রায়বাহাদুর খেতাব লাভের জন্য মেয়েকে রাজার হারেমে পাঠাতে তার বিশেষ আপত্তি নাই। মেয়েকে হারেমে পাঠিয়ে সমাজচ্যুত হতে সে রাজি আছে যদি সে খেতাব এবং জমিদারী পায়। বস্তুত: ইংরেজ শাসনকালে আমাদের সমাজে এই ধরণের চরিত্রের অভাব ছিল না। দেবেনবাবুর ঘর-সম্পত্তির হদিস পেয়ে তাকে কন্যা দান করতে তিনি রাজি হয়েছেন। এধরণের কার্যে তার জাতিচ্যুতির ভয় থাকলেও তার বক্তব্য—কন্যা সুখে থাকবে এবং নিজেরও কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটবে। আবার শিক্ষাসমাপনান্তে উষা যখন দেবেনবাবুকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি তখন উষাকে মন্দ কথা বলতেও তিনি ছাড়েন নি। চরিত্রটির বিশ্লেষণ সুন্দর কিন্তু উপন্যাস কাহিনীর পক্ষে উপযোগিতাহীন ক্ষীণ।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে শিক্ষিত এবং মার্জিত রুচির লীলার চরিত্রটি আকর্ষণীয়। তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজে শিক্ষিতা রূপবতী গুণবতী মেয়েদেরও টাকার অভাবে বিয়ে দেওয়া যে কত কষ্টকর ছিল লীলার চরিত্রটি সেই সমস্যাকে তুলে ধরেছে। সে বি, এ, পাশ, গীতবিদ্যায় পারদর্শিনী অথচ পিতামাতার অবর্তমানে অর্থাভাবে অধিক বয়স পর্যন্ত তার বিয়ে সম্ভব হয়নি। হেমাঙ্গিনী দেবীর উক্তিতে বিবাহঘটিত এই সমস্যার স্পষ্ট উল্লেখ আছে —' খুব আটকায়! হিন্দু সমাজের চেয়ে বরং বেশী আটকায়।' সে শিক্ষয়িত্রীর জীবন বেছে নিয়েছে। লেখক তার জীবিকার সংকুলান করলেও তাকে একটি পাত্র xxxxxxxxx যোগাড় করে দিতে পারেন নি।

পূর্বেই দেখেছি লেখক তার উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে বেশী দূরে স্থাপন করেন নি। এখানেও দেখি উষার শিক্ষার স্কুল নির্বাচিত হয়েছে স্যানিটোরিয়ম। চারু ব্যানার্জী ব্যারিষ্টারী পড়েছে ইনার টেম্পলে, তার হাতে রবীন্দ্রনাথের' সোনার তরী"। বলাবাহুল্য এ সমস্তই লেখকের পরিচিত চৌহদ্দিতে।

উপন্যাস হিসাবে' গরীব স্বামী' সার্থক এমন কথা বলা যায় না। কাহিনী অতিরিক্ত কল্পনাশ্রয়ী তাই পদে পদে আমাদের বাস্তববোধ পীড়িত হয়। তবে ব্রাহ্ম এবং বিলাত ফেরত সমাজের সমস্যা এবং তাঁদের জীবনযাত্রার নিখুঁত বর্ণনা ইত্যাদির মাধ্যমে রচনাটি উপভোগ্য হয়েছে।

প্রভাতকুমারের 'নবদুর্গা' উপন্যাসটি আশ্বিন, ১৩৩৫ থেকে চৈত্র, ১৩৩৬ সাল পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে ৩১শে জুলাই, ১৯৩০ ।

'নবদুর্গা'র কাহিনী এইরূপ — পল্লীগ্রামের এক বৃদ্ধ দরিদ্র ব্রাহ্মন দম্পতি তাদের অপরূপ সুন্দরী কন্যা নবদুর্গার বিবাহের চেষ্টায় কলিকাতায় আসার পথে কেদারেশ্বর দর্শনে যান। নবদুর্গার রূপ লাবন্যে আকৃষ্ট হয়ে সেখানকার বিত্তশালী চরিত্রহীন মোহন্ত তাকে লাভের আশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে । নবদুর্গাকে পাবার আশায় সে নানা ছলনায় আশ্রয় নেয় এবং এই দম্পতিকে প্রচুর অর্থ এবং সম্পদের প্রলোভন দেখায়। কিন্তু দরিদ্র দম্পতি নিজেদের সুখের জন্য নবদুর্গাকে মোহন্তের সঙ্গে বিয়ে দিতে অস্বীকৃত হয়ে গোপনে সেখান থেকে পলায়ন করে। লালসাকাতর এই মোহন্ত তখন তাঁর কুচক্রজাল বিস্তার করে। এই ব্যাপারে মোহন্তর জমিদারীর অর্থ আত্মসাৎ করে ধরা পড়েছে এমন এক নায়েব অধর মুখোপাধ্যায়কে সে নিযুক্ত করেছে এই চুক্তিতে যে অধর নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে নানান ছলে নবদুর্গাকে বিয়ে করে মোহন্তর কাছে পৌঁছে দেবে এবং ফলস্বরূপ মোহন্ত তাকে সমস্ত অপরাধ থেকে অব্যাহতি দেবে এবং নগদ দশহাজার টাকাও সে পাবে। অধর মুখোপাধ্যায় ছলনার আশ্রয়ে নবদুর্গাকে শাস্ত্রমতে বিয়ে করেছে ঠিকই কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে ভালবেসে ফেলায় মোহনন্তকে ~~মোহন্তকে~~ ফাঁকি দিয়ে নবদুর্গাকে নিয়ে পালিয়ে যায় । মোহন্তও তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রভাবতী নামক একটি মেয়ের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে একটি চক্ষু হারায় ।

কাহিনী রচনায় একটি সত্যঘটনার ছায়াপাত আছে। তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরি জনৈক নবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী এলোকেশীর সঙ্গে ব্যেভিচারে লিপ্ত হয়েছিল । স্বামী এখবর জানতে পেরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করে কিন্তু মোহন্তের চক্রান্তে সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় স্ত্রীকে হত্যা করে নিজে দ্বীপান্তরে যান এবং বিচারে মোহন্তর কারাবাস হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং অনেক প্রহসনও রচিত হয়েছিল যেমন তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের 'মোহন্তের কি দুর্দশা' (১৮৭৪), যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'মোহন্তের এই কি দশা !!' (১২৮০) ইত্যাদি । নবদুর্গার কাহিনী অবলম্বন এই বাস্তব ঘটনাটি হলেও লেখক তাঁর ইচ্ছা এবং রুচি অনুযায়ী কাহিনী চিত্রণ করেছেন। তীর্থস্থান তারকেশ্বর এখানে হয়েছে কেদারেশ্বর, মোহন্ত মাধবগিরি এখানে হয়েছে

অম্বিকাপুরী ।এলোকেশী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল কিন্তু নবদুর্গাকে লেখক মোহন্তের ক্লেদ লালসা থেকে দূরে সরিয়ে পবিত্র রেখেছেন ।

কাহিনীতে লেখক নবদুর্গার পবিত্রতা রক্ষা এবং মোহন্তের জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করার উদ্দেশ্যে যে ভাবে কাহিনী বর্ণনা করেছেন সেখানে বাস্তববোধ কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়। যেমন অধর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নবদুর্গার বিয়ের কথাবার্তা চলাকালে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিপিনের উপর কৈলাস ভট্টাচার্যের অগাধ বিশ্বাস স্থাপন যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয় না । বিপিন কৈলাস ভট্টাচার্যের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাঁর হৃদয় জয় করেছে ঠিকই কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে বিশেষ করে পাত্র স্বয়ং যেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত সেখানে অন্য একজন অপরিচিত লোকের সাহায্যে পাত্রের পারিবারিক এবং বংশপরিচয়ের খবরাখবর নেওয়া বিশেষ করে নিজের কন্যার বিবাহ ব্যাপারে এবং যে কন্যার পেছনে মোহন্তের লালসাদৃষ্টি আছে স্বয়ং পিতা একথা জেনেও শারীরিক অপটুতার অজুহাতে বিপিনের উপর পাত্র সংক্রান্ত খোঁজ খবরের ভার ন্যস্ত করার যুক্তি বিশেষ পাওয়া যায় না ।কাহিনীর পরিনতিও কিছুটা কৃত্রিম বলে মনে হয়। কারণ শঠচূড়ামনি মোহন্ত যে কুচক্রের জালে নবদুর্গার মত একজন নিরীহ গ্রাম্য মেয়েকে ও ~~ঘিরে~~ সদা সর্বদা ঘিরে ~~রেখেছে~~ রেখেছে সেখানে ছদ্মবেশে নবদুর্গার পলায়ন-পর্ব লেখক যে ভাবে বর্ণনা করেছেন, তা বিশ্বাস করতে কিছুটা কষ্ট বোধ হয় ।নবদুর্গার পলায়নে এবং মোহন্তর লাঞ্ছিত মূর্তিতে আমরা সুখ অনুভব করি ঠিকই কিন্তু কাহিনীর বাস্তবতাবোধ কিয়দংশে ক্ষুন্ন হয়েছে ।

ইতঃপূর্বে 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদীপ' উপন্যাসে সাধু-সন্ন্যাসীর চরিত্রের অন্ধকারময় ~~দিকটার~~ দিকটির প্রতি প্রভাতকুমার আলোকপাত করেছেন। গুরুদেবজাতীয় ব্যক্তির পদস্খলনের কথা 'ভুল ভাঙা' গল্পে রয়েছে ।প্রকৃতপক্ষে সাধু সন্ন্যাসীদের চরিত্রের এবং জীবনযাত্রার উপর প্রভাতকুমারের প্রসন্ন দৃষ্টির পরিচয় আমরা পাই না । কিন্তু এই জাতীয় চরিত্রের জঘন্যতার ~~দিকটা~~ দিকটি এখানে যেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন অন্য কোনও রচনায় সেই বিস্তারিত পরিচয় নাই ।

কেদারেশ্বর তীর্থের মোহন্ত অম্বিকাচরণ পুরী' নিয়ত ঘৃতদধি' দুগ্ধ সেবনে তাঁহার বপুখানি বিলক্ষণ স্থূল করেছেন এবং বাবা কেদারেশ্বরের সেবাইতরূপে বৎসরে তিনচার লক্ষটাকা মুনাফার জমিদারী ভোগ করেন। তার' জমিদারীতে বিপুল প্রতাপ' তিনি 'অত্যন্ত প্রজাপীড়ক' এবং প্রজারা তাঁকে ভয় করে। 'আরও একটা অখ্যাতি তাঁহার আছে — তিনি নাকি অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ। এ বিষয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান তাঁহার একেবারে শূন্য '। চল্লিশ বৎসর বয়স হলেও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা তার বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি। তিনি মদ্যপ, অত্যন্ত সৌখিন এবং বিকৃতরুচিসম্পন্ন। তাঁর ঘরের শোভাবর্দ্ধন করে 'অধিকাংশই 'রূপসী যুবতীর নগ্নমূর্ত্তি।' এহেন ইন্দ্রিয় পরাবশ বিকৃতমানসিকতার মোহন্ত নবদুর্গার অসামান্য রূপ দেখে সহজেই আকৃষ্ট হবেন সে কথা বলা বাহুল্য। তাই দেখি নবদুর্গাকে দেখেই তিনি লালসাকাতর হয়েছেন এবং কৌশলে কৈলাস ভট্টাচার্য্যকে বসিয়ে রেখে দেরি করিয়েছেন, হাত দেখার ভান করে নবদুর্গার হাত স্পর্শ করেছেন যে স্পর্শে তার মধ্যে ছিল তাঁর কামনার অঙ্গার। এই স্পর্শ তাকে উত্তেজিত করেছে এবং সেইরাত্রেই নবদুর্গাকে পাবার জন্য অধীর উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁর চিত্তবৃত্তির অসংযমতার পরিচয় রয়েছে সেই রাত্রেই ঘন ঘন মদ্য পানে এবং কঠিন ক্রূরতা প্রকাশ পেয়েছে প্রয়োজনবোধে দড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে নবদুর্গার মাতাপিতাকে একঘরে ফেলে রাখার প্রস্তাবে। মোহন্তবেশী এই জঘন্য ব্যক্তিটি নায়েব অধরচন্দ্রের অর্থআত্মসাৎজনিত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে নিয়োগ করেছে তার মারফৎ নবদুর্গাকে নিজের বশে এনে ভোগবাসনা চরিতার্থ করতে। পাছে নবদুর্গাকে নিয়ে অধরচন্দ্র পলায়ন অথবা নিজেই ভোগ করে তাই তিনি সবসময়েই নবদুর্গা এবং অধরচন্দ্রের মাঝে একজন তৃতীয় ব্যক্তি নিযুক্ত রেখেছেন। কাশী যাওয়ার পথে গাড়ীর কামড়ায় বসেঘন ঘন মদ্যপান এবং বেশভূষা তার লাম্পট্যের অকাট্য পরিচয়। অবশ্য সব করেও সে শেষরক্ষা করতে পারেনি। অবিশ্বাস্য উপায়ে নবদুর্গা পলায়ন করেছে এবং একটু অন্য ধরণের মেয়ে প্রভাবতীর হাতে তার লাঞ্ছনায় পাপের উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে।

মোহন্তের চরিত্রের পরিণতিটুকু ছাড়া সবই জীবন্ত উজ্জ্বলরেখায় অঙ্কিত। তার মত একজন কুচক্রী লম্পট যে প্রভাবতীর মত মেয়ের হাতে তারই সুরক্ষিত আবাসে অসহায়ভাবে লাঞ্ছিত হবে এবং প্রভাবতী বিনা বাধায় পলায়নে সক্ষম হবে এটা আশা করা যায় না। মনে হয় লেখকের মনে পাপের পরিণতি প্রদর্শনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে চরিত্রটিকে এই পরিণতি দান করেছে।

কাহিনীর নায়িকা নবদুর্গা । চরিত্রটি সুপরিস্ফুট নয় । নবদুর্গা অসম্ভব রূপবতী 'হ্যাঁ মেয়ের নবদুর্গা নাম সার্থক বটে - যা দুর্গার মতই রূপ । মেয়ে রাজরাণী হবার উপযুক্ত ।' কিন্তু পিতার দারিদ্র্য এবং এই অপরূপ রূপই তার বিয়ের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে । গরীবের ঘর এই রূপসী মেয়েকে বধূ রূপে বরণ করতে সংকোচবোধ করেছে । তার রূপ এবং মোহন্তের রূপমুগ্ধতাকে কেন্দ্র করে কাহিনী রচিত হয়েছে। অথচ সমস্ত উপন্যাসকাহিনীতে নবদুর্গাকে লেখক প্রায় নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন । তাকে কেন্দ্র করেই মোহন্তের চক্রজাল গড়ে উঠেছে অথচ নবদুর্গার ব্যক্তিত্বের পরিচয় আমরা কোথায়ও পাই না । তার বিয়ে, অধরচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক, গাড়ীতে কাশী গমন কোথাও তাকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায় না । কাশীগমন কালে গাড়ীতে মোহন্তকে দেখে সে ভয়ে কেঁপে উঠেছে , কাশীতে গিয়ে নিজের বিপদের কথা জেনেও সে অসহায়ের মতই নিশ্চুপ। প্রভাবতী এবং তার মা তাকে বিপদথেকে উদ্ধার করে দেবে এই আশায় সে তার শাড়ীগহনা প্রভাবতীকে দান করতে সঙ্কুচিত হয়নি অথচ উদ্ধার পেতে হলে প্রভাবতী তার রূপযৌবনের ছলনায় নবদুর্গার পাহারাদারকে বশ করবে শুনে প্রভাবতীর উপর সে মনে মনে বিরক্ত হয়েছে । চরিত্রের এই নিষ্ক্রিয়তা এবং অসংগতিতে তাকে উপন্যাসের নায়িকা বলে মেনে নেওয়া কষ্টকর । নায়িকা চরিত্রের প্রতি এই অবিচার লেখক ইতঃপূর্বে তাঁর অনেক উপন্যাসেই করেছেন।

'রমাসুন্দরীর সতীশ', নবীন সন্ন্যাসী'র গদাই পাল, 'রত্নদীপে'র খগেন. যেমন কুটিল, তেমনি এখানেও রয়েছে মানিকলাল ঘোষ।' সে মোহান্তের মোসাহেব, নিত্য-সহচর, তাঁহার কুকর্মের সহায়' । সে মোহান্তের প্রিয়-পাত্র — গুরুর উপযুক্ত শিষ্য । সে অত্যন্ত চতুর কিন্তু সাবধানী । সে মোহান্তের সর্বনাশা লালসার কথা জানে এবং এও জানে এই অত্যধিক লালসা তার বিপদ ডেকে আনতে পারে । তাই মোহন্তকে সে শান্ত হবার জন্য সাবধান করেছে, তার উক্তি —' ভট্চাযকে হাত করবার জন্য ধীরে ধীরে ক্ষেত্র প্রস্তুত করি — তার পর বীজ বপন করলে সুফল পাওয়া যাবে ।' সেই নানা ছলনায় ভট্টাচার্য পরিবারকে মোহন্তের রাজবাড়ীতে আটক রেখেছে, আর রাতের অন্ধকারে তারা পালিয়ে গেলে খোঁজখবরের জন্য চারিদিকে ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছে । নবদুর্গাকে অধরচন্দ্র বিয়ে করে মোহন্তর কাছে পৌছে দেবার কৌশল তারই আবিষ্কার । সে ষড়যন্ত্রকুশলী, মিথ্যা-ভাষী এবং মোহন্তের মোসাহেবীপনায় সিদ্ধহস্ত । মোহন্তের অন্যান্য কর্ম্ম-চারী তাকে অত্যন্ত ভয় করে। কারণ তারা জানে —'মানিক ইচ্ছা করিলে, তাহাদের ভাল যত করিতে পারুক আর না পারুক, মন্দ খুবই করিতে পারে।'

সে অর্থলোভী এবং অর্থলোভের আশায় পারে না এমন কর্ম্ম নাই। চরিত্রটি বাস্তব এবং জীবন্ত — মোহন্তের কুকাজে সদা-সর্বদা সে সহায় হয়ে থেকেছে।

অন্য একটি দুষ্ট প্রকৃতির চরিত্র অধীর মুখোপাধ্যায়। সে অত্যন্ত চতুর। মোহন্তের এষ্টেটের অর্থ তছরূপ করে মোহন্তের কাছে ধরা পড়েছে। এই অপরাধ থেকে রেহাই পাবার জন্য রুগ্ন স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও নবদুর্গাকে ছলে বলে কৌশলে বিয়ে করে মোহন্তর কাছে এনে দিতে সে স্বীকৃত হয়েছে। ~~একমাত্র চুরির অপরাধ থেকে রেহাই পাবার আশায়~~। নবদুর্গাকে কৌশলে সে বিয়ে করেছে ঠিকই, কিন্তু দুষ্ট হলেও সে বিবেক বর্জিত নয়। নবদুর্গাকে বিয়ে করার পর তার মনে হয়েছে — 'আহা এই স্বর্ণপ্রতিমাকে যথাশাস্ত্রবিবাহ করিয়া, অর্থলোভে লম্পটশিরোমণি - নরপিশাচ মোহান্তের হস্তে তুলিয়া দিতে হইবে ? — তার চেয়ে, ইহার গলায় ছুরি দেওয়াও হয়ত লঘু পাপ হইতে পারে।' তার মানসিক পরিবর্তনের জন্যই নবদুর্গা মোহন্তের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে।

উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে প্রভাবতীর চরিত্র অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং ~~বাস্তবরূপে~~ উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। প্রভাবতী বিবাহিতা কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় মায়ের কাছেই থাকে। দরিদ্রের সংসার, ব্যয় নির্বাহের জন্য মা রাঁধুনীর কাজ করে। প্রভাও একটু ভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে এবং মুখরা। প্রয়োজনবোধে নিজের রূপযৌবনের হাতছানিতে সে কাজ হাসিল করতেও পিছপা নয়। টাকার লোভেই সে নবদুর্গাকে উদ্ধার করতে রাজি হয়েছে — উপায়ন্তর না দেখে নবদুর্গার ছদ্মবেশে একাকী মোহন্তের ঘরে যেতেও সে বিশেষ ভীতা হয়নি। মোহন্ত যতই লম্পট হোক না কেন মানুষ ত বটেই — তার এই চিন্তাধারায় মনে এই ধরণের লম্পটকে মোকাবিলা করার অভ্যাস এবং সাহস দুইই তার আছে। অন্তর থেকে সে এই ধরণের লম্পটদের ঘৃণা করে, তার মনের ইচ্ছা মোহন্তের কান কেটে তাকে লাম্পট্যের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া এবং সে শেষ পর্য্যন্ত গরম চায়ের পেয়ালা মোহন্তের চোখেমুখে ছুঁড়ে দিয়ে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছে। উপন্যাসে তার ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত বাস্তবোচিত হলেও মোহন্তের সুরক্ষিত আবাসস্থল থেকে তার পলায়ন একটু অস্বাভাবিক মনে হয়।

অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে দরিদ্র কৈলাসচন্দ্রের নির্লোভতা, নিমাই মণ্ডলের চাতুর্য্য ইত্যাদি সুচিত্রিত।

প্রভাতকুমার উপন্যাসের পাত্রপাত্রীকে তাঁর পরিচিত ~~পরিবেশ~~

পারিপার্শ্বিকের বেশীদূরে স্থাপন করেন নাই। প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই পাত্রের আইন পড়ার ঝোঁক অথবা চরিত্রগুলির মুখে আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা শোনা যায়। তাদের অধিকাংশকে লেখক বিহার অথবা পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়েছেন। এখানেও দেখি দিলদারনগর, দানাপুর, বক্সার ইত্যাদি ষ্টেশনের উল্লেখ রয়েছে। বলাবাহুল্য এ সমস্ত স্থান প্রভাতকুমারের অতি পরিচিত। পাত্রপাত্রী বেশীর ভাগই বঙ্কিম অথবা রবীন্দ্রনাথের রচনা আওড়ে তাদের সাহিত্য প্রীতির পরিচয় দিয়েছে। এখানে মোহন্তকে দেখি নবদুর্গার রূপে উদ্বেল হয়ে বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর থেকে কোট করেছে —'তুমি কি বুঝিবে সন্ন্যাসী'।

সমসাময়িককালের দেশাচার অথবা মানসিকতার উল্লেখ উপন্যাসে পাওয়া যায়। উপন্যাস রচনা কালে আমাদের রাজনৈতিক আব-হাওয়ায় স্বাদেশিকতার ঝড় বয়ে চলেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে অনেকেই বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে দেশীয় ধুতি চাদর পরা শ্রেয় মনে করেছেন। মোহন্তর কাশী যাত্রাকালে তার ধুতি পাঞ্জাবী পরিধান উপলক্ষ্যে মানিকলাল তাকে বলেছে —' খুবচলবে হুজুর ! আজকাল স্বদেশীর যুগ কিনা, হুজুর, বড় বড় বাঙ্গালী ব্যারিষ্টাররা দিব্যি ধুতিচাদর পরে সভায় যাচ্ছেন, বক্তৃতা করছেন। বাড়ীতেও কত ব্যারিষ্টারকে দেখছি, হাইকোর্ট থেকে ফিরে এসে পাৎলুন ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরে চেয়ারে শুয়ে তামাক খাচ্ছেন।'

উপন্যাসের মূল বক্তব্যকে বাঙ্গালী সমাজের অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। একদিকে রয়েছে দরিদ্র পিতার কন্যাবিবাহ এবং অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জগতের পরোয়ানা নিয়ে সাধুবেশধারী বিত্তশালী মোহন্তজাতীয় ব্যক্তিদের ব্যভিচারের সমস্যা। সমাজে এই উভয় সমস্যার গুরুত্ব অনেকখানি। কিন্তু প্রভাতকুমারের রচনার গুণে এই গুরুগম্ভীর সামাজিক সমস্যাও আমাদের কাছে তেমন কোন গভীর সমস্যা বলে মনে হয় না। উপন্যাসের পরিবেশের মধ্যে তিনি এমন একটি হাস্য - রস - ধারা বইয়ে দিয়েছেন যেখানে মনে হয় মানুষ শত অপরাধ সত্ত্বেও অমানুষ হয়ে উঠতে পারে না, দুষ্ট লোকের শাস্তি অনিবার্য ভাবেই পেতে হবে। প্রথম বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অধরচন্দ্রের চরিত্রটিকে স্মরণ করা যেতে পারে। স্ত্রী বর্তমানে সে নবদুর্গাকে বিয়ে করেছে, মোহন্তের কাছে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে নবদুর্গাকে পাঠিয়ে দিতে স্বীকৃত হয়েছে, সে তহবিল তছরূপকারী—তার চরিত্রের এসমস্ত দোষ সত্ত্বেও যখন দেখি মোহন্তকে ফাঁকি দিয়ে নবদুর্গাকে নিয়ে সে পলায়ন করেছে তখন মনে মনে আমরা শান্তি অনুভব করি এবং আহ্লাদিত হই। প্রভাবতীও তেমন

সৎ বা আদর্শ চরিত্রের মেয়ে নয়। কিন্তু তার সব কলঙ্কের কথা ভুলে আমরা তাকে সাদরে বরণ করি যখন দেখি তারই হাতে লম্পট মোহন্ত নিগৃহীত হয়েছে।

উপন্যাস হিসাবে নবদুর্গা তেমন কোন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে না কিন্তু কাহিনীর সরস বর্ণনায়, কৌতুককর পরিস্থিতি সৃষ্টিতে এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রদর্শনে রচনাটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে।

(১৫)

'বিদায় বাণী' প্রভাতকুমারের সর্বশেষ উপন্যাস রচনা। উপন্যাসটি তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। উপন্যাসের ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রভাতকুমার লিখেছেন বাকি অংশ তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের রচনা। উপন্যাসটি আশ্বিন, ১৩৩৭ সাল থেকে চৈত্র, ১৩৩৮ সাল পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশকাল ৬ পৌষ, ১৩৪০।

উপন্যাসের প্রভাতকুমার রচিত পরিচ্ছেদগুলি নিম্নরূপ — প্রথম পরিচ্ছেদ — কন্যাদায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – মেয়ে দেখা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ — বাগবাজারে, চতুর্থ পরিচ্ছেদ – বালিগঞ্জে, পঞ্চম পরিচ্ছেদ — পাকাদেখা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - নন্দী পরিবার, সপ্তম পরিচ্ছেদ — সুমতির নিমন্ত্রন, অষ্টম পরিচ্ছেদ — সখী সংবাদ, নবম পরিচ্ছেদ — অগ্নিভক্ষণ, দশম পরিচ্ছেদ — শুশ্রূষা, একাদশ পরিচ্ছেদ — সুমতির মস্তিস্ক এখনও বড় দুর্বল, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ — সন্দেহ দোলায়, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ — সুসংবাদ, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ — বিবাহ, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ — নববধূ, ষোড়শ পরিচ্ছেদ — বিনিময়, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ — যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ — প্রতীক্ষা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ — ভীষ্মা প্রতিশোধ, বিংশ পরিচ্ছেদ — হতাশপ্রেমিক, একবিংশ পরিচ্ছেদ — নূতন কাসুন্দি, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ — শাড়ী প্রসঙ্গ, ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ — তাঁতিনী সংবাদ।

'বিদায় বাণী' প্রণয় ঘটিত সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস। প্রভাতকুমারের রচিত অংশে কাহিনী এইভাবে বর্ণিত হয়েছে — বিলাত ফেরত ব্যারিস্টার মি: সনৎ বোসের ইংরেজীয়ানায় অভ্যস্ত কলেজে পড়া ষোড়শী কন্যা সুমতি প্রখ্যাত কন্ট্রাকটর রায়বাহাদুর জে, কে নন্দীর ভ্রাতুস্পুত্র বিলাত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার সুবোধ নন্দীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু নন্দী সাহেব জাতিতে তন্তুবায় হওয়ায় কায়স্থ মি: বোস তার মেয়েকে সুবোধের সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজি হননি। সুবোধ চাকুরী নিয়ে দিল্লীতে চলে যায়। এবং সুমতিও প্রেমের ক্ষতকে একবৎসরের মধ্যেই মুছে ফেলে পিতামাতার মনোনীত পাত্র অনিলকুমারকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে।

ইতঃমধ্যে রায়বাহাদুর নন্দীর মেয়ে কনকলতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে তার বাড়ীতে আয়োজিত উৎসবে কনকলতার বান্ধবী সুমতি নিমন্ত্রিত হয়ে আসে। সুবোধ দিল্লীতে জেনে, বসু দম্পতিও সুমতিকে নন্দী ভবনে আসতে অমত করেননি। কিন্তু হঠাৎ সেদিন সকালেই সুবোধ বাড়ীতে এসেছে আর অপ্রত্যাশিত আগমনে সুমতি বা বসু দম্পতি কেউ যেন খুসী হতে পারেনি। সেদিন সন্ধ্যায় ম্যাজিকের আসরে হঠাৎ আগুন লাগায় দর্শকের আসনে বসে থাকা সুমতি পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। সুবোধ সেবা যত্নের মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তোলে। সুবোধ - সুমতি ছাদে বেড়াতে গিয়ে তাদের পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে এবং সুমতির কথাবার্তায় সুবোধের মনে ধারণা জন্মে সুমতি হয়ত আগের মতই তাকে ভালবাসে এবং সে প্রস্তাব করে সুমতিকে বিলাতে নিয়ে গিয়ে আইনসঙ্গত ভাবে বিয়ে করবে। সুমতি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরদিন তার মতামত জানাবে বলে বাড়ী যায় এবং সুবোধের সঙ্গে তার বিয়ের অমতের কথা জানিয়ে দেয়। নির্ধারিত দিনে অনিলকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। অষ্টমঙ্গলা সেরে অনিলকুমার বাড়ী যাওয়ার দিন তাকে বিষাদগ্রস্ত দেখায়। কারণ সুমতিদের ইংরেজী ধরণের আদব কায়দা তার ভাল লাগেনি। তাছাড়া সুমতির মধ্যেও নববধূর অনুরাগ যেমনটি আশা করেছিল তেমন পায়নি। তার এই মানসিক অবস্থায় তাদের বাড়ীতে কাপড় বিক্রী করতে আসা তাঁতিনীর মুখে সুবোধ-সুমতির প্রণয় কথা জানতে পেরে অনিলের বুক থেকে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

প্রভাতকুমারের রচিত কাহিনী অংশে তাঁর কয়েকটি বিশেষ চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রথমত: - বিলাত ফেরত ব্যারিস্টার সনৎ বোসের যৌবনকালের উগ্র ইংরেজীপনা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হয়েছে — প্যান্ট কোট পরলেও মাঝে মধ্যে ধুতি পরেন। আগে জাতিভেদ প্রথা মানতেন না কিন্তু নিজের কন্যার বিয়ের ব্যাপারে তিনি সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নি ।প্রকৃতপক্ষে তদানীন্তন সমাজে বিলাতফেরতগণ নিজেদের উদার এবং সংস্কারমুক্ত বলে প্রচার করলেও জাতিভেদ প্রথার উর্দ্ধে অনেকেই উঠতে পারেননি। প্রভাতকুমার নিজেও তাঁর গল্প কাহিনীতে আন্তর্জাতিক বিবাহ ঘটিয়েছেন।কিন্তু হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করে পাত্র পাত্রীর মিলন কোথাও ঘটাননি। এখানে জাতি বৈষম্যের জন্যই চাল-চলনে, ভাবে-ভঙ্গিতে এমনকি কণ্ঠস্বরে পর্যন্ত সাহেবীয়ানা হয়েও সুবোধ বিলাত ফেরত সমাজের কলেজে পড়া শিক্ষিতা মেয়ে সুমতিকে লাভ করতে পারেনি ।সনৎ বোসের চরিত্রে বিলাত ফেরতদের আচার আচরণের অসঙ্গতির প্রতি লেখক ইঙ্গিত করেছেন ।

দ্বিতীয়ত: — বেশি বয়সী কলেজপড়া মেয়েদের চটুল প্রেমের প্রতি লেখকের কটাক্ষ অনুভব করা যায় ।

তৃতীয়ত: — কিছু লোকের মধ্যে তৎকালীন সমাজে বিলাত ফেরতের সঙ্গে মেলামেশা করার এবং বিলাতে না গিয়েও সাহেব হবার ইচ্ছা দেখা যেত ।এই ইচ্ছার প্রকাশ ঘটেছে রামজীবনবাবুর চরিত্রে ।

চতুর্থত:— উচ্চমধ্যবিত্ত, আধা বিলাতী সমাজের মধ্যেও মুষ্টিমেয় সত্যকারের হিন্দু - সংস্কার সম্পন্না গৃহিনী ছিলেন, রামজীবনবাবুর স্ত্রী তার পরিচয় বহন করছে ।

অসমাপ্ত 'বিদায় বাণী' রচনায় তাঁর প্রতিভার কোন নূতন দিগ্দর্শনের ইঙ্গিত পাই না ।

প্রভাতকুমারের উপন্যাস আলোচনায় দেখা যায় এখানকার পাত্রপাত্রীরা প্রায় সকলেই এসেছে আমাদের পরিচিত পরিবেশ থেকে।তাদের জীবনাচরণ, মানসিক সংগঠন সবই আমাদের কাছে অতি পরিচিত বলেই মনে হয়। 'রমাসুন্দরী'র নবগোপাল, 'নবীন সন্ন্যাসী'র মোহিত, 'রত্নদীপ'র রাখাল, 'জীবনের মূল্য' এর গিরিশচন্দ্র ,'সিন্দুর কৌটা'র বিজয় ইত্যাদি নায়ক চরিত্রগুলি শুধু নয় অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্র এমনকি যে কুটিল চরিত্রগুলি উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে

তাদের অবস্থিতিও আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের অধিক দূরবর্তী নয়। জমিদার শাসিত পল্লীগ্রামের স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন সীতানাথ, কূটজাল বিস্তারে কুশলী গদাই পাল অথবা জমিদার পরিবারের আত্মীয়বৎ প্রকৃত হিতৈষী রঘুনাথমজুমদারের মত দেওয়ানজি সেকালের জমিদার শাসিত অঞ্চলে দুর্লভ ছিল না। উপন্যাসে জায়া ও জননীর যে প্রেম-স্নেহশীল হৃদয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে সেই পরিচয়ে আমাদের বাঙ্গালী সংসারের প্রেমশীলা বধূ এবং স্নেহপূর্ণ মাতৃহৃদয়কে স্মরণ করায়। সন্তানের প্রতি বাঙ্গালী মাতৃহৃদয়ের স্নেহাধিক্য বহুক্ষেত্রেই সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালনায় ব্যর্থ হয়। কোন ধ্যানলোকের আদর্শায়িত মাতৃমূর্তি নয়, দোষেগুণে ভরা সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের মাতৃহৃদয়ের স্বরূপ প্রভাতকুমার চিত্রিত করেছেন। 'রমাসুন্দরী'র কমলাদেবী, আরতি' উপন্যাসের বিনোদের মাতার চরিত্র-চিত্রণে সেই পরিচয় রয়েছে। উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণে প্রভাতকুমার কোন আদর্শায়িত জীবনরূপের সন্ধান করেন নাই। আমাদের নিত্য দিনের সমাজ-সংসার-পরিবেশে যে মানুষ তার আপন প্রাণের তাগিদে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, সুখ - ঐশ্বর্য, দু:খ -দুর্যোগ, অযাচিত করুণা অথবা প্রবঞ্চনা, স্খলন - পতন - ত্রুটি সত্ত্বেও জীবনধারণ করে চলেছে প্রভাতকুমারের উপন্যাসে তাদেরই মিছিল এগিয়ে গেছে।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসে যে সমস্যাগুলি চিত্রিত আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রায়শ:ই সেই সমস্যার সন্ধান পাওয়া যাবে। সমস্যা - সমাধানের উপায়টিও সেই সাধারণ জীবনবোধের অনুগত। উপন্যাসের নায়কনায়িকার মনে প্রেম সমস্যা আছে কিন্তু সেই সমস্যা তীব্র তীক্ষ্ণরূপে জীবনের মর্মমূলে বিদ্ধ হয়ে জীবনকে গভীরভাবে কোথাও আন্দোলিত করেনি। বঙ্কিম সাহিত্যে নর - নারীর প্রেম-সমস্যা রূপায়িত এবং সেই সমস্যার তীব্রতা জীবনকে গভীরভাবে আলোড়িত করলেও নীতি - আদর্শের শৃঙ্খলে প্রায়শ:ই শৃঙ্খলায়িত। রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিত্রণে প্রেমের জটিলতা এবং তার বিপুল ঐশ্বর্য ও মহিমাময় রূপটি প্রকাশিত। শরৎচন্দ্র নর - নারীর হৃদয়ের অন্ত:পুরে প্রবেশ করে তার প্রেম সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটনেরচেষ্টা করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রেমের অচরিতার্থতায় সমাজের তথা কথিত নীতি - নিয়মের দুষ্টক্ষতের প্রতি তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশিত হয়েছে। প্রভাতকুমারের নর-নারীর প্রেম সমস্যা মানব-হৃদয় - রহস্যের কোন অনালোকিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশের চেষ্টা বিশেষ করে নাই। সাধারণত: মানুষের প্রেমার্তি, প্রেমাস্পদ-মিলনে তার উৎকণ্ঠা, প্রেমের তাড়নায় আমাদের সাময়িক চিত্তবিক্ষেভ এবং বিভ্রান্ত চিত্তের কৌতুক অসঙ্গতিপূর্ণ আচার আচরণই বিশেষভাবে রূপায়িত। প্রেমের ক্ষেত্রে সামাজিক বিধি নিষেধকে অতিক্রম করা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্র কারও পক্ষেই সম্ভব হয় নাই। তবুও তাঁদের রচনায় প্রেমের যে জটিলতর রূপ এবং তীব্রতাকে অনুভব করা যায় প্রভাত-সাহিত্যে প্রেমের সেই জটিলতর

রূপটি প্রায়শঃই অনুপস্থিত। ফলকথা, হৃদয়ের গভীরে নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন অপেক্ষা উপরিতলের ঘটনা বর্ণনাই প্রভাত-উপন্যাসে সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রভাতকুমারের চরিত্রচিত্রণের এই বিশেষ ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর জীবন-দৃষ্টি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল সহজ সরল এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী। বাঙ্গালী হিন্দু পরিবার ও সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধকে তিনি সহজেই মেনে নিতে পেরেছিলেন। শুধু স্বীকার করা নয় এই নীতি এবং সংস্কারের প্রতি তাঁর গভীর আস্থার কথা সহজেই অনুমান করা যায়। জীবন সম্পর্কে এই সহজ রসদৃষ্টি বিংশ শতাব্দীর কোন রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা ধর্ম্মীয় আন্দোলনে ব্যাহত হয় নাই। বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের হতাশাও তাঁর এই বিশ্বাসকে বিচলিত করতে পারেনি। কল্লোলযুগের লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যখন 'বিবাহের চেয়ে বড়' (১৯৩১) রচনা করেছেন, প্রবোধ কুমার সান্যাল যখন 'যাযাবর' লিখেছেন, প্রভাতকুমার তখন 'সতীর পতি' (১৩৩৩) উপন্যাসের মাধ্যমে হিন্দুনারীর সতীত্বের জয়গান করে চলেছেন। তাঁর শান্ত-সংযত-দৃষ্টির সম্মুখে সমস্যাসঙ্কুল জীবনধারা প্রবাহিত হলেও প্রভাত-মানস সেই সমস্যার সমাধান সহজেই খুঁজে পেয়েছে। বিবাহিত বিজয়ের অপর নারীতে আসক্তি যে সমস্যার উত্থাপন করেছিল, বিজয়ের সতী-সাধ্বী স্ত্রী বকুরাণীর পরম উদারতায় সুশীকে সপত্নীত্ব গ্রহণের অধিকারদান মাধ্যমে সেই সবকিছুর সহজ সমাধান ঘটেছে। কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাবের অধিকারী হলেও তাঁর শিল্পদৃষ্টি ছিল সংযত এবং অতিরেক-বিমুখ; সাহিত্য রচনার অন্তরালে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণে তিনি বিরত থেকেছেন। তথাকথিত প্রগতিবাদী অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু, প্রগতিশীল ব্রাহ্ম, ইংরেজ শাসক অথবা স্বদেশী আন্দোলনকারী কোন পক্ষকেই প্রভাতকুমার কোথাও অকুণ্ঠ সমর্থন জানান নাই। আবার বিরোধিতায় বিষোদ্গার থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন। বরং দেখা যায় এদের কার্য্যকলাপের মধ্যে যে আতিশয্য, অসঙ্গতি রয়েছে তাকে অবলম্বন করে তিনি কিছু রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক করেছেন। কিন্তু সেইজন্য যদি ভাবা যায়, তাঁর জীবনদৃষ্টি অগভীর, তাহলে ভুল করা হবে। গভীর সহানুভূতিতেই তিনি জীবনকে দেখেছেন, ফলে ঐকান্তিক দুঃখভার কারও ভাগ্যে চাপিয়ে দিতে তিনি স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত হয়েছেন। তাই তাঁর উপন্যাস কাহিনীর পরিণতি প্রায়শঃই হয়ে উঠেছে মধুরান্তিক। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের আনন্দ-উপলব্ধি ব্যক্তি-জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী আনন্দধারার সঙ্গে হয়ত যুক্ত হতে পারেনি, যেমন হয়েছে রবীন্দ্রচিন্তায়। হয়ত তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের জীবন-জিজ্ঞাসা শরৎচন্দ্রের মত আমাদের সামাজিক পারিবারিক জটিল জীবনের মর্ম্মমূলে অনুপ্রবিষ্ট নয়, কিন্তু তাঁর জীবনদৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে

ইন্দ্রধনুর রঙিন আভা, অশ্রুও যেখানে হাসির কিরণে উজ্জ্বলতা পেয়েছে।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলি মূলত: ঘটনাপ্রধান। বঙ্কিমের উপন্যাসে চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও ঘটনার গতিবেগ অনেকাংশে চরিত্রবিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। প্রভাতকুমারের উপন্যাসেও প্রায় সর্বত্রই ঘটনার প্রাধান্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারেনি। চরিত্রবিশ্লেষণ রীতিতে উপন্যাস রচনার অভ্রান্ত ইঙ্গিত 'চোখের বালিতে' থাকলেও প্রভাতমন সেই দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। বরং দেখা যায় নানা চমকপ্রদ এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমাবেশে কাহিনীর সরস প্রবাহে চরিত্রগুলি পরিণতির দিকে প্রবাহিত হয়েছে। উপন্যাসের নর নারী চারিত্রিক স্বকীয়তায় ঘটনা প্রবাহকে চালিত করতে পারে নাই।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসে চরিত্র বিশ্লেষণ থেকে কাহিনী কথন অত্যধিক গুরুত্ব পাওয়ায় একটি সম্পূর্ণ কাহিনী উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে এবং কাহিনী সমাপ্তিতে পাঠকমনের জিজ্ঞাসার অবকাশ প্রায়শই আর থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ঘটনা বর্ণনার আধিক্যে কিছু অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার কাহিনীতে অনুপ্রবেশ করে কাহিনী বিন্যাসে সংহতি প্রদানে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

কাহিনী বর্ণনায় উপকাহিনী সংযোজন প্রবণতা প্রভাতকুমারের মূল উপন্যাস রচনার অন্যতম রীতি। উপন্যাসে উপকাহিনীর উপযোগিতা মূল কাহিনীর পরিপোষক হিসাবে। প্রভাতকুমারের উপন্যাসে উপকাহিনী সংযোজন সর্বত্র সার্থক হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসের কাশ্মীর বর্ণনার অংশ অথবা 'নবীন সন্ন্যাসী'র ভৌতিক কান্ড, আফিমচোর' ইত্যাদি উপকাহিনীও মূল কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য ছিল না, 'জীবনের মূল্য', 'সত্যবালা' ইত্যাদি উপন্যাসেও এই উপকাহিনী বর্ণনার প্রবণতা লক্ষনীয়।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলিতে বর্ণনা অংশের স্বল্পতা এবং সংলাপ রচনার আধিক্য বর্তমান। উপন্যাসের বর্ণনা অংশে, ঘটনা, লেখক কর্তৃক বিশ্লেষিত হয়ে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হয়। ফলত: লেখকমনে ঘটনার প্রতিক্রিয়া এবং উপলব্ধির কথাও স্বভাবতই এই রীতিতে সমধিক প্রকাশিত হয়। সংলাপ মাধ্যমে ঘটনা এবং চরিত্র উপস্থাপিত হলে লেখক মনের ভাবনা পাত্র-পাত্রীর সংলাপের অন্তরালে চাপা পড়ে যায়। সংলাপবহুল উপন্যাস নাটক-দর্শনের আনন্দ উপভোগ করায়। প্রভাতকুমারের উপন্যাসে এই নাট্যধর্মীতা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর 'মনের মানুষ' উপন্যাসের অংশবিশেষ উদ্ধার করা গেল। —

'নিগমানন্দ কুঞ্জলালের মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া, একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার মনে যে দুশ্চিন্তা আছে তা কি কোনও জীব-ঘটিত ?"

কুঞ্জ বলিল, " আজ্ঞে, জীব-ঘটিত বইকি ।"

নিগমানন্দ সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "কোন স্ত্রীলোক-ঘটিত ?"

কুঞ্জলাল করযোড়ে বলিল, " স্বামীজি সর্ব্বজ্ঞ ।"

স্বামীজি বলিলেন" বুঝেছি । সন্ধ্যা বেলা একদিন তুমি এস। সে সময় কেউ থাকে না । তোমার কি দুঃখ, শুনবো । যোগমায়ার কৃপা হলে সবই হতে পারে । দেবীর হোমের জন্য আধসের উত্তম গব্য ঘৃত নিয়ে এস। "

এখানে নিগমানন্দের 'চাহনি', 'মুচকি হাসা' কুঞ্জলালের সসংকোচ ভাব, প্রকাশের মধ্যে যেন নাট্যকারের নির্দেশ রয়েছে । লেখক এখানে কুঞ্জলালের কুণ্ঠিত মনোভাব অথবা নিগমানন্দের তথাকথিত গুরুসুলভ গাম্ভীর্যের অন্তরালে স্বার্থসিদ্ধির মনোভাবটি সংলাপের মধ্যে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করেছেন । চরিত্র সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য নয়, তাদের আচার আচরণেই মনোভাব সুপ্রকাশিত ।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলি নামাঙ্কিত পরিচ্ছেদে বিভক্ত। পরিচ্ছেদের নামকরণ বর্ণিত বিষয়ের স্পষ্ট আভাষ আছে । পরিচ্ছেদের এই নামকরণ উপন্যাসকে নাটকের লক্ষণাক্রান্ত করেছে। তাঁর সমকালের রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস রচনায় এই পন্থা অবলম্বন করতে দেখাযায় না । এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রভাতকুমারকে কিছুটা বঙ্কিমরীতি অনুসারী বলে মনে হয় ।

ঘটনা এবং চরিত্রের বিবরণ প্রদানে পরোক্ষ উক্তি, চিঠিপত্রের ব্যবহার, স্বপ্ন দর্শন ইত্যাদি উপন্যাস রচনার অন্যতম প্রচলিত কৌশল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিষবৃক্ষ', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ইত্যাদি উপন্যাসে অনেকস্থলে পত্র মাধ্যমে ঘটনা এবং চরিত্রের বিবৃতি প্রদান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ' নৌকাডুবি ,' 'চোখের বালি', গোরা' ইত্যাদি উপন্যাসে পত্র ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে । শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত', চন্দ্রনাথ ইত্যাদি উপন্যাসেও পত্রের ব্যবহার দেখা যায় । প্রভাতকুমার তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই পত্রের ব্যবহার করেছেন। এই পত্রগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পত্রলিপিকে স্মরণ করায় । পত্রগুলিতে 'শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়' থেকে আরম্ভ করে 'আজ্ঞাধীন', 'তোমার স্নেহের' ইত্যাদি পত্র লিখনের বিশেষ ভঙ্গীটি পর্যন্ত প্রভাতকুমার ব্যবহার করেছেন। এই অনুসরণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না । প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস মধ্যে পত্র ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য, কাহিনীর সংযোগ রক্ষায়, ঘটনার

কার্য্য কারণ বিশ্লেষণে অথবা চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্যও পত্র ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রভাতকুমারের 'নবীন সন্ন্যাসী'র গদাই পালের লিখিত পত্রগুলি উপন্যাসের কাহিনী রচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টি এবং মুক্তির মূলে এই পত্রগুলি। আবার উপন্যাসের দুইটি সমান্তরাল কাহিনীর সংযোগসূত্ররূপে দেখা দিয়েছে মোহিতের নামে লেখা পত্রটি। 'সিন্দুর কৌটা'য় বিজয়-সুশীর প্রণয় কাহিনী বকুরাণীর কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে বকুরাণীকে লিখিত বিজয়ের পত্রগুলিতে। 'প্রতিমা' উপন্যাসের মিলনান্তক পরিণতির মূলে রয়েছে একটি পত্র। 'সুখের মিলন' উপন্যাসে হ্যারি বনার্জির লিখিত পত্রদুইটি কাহিনীর রহস্য এবং জটিলতার উন্মোচন ঘটিয়েছে।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত অথবা অলৌকিকতা বিশেষ স্থান পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীতে অলৌকিকতা সৃষ্টির জন্য স্বপ্নদর্শন অথবা অস্থির মানসিকতার মাধ্যম অবলম্বন করেছেন। 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীর চিন্তায় এর পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া রচিত হয়েছে কখনও বাঙ্গালী জীবনের সংস্কারের উপর ভিত্তি করে (সম্পত্তি সমর্পণ, গুপ্তধন ইত্যাদি গল্পে) আবার মনোবিকারের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে 'নিশীথে', ক্ষুধিত পাষাণ' ইত্যাদি গল্পে। প্রভাতকুমার বাঙ্গালী জীবনের সাধারণ সংস্কারের উপর ভিত্তি করে উপন্যাসে দুই একটি ভৌতিক কাহিনী সংযোজন করেছেন মাত্র (যেমন নবীন সন্ন্যাসী'র একটি ভৌতিক কান্ড চতুর্দশ পরিচ্ছেদ)। কিন্তু সেখানে কোন অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। প্রভাতকুমারের উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর স্বপ্নদর্শন অনেকাংশে ফ্রয়েডিয় মনোবিজ্ঞান সম্মত, কোন অলৌকিকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য লেখকের মধ্যে দেখা যায় না। বিধবা বৌরাণীর নিজেকে নববধূরূপে স্বপ্নে দর্শন, মোহিতের নিজেকে বর এবং চিনিকে বধূবেশে স্বপ্নেদর্শন, উভয়ের চিত্তের অবদমিত যৌনাকাঙ্খার পরিচায়ক হিসাবে ব্যাখ্যা করলে হয়ত ভুল করা হবেনা। 'জীবনের মূল্য' উপন্যাসে প্রৌঢ় গিরিশচন্দ্রের সদ্যযৌবনাগতা প্রভাবতীকে তার প্রথম পক্ষের পত্নীরূপে স্বপ্নে দেখাকেও একইভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। 'মনের মানুষ' উপন্যাসের কুঞ্জলালের দীর্ঘ স্বপ্নদর্শনের পশ্চাৎপটে আছে সন্ন্যাসীদত্ত মোদকভক্ষণের মনোবিকাররূপ প্রতিক্রিয়া। কুঞ্জলালের এই মনোবিকারের আশ্রয়েই লেখক অসম্ভব সব ঘটনা উপস্থাপিত করে কাহিনীতে আমেজ আনার চেষ্টা করেছেন।

বাংলা উপন্যাস-রচয়িতার আসরে-প্রভাতকুমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ঔপন্যাসিকের অভাব হয়ত নাই । উপন্যাস রচনায়, কাহিনী ও চরিত্র বিশ্লেষণের সার্থক সমন্বয়ে সামগ্রিকভাবে যে ঐক্যবন্ধরূপ আশা করা যায় প্রভাতকুমারের উপন্যাসে সর্বত্র সেই সার্থকতা হয়ত অনুপস্থিত। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি কোন দুর্বার অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে তাড়িত হয়ে জীবনকে উন্মথিত হয়ত করে নাই । কিন্তু তাঁর সমকালে রবীন্দ্র-শিল্প - ব্যক্তিত্বের ব্যাপক প্রভাব সত্ত্বেও সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের শান্তরসের সাধক প্রভাতকুমার অনায়াস ভঙ্গিতে তাঁর উপন্যাসে যে জীবনকথা শুনিয়ে বাঙ্গালী পাঠক হৃদয়কে মুগ্ধ করেছেন — সেই জনপ্রিয়তাই তাঁর শিল্প সাধনায় সিদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে ।

— X —

উল্লেখ পঞ্জী

১। কথাশিল্পী প্রভাতকুমার — কালিদাস রায়, উপাসনা, বৈশাখ, ১৩৩৯

২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (চতুর্থ সং)-শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১৯

৩। An Introduction to the study of Literature(41 Indian Ed.)- W.H. Hudson page 131

৪। ঐ ঐ ঐ (ঐ ঐ

৫। Aspects of the Novel(Penguin Books,1970)- E.M.Forster-page 30-31

৬। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে 'ভারতী'তে প্রথমে 'সুন্দরী' নামে মুদ্রিত হয়।

৭। বেঙ্গল লাইব্রেরীর সংকলিত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা মতে প্রকাশকাল ২৬ এপ্রিল, ১৯০৮।

৮। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ২ শ্রাবণ, ১৩০৬ সালের পত্রাংশ — দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫ পৃ: ১৬৬ - ৬৭

৯। চোখের বালি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী(জন্মশতবার্ষিকী সং) সূচনা অংশ পৃ ২১২

১০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(দ্বিতীয় খন্ড) — সুকুমার সেন — পৃ: ২১৫

১১। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খন্ড) — সাহিত্যসংসদ প্রকাশিত - পৃ: ৩৪২

১২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড) — সুকুমার সেন, পৃ: ২৩৮

১৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ৬১

১৪। সাধনা — চতুর্থবর্ষ, প্রথম ভাগ, পৃ: ৪৭১

১৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড) — সুকুমার সেন পৃ: ২১৫

১৬। রমাসুন্দরী — প্রভাত গ্রন্থাবলী (প্রথম খন্ড) শ্রীভবন প্রকাশিত, পৃ: ২৫৩

১৭। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ২১৪

১৮। বাংলা সাহিত্যের নরনারী — প্রমথনাথ বিশী, পৃ: ১৩৫

১৯। প্রভাতকুমার: জীবন ও সাহিত্য- ডা: শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ১৪৯

২০। বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খন্ড) সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত — পৃ: ২৪৯

২১। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৭২

২২। ঐ — ঐ পৃ: ৭২

২৩। রমাসুন্দরী — প্রভাত গ্রন্থাবলী(প্রথম খন্ড), শ্রীভবন প্রকাশিত, পৃ: ২৩৮

২৪। ঐ ঐ ঐ পৃ: ২৩৯

২৫। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ২১৪

২৬। রমাসুন্দরী - প্রভাত গ্রন্থাবলী-(প্রথম খন্ড), শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ২৩৪

২৭। ঐ ঐ — (ঐ) ঐ পৃ: ২৬১

২৮। ঐ ঐ — (ঐ) ঐ পৃ: ২৮৭

২৯। প্রবাসী —পৌষ, ১৩১৪(শ্রীযুদ্যান্ত্রিক শর্ম্মাকৃত সমালোচনা)।

৩০। নবীন সন্ন্যাসী — প্রভাত গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় খন্ড) শ্রীভবন প্রকাশিত, পৃ: ২৩৩

৩১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ: ২১৫

৩২। প্রবাসী — অগ্রহায়ণ ১৩১৯।

৩৩। প্রভাত গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) — শুভবন প্রকাশিত, পৃঃ ৩০২

৩৪। ঐ (ঐ) — ঐ পৃঃ ৪৪৭ - ৪৮

৩৫। ঐ (ঐ) — ঐ পৃঃ ৪৪৯

৩৬। ঐ (ঐ) — ঐ পৃঃ ৪৫৫

৩৭। ঐ (ঐ) — ঐ পৃঃ ৪৯২

৩৮। ঐ (ঐ) — ঐ পৃঃ ৩০৪

৩৯। ঐ (ঐ) — ঐ পৃঃ ৩০৫ - ৩০৬

৪০। ঐ (ঐ) — ঐ পৃঃ ৩৬২

৪১। ঐ (ঐ) — ঐ পৃঃ ২৪৯

৪২। ঐ (ঐ) — ঐ পৃঃ ২৪৮

৪৩। ঐ (ঐ) — ঐ পৃঃ ২৫০

৪৪। প্রবাসী — অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

৪৫। ঐ — ঐ

৪৬। ঐ — ঐ

৪৭। মনীষা - মন্দিরে — কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, সঙ্কলন, অগ্রহায়ণ, ১৩২১।

৪৮। An introduction to the study of literature(Fourth Indian - Ed. W.H.Hudson -- Ed. Page 140

৪৯। ঐ ঐ ঐ Page 139

৫০। নবীন সন্ন্যাসী - প্রভাত গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)- শ্রীভবন প্রকাশিত, পৃঃ ২১৮-১৯

৫১। ঐ ঐ (ঐ) - ঐ পৃঃ ২১৯

৫২। ঐ ঐ (ঐ) - ঐ পৃঃ ৫০৩

৫৩। প্রবাসী — অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ (ক) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২১৫

৫৪। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ (প্রথম সং)-ডঃ রামদুলাল বসু

৫৫। প্রভাত গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড)— শ্রীভবন প্রকাশিত পৃঃ ২৬০

৫৬। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ২৭৯

৫৭। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ২৯৭

৫৮। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৩০৭

৫৯। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৩৭৮

৬০। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৩৭৯

৬১। ঐ ঐ — ঐ

৬২। প্রভাত গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড) — শ্রীভবন প্রকাশিত পৃঃ ৪৫৭
৬৩। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৪৫৭
৬৪। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৪৬০
৬৫। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৪৬৩
৬৬। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৪৬৭
৬৭। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ২৫৮
৬৮। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৩৩৮ - ৩৯
৬৯। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৪৫৭
৭০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — পৃঃ ২৯৬
৭১। প্রভাত গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড) — শ্রীভবন প্রকাশিত পৃঃ ৩০৬
৭২। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৪৮১
৭৩। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৩৫০
৭৪। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৩৫০
৭৫। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ২৯৪ - ২৯৫
৭৬। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ২৮৩
৭৭। জীবনের মূল্য —(ভূমিকা —গ্রন্থাবলী সিরিজ)- প্রভাত গ্রন্থাবলী ৪র্থ ভাগ বসুমতী সাহিত্য মন্দির পৃঃ ১

(ডঃ শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'প্রভাতকুমার : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে এ সম্পর্কে প্রথম সংস্করণের যে উদ্ধৃতি (পৃ নং ১৭৭)দিয়েছেন সেখানে কিছু পাঠভেদ আছে)

৭৮। প্রভাতকুমার জীবন ও সাহিত্য—ডাঃ শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ১৭৯
৭৯। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২১৬
৮০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)-ডাঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৫৪
৮১। প্রভাত গ্রন্থাবলী (চতুর্থ খণ্ড ১ম সং)-শ্রীভবন প্রকাশিত পৃঃ ২০৮
৮২। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৩২৫
৮৩। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৩২৫
৮৪। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৩২৭
৮৫। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৩৬৯
৮৬। ঐ ঐ — ঐ পৃঃ ৩৭৪
৮৭। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২১৬
৮৮। প্রভাত গ্রন্থাবলী (চতুর্থ খণ্ড)-শ্রীভবন প্রকাশিত পৃঃ ২২২
৮৯। প্রভাত গ্রন্থাবলী (পঞ্চম খণ্ড)-শ্রীভবন প্রকাশিত ১০৬
৯০। মানসী ও মর্ম্মবাণী — আশ্বিন, ১৩৩৩
৯১। প্রভাত গ্রন্থাবলী (পঞ্চম খণ্ড) শ্রীভব পৃঃ

৯২। প্রভাত গ্রন্থাবলী (পঞ্চম খন্ড)– শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ৩১৮

৯৩। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ২১৩

৯৪। প্রভাত গ্রন্থাবলী (পঞ্চম খন্ড) – শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ৩২১ - ২২

৯৫। ঐ ঐ – ঐ পৃ: ৩৩৫

৯৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড) - সুকুমার সেন পৃ: ১৬৭

৯৭। প্রভাত গ্রন্থাবলী (ষষ্ঠ খন্ড) - শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ৪১৬

৯৮। প্রভাত গ্রন্থাবলী ষষ্ঠ খন্ড) - শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ২৩৫

৯৯। ঐ ঐ – ঐ পৃ: ২৭৫

১০০। ঐ ঐ – ঐ পৃ: ৩৯০

১০১। ঐ ঐ – ঐ পৃ: ২৯৭

১০২। ঐ ঐ – ঐ পৃ: ২৯৭ - ২৯৮

১০৩। ঐ (সপ্তম খন্ড) – ঐ পৃ: ২৪২

১০৪। ঐ ঐ – ঐ পৃ: ১৭৪

১০৫। ঐ ঐ – ঐ পৃ: ১৭৪

১০৬। ঐ ঐ – ঐ পৃ: ১৭৯

১০৭। ঐ ঐ – ঐ পৃ: ১৫৫

১০৮। ঐ ঐ – ঐ পৃ: ১৮৩

১০৯। প্রভাত গ্রন্থাবলী (সপ্তম খন্ড)– শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ৪৭৬

শ্রীসনৎ কুমার গুপ্ত লিখেছেন —' এসব সংবাদ আমি গ্রন্থকারের অভিন্ন সুহৃদ কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রমুখাৎ জেনেছি ।'

১১০। প্রতিমা – প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ: ৩

১১১। সুখের মিলন (ভূমিকা)–প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১১২। ঐ ঐ – ঐ পৃ: ১৫৪

১১৩। প্রভাত কুমার: জীবন ও সাহিত্য – ড: শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়

পৃ: ২০১

— গল্প —

(১)

বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিচিতি এবং প্রতিষ্ঠা কবি অথবা ঔপন্যাসিক হিসাবে ততখানি নয় যতখানি গল্পকার হিসাবে। মূলত: তাঁর অপূর্ব রসঘন, অনবদ্য হাস্য কৌতুকাশ্রিত গল্পগুলির জন্যই সমকালীন পাঠকমনকে তিনি জয় করেছিলেন এবং তিরোধানের প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পরে আজও আমরা তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। ভাবলে বিস্ময় জাগে, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে গল্প রচনা শুরু করে, তাঁরই সমকালে বসে প্রভাতকুমার গল্পকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ থেকেও বেশী জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ বাংলা সার্থক ছোটগল্পের প্রবর্তকই শুধু নন শ্রেষ্ঠ রচয়িতার সম্মান তাঁরই প্রাপ্য এবং একথাও স্বীকার্য সাহিত্যিক প্রতিভার তুলনামূলক বিচারে উভয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠতর। অবশ্য প্রভাতকুমারের এই জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান খুব দুরূহ নয়। রবীন্দ্রনাথ মূলত: কবি এবং তাঁর সৌন্দর্যানুভূতির সূক্ষ্মতা, গভীর আবেগের বিদগ্ধ বিশ্লেষণকে পাঠকমন তখনও ঠিক সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলত: তখনও তিনি মুষ্টিমেয় পাঠকের লেখক এবং তাঁর গল্পগুলিতে বস্তু-অতিরেক মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্যে পাঠক অনুভব করেছে আপাত দুরূহতা। এছাড়া 'নষ্টনীড়' (১৩০৮) এর মতো গল্পে তিনি আমাদের সামাজিক পরিবেশে অবৈধ অথচ নরনারীর হৃদয়ের চিরন্তন প্রেমাকাঙ্ক্ষার যে সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন সেজন্য তাঁকে দুর্নীতি প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। তাঁর 'পয়লা নম্বর' (১৩২৪), 'স্ত্রীর পত্র' গল্পগুলিও তখনকার সমাজ পরিবেশ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে না পারায় তাঁর জনপ্রিয়তায় আঘাত লেগেছে। বাংলার সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্রের পূর্ণোদয় তখনও হয়নি এবং রবীন্দ্রনাথের সুউচ্চ ভাবাদর্শের সঙ্গে পাঠকমন তখনও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। এই দুইয়ের মধ্যবর্তীকালের পাঠকমনের শূন্যতাকে পূর্ণ করেছেন প্রভাতকুমার।

ছোটগল্পকার প্রভাতকুমারের এই সিদ্ধির কারণ নির্ণয়, তাঁর গল্পের পরিচয় প্রদান এবং রচনাশিল্পের নৈপুণ্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গ তাঁর সমসাময়িককাল থেকে আধুনিককালের সাহিত্যসমালোচকগণ কর্তৃক নিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর 'ষোড়শী' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে 'প্রবাসী'তে গল্পগ্রন্থটির সমালোচনায় বলা হয়েছে ' প্রভাতবাবুর গল্প সর্বজন সমাদৃত, সুতরাং তাহার নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। এই 'ষোড়শীর' ষোলটিগল্প লেখকের গল্প-রচনা শক্তির মধ্যাহ্ন কালের রচনা সুতরাং এগুলি তাঁহার অ-সাধারণ শক্তির বিশেষত্ব সমূহে যে অলঙ্কৃত তাহাও বলা বাহুল্য। এ গল্পগুলি হাস্য ও

করুণ উভয় রসের সমাবেশে পরম উপভোগ্য হইয়াছে। ভাষা সহজ, ব্যঞ্জনা যথাযথ, আখ্যান ঘরোয়া ; সুতরাং ইহা সকল শ্রেণীর পাঠকের প্রীতিপ্রদ ।....১ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'ষোড়শী' এবং 'নবকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠে প্রভাতকুমারের প্রশস্তি লিখেছিলেন —'দ্বিতীয়বার যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল ।হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে, বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।.....'২

মোহিতলাল মজুমদার শরৎচন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন —' শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে একটি হাস্যোজ্জ্বল অথচ শিশির স্নিগ্ধ বাস্তব কল্পনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে কল্পনায় সুপরিচিত দৈনন্দিন জীবনের আলোক চিত্র সংগ্রহ করা হইতেছিল । তার প্রকাশভঙ্গি যেমন অনবদ্য, তার ভাবদৃষ্টিও তেমনই সহজ ও সরল, সে যেন কোথাও বাধেনা ।জীবনকে একটা নূতন দিক হইতে দেখিবার প্রয়াস তাহাতে নাই, কোন অন্ধকার গহ্বর বা কুটিল পথ-রেখার আবিষ্কার তাহার মধ্যে নাই , কেবল একটি সহজ সরল আত্মীয়তার আনন্দে ও সহৃদয় কৌতুক হাস্যে সেগুলি সমুজ্জ্বল। সাধারণের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' হইতেও এগুলির প্রচার যেন একটু বেশী হইয়াছিল । প্রভাতকুমারের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তাঁহার কল্পনার সহজ রসিকতা ; আর একটা কারণ , সেচিত্রগুলি সমাজ ও পরিবারের সংকীর্ণ ফ্রেমে বাঁধা । রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যে সূক্ষ্ম অন্তরতর যোগ আছে — যে বিপুলতর রহস্যের ছায়ায় সকল ক্ষুদ্রতা একটা অসীমতা লাভ করিয়াছে , প্রভাতকুমারের কল্পনায় তাহার কিছুই নাই । তাই সেগুলি খাঁটি গল্প হিসাবেই মুগ্ধ করে, কাহারও গভীরতর চেতনা স্পর্শ করে না । ৩ প্রভাতকুমারের উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনাকালে শ্রদ্ধেয় সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন প্রভাতকুমারের কারবার ছিল জীবনের উপরিভাগকে নিয়ে ।কোন গভীর আবেগের চিত্র অংকন না করে সাধারণ জীবনের ছোটখাট চাঞ্চল্য লঘু হাস্য পরিহাস অবলম্বনেই তাঁর ছোটগল্প রচিত হয়েছে ।'সাধারণত: আমাদের জীবনে সমস্যা এত সুদূরপ্রসারী হয় না, যাহাতে তাহার বিস্তারিত আলোচনার জন্য পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের প্রয়োজন হয় । আমাদের জীবনে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের কম্পন লাগে, ছোট ছোট সমস্যার স্পর্শে ইহা হিল্লোলিত হয়, আশা ও কল্পনা, উচ্চাভিলাষ ও কর্মশক্তির যে ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা জাগাইয়া তোলে, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে বৈষম্য হাস্যরসের সৃষ্টি করে — তাহার সমস্ত বুদ্বুদ্ ও উত্তেজনা ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালায় বেশ স্বচ্ছন্দ ও সুশোভনভাবে ধরিয়া রাখা যায়। এই ছোটগল্পের আর্টে প্রভাতকুমারের স্বাভাবিক নিপুণতা বিস্ময়কর । তাঁহার অগভীর আলোচনা-প্রবণতাও ছোটগল্পের উৎকর্ষবিধানে সহায়তা করিয়াছে ।

জীবনের খণ্ডাংশ নির্বাচনে, তাহার ছোটখাট বৈষম্যে-অসংগতির উদ্ঘাটনের দ্বারা তাহার উপর মৃদু হাস্য কিরণ সম্পাতে, আলোচনার লঘু কোমল স্পর্শে, দ্রুত অথচ অকম্পিত রেখাঙ্কনে, সকল প্রকার গভীরতা ও আতিশয্যের সযত্ন পরিহারে, আকস্মিক অথচ অভ্রান্ত যবনিকাপাতের সমাপ্তি-কৌশলে - এই সমস্ত দিক্ দিয়াই তিনি উচ্চাঙ্গের নিপুণতার নিদর্শন দিয়াছেন।' ৪ তিনি একথাও বলেছেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় অনুভূতি বা মর্মভেদী অন্তর্দৃষ্টি প্রভাতকুমারের মধ্যে না থাকলেও ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে প্রভাতকুমার যে রাজ্যে আমাদের নিয়ে গিয়েছেন 'তাহাকে বয়স্কদের রূপকথার রাজ্য বলা যাইতে পারে।' ৫ প্রভাতকুমারের সামান্য কয়েকটি গল্পকে ভাবগম্ভীর বলে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং অবশিষ্ট অধিকাংশ গল্পকেই হাস্যরস প্রধান বলেছেন। গল্পগুলির পরিচয় প্রদানে চরিত্রসৃষ্টি অথবা ঘটনাবিন্যাসে কিভাবে হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে নিপুণভাবে তিনি স্কোলি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন এবং 'ছোটগল্পের আর্ট ও রচনা - কৌশল, ইহার পরিমাণবোধ ও সমাপ্তি বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা অসাধারণ '৬ - একথাও বলেছেন।

ডা: সুকুমার সেন প্রভাতকুমারের মানসিকতা এবং ছোটগল্প রচনার প্রসঙ্গে বলেছেন - প্রভাতকুমারের জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ছিল বিস্তীর্ন। 'রবীন্দ্রনাথের মত প্রভাতকুমারও জীবনকে দেখিয়াছিলেন সহজভাবে, কিন্তু তাঁহার সে দেখা 'নিতান্তই সহজ সরল', - সে দৃষ্টি তলায় নামে না, উপর খুশির আলোক বিকীর্ণ করে। প্রভাতকুমার জগৎ ও জীবনকে দেখিয়াছিলেন শুধু চোখ দিয়া। সে চোখে মনের রঙ যে টুকু লাগিয়াছে তাহা কৌতুকের ও তৃপ্তির। গভীর সংবেদনা এবং ইমোশন তাহাতে সর্বদা স্পষ্ট নয়।' ৭ প্রভাতকুমারের গল্পের পাত্রপাত্রী পশ্চিম বঙ্গের পল্লীবাসী থেকে লণ্ডনের ল্যাণ্ডলেডি পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার কথা তিনি বলেছেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সমস্যার কথাও প্রভাত সাহিত্যে রয়েছে কিন্তু ডা: সেনের মতে —'প্রভাতকুমারের দৃষ্টি কৌতুহলী ও কৌতুকী প্রেক্ষকের - সে দৃষ্টিতে সমবেদনা যথেষ্ট কিন্তু সংবেদনা এতটা পর্যাপ্ত নয় যাহাতে চরিত্রের অন্তরে বা ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ব্যাপারটার একটা তাৎপর্যে পৌঁছানো যায়। সে দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের সাধারণ ঘটনা হইতে গল্পের উপাদান খুঁজিয়া লইতে পারে, এবং সে উপাদানে ঘটনাসংযোগটাই প্রধান, মানুষ তাহার উপকরণ মাত্র। সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য গল্পগুলির প্লট বিরচিত, তবুও প্রভাতকুমারের গল্পে প্রত্যাশিত অশ্রু সজলতার দীর্ঘনি:শ্বাস পরম্পরার সাক্ষাৎ পাই না।' ৮ প্রভাতকুমারকে ডা: সেন বলেছেন 'জন্ম - রোমান্টিক' কিন্তু তাঁর দৃষ্টিকোণ ছিল বাস্তবাভিমুখ। তাঁর গল্পের 'প্লট ঘটনা নির্ভর, ব্যক্তি-নির্ভর নয়।' 'প্রভাতকুমারের রচনারীতি নিতান্ত সরল' বলেই তিনি উল্লেখ করেছেন।

প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন — 'আসলে প্রভাতকুমারের গল্পে মানব হৃদয় এক উন্মুক্ত উদার নীলাকাশে সীমাহীন প্রসার লাভ করেছে বলেই সেখানে আকাশের হাসি মধুর জ্যোৎস্না হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রভাতকুমার হাস্যরসিক নন, কিন্তু হাসি তাঁর গল্পদেহে স্নিগ্ধ লাবণ্যের মত নয়নাভিরাম। তাঁর দৃষ্টিতে আছে প্রসাদগুণ, তাই তাঁর সৃষ্টিতে হাসির মধুস্বাদ। জীবনকে উদার চোখে দেখার সঙ্গে সহজ চোখে দেখারও সাধনা তিনি করেছেন। ....'[৯]

অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য — 'প্রভাতকুমার বাঙালী সংসারের নিপুণ কলাবিদ। তাঁর স্নিগ্ধ মমত্বের স্পর্শে আমাদের পরিচিত পারিবারিক জীবনের হাসিকান্নাগুলি মনোরম হয়ে দেখা দিয়েছে। সমাজের ওপর প্রয়োজন মতো ধিক্কার কখনো কখনো আছে — .... কিন্তু ধিক্কার বা আঘাত তাঁর গল্পে মুখ্য হয়ে ওঠে নি। হয় হাস্যরস তাদের আলোকিত করে দিয়েছে, নইলে করুণার স্পর্শে তা মেদুর হয়ে গেছে।'[১০] প্রভাত-ব্যক্তিত্ব এবং মানসিকতা প্রসঙ্গে বলেছেন — 'তিনি কোন সংস্কার ভাঙ্গেন নি, কোন নূতন সত্য সন্ধান করেন নি, জীবনকে বিচার করার ও প্রশ্ন করবার যে বলিষ্ঠ দুঃসাহস প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পে লেখকের আছে — প্রভাতকুমারের মধ্যে তার স্বল্পতা সহজেই অনুভবনীয়। প্রতিটি প্রধান ছোটগল্প — লেখক যে 'Individuality' 'র অধিকারী, যে 'Personality' তে চেখভ — মোপাসাঁ — রবীন্দ্রনাথ — গোর্কী — জয়েস — হেমিংওয়ে — দেদীপ্যমান — প্রভাতকুমারের মধ্যে সেই স্বাতন্ত্র্য — রেখাঙ্কিত অনন্য ব্যক্তিত্বকে আমরা পাইনা। কিন্তু 'great' না হলেও তিনি 'good' তাঁর কৃতিত্ব সেইখানেই।'[১১] গল্পরচনার শিল্প — কলা - কৌশল সম্পর্কে বলেছেন — 'চমৎকার প্রসাদগুণ — মণ্ডিত ভাষায় তিনি ছোটখাট জিনিষগুলিকেও উপভোগ্য গল্পে পরিণত করতে পারতেন, climax রচনায় তাঁর নৈপুন্য ছিল, সিচুয়েশন সৃষ্টির কৌশল ছিল তাঁর অধিগত।'[১২] শ্রদ্ধেয় অজিত দত্ত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' পুস্তকে প্রাসঙ্গিকভাবে প্রভাতকুমারের আলোচনায় বলেছেন — রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের পাশে প্রভাতকুমার এক নূতন এবং বিশিষ্ট গল্পধারার প্রবর্তন করেছেন। প্রভাতকুমারের দৃষ্টি ছিল রোমান্টিক, সাধারণ মানুষের কথা সহজ সরল ভাষায় তিনি বিবৃত করেছেন। তাঁর গল্পে লঘুস্বাচ্ছন্দ্য এবং হাসির আমেজ একটি বৃহৎ আকর্ষণ। এই হাসির উৎস মূলত: ঘটনা সংস্থাপন নির্ভর। প্রভাতকুমারের রচনাভঙ্গি অনেকটা নিরপেক্ষ এবং নির্লিপ্ত, Subjective নয় objective শ্রেণীর।

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীভূদেব চৌধুরী প্রভাতকুমারের শিল্প প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন —'প্রভাতকুমারের শিল্প প্রকৃতি পথিক - বৃত্ত , — ছবি দেখা আর ছবি আঁকা তাঁর স্বভাব । চলমান জীবন - যানের দ্বারা পথে ছুটে চলা জগৎকে তিনি তাঁর নির্বিকার মন দিয়ে ধরে- ছেন , — তাকেই হুবহু এঁকে দিয়েছেন গল্পের মধ্যে । জীবনের ছবি দেখে গল্পের ছবি আঁকা প্রভাতকুমারের শিল্প - ধর্ম , এই অর্থেই তাঁকে স্কেচ শিল্পী বলেছিলাম । আর এই কারণেই , প্রভাতকুমারের গল্পের যা কিছু আবেদন সে কেবল গল্পের শরীর সংস্থানের সীমাতেই আবদ্ধ ।' [১৩] আরও বলেছেন আরভিং এর মত প্রভাতকুমার অতটা পথচারী না হলেও তিনি কয়েকবারই কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করেছেন — পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিলেতেও গিয়েছেন — কিন্তু কোথাও তাঁর মন স্থির হয়ে বসেনি। এদিক থেকে মন - প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন অনেকটা নির্বিকার । কেবল সুমিত ভাষণ এবং পরিবেশোচিত বিন্যাসের ফলেই তিনি গল্পের দেহে ছোটগল্পের ইম্প্রেশন সৃষ্টি করতে পেরেছেন ।

শ্রদ্ধেয় কথাসাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী এবং রচনার বিবৃতি প্রদান করে মূলত: বলেছেন প্রভাতসাহিত্যে হাস্যরসই প্রধান । ....' বেশী না হোক , শুদ্ধ করুণ রসেরও কয়েকটি গল্প আছে তাঁর । কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে স্বচ্ছন্দে বলা যায় , নিত্যজীবনের ঘৃণা - প্রেম , দ্বন্দ্ব - সখ্য , আশা নৈরাশ্য , আনন্দ - শোক , পতন-অভ্যুদয় — যে বিষয় নিয়ে , যে-সুরই তুলুন , হাসির একটি দ্বৈত সুর , কখনও ঝঙ্কৃত , কখনও স্তিমিত , সর্বক্ষেত্রেই যেন ওত:প্রোত হয়ে থাকে । শুধু তাই নয় , অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে , যেখানে রচনার সমস্ত পটভূমি বা পরিবেশ হাস্যরসের প্রতিকূলই , প্রভাতকুমারের চটুল দৃষ্টি হাস্য- রসের সন্ধান পেয়েছে , লেখনী হাস্যরসের সার্থক শিল্পসৃষ্টি করেছে ।' [১৪]

ডা: গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বাংলা কথাসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন — প্রভাতকুমার 'রবীন্দ্র — অনুরাগী হলেও রবীন্দ্র অনুগামী ছিলেন না । তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী রক্ষণ- শীল এবং বহুলাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত ।' প্রভাতকুমারের 'সমগ্র সৃষ্টিপ্রবাহের প্রবণতা আদ্যন্ত প্রায় একই ধরণের । এই ধারার কোন উল্লেখযোগ্য বাঁকের চিহ্ন কোথাও তেমনভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না । তাঁর জীবন- দৃষ্টির গতি একমুখী । রবীন্দ্রনাথ , সবুজপত্র , প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি সমকালীন কোন ব্যক্তি বা ঘটনা তা অন্যত্র যতই প্রভাবশালী হক না কেন , প্রভাতকুমারের শিল্প -ব্যক্তিত্বের ওপর তেমন কোন অভিঘাত বা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।' [১৫]

প্রভাতকুমারের 'জীবনবোধের মূলকথা, জীবন সম্পর্কে সুস্থ সহজ রসদৃষ্টি। সেই দৃষ্টি বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের হতাশা সমস্যা ও সংশয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন বা খন্ডিত নয়। সে দৃষ্টি উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমপাদের, সহজ আনন্দ ও কৌতুকরসস্নিগ্ধ দৃষ্টি। সে দৃষ্টির সম্মুখে যে জীবন প্রসারিত সেখানে সমস্যা নেই এমন নয়, কিন্তু তা কখনও আয়ত্তের অতীত নয়।'[১৬] ডাঃ রায়চৌধুরী আরও বলছেন — প্রভাতকুমার প্রাচীন বা নবীন পন্থী যাই হোন না কেন তাঁর চিত্রিত নরনারী প্রচলিত সমাজ শৃঙ্খলা মেনে নিলেও একথা অবশ্য স্বীকার্য্য 'মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসায় প্রভাতকুমারের শিল্পী হৃদয় ছিল কানায় কানায় পূর্ণ।'[১৭] ব্যক্তিগত জীবনে বহু বিচিত্র নরনারীর সংস্পর্শে প্রভাতকুমার এসেছিলেন তাদের প্রতি লেখকের সহানুভূতিও ছিল প্রবল এবং 'এই সব মানুষের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হয়ত খুব গভীর নয়, রবীন্দ্রনাথের মত তা মানব জীবনের মর্মমূলে চরিত্রের স্বরূপের গহনে অনুপ্রবেশ করতে পারেনা, কিংবা শরৎচন্দ্রের মত তা নরনারীর চরিত্র — রহস্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণেও তেমন সক্ষম নয়, কিন্তু তবু প্রভাতকুমারের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে এই দৃষ্টি নিতান্ত উপেক্ষনীয় নয়। ⟶

→সে দৃষ্টি জীবনের উপরিতলচারী হলেও তা একান্ত সত্য। শুধু সত্য নয়, তা সজীব ও রসোজ্জ্বল।' ১৮

অধ্যাপক শ্রীঅচ্যুত গোস্বামী প্রভাতকুমার সম্পর্কে আলোচনায় মন্তব্য করেছেন —' প্রভাতকুমারের বাস্তববোধ স্বচ্ছ এবং নির্মল। কোন রকম দার্শনিকতার বা ভাবালুতার চশমা না পরে তিনি প্রাত্যহিক বাস্তবকে নিখুঁত ও যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বাস্তবকে কোনভাবে আদর্শায়িত ও অতিরঞ্জিত না করেই তিনি তাকে উপভোগ করতে পারেন। জীবনের এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতির মধ্যে বলিষ্ঠতা আছে তাই বাংলা সাহিত্য চিরকাল প্রভাতকুমারকে আদরণীয় করে রাখবে।

প্রভাতকুমার প্রকৃত শিল্পী। তাঁর কাহিনী ফটোগ্রাফ নয় তা কষ্টকল্পনা নয়(ত্রৈলোক্যনাথের মত) জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পী মানসে রূপান্তরিত হয়ে অনায়াসে কতকগুলো কৌতুককর ছবি হয়ে ধরা দিয়েছে, এবং উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে এই ছবিগুলিকে তিনি উপহার দিয়েছেন।' ১৯

ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে প্রভাত-প্রতিভায় দেশী বিদেশী প্রভাব, তাঁর স্বাতন্ত্র্য এবং সমসাময়িক অথবা পরবর্তী বাংলা ছোটগল্প রচনা ধারায় প্রভাতকুমারের রচনা পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা ইত্যাদি সম্পর্কে ডা: আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন .....' তাঁহার ছোটগল্প বলিবার ভঙ্গীটি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবজাত নহে, ইহাতে তাঁহার মধ্যে একটু স্বকীয়তা প্রকাশ পাইলেও ইহা প্রধানত: আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুসারী ছিল। কথার রস দ্বারা তাহাতে কাহিনীর ধারাটি অস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই, রবীন্দ্রনাথের বহু কাহিনী অস্পষ্ট ভাবলোকে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমনকি অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রেরও বহু কাহিনী বাস্তব সত্যের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াও দুর্নিরীক্ষ ভাব-স্বপ্নের মধ্য দিয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রভাতকুমারের কথাসাহিত্য রচনায় তাহা দেখা যায় না। তাহা সত্ত্বেও, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, প্রভাতকুমারের ছোটগল্প রচনার প্রভাব তাহার সমসাময়িক কিংবা তাঁহার পরবর্তী আর কোন কথাসাহিত্যিকই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। বরং রবীন্দ্র নাথের গীতিধর্মী রচনার প্রভাবই তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।' ২০

ডা: শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণামূলক গ্রন্থে প্রভাতকুমারের ছোটগল্প সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য গল্পগুলিকে তিনি বিষয়ানুযায়ী কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে নিয়েছেন এবং গল্পালোচনা প্রসঙ্গে লেখকের মানসিকতারও পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য একথাও তিনি বলেছেন 'কেবল উপাদান অথবা বিষয় বিশ্লেষণের দ্বারা সাহিত্যের রসাস্বাদন সম্ভব নয়।' ২১ প্রভাতকুমারের গল্পগুলির বিষয় বৈচিত্র্য এবং গঠন কৌশলের আলোচনায় সাধারণ ভাবে এই সিদ্ধান্তে তিনি এসেছেন 'তাঁহার অধিকাংশ গল্প তাহা যে বিষয়েরই হউক না কেন প্রধানত: কৌতুক রসাশ্রিত।' ২২ ডা: চট্টোপাধ্যায়র মতে প্রভাতকুমার ছিলেন 'বাঙ্গালী জীবনেরই রূপকার' এবং তাঁর জীবনদৃষ্টি বঙ্কিম আদর্শে প্রভাবিত। গল্প রচনার ক্ষেত্রে 'জীবনের খণ্ডাংশ নির্বাচন করিতে গিয়া প্রভাতকুমার দু:খ এবং গভীর বেদনাবোধকে এড়াইয়া গিয়াছেন। দু:খ হতাশা এবং আশাভঙ্গের বেদনা যে প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে নাই তাহা নহে, কিন্তু দু:খ সেখানে সুখকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবার পটভূমিকা মাত্র। 'দেবী', 'কাশীবাসিনী', 'আদরিনী' ইত্যাদি করুণরসাত্মক গল্পগুলির কথা স্মরণ রাখিয়াই আমরা উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছি। কারণ এই গল্পগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অগভীর। এইজন্যই তিনি উপন্যাস রচনায় বিশেষ সার্থক হইতে পারেন নাই। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে সার্থক ছোটগল্পকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে।।' ২৩

প্রভাতকুমারের সমকাল থেকে আধুনিককাল অবধি তাঁর গল্প সাহিত্যের রসোপলব্ধির জন্য যে সকল সমালোচনা করা হয়েছে সে সমস্তই প্রায় ক্ষুদ্র পরিসরে প্রাসঙ্গিক আলোচনা। শ্রদ্ধেয় মোহিত লাল মজুমদার শরৎচন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের আলোচনা করেছেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে প্রভাতকুমারের গল্প - উপন্যাস আলোচনা করেছেন, কেউ বা বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রভাতকুমারকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবার বাংলা কথাসাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রভাতকুমারের প্রসঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন। ফলকথা, সেই আলোচনাগুলি নি:সন্দেহে মূল্যবান হলেও এত পর্য্যাপ্ত নয় যা থেকে সামগ্রিকভাবে প্রভাতসাহিত্যের গল্পগুলির পূর্ণ পরিচয় এবং রসাস্বাদন করা যেতে পারে। ডা: শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনায় প্রভাতকুমারের গল্প রচনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রত্যাশিত ছিল কিন্তু সেখানেও প্রভাতকুমারের জীবনালোচনা এবং মতাদর্শের বিস্তারিত পরিচয় না থাকায় গল্পগুলির রসাস্বাদনের পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে যে কোন

সাহিত্যসৃষ্টির পশ্চাৎপটে ক্রিয়াশীল থাকে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন এবং জীবনোপলব্ধি বা দর্শন। তাই জীবনের পরিচয় ব্যতিরেকে তাঁর সৃষ্টির আস্বাদনের পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব নয়। অবশ্য একথাও স্বীকার্য প্রভাতকুমারের ব্যক্তিজীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উপস্থাপন করা অত্যন্ত দুরূহ। কারণ তাঁর আত্মজীবনীমূলক বিস্তারিত কোন রচনার অনস্তিত্ব। প্রভাতকুমারের পৌত্র কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত মিহির কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রভাতকুমারের স্মৃতিকথামূলক রচনা, চিঠিপত্র এবং পুস্তকাদি থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যে পরিচয় পাওয়া গেছে সেইগুলির সাহায্যেই তাঁর জীবনচরিত রচনার এবং মতাদর্শের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। তাঁর গল্পসাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য এই পরিচয় কিছুটা সাহায্য করবে।

প্রভাতকুমারের প্রথম গল্প 'বেনামী চিঠি', রচিত হয়েছে ১৩০২ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠের পূর্বে [২৪] এবং শেষ গল্প 'দুধ মা'র প্রকাশকাল চৈত্র, ১৩৩৮। প্রায় দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসরকাল তিনি গল্প রচনা করেছেন। গল্প রচনার আসরে প্রথম আবির্ভাবের কালে রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি যে সবিশেষ ঋণী সেকথা জীবনালোচনা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি। 'বেনামী চিঠি' রাধামণি দেবীর ছদ্মনামে ভাদ্র, ১৩০৫ সালে 'প্রদীপে' বেরিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় এই গল্পটির প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করাতে প্রভাতকুমার যথেষ্ট উৎসাহবোধ করেন এবং নিয়মিত গল্প লেখা শুরু করেন। গল্প রচনার শুরুতে প্রভাতকুমারের মনে দ্বিধা সংকোচ লক্ষ্য করা যায়। তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর মনে ধারনা ছিল 'গদ্য লিখিতে হইলে এক গল্প লেখা, নয়ত ঐতিহাসিক দার্শনিক ইত্যাদি কোন বিষয়ের আলোচনা করা, কিন্তু ইহার জন্য ঘটে কিঞ্চিৎ বিদ্যা থাকার প্রয়োজন, আমার তাহা নাই। আমি পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে বড় বেশী কিছু পড়ি নাই—' [২৫] লক্ষ্য করবার বিষয় এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনায় রীতিমত উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর প্রথম পর্য্যায়ের গল্প রচনা 'ঘাটের কথা' (কার্তিক, ১২৯১), 'রাজপথের কথা' (অগ্রহায়ণ, ১২৯১), 'মুকুট' (বৈশাখ, - জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২) বাদ দিলে দেখা যায় ১২৯৮ সাল থেকে পূর্ণোদ্যমে ছোটগল্প রচনা আরম্ভ করেছেন। প্রথমে 'হিতবাদী' পরে 'সাধনা'য় প্রকাশিত তাঁর এই পর্যায়ের গল্পগুলি মোটামুটিভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনার একটি ধারাকে প্রবাহিত করেছে। ১২৯৮ থেকে ১৩০২ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ন্যূনাধিক চল্লিশটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে 'দেনাপাওনা', 'পোষ্টমাষ্টার', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন,' 'নিশীথে,' 'কাবুলিওয়ালা' এবং 'ছুটি' ইত্যাদির মত বিখ্যাত গল্প। প্রভাতকুমার এ গল্পগুলি পড়েছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায় কারণ ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সালে রবীন্দ্রনাথকে একপত্রে লিখেছেন —

' সম্প্রতি সাধনায় প্রকাশিত আপনার গল্পগুলির অনাহূত সমালোচনা শুনুন। 'নিশীথে' গল্পের ভিতর যেমন একটা Weirdness আছে' তেমন বাঙালায় খুব কম দেখিয়াছি। আপনার 'কঙ্কাল', 'জীবিত ও মৃত' এই দুইটির সঙ্গে ইহার তুলনা হইতে পারে। 'মানভঞ্জনে' ভাষা এবং বর্ণনার পরিপাট্য চমৎকার এবং মোহকর। 'আপদ' গল্পে হাস্যরসের খরস্রোত রহিয়াছে।'২৬ যাহোক রবীন্দ্রনাথের গল্পের সঙ্গে সম্যক পরিচিতি লাভের পরও তাঁর মনে গদ্য রচনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক অথবা দার্শনিক বিষয়ের আলোচনার কথা মনে হয়েছে এই পত্রেই অন্যত্র লিখেছেন —'গদ্য লিখিতে হইলে এক গল্প লেখা নয়ত ঐতিহাসিক দার্শনিক ইত্যাদি কোন বিষয়ের আলোচনা করা কিন্তু ইহার জন্য ঘটে কিছু বিদ্যা থাকা প্রয়োজন, আমার তাহা নাই। আমি পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে বড় বেশী কিছু পড়ি নাই.......' রবীন্দ্রপূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িককালের যশস্বী লেখকদের ইতিহাসাশ্রয়ী রচনাধারা সম্ভবত: প্রভাত মনে এই ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। প্রসঙ্গত: স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫ - ১৯৩২) প্রথম গল্প সঙ্কলন 'নবকাহিনী'র (১৮৯২) কথা স্মরণ করা যায়।। 'নবকাহিনী' গল্পগ্রন্থের একাধিক রচনা জেমস টডের রাজস্থানের ইতিহাস - অবলম্বনে রচিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম গল্প 'কুমার ভীমসিংহ' (১২৯৩) টডের রাজস্থানের ইতিহাস অনুসরণে লেখা 'ক্ষত্রিয় রমনীও অনেকাংশে ইতিহাসাশ্রয়ী। ঐতিহাসিকতার আবরণে লেখা 'সন্ন্যাসিনী' (১২৯২) গল্পটির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ইতিহাস অথবা সমাজ যেপটভূমিকাতেই তিনি গল্প লিখেছেন সেখানে নারী ব্যক্তিত্বই মূল উপজীব্য হয়েছে - ইতিহাস অথবা সমাজ মুখ্য হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া গল্পাকারে পরিবেশিত হলেও প্রকরণের বিচারে যথার্থ ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারেনি এরা। এই প্রসঙ্গে কালের দিক থেকে রবীন্দ্র সমসাময়িক ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত গল্পলেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৬১ - ১৯৪০) কথাও স্মরণীয়। তাঁর গল্পগুলিকে ঠিক ছোটগল্প বলা যায় না, ছোটগল্পের সংক্ষিপ্তি অথবা বিশেষ ব্যঞ্জনা গল্পগুলিতে অনুপস্থিত তবে গল্পের রোমান্টিক বর্ণনা আকর্ষণীয় হয়েছে। তাঁর 'লক্ষহীরা', 'শ্যামের কাহিনী' ইত্যাদি গল্পগুলি এই পর্য্যায়ে পড়ে। তাঁর কিছু হাস্যরসাত্মক এবং গালগল্প জাতীয় রচনাও রয়েছে। ফরাসী সাহিত্যে পারঙ্গম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮ - ১৯২৫) মূলত: নাট্যকার হলেও ফরাসীভাষা, থেকে কিছু ছোটগল্প বাংলায় অনুবাদ করে বাঙ্গালী পাঠককে ফরাসী ছোটগল্পের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে সত্যকারের ছোটগল্প সৃষ্টির পূর্বে আর একজন গল্পশিল্পীর নামোল্লেখ না করলে ব্যত্যয় ঘটবে, তিনি হাস্য - কৌতুক রঙ্গ - রূপকের গল্পকার ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭ - ১৯১৯)। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যক্তিগত জীবনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে এনেছে বৈচিত্র্য। একদিকে তাঁর মজার গল্প

'মুণ্ডমালা'র গল্পগুলিতে'ফোকলা দিগম্বর' এর কাহিনীতে রয়েছে রঙ্গ-রসিকতার মধ্য দিয়ে গল্প বলার চেষ্টা অন্যদিকে'ডমরু চরিতের' অপূর্ব আপাত কৌতুকময়গল্পগুলির মাধ্যমে তিনি সমসাময়িককালের ব্যক্তি ও জীবনকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ ছোটগল্প লেখেননি, তাঁর পক্ষে হয়ত সম্ভবও ছিল না কিন্তু তাঁর এই রঙ্গ - ব্যঙ্গের কথক ভঙ্গিটিকে আশ্রয় করে পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে অনেক সার্থক ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়েছে। প্রভাতকুমারের অনেক গল্প রচনায় তাঁর প্রভাব লক্ষিত হয়েছে।

গল্পরচয়িতা প্রভাতকুমারের গল্পের রসাস্বাদন এবং প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য একদিকে যেমন তাঁর জীবন ইতিহাস এবং মানসিকতা অনুধাবনের প্রয়োজন অন্যদিকে তেমনি তাঁর সমসাময়িককালে বাংলা ছোটগল্পের আসর এবং সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিচিতি আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমানসে বাংলা ছোটগল্প প্রথম সার্থকরূপ লাভ করলেও তাঁর চিন্তাধারার ব্যাপ্তি এবং গভীরতাকে অনেকেই অনুধাবন করতে পারেনি। কিন্তু ছোটগল্প রচনার যে পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করলেন সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই গল্প রচনা শুরু করেন। গল্প প্রকাশের প্রধান বাহন সাময়িক পত্রিকা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেখা যাবে কবিতার সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয়ভাবে গল্প রচনার প্রচেষ্টা। বস্তুত: সাময়িক পত্রিকার পাঠকের দাবীতেই এই সময়ে বহু গল্প রচিত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে সমস্ত সাময়িক পত্রিকা প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে'ভারতী'এবং'সাহিত্য' পত্রিকা দুইটি ছিল অন্যতম। ইতঃপূর্বে রবীন্দ্রনাথের'সাধনা' (১২৯৮-১৩০২) আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সম্পাদিত'হিতবাদী' (১২৯৮) ইত্যাদি পত্রিকায় কিছু গল্প রচনার পরিচয় আছে। বিশেষত: রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায়'ভারতী'(১২৯২ - ১৩৩৩) পত্রিকা গল্প প্রকাশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।'ভারতী' পত্রিকার জন্ম মূলত: ঠাকুর পরিবারে হলেও, এবং পারিবারিক পরিচিত মহলের রচনা প্রকাশের সুযোগ প্রথম দিকে লাভ করলেও, পরবর্তী সময়ে অপরিচিত লেখকের রচনাও পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হতে থাকে। ক্রমে'ভারতী'রলেখকদের মধ্যে একটি গভীর অন্তরঙ্গ পরিবেশ গড়ে ওঠে। সাধারণ ভাবে বলা যায় 'ভারতী'র লেখকগণ ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত বা অনুরাগী, কিন্তু সেইজন্য তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্র অন্ধতা ছিল একথা বলা যায় না।'নিবিড় আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে ভারতী পত্রিকা বাংলাদেশের একাধিক পুরুষের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখকদের আপন প্রীতির গণ্ডিতে এনে বেঁধেছিল। এদের মধ্যে বিচিত্র শিল্প-

প্রকৃতির সমাবেশ হয়েছিল, — কল্পনা - রোমান্স, বাস্তব তথ্যানুসারিতা, রক্ষণশীল আদর্শবাদ ও বন্ধন বিমুখ দীপ্ত বিদ্রোহ - বাসনা, আবেগ - আবহ -উচ্ছ্বাস, তথ্য সংক্ষিপ্তি ও নাটকীয়তা, — ভারতীর গল্পের আসরে ছোটগল্পের সকল স্বাদই ছিল একান্ত লভ্য । আবার কাল ও ভাবের দিক থেকেও এদের মধ্যে রবীন্দ্র-পূর্ব রবীন্দ্র - উত্তর, রবীন্দ্র - প্রভাবযুক্ত, বিচিত্র রকমের শিল্পী ছিলেন।'২৭ তাই দেখি স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রমথনাথ চৌধুরী , সরলা দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি পরবর্তীকালে বাঙলা সাহিত্যের অনেক প্রথিতযশা লেখকের যোগাযোগ 'ভারতী'র আসরেই হয়েছিল ।'ভারতী'র লেখকগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য মানসিকতা এই-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন সেকালের তুলনায় প্রগতিশীল। রবীন্দ্ররীতিকে আত্মস্থ করতে না পারলেও এঁদের মধ্যে অনেকেই সমসাময়িক জীবনধারা রূপায়ণে এবং পরবর্তীকালে গল্প উপন্যাসে অন্ধ রক্ষণশীলতার প্রতিবাদ করেছেন এবং অনুবাদ অনুকরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করিয়েছেন ।

প্রাচীনপন্থী সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনধারা বর্ণনার অবসান ঘটিয়ে কাহিনীতে নূতনত্ব আরোপ এবং সেই গল্পকাহিনী রূপায়ণে চলিতভাষার প্রয়োগের অভিনব প্রচেষ্টায় প্রমথনাথ চৌধুরীর (১৮৬৮ । ১৯৪৬) সম্পাদনায় সাহিত্যক্ষেত্রে 'সবুজপত্র'র (১৩২১) আবির্ভাব হয়েছে ।'বৎসরখানেকের মধ্যেই প্রমথবাবুর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সমাজ চিন্তায় মর্মান্তিক ও গতানুগতিকতার উপর প্রাণান্তিক আঘাত হানিল।' ২৮ 'সবুজ পত্রের সারথি রবীন্দ্র নাথ গান্ডীব সব্যসাচী প্রমথনাথ ।' ২৯ সবুজপত্রের অন্তরালে থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা যুগিয়েছেন ।'সবুজপত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল – বিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তিত সামাজিক জীবনের রূপদান , বিশ্বসাহিত্যের নব নব চিন্তা ও ভাবধারার সঙ্গে নিজেদের পরিচিত করা। উত্তরকালে 'ভারতী'দলের কিছু লেখকও এখানে উপস্থিত হয়েছেন ।

মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায়ের আনুকূল্যে 'মানসী'-(১৩১৫) পরে প্রভাতকুমারের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'(১৩২২) পত্রিকার আসরে সমবেত হয়েছিলেন কিছু রবীন্দ্রভক্তের দল । রবীন্দ্রভক্ত হলেও এখানকার শিল্পীরা অনেকে রবীন্দ্রমানসের যুগোচিত পরিবর্তনকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করেন নাই। তাঁদের কারো কারো দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল হিন্দুধর্মের সনাতন আদর্শ ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য । কালোচিত পরিবর্তনকে এঁরা সর্বক্ষেত্রে স্বীকার করে নিতে পারেন নি ।প্রভাতকুমার, জগদীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ছিলেন এই আসরের মুখ্য লেখক ।

রবীন্দ্রনাথ কখনও শাস্ত্রের প্রথাগত অনুশাসনে বাঁধা পড়েননি। তাই তাঁর সাহিত্য চিন্তা ছিল 'জীবনমননের ফসল ফলানো'। অন্যপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে চিন্তা করেছেন সমাজ শাসন ও নীতি শিক্ষার অন্যতম উপায় হিসাবে। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা তরুণ রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল এবং উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ অচিরে নিষ্পত্তি হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষাবলম্বী নব্য হিন্দুর দল কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে রেহাই দেন নাই। তাই দেখি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ যখন পূর্ণোদ্যমে — গল্প সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন তখন 'নবজীবন' পত্রিকা উঠে যাওয়ার পর 'সাহিত্য' (১২৯৭) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-বিরোধীদের আসর জমে উঠেছে। চন্দ্রনাথ বসুর পর সুরেশ সমাজপতি এই বিরোধিতার মুখ্য ভূমিকা গ্রহন করেন। এঁরা ছিলেন প্রাচীনপন্থী, শাস্ত্রীয় প্রথাগত রীতিনীতি অনুসারে জীবন বা সমাজের মূল্যায়ণ করতে আগ্রহী। বিংশ শতাব্দীতে উপনীত হয়েও এই রবীন্দ্র-বিরোধিতা হ্রাস পায়নি। 'সবুজ পত্র' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জনদাস সম্পাদিত এবং বিপিন চন্দ্র পাল পরিচালিত 'নারায়ণ' (অগ্রহায়ণ, ১৩২১) পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের ভাবনা এবং প্রমথনাথের ভাষাকে একজোটে আক্রমণ করে। রবীন্দ্রনাথের নূতন সাহিত্য চিন্তাকে নিয়ে অতি স্পষ্টভাবেই নিন্দায় মেতে ওঠে।

বাংলা গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে যখন রবীন্দ্র ভক্ত এবং বিরোধীদের তথা প্রগতিপন্থী এবং রক্ষণশীল সাহিত্যিকদের মধ্যে মতবিরোধ চলেছে এই সময়ে কথাসাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হয়েছেন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসে পাঠক বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে, আবার রবীন্দ্র - অনুসারী প্রগতিপন্থীদের রচনায় জীবনের কোন স্পষ্টরূপ তখনও প্রস্ফুটিত নয়, অন্যদিকে প্রাচীনপন্থীদের জীবনচেতনা বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত জীবনধারার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে। পাঠকের এমন একটি মানসিক অস্থিরতার মধ্যে অপূর্ব সংবেদনশীল মন নিয়ে সাবলীল ভাষায় গল্প - উপন্যাস রচনা করে অচিরাৎ পাঠকমন জয় করেছেন শরৎচন্দ্র। একদিকে তাঁর রচনায় যেমন 'কল্লোল' যুগের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, অন্যদিকে প্রাচীন পারিবারিক কাঠামোর প্রতি গভীর আস্থাও লক্ষনীয়।

'ভারতী'র সাহিত্যিক গোষ্ঠী যুগমানসের পরিপ্রেক্ষিতে যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিল সেই দৃষ্টি বিদেশীর সাহিত্য ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে নবরূপ গ্রহণ করে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তরুণ এক সাহিত্যগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটায়। তারুণ্যের আলোকে আলোকিত এই লেখকগোষ্ঠী প্রধানত: 'কল্লোল' (১৩৩০) 'কালিকলম' (১৩৩৩) এবং 'প্রগতি' (১৩৩৪) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। সাহিত্যে সমবেতভাবে এরা 'কল্লোলগোষ্ঠী',—

এই যুগ 'কল্লোলযুগ' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। রবীন্দ্র উত্তর যুগের সৃষ্টির সংকল্প বশত: সচেতনভাবে এঁরা ছিলেন রবীন্দ্র - বিদ্রোহী । সমাজের নিপীড়িত, আর্থিক দুর্দশাগ্রস্থ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি এঁদের ছিল গভীর সহানুভূতি । গভীর জীবনানুসন্ধিৎসা, দেহজ কামনা ভিত্তিক মানব প্রেম চেতনা এবং তারুণ্যের আবেগজনিত রোমান্টিকতা এদের রচনায় লক্ষনীয় । 'কল্লোলযুগের লেখকদের মধ্যে ছিল নগর - চেতনা, সমাজ ও শ্রেণী নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তি-স্বত্বের মূল্যায়নের চেষ্টা । এই যুগের উল্লেখযোগ্য লেখকগণ দীনেশ রঞ্জন দাস, গোকুল চন্দ্র নাগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম , প্রবোধকুমার সান্যাল, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি।

ইংরেজদের আগমনে এবং তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি স্পর্শে ঊনিশশতকের বাঙ্গালী জীবনের অভূতপূর্ব আলোড়ন এবং নব নব চিন্তাধারার বিকাশ ঘটলেও পারিবারিক এবং সামাজিক আদর্শবোধ তখনও কিছুটা স্থির নিশ্চিত ছিল। মুখ্যত: হিন্দুধর্মের সনাতন আদর্শে পরিচালিত বাঙ্গালী জীবনের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব স্বাভাবিকভাবে পড়লেও সমতালে সেখানে সমন্বয় সাধনের চেষ্টাও লক্ষনীয়।

কিন্তু বিংশশতাব্দীর সূচনা থেকেই সামাজিক রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক ঘটনার অভিঘাতে ব্যক্তিগত এবং বৃহত্তর জীবনবোধ ক্রম অপসৃয়মান। প্রথম আঘাত বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন (১৯০৫ -১২)। কার্জনের এই কুটিল পরিকল্পনা রোধের জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামবাদী আন্দোলনের পথে এগিয়ে গেল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়েছে কিন্তু দেশের যুবচিত্তে স্বদেশমুক্তির যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল, ইন্ধনের অভাবে সাময়িকভাবে নির্বাপিত হলেও সুপ্তাকারে যুবচিত্তের একাংশে থেকেই গেল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধারম্ভে বিদেশী শক্তি - সহযোগিতায় দেশ স্বাধীন করার এক গোপন প্রয়াস লক্ষিত হয়। কিন্তু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বাঘাযতীনের পরাজয়ে সংগ্রামবাদীদের এই আন্দোলনে এক গভীর হতাশা দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে এদেশে সংঘটিত না হলেও - পরোক্ষ ফলশ্রুতি আমাদের জীবনের উপর বর্তেছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা এবং দুর্মূল্যতা প্রাত্যহিক জীবনকে দু:সহ করে তুলেছে। এই যুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করলে ভারতবাসীকে স্বরাজ দেওয়া হবে - এই ধরনের আশ্বাসে আশান্বিত হয়ে তদানীন্তন রাজনৈতিক নেতা গান্ধীজী ভারতবর্ষীয় সৈন্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়েছিলেন কিন্তু যুদ্ধাবসানে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের 'মন্টেগু - চেমসফোর্ড' সংস্কারে বেশী কিছু পাওয়া গেল না । উপরন্তু পাওয়া গেল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। বাংলা দেশে এক দুর্বিষহ অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর অন্য প্রদেশে

গিয়ে জীবিকার্জনের পথ সঙ্কুচিত হওয়ায় মনে এল প্রচণ্ড হতাশা, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সব দিক থেকেই বঞ্চিত হল দেশবাসী। প্রবর্তিত হল দমননীতি-মূলক — রাউলাট অ্যাক্ট। জনগনের মনে দেখা দিল বিক্ষোভ, অপমানিত বিক্ষুব্ধ এই জাতির উপর জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ চালাল নরহত্যার বর্বর লীলা। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হল, গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০)। এই আন্দোলনে জাতি - ধর্ম নির্বিশেষে অনেকেই যোগদান করল — নগরবাসী যুবসমাজ গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হয়ে স্বদেশী জিনিষ ফেরি করতে লাগলো। নগরবাসীর সঙ্গে হলো গ্রামের কিছুটা পরিচিতি, গ্রামের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচয়। কিন্তু এই আন্দোলনও সফল হয়ে উঠতে পারলো না। চৌরিচৌরায় আন্দোলন রূপান্তরিত হল হিংসাত্মক কার্যকলাপে। গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। যুবমানস হলো হতাশায় আচ্ছন্ন। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় হতাশ যুবমানসে মধ্যবিত্ত জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে এনেছে অনাস্থা, প্রচলিত রীতি নীতির উপর অশ্রদ্ধা।

যুগচিন্তায় এই হতাশা এবং নৈরাশ্যকে আরও প্রকট করে তুলেছে এযুগের মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থনৈতিক পঙ্গুতা। বিগত শতাব্দীর মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজে একদল ছিল জমি জমা নির্ভর, অন্যদল জমিবিহীন কিন্তু চাকুরী-জীবী বা ব্যবসায়ী। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বহু বঙ্গসন্তান বহির্বঙ্গে গিয়ে চাকুরী অথবা ব্যবসা করে অর্থোপার্জন করেছে। এই চাকুরীর নেশা গ্রাম থেকে তাকে শহরে আকর্ষন করেছে, ফলে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে অর্থসংকট দৃঢ়তর হয়েছে। (অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি, পরিবর্তে তারা পেয়েছে উচ্চশিক্ষা, ক্ষেত্রবিশেষে চাকুরীক্ষেত্রে অবতীর্ণা) বিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্তের আর্থিক সমস্যা আরও চরমে উপস্থিত হয়েছে বিশেষত: প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে। মধ্যবিত্তসমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি অথচ শহরাঞ্চলে চাকুরীর দুষ্প্রাপ্যতা এবং বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে অর্থোপার্জনের পথ সঙ্কুচিত হয়ে গভীরতর হতাশায় তাকে নিমজ্জিত করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই দেখা গেছে দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এই মধ্যবিত্ত সমাজ এবং তাদেরই অধিকাংশের জীবনের হতাশা-সংশয় যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আরও লক্ষ করা যায়, নরনারীর হৃদয় সম্পর্কে আকর্ষণ বিকর্ষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতা সিগমণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬ -১৯৩৯) এবং ইংলণ্ডের চিকিৎসা বিজ্ঞানী হ্যাভলক এলিসের (১৮৫৯ - ১৯৩৯) চিন্তাধারা তরুণ সমাজে প্রবেশ করে সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই সমাজ ও সাহিত্য পরিবেশে প্রভাতকুমার সাহিত্য সাধনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে প্রভাতকুমার গল্পরচনায় ~~প্রবৃ~~ প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এমনকি তাঁর 'দেবী' গল্পের প্লটটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি রবীন্দ্র পরিবারের সান্নিধ্য এবং 'ভারতী' পত্রিকার কার্য্যালয়ে যাতায়াতের সুযোগে সেখানকার রবীন্দ্র প্রভাবিত সাহিত্যিক আবহমণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু প্রভাতকুমারের রচনায় রবীন্দ্রপ্রীতির পরিচয় থাকলেও রবীন্দ্রপ্রভাব বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। প্রধানত উভয়ের মানসিকতা এবং জীবন দৃষ্টিতে এক দুস্তর ব্যবধান রচনায় ভিন্ন স্বাদ এনে দিয়েছে। উপনিষদের ভাব- ভাবনায় পুষ্ট রবীন্দ্রমানসে একদিকে রয়েছে যেমন সংস্কারমুক্ত ধর্মীয় চেতনা সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ মানব সমাজের প্রতি গভীর সমবেদনা, নিগূঢ় মননের বিস্ময়কর ব্যাপ্তি, অন্যদিকে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকে হারিয়ে যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। পারিপার্শ্বিক সমাজ এবং মানুষের প্রতি তাঁর যে সমবেদনাময় ~~দৃ~~ দৃষ্টি সে দৃষ্টি বাস্তব কিন্তু কবিমনোচিত। তাঁর ছোটগল্পের গীতিধর্মিতার অভিযোগের প্রতিবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন — 'এক সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ী চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগলো, আহা যে পাগলাটে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ওর না - জানি কি দশা হবে। কিম্বা ধরো খ্যাপাটে ছেলে সারাগ্রাম দুষ্টামির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকীটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গান জাতীয় পদার্থ বলবে ? আমি বলবো, আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটেনি। যা কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি, তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। ..... ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙ্গালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।' ৩০ কবির উক্তি অনুসরণ করলে সহজেই বোঝা যাবে প্রচলিত অর্থে আমরা যাকে বাস্তব বলি অর্থাৎ দৃশ্য বস্তু বা ঘটনা যেখানে প্রধান হয়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের কাছে সেখানে বস্তুসত্য থেকে অনুভূতির সত্যতাই অধিক বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। মহৎ সাহিত্যে অনুভূতির অনুরণনই প্রধান — প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং হৃদয়ের সত্যতা মিলেমিশে রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতার সৃষ্টি। 'রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্পে এই বাস্তবতাই শেষ কথা নয়। গল্পের গল্পত্ব ছাড়াইয়াও এমন একটা ধ্বনিরেশ থাকে যাহা মনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজিতে থাকে। চোখে দেখা মানুষের সুখদুঃখময় যে জীবনখণ্ড আবহমান প্রাণ- প্রবাহের ভঙ্গ - তরঙ্গমাত্র, রবীন্দ্রনাথের গল্পে ~~সেই~~ জীবনের ক্ষণলব্ধ ভালোবাসা - ভালো- লাগা ও তুচ্ছতা - ব্যর্থতা - অচরিতার্থতা সবই একটি যেন অতিলৌকিক সার্থকতায় পৌঁছিয়াছে, জীবনের অসার্থকতার ব্যথা বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনার ~~সুরে হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, প্রেমের দুঃখদহন বিশ্বচৈতন্যের শান্তিজলে~~

নীড় হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, প্রেমের দু:খদহন বিশ্বচৈতন্যের শান্তিজলে নির্বাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্পে বিনা আয়োজনে দ্যাবাপৃথিবী সম্মিলিত, স্বর্গের অচঞ্চল নক্ষত্রালোক মাটির প্রদীপের ক্ষীণ চঞ্চল শিখায় দীপ্যমান।[১৩১] রবীন্দ্রনাথের এই গভীর মননের সঙ্গে বাগ্‌রীতির বৈদগ্ধ মিলেমিশে ছোটগল্পগুলিকে অপূর্বশ্রী দান করেছে।

প্রভাতকুমারের জীবনদৃষ্টিতে এই অন্তর্গূঢ়চারী গভীর মনন তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। চোখ মেলে প্রাণভরে তিনি জগৎকে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর সেই দেখায় বিন্দুতে সিন্ধুর উপলব্ধি নাই। তিনিও জীবনকে গভীর ভাবেই দেখেছেন কিন্তু সেই দৃষ্টি এত অতলস্পর্শী নয় যেখানে ব্যক্তির মধ্যে বিশ্বব্যক্তিত্ব, রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই বলে তাঁর জীবনদৃষ্টিকে অগভীর ভাবলে ভুল করা হবে। নিত্যদিনের জগৎ সংসারে যে হাসিকান্না, যে ভাল মন্দ লাগা, যে সার্থকতা - ব্যর্থতায় ভরে আছে সেগুলি নিয়েই তিনি খুশি থেকেছেন। জীবনের রহস্যপূর্ণ গভীর উপলব্ধি অথবা মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব বিশ্লেষণে তিনি উন্মুখ হয়ে উঠেননি। জীবনের জটিলতা পরিহার করে নেহাত সহজ সরল দৃষ্টিতেই তিনি জীবনকে দেখেছেন। এইভাবে দেখতে গিয়ে যে কার্য - কারণের বৈষম্য, যে অসঙ্গতি, যে রঙ্গরসিকতা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি, যে অমেয় সুখ-দু:খের সন্ধান তিনি পেয়েছেন তাকেই সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শে একদিকে রয়েছে ঔপনিষদিক চিন্তায় গঠিত মানবীয় মহৎ আদর্শের প্রতি সুগভীর অবিচলিত আস্থা, চিরন্তন সত্য ও কল্যানের প্রতি প্রত্যয় আবার অন্যদিকে তাঁর মনে গড়ে উঠেছিল মানবতাবাদ এবং আশাবাদ। রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল চিরন্তন মানবের মহত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্মীয় সংস্কারে তাঁর মানবতাবাদ কোন সময়ে আচ্ছন্ন হয়নি — তিনি মুক্ত দৃষ্টিতে হৃদয়সত্যের জয়গান গেয়েছেন। প্রভাতকুমারের জীবনবোধে এই উদার উন্মুক্ত মানবতাবোধের পরিচয় পাই না। তিনিও মানুষকে ভালবেসেছেন, মানবজীবনের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সহানুভূতি ছিল কিন্তু তাঁর মানবীয় প্রত্যয় সনাতন হিন্দু আদর্শে এবং প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের উপর গড়ে উঠেছে। চিরন্তন মানবধর্মে আস্থাশীল রবীন্দ্রনাথ অন্ধ সংস্কারের প্রতিবাদ করে হয়েছেন প্রগতিশীল, প্রভাতমন প্রচলিত সংস্কারের মধ্যে থেকেই করেছেন মানবতাবোধের মূল্যায়ন। তাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বিশ্বমানবমনের পরিচয় পাই আর প্রভাত সাহিত্য মূলত: বাঙালী মন নিয়েই আবর্তিত হয়েছে।

প্রভাতকুমার ছিলেন মাতা - পিতার একমাত্র সন্তান এবং তাঁদের স্নেহ - ভালবাসা পেয়েছিলেন অপর্যাপ্তভাবে । বিশেষ করে মায়ের স্নেহদৃষ্টি ছিল অত্যধিক, মায়ের প্রতি প্রভাতকুমারের শ্রদ্ধা ছিল অতি অপরিসীম। মা ছিলেন নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা, মায়ের এই সনাতন হিন্দু ধর্মনিষ্ঠা প্রভাতমনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে । প্রভাতকুমারের চিন্তাধারায় যে সনাতন - হিন্দু আদর্শ-প্রীতি লক্ষ্য করা যায় বোধকরি মায়ের প্রভাবই সেখানে ক্রিয়াশীল। শোনা যায় মাতৃ অনুরোধেই তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিতা সরলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। মায়ের অনুরোধে যিনি এতবড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁর জীবনে মায়ের প্রভাব যে কত গভীর সেটা সহজেই অনুমান করা যায় ।

প্রভাতকুমারের এই সনাতন হিন্দু ধর্মের আদর্শের প্রতি আনুগত্য লক্ষনীয় । সনাতন আদর্শে নারী কল্যাণময়ী রূপেই অধিষ্ঠিতা, নারীর সার্থকতা তার পাতিব্রত্যে, গৃহাশ্রমে প্রেম - প্রীতি স্নেহ - ভালবাসা সেবা - যত্নের উৎস-রূপে বিরাজিত হয়ে। প্রেমের ক্ষেত্রে নারীমনের স্বাধীনতা সনাতন হিন্দুধর্ম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেনি । সামাজিক বিধির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে স্বামীপ্রেমই এখানে বন্দিত । প্রভাতকুমারের মননে নারীপ্রেম সম্পর্কে এই ধারনাই দৃঢ়তর। কিছু অসামাজিক প্রেম চিত্রণ থাকলেও হিন্দু সমাজের বিধিনিষেধ শেষ পর্য্যন্ত তিনি মেনে নিয়েছেন ।

জাতিভেদ প্রথা সনাতন হিন্দুর এক দুর্লঙ্ঘ্য সংস্কার, প্রভাতমন এই সংস্কারকে সর্বত্রই মেনে চলেছেন । বিভিন্ন প্রদেশের পাত্র পাত্রীর বিবাহ সংগঠনেও তিনি কুন্ঠিত হননি কিন্তু ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ স্থাপন তিনি স্বীকার করে নিতে পারেন নি ।

স্বামীসংসর্গহীন বালবিধবার পুনর্বিবাহের সমর্থন থাকলেও বয়স্ক বিধবা অন্ততপক্ষে স্বামীর সংসার যে একবার করেছে এধরনের নারীর হৃদয়ে প্রেম যতই প্রগাঢ় হোক না কেন, বিবাহবন্ধনে নারীর হৃদয়ের প্রেম যতই প্রগাঢ় হোক না কেন, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে সেই প্রেমকে সার্থক করে তিনি তোলেন নি। বয়স্কা বিধবার প্রেমে বা পুনরায় সংসার স্থাপনে তার মন সমর্থন জানায়নি ।

প্রভাতমনে কৈশোর প্রেমের গুরুত্ব তেমন অনুসৃত হয়নি, এ যেন ছেলেবেলাকার ছেলেখেলা । এই প্রেম জীবনে কোন জটিলতা আনে না । জীবন প্রবাহে সামান্য একটু কৌতুক কৌতুহলের তরঙ্গ তুলে বিশাল প্রবাহে আপনি মিলিয়ে যায় ।

নারী অথবা পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিবাহিত জীবনযাপন প্রভাতমানসে শ্রেয়তর বলেই বিবেচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় পারস্পরিক সান্নিধ্যের প্রয়োজনীয়তাও একান্ত কাম্য নতুবা উভয়ের বিপথ গমনের আশংকা থেকে প্রভাতমন মুক্ত ছিল না। শুধু মানসিক নয় দৈহিক সান্নিধ্যকেও প্রভাতকুমার গুরুত্ব দিয়েছেন।

নারীর উচ্চশিক্ষা এবং স্বাধীনতাকে প্রভাতকুমার প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেননি, নারী গৃহলক্ষ্মী রূপেই তাঁর মনে প্রতিভাত হয়েছে, এক্ষেত্রে অনেকাংশে তিনি সনাতন আদর্শেই বিশ্বাসী বলে মনে হয়।

পতিতার - প্রেমে প্রভাতকুমারের মনে সহানুভূতি বর্তমান। নারী সে যতই হীনকর্মে লিপ্ত হোক না কেন সত্যকারের প্রেমের মহিমায় তার হৃদয়ও যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। কিন্তু সমাজ সংস্কারকে লঙ্ঘন করেপতিতাকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করে তার প্রেমের মূল্যদান করতে প্রভাতমন কুন্ঠিত হয়েছে।

ব্যক্তি জীবনে সনাতন হিন্দু - ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী হলেও তিনি ছিলেন অনেকাংশ ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা এবং বিলাত প্রবাস কালে খৃষ্টান ধর্মীয়গণের সঙ্গে মেলামেশায় এই উভয় ধর্ম সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি তিনি সহ্য করতে পারেন নি। ফলত: ধর্ম অবলম্বনে আতিশয্যকে তিনি ঈষৎ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অথবা রঙ্গ - রসিকতা করেছেন।

প্রভাতকুমারের মন ছিল সমাজ সচেতন, তাঁর কালের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অথবা ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে তিনি বিশেষ ভাবেই পরিচিত ছিলেন, তাঁকে সক্রিয়ভাবে ইংরেজ শাসন শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না কিন্তু তাঁর দু একটি গল্পে ইংরেজদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেও যেযুক্তিহীন আবেগ উচ্ছ্বাস ছিল তাকেও তিনি মেনে নিতে পারেননি, এবং সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁর মনকে বিশেষ আকৃষ্ট করতে পেরেছিল বলে কোথাও মনে হয় না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্যে বাস্তবতার নামে জীবনের যে নগ্নতা কুশ্রীতা, যৌনাবেদন ইত্যাদি সাহিত্যকে আশ্রয় করেছিল প্রভাতমন তথাকথিত সেইসববাস্তববাদী আধুনিক সাহিত্যিকদের মতবাদকে সর্বত্র মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর সুরুচিপূর্ণ মন জীবনের এই নগ্নতা প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করেছে।

ইংরেজী সাহিত্যে অভিজ্ঞ প্রভাতমনে আমাদের দেশের লোক - সাহিত্য ও প্রবাদ প্রবচন সংগ্রহের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তিনি সবিশেষ পরিচিত ছিলেন।

প্রভাতকুমারের মন ছিল শান্ত, সংযত, নির্বিরোধ আত্মতৃপ্ত। তাই দেখি ঊনবিংশ শতাব্দীর সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী মন, বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধোত্তর হতাশা, সংশয়ের মধ্যে অবিচলিতভাবে জীবন প্রত্যয়ী। এই স্থির জীবন বিশ্বাস তাঁর জীবনের গতিকে করেছে একমুখী, যে গতি কোথাও রুদ্ধ হয়নি। তাঁর জীবনদৃষ্টিতে মিশে ছিল অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি যে তৃপ্ত দৃষ্টি বিপরীত সব কিছুকে সহজেই মানিয়ে নিয়েছে। শত দুর্যোগের মধ্যেও জীবন সম্পর্কে এই স্থির বিশ্বাস নিয়েই তিনি হাসিমুখে পথ পরিক্রমণ করেছেন আর এই পথ পরিক্রমায় যে জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে নিজ হৃদয়ের স্থির বিশ্বাসের আলোকে অদ্ভুত সহানুভূতিতে তাকে দেখেছেন এবং তারই একান্ত সেই সত্য উপলব্ধির কাহিনী হাসিমুখে আমাদের শুনিয়ে গেছেন।

সাধারণভাবে প্রভাতকুমারের উপর্যুক্ত মানসিকতা এবং তাঁর কালের ঘটনা পরিবেশকে স্মরণ রেখে তাঁর গল্পালোচনা এবং রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হব।

প্রভাতকুমারের গল্পগ্রন্থের সংখ্যা মোট বারোটি। একশত ঊনিশটি গল্প এখানে সংকলিত হয়েছে। কোন গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়নি এযাবৎ যা পাওয়া গিয়েছে এমন গল্পের সংখ্যা আটটি।'৩২ রাধামণি দেবী এবং শশিভূষণের ছদ্মনামে লেখা প্রভাতকুমারের 'পূজারচিঠি' শীর্ষক দুইটি গল্প ১৩০৪ সালের কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম ও ষষ্ঠ পুরস্কারলাভ করেছিল। 'গুলবেগমের আশ্চর্য গল্প' কাহিনীটি মুসলমানী কেচ্ছা নং ৩ নামে ১৩১৬ সালে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত, কিন্তু কোন গল্পগ্রন্থে স্থান পায়নি। 'দুধ - মা' গল্পটি মাসিক বসুমতীতে চৈত্র, ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এর অব্যবহিত পরেই লেখকের মৃত্যু হওয়ায় কোন গল্পগ্রন্থে সংকলিত হওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। অল্পবয়স্কদের জন্য লেখা 'কাজির বিচার', (রামধনু, মাঘ, ১৩৩৪) 'বীরবলের গল্প' (রামধনু, কার্তিক, ১৩৩৫), 'কাজির বুদ্ধি' (মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত রংমশাল, ১৩৩৫) এবং 'আমলার নমুনা' (ভারতী, পৌষ, ১৩০৬) গল্পগুলি বিশিষ্ট না হওয়ায় সম্ভবত গল্পগ্রন্থে স্থানলাভ করে নাই।

(২)

প্রভাতকুমারের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নবকথা'। প্রথম প্রকাশ কাল কার্তিক, ১৩০৬। প্রথম সংস্করণে বারোটি গল্প সংকলিত হয়েছিল। ১৩১৮ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং সেখানে আরও পাঁচটি গল্প সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

গ্রন্থে সংকলিত 'বঙ্কিমবাবুর কাজির বিচার'(কার্তিক, ১৩০৬) শীর্ষক রচনাটি প্রভাতকুমারের মাতৃষ্বস্রেয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা একথা প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া 'দেবী' গল্পটির আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখকের এ স্বীকৃতির উল্লেখ আছে। এখানকার অধিকাংশ গল্পই ইতঃপূর্বে 'ভারতী', 'প্রদীপ' এবং 'দাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া— "দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর' ঠিক গল্প নহে – সত্য ঘটনা বলিয়া শোনা যায়। বঙ্কিমবাবুর 'কাজির বিচার' গল্পটিও জনশ্রুতিমূলক। ....'ভূত না চোর ?' 'কাটামুণ্ড' এবং 'শাহজাদা ও ফকির কন্যার প্রণয় কাহিনী' এই তিনটি গল্প ভাষান্তর হইতে গৃহীত, অনুবাদ নহে — স্বেচ্ছামত পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছি।..." একথা দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেন।

এখানে সংকলিত 'ভুলভাঙা' গল্পটিতেও রবীন্দ্রনাথের পরামর্শমত পরিবর্তনের কথা লেখক স্বীকার করেছেন। 'হরিপ্রিয়ার সম্বন্ধীয় গল্পটি জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে ছাপা হইতেছে। আপনার পরামর্শমত পরিবর্তনাদি করিয়া দিয়াছি।' ৩৩ গল্পরচনায় রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ নেওয়া, সত্য ঘটনা অথবা অন্যভাষা থেকে গল্পকাহিনী আহরণের চেষ্টা থেকে বোঝা যায় লেখক এখনও গল্পরচনার ক্ষেত্রে আত্মশক্তিতে পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেন নি। বস্তুত: 'নবকথায় কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্পের পাশাপাশি কয়েকটি গল্পে তাঁর অপরিণত শক্তির পরিচয়ও আছে।

অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্থ বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারে কন্যাবিবাহ এক সমস্যা বিশেষ, উপরন্তু কন্যাবিবাহে বরপণ দেওয়ার রীতি সমস্ত কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তদুপরি কন্যা অঙ্গহীনা হলে সমস্ত সমস্যাটি কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে 'অঙ্গহীনা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫) গল্পে তারই কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অবশ্য এখানে কোন সমস্যাই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেনি। চারিত্রিক উদারতায় সব কিছুর সহজ মধুর সমাধান ঘটেছে।

নিতান্ত ভালমানুষ শ্যামাচরণ বাবু স্ত্রীর সামান্য গয়নাটুকু বিক্রয় করে প্রায় হাজার টাকা মূলধন নিয়ে আশাপোষণ করেছিলেন কন্যা শৈলবালার সঙ্গে পুত্রবধূ জমিদারনন্দন মোহিনীমোহনের বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করতে। সবই ঠিক হয়েছিল কিন্তু পাত্রপক্ষের দাবী মেটাতে ন্যূন পক্ষে তিনহাজার টাকার দরকার। শ্যামাচরণ বাবুর পক্ষে এই টাকা জোগাড় করা সম্ভব না হওয়াতে সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়। যদিও ইতঃপূর্বে মোহিনী এবং শৈলবালার হৃদয়ে পারস্পরিক-ভাবে পূর্বরাগের সঞ্চার অতি সঙ্গোপনে ঘটেছিল। অর্থাভাবে শ্যামাচরণ বাবু কন্যার বিবাহ দ্বিতীয় পক্ষে অন্যত্র স্থির করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশত: একদিন ঘটির কানায় রাখা বাম হাতের একটি আঙ্গুলের উপর দেওয়াল থেকে খসে চূণ সুরকী পড়ায় শৈলবালার অর্দ্ধেক আঙ্গুল কাটা যায়। গায়ে হলুদ হয়ে যাওয়ার পর অঙ্গহীনা এই অজুহাতে শৈলর বিয়ে ভেঙ্গে যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই রাত্রেই মোহিনী তাকে বিয়ে করে। পিতার অজান্তে মোহিনীকে বিয়ে করেছিল তাই পারিবারিক অশান্তির ভয় ছিল কিন্তু মোহিনীর পিতা হরেকৃষ্ণ-বাবুর উদারতায় সবকিছুর শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়ে যায়।

কাহিনী পরিকল্পনায় একটি সত্য ঘটনার আভাষ আছে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেজ মেয়ে সুরবালা যখন পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা সেই সময় দোতলার দেওয়ালের কার্ণিসের কিছুটা ভেঙ্গে ঘটির উপরে রাখা তার হাতে পড়ে ফলত: তার দুইটি আঙ্গুলের কিছু অংশ কাটা যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন — 'বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অঙ্গহীনা নামক গল্পের নায়িকা সৃষ্টি করিয়াছেন। বলাবাহুল্য সেই গল্পের অন্যান্য ঘটনা তাঁহার কল্পনা প্রসূত।' ৩৪

কাহিনী বর্ণনার মধ্যে দিয়ে এখানে গল্পরস জমে উঠেছে। বিয়েতে বরপণ আদায়ের ব্যাপারে পাত্র পক্ষের যে হীনতা যে অমানবিক আচার আচরণকে কেন্দ্র করে এখানে হরেকৃষ্ণবাবুর চরিত্রকে মসীলিপ্ত অথবা কন্যাদায়গ্রস্থ শ্যামাচরণ বাবুর উদ্ভ্রান্ত করুণ রূপটিকে ফুটিয়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল লেখক সেইদিকটিকে পরিহার করেছেন। অন্যদিকে বলা যায় পণ প্রথাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের 'দেনা - পাওনা' গল্পে পাত্রের পিতার জঘন্য অর্থলিপ্সু চরিত্রটি গল্পরসের জোগান দিয়েছে।

গোঁড়া হিন্দু পরিবারের ছেলে বিবাহিত মণিভূষণ এবং তার অধ্যাপক-কন্যা খৃষ্টধর্মাবলম্বী হিমানীর পারস্পরিক প্রেম কাহিনী 'হিমানী' (বৈশাখ, ১৩০৬) গল্পের উপজীব্য বিষয়। মণিভূষণ হিন্দু এবং বিবাহিত তাই এই মিলন অসম্ভব জেনে হিমানীর পিতার পরামর্শে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এরপর মণিভূষণ তার বিবাহিতা স্ত্রী নবদুর্গার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে হিমানীকে ভুলতে চেয়েছে কিন্তু এব্যাপারে স্ত্রীর অসহযোগিতায় ব্যথিত হয়ে সে মানসিক রোগগ্রস্থ হয়ে হিমানীর চিন্তাতেই বিভোর হয়েছে। মণিভূষণের প্রতি হিমানীর নিগূঢ় প্রেমের ঐকান্তিকতায় সে কুমারী জীবন যাপন করেছে এবং শেষপর্য্যন্ত মণিভূষণের স্ত্রীর রোগশয্যায় এক সংকট পূর্ণ মুহূর্তে তাকে নিজ-রক্ত দানে বাঁচিয়ে তুলে সে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছে এই বিশ্বাসে যে রক্তদানের মধ্য দিয়ে আংশিকভাবে সে নিজেকে নবদুর্গায় রূপান্তরিত করে মণিভূষণের প্রেমে ধন্য হয়ে নারী জীবন সার্থক করে তুলেছে।

হিমানী চরিত্রের পরিণতি একটু অস্বাভাবিক মনে হলেও তার আত্মত্যাগের করুণ কাহিনী মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। গল্পে অসামাজিক দুর্বার প্রেমের উম্মত্ততা অংকণের পরিবর্তে প্রভাতকুমার সনাতন হিন্দু সংস্কার মেনে নিয়ে প্রেমের মাধুর্যপূর্ণ স্বরূপটি উদ্ঘাটনে সক্ষম হয়েছেন।

ভাষান্তর থেকে গৃহীত এবং স্বেচ্ছামত পরিবর্তিত গল্পকাহিনী 'ভূত না চোর ?' (চৈত্র, ১৩০৩) গল্পে সেকালের অতি দরিদ্র, অর্থাভাবে ছলনার আশ্রয়ী এক ফিরিঙ্গি সাহেবের করুণ জীবনযাপন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দেনার জ্বালায় জর্জরিত সাহেব আত্মগোপনের জন্য তেতলায় ঘর ভাড়া নিয়ে অন্য বন্ধুর সাহায্যে বাইরের দরজায় তালা দিয়ে সারাদিন ঘরে চুপচাপ থেকে রাত্রে স্নানাহার সেরে নিতে গিয়ে বাড়ীওয়ালার মনে কিভাবে ভূতের ভয় জাগিয়ে তুলেছিল তার এক কৌতুককর কাহিনী।

ভগ্নীপতিকে জব্দ করবার জন্য তার অল্পবয়েসী শ্যালিকা, ভগ্নীপতি রামসুন্দর বিলাত যাচ্ছে এই মর্মে রামসুন্দরের বাবাকে চিঠি লিখে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল এবং অবশেষে সেই চিঠির ফলে সত্য সত্যই রামসুন্দর কি ভাবে বিলাত যেতে সমর্থ হয়েছিল তার এক কৌতুককর কাহিনী 'বেনামী চিঠি' (ভাদ্র, ১৩০৫)। ঘটনা সংস্থাপনের মাধ্যমে কাহিনীতে কৌতুক হাস্যের সৃষ্টি হয়েছে। গল্পের উপসংহারে তৎকালীন বিলাতফেরতদের সামাজিক সুবিধা অসুবিধার কথা বর্ণিত হয়েছে। 'বিলাত ফেরত ব্যক্তিগণ আমাদের গল্পের বিষয়ীভূত হইলে, তাঁহাদিগকে মিষ্টার ছাড়া অন্য কিছু বলা আমাদের সেই ক্ষমতাসীমার অতীত। মিষ্টার রামসুন্দর বিলাত হইতে ফিরিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। দুই বৎসরেই বেশ পশার

জমিয়া x গিয়াছে

জমিয়া গিয়াছে। পিতামাতা পুত্রের সম্পর্কে তাহার পূর্বকৃত অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছেন। একটা জঁকাল রকমের প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়ায় সমাজও রামসুন্দরকে মার্জনা করিয়াছে। আপাতত: মার্জনা করিয়াছে বটে কিন্তু কন্যার বিবাহের সময় কোনও গোল উঠিবে কিনা বলা যায় না।' ৩৫

অর্থপিশাচ, মানবতাবোধহীন এক বৃদ্ধ তার সদ্যমৃতা পুত্রবধূর অলংকারগুলি আদায়ের জন্য বৈবাহিকের সঙ্গে যে হৃদয়হীন কদর্য ব্যবহার করে চাবির অভাবে কন্যাশোকাতুরা বৈবাহিককে সিন্দুক ভাঙ্গিয়ে অলংকার গুলি বের করে দিতে বাধ্য করেছিল — মূলত: সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'কুড়ানো মেয়ে' (আষাঢ়, ১৩০৬) গল্পে। অবশ্য গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে নৌকাডুবিতে তার গহনাগুলি খোয়া যায় এবং সেগুলি ফিরে পাবার লোভে বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করতেও সে পেছপা হয়নি।

'কাজির বিচার', 'কাটামুণ্ড', 'শাহজাদা ও ফকীরকন্যার প্রণয় কাহিনী' আরব্য উপন্যাস থেকে নেওয়া কাহিনী ভিত্তিক রচনা। ভাষান্তর থেকে নেওয়া এই গল্পগুলি প্রভাতকুমারের মৌলিক গল্পসৃষ্টি নয় তবে সহজ সরল ভাষায় গল্পগুলির উপস্থাপনা প্রভাতকুমারের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে।

প্রভাতকুমারের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবন-চরিত' (সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬) বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত বলে মনে হয়। বিখ্যাত গল্পকার ও হেনরির 'The tale of a tainted Tenner' গল্পটির প্রভাব এখানে রয়েছে। জড় পদার্থের মুখে চেতনা আরোপ করে গল্প-কাহিনী রচনার কৌশল ইতঃপূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা'য় দেখা গেছে। অবশ্য এগুলি সর্বাংশে ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারেনি। 'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবন-চরিত' ও একটি সম্পূর্ণ-কাহিনী সমৃদ্ধ নয়, অনেকগুলি চরিত্র সংস্পর্শের অভিজ্ঞতা মাত্র বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী কালে প্রভাতকুমারের অনেকগুলি গল্প উপন্যাস রচনার চরিত্রচিত্রণের প্রাথমিকরূপটির জড় এখানে আছে বলে অনুমান করা যায়। গল্পে চারু চরিত্রে যে স্নেহময়ী, সেবাপরায়ণা গৃহবধূর রূপ অঙ্কিত হয়েছে পরবর্তীকালে 'বাল্যবন্ধু' গল্পের হেমাঙ্গিনী, 'আমার উপন্যাস' গল্পের প্রিয়, 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসের সুরবালা, 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসের বকুরাণী ইত্যাদি চরিত্রগুলির মাধ্যমে নারীর এই রূপটি প্রকাশিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচার প্রসার হতে থাকে এবং ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত একদল নব্যতন্ত্রের যুবকের মনে প্রাচীন হিন্দু সংস্কারকে ভেঙ্গে ইংরাজদের অনুকরণে জীবনযাত্রা নির্বাহের চেষ্টা সমাজে লক্ষ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ফলে

স্ত্রীলোকের পর্দানশীন প্রথাও অপসারণের চেষ্টা চলে। যেখানে হিন্দু সমাজে বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে প্রকাশ্যে রাজপথে ভ্রমণও অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল সেখানে স্ত্রীকে বিদেশী পোষাকে আবৃত করে একসঙ্গে রাজপথে ভ্রমন এমনকি থিয়েটার দেখা পর্য্যন্ত এই নব্যতন্ত্রী যুবকদের মনে স্থান পেতে থাকে। এই ধরণের এক নব্যতন্ত্রী যুবক সুবোধ, মেম শিক্ষয়িত্রীর কাছে লেখাপড়া শেখা তার স্ত্রী সুনীতিকে মেমসাহেবের পোষাকে সজ্জিত করে থিয়েটারে যাওয়ার পথে যে বিড়ম্বনা ভোগ করেছিল তারই হাস্যরসাত্মক মধুরান্তিক কাহিনী 'পত্নীহারা' (শ্রাবণ, ১৩০৬)। 'পত্নীহারা'য় একদিকে আছে দাম্পত্য প্রেমের মধুর চিত্র, অন্যদিকে নব্যতন্ত্রে দীক্ষিত তৎকালীন যুবকদের মনোবাসনার কথা। প্রভাতকুমার প্রাচীন পারিবারিক আদর্শে বিশ্বাসী হলেও নব্যতন্ত্রের প্রতি তাঁর বিরূপতা এখানে প্রকাশ পায় নাই। আশ্চর্যভাবে নিরপেক্ষ থেকে কাহিনীর ঘটনাসংস্থাপনের কৌশলে গল্পে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

ঘর - সংসারে থেকে বিবাহিত জীবনে স্বামী সেবা এবং আত্মীয় পরিজনের পরিচর্যার মাধ্যমে নারী সার্থকতা অর্জন করে। প্রভাতমানসের এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে 'ভুলভাঙ্গা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) গল্পে। হরিপ্রিয়াদেবী তার কলেজে পড়া ঘোর থিয়জফিষ্ট দাদার প্রভাবে সংকল্প করেছিল আজীবন কুমারী থেকে ধর্মালোচনায় জীবন অতিবাহিত করবে। তার মনে দৃঢ় ধারণা হয়েছিল এই বিশ্বজগৎ মায়াময়, সংসার কারাগার বিশেষ। তাই বিবাহিত জীবনে স্বামী সোহাগে মন তার বিচলিত হলেও সবলে সেই দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে উচ্চতর সাধনের জন্য গুরুর সঙ্গে একদিন গভীর রাতে গৃহত্যাগ করে। কিন্তু ধর্মসাধন মানসে ঋষিতুল্য পিতৃতুল্য যে গুরুদেবের হস্তধারণ করে পিতৃ গৃহ ত্যাগ করেছিল সেই গুরুদেবই যখন তাকে প্রেম নিবেদন করে বসে তখন 'সেই গুরু- দানবকে গর্বিত পদাঘাতে ধরাশায়ী করে' স্বীয় অমূল্য সতীত্ব মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তার ভুল ভেঙ্গে যায়। অন্যদিকে তার দাদাও বিয়ে করে সংসার ধর্মপালনে ইতঃপূর্বেই ব্রতী হয়েছিল। গৃহাশ্রমের প্রতি প্রভাতকুমারের গভীর আকর্ষণ, নারীর স্বামী পূজা, নরনারীর সংসার জীবনের প্রতি গভীর আস্থার কথা এখানে উচ্চারিত। অন্যদিকে তথাকথিত গুরুদেবদের চরিত্রের প্রতিও এখানে কটাক্ষ আছে। সন্ন্যাসী জীবনের প্রতি লেখকের অনাস্থা পরবর্তীকালে রচিত 'নবীন সন্ন্যাসী'র (ভাদ্র, ১৩১৯) মোহিতলালের চরিত্রে, 'রত্নদীপ' (আষাঢ়, ১৩২২) এর গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ভবেন্দ্রের সংসারে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছায় প্রকটিত হয়েছে। গুরুদেব অথবা মোহন্ত জাতীয় অধিকাংশ ধর্মধ্বজীদের চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতিও লেখকের সন্দেহ প্রকাশিত হয়েছে 'নবদুর্গা' (১৯৩০) উপন্যাসের কেদারেশ্বর তীর্থের মোহন্ত অম্বিকাচরণ পুরীর চরিত্রে।

গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের সংশোধনের কথা প্রভাতকুমারের চিঠি থেকে জানা যায় —' হরিপ্রিয়ার সম্বন্ধীয় গল্পটি ভারতীতে ছাপা হইতেছে। আপনার পরামর্শমত পরিবর্তনাদি করিয়া দিয়াছি ।' ৩৬ রবীন্দ্রনাথের পরামর্শের কথা না জানা গেলেও অন্য একটি চিঠিতে ৩৭ 'ভুলভাঙা' গল্পের যে সংক্ষিপ্তরূপ রবীন্দ্রনাথকে প্রভাতকুমার জানিয়েছিলেন তার সঙ্গে প্রকাশিত গল্পের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । সংক্ষিপ্তসারে, কারণ- সুধাপানে গুরুদেবের উন্মত্তাবস্থার কথা আছে এছাড়া শ্বশুরবাড়ীতে হরিপ্রিয়ার অদ্ভূত আচরণের জন্য উৎপীড়নের কথাও উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু প্রকাশিত গল্পে এই সকল কথা নাই। সম্ভবত: রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে এই পরিবর্তন ঘটেছে এবং নি:সন্দেহে গল্পের সংহতি তাতে বেড়েছে । গুরুদেবের চরিত্রে -হীনতার কথা ইত:পূর্বে আমরা দেখেছি তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে । ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মুণ্ডমালা' (১৯০১) য় ভণ্ড সন্ন্যাসীর চরিত্র আছে ।

মানুষের ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস এবং ঘটনা পরিবেশের চাপে পড়ে স্বামী সোহাগিনী ষোড়শী গৃহবধূ সংস্কার বসে কিভাবে নিজের মানবীত্বে সংশয়ান্বিত হয়ে দেবীত্বে বিশ্বাস করতে শুরু করে শেষ পর্য্যন্ত নিজের ব্যর্থতার মর্ম্মপীড়ায় আত্মবিসর্জন করেছিল তারই করুণ কাহিনী 'দেবী (ভাদ্র,১৩০৬) গল্পে বিবৃত হয়েছে । দেবী গল্পের প্লট রবীন্দ্রনাথের দেওয়া, উপস্থাপনা অবশ্যই প্রভাতকুমারের। গল্পটি সর্বাংশে রবীন্দ্রনাথের মন:পূত হয়নি প্রভাতকুমারের এক চিঠি থেকে সে কথা জানতে পারি :—

' শুনিলাম আমার দেবী' গল্প পড়িয়া আপনি নিরাশ হইয়াছেন, তাহার সাইকোলজি পরিস্ফুট হয় নাই দেখিয়া । পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া মানুষ করা বড়ই কঠিন দেখিতেছি ; যতই যত্ন কর, তার মায়ের মন কিছুতেই উঠে না । তার মা বলিবেই বলিবে — ঐ আমার মেয়ের অযত্ন হইল। · - - -

.........'দেবী'র একটা ফাইল পাঠাইতেছি এই ডাকে। একটু touch করিয়া দিবেন অনুগ্রহ করিয়া ?'....৩৮ কিন্তু প্রভাতকুমারের লিখিত গল্পে রবীন্দ্রনাথ কোন পরিবর্তন করেছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না । যাহোক 'দেবী' গল্পটি ট্র্যাজিক মহিমায় উদ্ভাসিত — এবং এইটি প্রভাতকুমারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প । শুধু কৌতুকহাস্যেই নয় ট্র্যাজিক গল্প রচনাতে প্রভাতকুমারের দক্ষতার বিশেষ পরিচয় গল্পটিতে রয়েছে ।'দেবী'র আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন ....' এখানে প্রভাতকুমারের শিল্প প্রতিভা নিজের শান্ত , সরস ও সজল, কল্পনার সীমা অতিক্রম করে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ও দার্শনিকতা - সুলভ এক মহাকাশের মধ্যে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে । আর গল্পটির সর্বতোমুখী শৈল্পিক সফলতা এই সত্যটিই প্রমান করেছে যে, আর একটু আত্মস্থ এবং সাধননিষ্ঠ হলে তার যে হাত জলতরঙ্গ বাজিয়েছে তা মৃদঙ্গে ধ্রুপদী

বোল তুলতে পারত ।

নিতান্ত দরিদ্র শ্রীবিলাস, শ্বশুরের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে ওকালতি পাশ করেও পসারজমাতে ব্যর্থ হয়েছে । স্বাভাবিকভাবেই তার মনে কিছুটা হীনমন্যতা দানা বেঁধেছে, উপরন্তু স্ত্রী ধনী-কন্যা এবং মুখরা হওয়ায় তার দাম্পত্য জীবনেকিছু অশান্তি দেখা দিয়েছে । কোন এক বিবাহ উপলক্ষে জেদের বশে স্ত্রী সরোজবাসিনী, স্বামীর অসচ্ছলতার প্রতি ইঙ্গিত করে পিত্রালয়ে চলে যাওয়ায় শ্রীবিলাসও দুর্বুদ্ধিবশত: আবার বিয়ে করে।অবশ্য তার দ্বিতীয়া পত্নী রোগভোগে অল্প দিনের মধ্যে মারা যাওয়ায় এই দম্পতির পুনর্মিলনে তেমন কোন বাধা হয় নাই। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি'র(বৈশাখ, ১৩০৫) গল্পকাহিনীতে শত অশান্তির মধ্যেও দাম্পত্য বন্ধনের ও নারীর পতি-ধর্মের প্রতি লেখকের আস্থার ভাবটি অনুভব করা যায়। লেখকের মন্তব্য — 'এমন কোন সাংসারিক কষ্ট আছে, যাহা দাম্পত্য প্রণয়ের স্নিগ্ধমধুর স্পর্শে নিতান্ত লঘু হইয়া না যায় ?' ৪০ এই গল্পে অন্যত্র সরোজবাসিনীর মাকে দিয়ে বলিয়েছেন —' পুরুষ স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন আর গতি নাই ।' ৪১

লন্ডন সমাজের জনৈক গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সুচিকিৎসক স্যার হেনরি রবিনসন মাঝে মাঝে উন্মাদব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েঘরছাড়া হয়ে যেতেন আবার ব্যাধির উপশম হলে ঘরে ফিরে আসতেন । একবার ভারত ভ্রমনে এসে এই ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে পড়েন। সৌভাগ্যক্রমে এক বাঙালী ভদ্রলোকের ঘরে স্থান লাভ করেন এবং তার মেয়ের জ্বরবিকারের সংকটময় মুহূর্তে নিজে চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তোলেন। কিছুদিনের মধ্যে স্যার হেনরিও ব্যাধিমুক্ত হন এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যায় । 'ভিখারী সাহেব' (আশ্বিন, ১৩০৬) এর এই গল্পকাহিনীতে উন্মাদরোগগ্রস্থ হেনরির হৃদয়ে অসুস্থা গিরিবালার প্রতি কন্যাসম সন্তান স্নেহের পরিচয় বেশ আকর্ষণীয় ভাবে বিবৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' (অগ্রহায়ণ, ১২৯৯) গল্পে একজন মেওয়াওয়ালা আপাতরুক্ষ কাবুলির হৃদয়ে বাঙালী মেয়ে মিনিকে কেন্দ্র করে যে চিরন্তন পিতৃহৃদয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এই গল্পেও ভিন্নদেশীয় রবিনসন-চিত্তেও একই ভাবের প্রকাশ দেখি।'ভিখারী সাহেব' রচনায় 'কাবুলিওয়ালা'র প্রভাব হয়ত অসম্ভব নয়। তবে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি রস প্রধান আর ভিখারী সাহেব গল্পে কাহিনী প্রাধান্য পাওয়ায় তেমনভাবে রসঘন হয়ে উঠতে পারেনি ।

'বিষবৃক্ষের ফল'(কার্ত্তিক, ১৩০৬) গল্পটিতে উদ্ভট খেয়ালের বশবর্তী হয়ে কলেজে পড়া চারজন তরুণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষের' অনুসরণে বৈষ্ণবীর

ছদ্মবেশে তাদেরই মধ্যে অন্যতম চারুর শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে বাড়ীর মেয়ে মহলে গান শুনিয়ে ফেরার পথে জমাদার সাহেবের হুকুমে গ্রেপ্তার হয়ে থানায় উপনীত হয়। শেষ পর্যন্ত চারুর শ্বশুরের কৃপায় সেইরাত্রে হাজতবাস থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু ছদ্মবেশ ধারণ করে শ্বশুর বাড়ীতে আগমনে কিভাবে চারু এক প্রচন্ড লজ্জাকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গল্পে তারই কৌতুককর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনী নিতান্ত উদ্ভট কল্পনাশ্রয়ী হলেও পরিবেশনার গুণে কৌতুক হাস্যের সৃষ্টি করেছে। ইংরাজী শিক্ষা এবং অত্যধিক উপন্যাস পাঠের প্রতি লেখকের মৃদু ব্যঙ্গের পরিচয় এখানে আছে। চারুর মুখে শুনি — 'ইংরিজি পড়ে লোকে যে রকম স্ত্রী-বৎসল হয়ে উঠেছে — চব্বিশ ঘন্টা স্ত্রীর 'শ্রীচরণের ছুঁচো' হয়ে পড়ে থাকলে সে বেচারী মান করবার অবসর পাবে কখন ?' ৪২ অথবা এই ছদ্মবেশী বৈষ্ণবীদের উদ্দেশ্যে বাড়ীর বড়বধূকে বলতে শুনি —'একটা থিয়েটারের গান গাওনা। আজকাল ত কত বোষ্টুমি এসে থিয়েটারের গান গায় — নন্দাবিদায়, তবে গিয়ে প্রভাস মিলন, আরও সব কত কি।' ৪৩ বড়বধূর উক্তির মধ্যে তৎকালীন গৃহবধূদের মনে থিয়েটার প্রিয়তার কথা স্মরণ করায়। অত্যধিক উপন্যাস পাঠের ফলে অল্পবয়স্কদের মনে যে বিকৃত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু' (১৮৭৭) প্রহসনটির নায়িকা হেমাঙ্গিনী চরিত্রে তার পরিচয় আছে। নভেলের অনুকরণে - নায়ক - নায়িকার মনে প্রণয় সঞ্চারের পর বিবাহ না হলে হেমাঙ্গিনী মনে কষ্ট অনুভব করে। নিজের বিবাহ ব্যাপারেও মিথ্যাভাষী বাক্‌পটু অলীকবাবুকে সে পছন্দ করেছে কারণ তার ধারণা অলীকবাবু অনেক নভেল পড়েছেন বলে এত অলংকার যুক্ত সুন্দরভাবে কথা বলতে পারেন। উপন্যাসের নায়িকার অনুকরণে গোপনে সে অলীকবাবুকে প্রেমপত্র পাঠিয়েছে এবং তার প্রেমপত্রের ভাবভাষাও বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষের' অনুরূপ। নবকথা গল্পগ্রন্থের 'বঙ্কিমবাবুর কাজির বিচার' গল্পটি শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা।

'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর' (অগ্রহায়ণ, ১৩০২) ঠিক গল্প নয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতিমূলক সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত একটি কৌতুককর রচনা। 'পাকশালার সহকারীরূপে নিযুক্ত' চন্দ্রমোহন নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ পাঠ করেই গ্রন্থকার হবার আশায় স্বীয় অল্পবিদ্যাবলে বর্ণপরিচয় রচনা করে পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে কালক্রমে সুনামের অবলুপ্তি ঘটিয়ে হাসিচ্ছলে 'বিদ্যাসাগর' নামেই পরিচিত হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং বিদ্যাসাগর এই ঘটনা জানতে পেরে চন্দ্রমোহনের সঙ্গে 'মিতে' পাতিয়ে তাকে ছাপাখানায় একটি চাকরীর ব্যবস্থা করে লেখাপড়ার বন্দোবস্ত কিভাবে করে দিয়েছিলেন তারই এক হাস্যরসাত্মক কাহিনী।

'নবকথা'য় সংকলিত সতেরোটি রচনার মধ্যে 'কাটামুণ্ড' এবং 'সাহজাদা-ও ফকিরকন্যার প্রণয় কাহিনী' ব্যতিরেকে অন্যান্য গল্পগুলির রচনাকাল ১৩০২ থেকে ১৩০৬ সাল এবং এইগুলি রচিত হয়েছে লেখকের মোটামুটিভাবে তেইশ থেকে সাতাশ বৎসর বয়ঃকালের মধ্যে। বিদ্যাশিক্ষা এবং কর্মসূত্রে এই সময়ে তিনি বিহারের পাটনা, জামালপুর, দিনদারনগর, উত্তর প্রদেশের সিমলা, বাংলাদেশের কলিকাতা ইত্যাদি অঞ্চলে ঘোরাফেরা করেছেন। তাই কোন কোন গল্পের পটভূমিকায় দেখি এই সমস্ত অঞ্চলের বর্ণনা। যেমন 'ভুলভাঙ্গা' গল্পে জামালপুরের তখনকার বাঙালী সমাজের এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাই। গল্পের নায়িকা হরিপ্রিয়া আত্মজবানীতে জানিয়েছে —' যে স্থানে আমাদের বাসা, তাহাকে বৈদ্যপাড়া বলে। .... বৈদ্যপাড়ায় সবই বাঙ্গালী - শুনিলাম জামালপুরময় সবই বাঙ্গালী। হিন্দুস্থানীর সংখ্যা জামালপুরে মুষ্টিমেয়। হিন্দুস্থানী যত, তাহারা সব জামালপুরের বাহিরে আসেপাশে পল্লীগ্রামে থাকে। জামালপুরে সমস্তই অফিসের বাবু। নয়টা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত জামালপুরসুদ্ধ বাবু অফিসে আবদ্ধ থাকে, সুতরাং ঐ সময়ের জন্য জামালপুরটা স্ত্রীলোকের রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত প্রকাশ্য রাজপথ অতিক্রম করিয়া এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া বেড়ায়। প্রয়োজন হইলে দল বাঁধিয়া এপাড়া ওপাড়া করাও চলে। এইটি জামালপুরের স্ত্রীসমাজের বিশেষত্ব। বঙ্গদেশের বাহিরে আর কোথাও স্ত্রীলোকদের এ সুযোগ নাই।' ৪৪ বস্তুতঃ বাঙালী অধ্যুষিত তৎকালীন জামালপুরের এই দৃশ্য অসম্ভব ছিল না। 'স্ত্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' গল্পে বাঁকীপুরের উল্লেখ লেখকের ছাত্রাবস্থায় সেখানে অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সময়ে লেখা তাঁর 'সিমলা শৈল' (ফাল্গুন, ১৩০৪) রচনাটিতে চাকুরী জীবনে তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থানের কথা মনে করায়। 'কুড়ানো মেয়ে' গল্পে অন্নদার স্ত্রী বিয়োগের পর মানসিক অবস্থা, 'বেনামী চিঠি' গল্পে রামসুন্দরের মাতাপিতার অমতে শ্বশুরের অর্থে গোপনে বিলাত যাত্রায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের গোপন বাসনার প্রতিফলন ঘটেনি এমন কথা জোর করে বলা যায় না। 'বিষবৃক্ষের ফল' গল্পে বঙ্কিমরচনা-প্রীতি এবং অন্য দু একটি গল্পে রবীন্দ্রপ্রীতির কথাও উল্লেখযোগ্য। 'অঙ্গহীনা' গল্পে কন্যাদায়ের সামাজিক সমস্যা, 'পত্নীহারা' গল্পে নব্যযুবসম্প্রদায়ের মানসিকতা ইত্যাদি সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার কথা বিধৃত। গল্পরসের দিক থেকে একদিকে যেমন রয়েছে 'হিমানী', 'দেবী' ইত্যাদির মত করুণ রসাত্মক গল্প, অন্যদিকে 'বিষবৃক্ষের ফল' এর মত হাস্যরসাত্মক গল্পও বর্তমান। পরবর্তীকালে প্রভাতকুমারের গল্প রচনায় যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থের মধ্যে সেগুলির কিছু কিছু পরিচয় রয়েছে।

(৩)

প্রভাতকুমারের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'ষোড়শী' । প্রথম প্রকাশকাল আশ্বিন, ১৩১৩। বিভিন্ন ভাব রসের ষোলটি গল্প এখানে সংকলিত হয়েছে । গল্পগুলি ইত: পূর্বে 'প্রবাসী', 'বঙ্গদর্শন' এবং 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০৬ থেকে ১৩১১ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল । লেখকের জীবিতকালের মধ্যে গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণ মুদ্রিত হয়ে এর জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করছে। বস্তুত:'ষোড়শী'তে প্রভাত - প্রতিভা সুপরিস্ফুট। 'বলবান জামাতা'র মত অনাবিল হাস্যরস সমৃদ্ধ গল্প যেমন এখানে আছে তেমনি আছে 'কাশীবাসিনী', 'বন্য শিশু'র মত করুণ রসাত্মক গল্প ।এই উভয় শ্রেণীর গল্প রচনাতেই তাঁর যে দক্ষতা কতখানি 'ষোড়শী'র অনেক গল্পেই সেই পরিচয় আছে ।

রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব সেনের নেতৃত্বাধীনে বাংলাদেশে নবরূপ লাভ করেছিল । ১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরেরপ্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়া, ১৮৫৭ - ৫৮ সালে কেশব সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ এই ধর্মান্দোলনকে নূতন পথে চালিত করে ।এঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজে যে নূতন শক্তি সঞ্চালিত হয়েছিল তারই ফলশ্রুতিতে' ১৮৫৯ সালে 'ব্রাহ্মবিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র কলেজের ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে উপদেশ দিতে লাগিলেন । তদ্দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইলেন ।' ৪৫ তৎকালীন স্কুল কলেজে পড়া কতিপয় শিক্ষিত যুবকের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকর্ষণ এবং তার আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালনের মধ্যেআন্তরিকতার অভাব ছিল না কিন্তু তাদের চিন্তাধারার মধ্যে কিছু হাস্য-কর অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল ।

প্রভাতকুমারের 'বউচুরি' (বৈশাখ, ১৩০৭) গল্পের নায়ক অনাথ-শরণ কলেজে পড়া শিক্ষিত যুবক, ব্রাহ্মসমাজে তার নিয়মিত যাতায়াত আছে এবং এই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগবশত: সকাল সন্ধ্যায় একতারা বাজিয়ে ব্রাহ্মসঙ্গীত গান করে থাকে । কিন্তু তার বিশেষ বন্ধু, দীক্ষিত ব্রাহ্ম হেমন্তকুমারের প্রভাবে তার মনে প্রবল বিশ্বাস জন্মেছে 'প্রেম সম্পর্ক - বিহীন, পূর্বরাগ বর্জিত বিবাহ বিবাহই নয় ।''হিন্দু ধর্মমতে বিবাহিত তার স্ত্রী মন্দাকিনীকে যেহেতু সে আগে থেকে ভালবেসে বিয়ে করেনি সুতরাং সে তাহার স্ত্রী নহে ভগিনী ।' তাই সে ঠিক করেছে মন্দাকিনীকে কলিকাতায় নিয়ে যাবে এবং সেখানে উভয়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে ঐ ধর্মের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার যে নূতন আইন প্রবর্তিত হচ্ছে সেই আইন অনুসারে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করবে। তারপর মন্দাকিনী যাকে ভালবাসবে তাকেই স্বামীত্বে

বরণ করবে। অনাথশরণ নিজেও তার বন্ধুর দূর সম্পর্কীয় ভগিনী নগেন্দ্রবালা, যার সম্পর্কে অনাথশরণের ধারণা যে সে তাকেই মনে মনে ভালবাসে, সেই নগেন্দ্রবালাকে সে বিয়ে করবে। কিন্তু কার্যত: দেখা গেল 'সুপ্তিমগ্না নবযৌবনা' মন্দাকিনীর চন্দ্রালোকিত মুখখানি, তার 'অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটি,' তার হৃদয়কে চঞ্চল করেছে এবং কলকাতায় যাত্রাপথে অসুস্থ মন্দাকিনীর সেবাযত্ন করতে গিয়ে মন্দাকিনীর প্রেমের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে অনাথশরণ আত্মহারা হয়েছে ।

প্রকৃতপ্রস্তাবে, ব্রাহ্মধর্মের গূঢ় অর্থ এবং সঠিক বিশ্লেষণ অনুধাবন করতে না পারায় কিছু অদ্ভুত মনোভাব সে কালের ব্রাহ্ম ধর্মানুরাগী অনেক যুবকের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল এমনকি স্ত্রীকে ভগিনী বলতেও তারা কুন্ঠিত হয়নি। এই ধরণের হাস্যকর চিন্তাধারার প্রতি লেখকের মৃদু ব্যঙ্গের আঘাতে প্রচুর কৌতুকরস সৃষ্টি এই গল্পে করেছেন । লেখকের মনোভাব গল্পে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে ~~গল্পে তার~~ চাণক্যের উক্তির সমর্থনে অর্থাৎ 'ঘৃতকুম্ভসমা নারী এবং তপ্তাঙ্গারসম পুরুষকে একত্র স্থাপন করিবে না, করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। সেই নরনারী যদি স্বামী স্ত্রী হয় এবং তাহাদের বয়স যদি তরুণ হয়, তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে ?' অনাথশরণের যে ভাবাদর্শ চরম উদার আধুনিক হতে গিয়ে বিকৃতভাবে 'স্ত্রী'কে 'ভগিনী' সম্বোধনে কুন্ঠিত নয় সেই আদর্শ যখন সুপ্রাচীন চাণক্য পন্ডিতের মতাদর্শে অনাথশরণের জীবনে রূপায়িত হতে দেখি তখন স্বতই হাস্যরসের যোগান দেয় ।

'সারদার কীর্তি' (মাঘ, ১৩০৬) গল্পে পূর্ব জন্মের সংস্কারের প্রতি সুকৌশলে এক ব্যারিস্টারের মনে কিছুটা বিশ্বাস জন্মিয়ে, তার স্ত্রীকে পূর্ব জন্মের মা বলে ডেকে নিজের কাসরোগের উপশমার্থে তার পাদোদকপ্রার্থী হয়ে সুচতুর সারদা কপটতা অবলম্বনে সহানুভূতিশীল এবং পরোপকারী এই দম্পতীর গৃহে আশ্রয় লাভ করে শেষপর্য্যন্ত তাদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে গৃহসামগ্রী অপহরণ করতে গিয়ে কিভাবে ধরা পড়ে তারই কৌতুককর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । অবশ্য এখানে সারদা-বিবৃত, দেবী বিশালাক্ষীর স্বপ্নাদেশ অথবা পাদোদক রোগউপশমের কারণ হয়নি। পরন্তু পাদোদকের সঙ্গে গোপনে মিশ্রিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অনেকাংশে কার্য্যকরী। লেখকের মনোভাবের প্রতিধ্বনি শুনি ব্যারিস্টার পত্নীর মুখে —' ওষুধ খাবে না বিষুধ খাবেনা, পাদোদক জল খেয়ে মানুষের রোগ ভাল হয় ?' ধর্মীয় সংস্কার থেকে যুক্তি এখানে বড় । যুক্তিহীন ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস থেকে হৃদয়বৃত্তির উদারতার কথা এখানে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ।

'বাস্তুসাপ' (বৈশাখ, ১৩০৯) গল্পটিতেও হিন্দুধর্মমতে বাস্তুসাপ

সম্পর্কে যে সংস্কার প্রচলিত আছে অর্থাৎ বাস্তুসাপ কুল দেবতা বিশেষ, গৃহবাসীর মঙ্গলার্থেই তার অবস্থান , তাই দেবতাজ্ঞানে বাস্তুসাপ পূজনীয়, বাঙালী-মনের এই সংস্কার অবলম্বনে লেখক গল্পটিতে কিছু হাস্যরসিকতা করেছেন। লক্ষনীয় এই-কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে এই সংস্কারের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে তিনি কোন মতামত ব্যক্ত করেন নি, সংস্কারাচ্ছন্ন অথবা মুক্ত, কোন পক্ষকেই তিনি আঘাত হানেন নাই ।নবনিযুক্ত ভৃত্য ভোজুয়া সাপকে মানুষের শত্রুজ্ঞানে যেমন সংস্কার মুক্ত মনে হত্যা করেছে আবার ব্রহ্মহত্যা জনিত সংস্কারবোধ গৃহকর্তা শাস্ত্রানুসারে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম করেছেন। বাস্তুসাপ হত্যার জন্য লাঞ্ছিত ভোজুয়া আক্রোশে দুইটি সাপ কিনে এনে গৃহকর্তার সামনে ফেলেছে , সাপদুইটি তাকে দংশনও করেছে কিন্তু বিষদন্তহীন এই সর্পদংশনে কোন সাংঘাতিক ক্ষতি হয়নি । সাংসারিক কোন অমঙ্গল না হওয়াতে সংস্কারাচ্ছন্নের দল ভাববেন শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়া কর্মাদি মেনে চলাতে কোন ক্ষতি হতে পারেনি আবার সংস্কারমুক্ত দলের ভাবতে কোন অসুবিধা নেই যে বাস্তুসাপ হত্যায় কোন অমঙ্গল নাই ।

বালবিধবা তরঙ্গিনী এবং সদ্য বিবাহিতা প্রিয়তমা প্রতিবেশিনী। সখীত্বসূত্রে আবদ্ধ দুই নারীর মান-অভিমান, প্রেম-প্রীতির কাহিনী 'প্রিয়তমা'(অগ্রহায়ণ, ১৩০৬) গল্পের বিষয়বস্তু ।তরঙ্গিনীর মৃত্যু অত্যন্ত করুণ এবং পাঠকমনকে দ্রবীভূত করেছে । এই দুই নারীর সখীত্ব সম্বন্ধ একটু ভিন্নধর্মী, কিছুটা সমকামিতা পর্যায়ের। 'তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রণয়ী ও প্রণয়িণীর মতই আচরণ করিত। তাহাদের পত্রগুলি প্রেমলিপি ছাড়া আর কিছুই নহে।তাহাতে আদর সোহাগ ও মান অভিমানের প্রাচুর্য্য থাকিত। দেখা হইলে দুইজনে নিভৃত স্থানে গিয়া উপবেশন করিত, কোন তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে তাহাদের মুখে কথা ফুটিত না ।'[৭] একটু অস্বাভাবিক এবং বিরলদৃষ্ট হলেও উভয় নারীতে এই সম্পর্ক আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত । প্রভাতকুমারের রুচি বোধ কাহিনীকে যৌন বিকার বিশ্লেষণের মধ্যে দাঁড় না করিয়ে করুণ পরিণতি দান করেছে । এই ধরণের গল্প প্রভাতসাহিত্যে আর লক্ষ্য করা যায় না ।

'বন্যশিশু'(জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭) গল্পে এক পাহাড়িয়া স্ত্রীলোকের বিকৃত সন্তানবাৎসল্যের পরিচয় রয়েছে । সপরিবারে কুমুদনাথ সিমলায় বেড়াতে গিয়ে সেখানকারতারাদেবী মন্দির দর্শনকালে অসহায় অবস্থায় পরিত্যক্ত এক শিশুকে দয়াপরবশ হয়ে গৃহে এনেছিলেন কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা এবং সেবাযত্ন সত্ত্বেও শিশুটি মারা যায়। শিশুটি স্থানীয় কোন পাহাড়িয়া রমনীর ছিল। কুমুদনাথই সন্তান হত্যাকারী এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সেই সন্তানহারা পাহাড়িয়া রমনী প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কুমুদনাথের শিশু সন্তানকে হত্যার

'কলির মেয়ে' (আশ্বিন, ১৩০৮) গল্পে বিনোদ বিহারী তার দুর্দান্ত প্রকৃতির জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়হরি কর্তৃক প্রহৃত হয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং তিনবৎসরকাল অজ্ঞাতবাসের পর অর্থকষ্টে পড়ে অর্থোপার্জনের এক হীন মতলব স্থির করে বাড়ী ফিরে এসে নিজেকে ভাল চাকুরীয়া বলে প্রচারিত করে জমিদার জমিদার কন্যা শরৎকুমারীকে বিয়ে করে। তার মতলবটি ছিল বিয়ে করে কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করে বৌকে ফেলে রেখেই পালিয়ে যাবে। কিন্তু বিয়ের পর শরৎকুমারীরআকর্ষণ তার পালিয়ে যাবার পক্ষেবাধা হয়ে দাঁড়ায়। শেষে স্ত্রীকে তার সত্য পরিস্থিতি খুলে বলে এবং এক চিঠিতে দাদাকে সব কথা জানিয়ে বিয়েতে পাওয়া গহনার হাজার টাকা সম্বল করে বৌকে নিয়ে সবার অলক্ষ্যে গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করে ।

'ধর্মের কল' (আষাঢ়, ১৩০৮) গল্পে সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী শশিভূষণ বাল বিধবা মনোরমার প্রেমে পড়ে সন্ন্যাস ত্যাগ করে, ঘরে ফিরে এসেছে। সে সময়ে বিধবা-বিবাহ আইন বলবৎ হলেও গ্রাম্য সমাজে নিন্দনীয় ছিল। তাই উভয়ের পিতা পরামর্শ করে, মনোরমাকে হৃদরোগের অজুহাতে সুচিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যায়, পরে তার মৃত্যু ঘোষণা করে এবং শশিভূষণও কাশীর মঠে আবার ফিরে গেছে এই ধরণের মিথ্যা খবর গ্রামে রটনা করে দেয় । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়ে কলকাতায় উপস্থিত হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগর এই বর কন্যাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এখানে প্রভাতকুমার বাল বিধবা মনোরমার বিয়ে দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন — 'মেয়েটির বছর পনেরো বয়স যদিও, কিন্তু বুদ্ধি ও প্রকৃতি শিশুবৎ। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের বৃদ্ধি এ পর্য্যন্ত হয় নাই' তাছাড়া বিয়ে হলেও — 'দুইবেলা মাছ ভাত খাওয়া এবং সিঁদুর পরিতে পাওয়া ছাড়া মনোরমা আরকোনও সধবাসুখের অধিকারিনী ছিল না ;' অর্থাৎ আবাল্য সে স্বামীসঙ্গ-বর্জিতা ছিল । শশিভূষণকে সন্ন্যাস থেকে গৃহীর জীবনে প্রতিষ্ঠা করে, গৃহী জীবনের শ্রেষ্ঠতাকেই প্রভাতকুমার এখানে সমর্থন করেছেন । গল্পটির রচনা কৌশল সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে .... ' লেখকের রচনাভঙ্গী ও গল্প বলিবার প্রণালী মনোরম।' ১৪৮

বস্তুত: গল্পটি সুখপাঠ্য।

প্রভাতকুমারের হাস্যরসাশ্রিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'প্রণয় - পরিণাম' (ভাদ্র, ১৩০৮)। রাশি রাশি বাঙলা উপন্যাস পড়া 'হিন্দু বয়েজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র' চোদ্দ বছরের মাণিকলালের প্রতিবেশী বালিকা এগারো বৎসর বয়সের কুসুমলতার সঙ্গে প্রেমে পড়া এবং তার উপভোগ্য পরিণতি গল্পটিরবিষয়বস্তু। কুসুমলতা মাণিকলালের বাল্যকালের খেলার সঙ্গী, কিন্তু তাকে দেখে কোনদিন

সে চিত্ত-চাঞ্চল্য অনুভব করেনি। সম্প্রতি কুসুমদের বাগানে গাছে উঠে যখন সে পেয়ারা পাড়ছিল, গঙ্গাস্নান প্রত্যাগতা সিক্তবসনা কুসুমকে দেখেই 'মাণিক হৃদয় হারাইল।' তারপর 'কোষো পেয়ারায়' তার আর মন উঠেনা। খেলাধুলায় মন নাই, স্কুল পালিয়ে কবিতা লেখে XXX আর শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করে 'কেন দেখিলাম! হরি হরি কি দেখিলাম! দেখিলাম ত মরিলাম না কেন? আমার মনে এ আগুন এ কুলকাঠের আঙার — কে জ্বলিল রে? নিবিবে কি? কতদিনে — হায় কত দিনে?' মাণিকের মনের আগুনে ইন্ধন যোগান দিল তার কলেজে পড়া পিসতুতো ভাই 'মনের রন্ধে রন্ধে XXXX রোমান্স' ভরা নীরব কবি প্রভাস। ফলত: মাণিক কুসুমকে অভিনব উপায়ে প্রেম নিবেদন করেছে এমনকি কবিতা রচনা করে কুসুমকে তার মানসিক অবস্থার কথা জানিয়ে দিল। বেরসিক কুসুম মাণিকের নিষেধ সত্ত্বেও পত্রখানি সদ্য বিবাহিত দিদিকে দেখালে সব কথাই প্রকাশ পেল। এদিকে অত্যুৎসাহী প্রভাস মাণিকের বাবাকে মাণিকের প্রণয় সংক্রান্ত জীবন সমস্যার আশু সমাধানের কথা জানালে, মাণিকের বাবা ডাক্তার চৌধুরী অতি সত্বর মাণিককে ডাকিয়ে 'বামহস্তদ্বারা মাণিকের দক্ষিণ কর্ণটি ধারণ করে' রোষকষায়িত নেত্রে বলে উঠলেন —' ইস্টুপিড শুয়োর! আজ বাদে কাল এক্জামিন — লেখা পড়া গেল, লব হচ্ছে?' XX বলিয়া ঠাস ঠাস করিয়া তাহার গন্ডদেশে কয়েকটা চড় কষাইয়া দিলেন।'

বলাবাহুল্য ডাক্তার পিতার এই চপেটাঘাতেই মাণিকলালের প্রেম-ব্যাধি আরোগ্যলাভ করে এবং অল্পদিনেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কুসুমের বিয়েতে মাণিক বিস্তর লুচি খায়।

গল্পটিতে কাহিনী অংশ সাধারণ এবং সামান্য, কিন্তু বাক্‌চাতুর্যপূর্ণ উপস্থাপনা, সরল মন্তব্য এবং স্বাভাবিক চরিত্রসৃষ্টির গুণে রচনাটিতে হাস্যরসের অফুরন্ত ধারা লেখক বইয়ে দিয়েছেন। গল্পটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং উপভোগ্য 'রচনাটির আদ্যোপান্ত সুমধুর হাস্যরসে অনুপ্রাণিত। কিন্তু অতিরঞ্জিত নহে।' ৪৯

— এই ছিল সমসাময়িক সমালোচনার মন্তব্য। মাণিকলালের প্রেম প্রকাশের ভাব ভাষা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অলীকবাবুর নায়িকা হেমাঙ্গিনীর, নভেলের নায়িকার অনুকরণে প্রেমাস্পদ অলীকবাবুকে লেখা প্রেমপত্রের ভাব ভাষাকে স্মরণ করায়। হেমাঙ্গিনী লিখেছে —' যে অবধি আমাদের গবাক্ষদ্বার দিয়া তোমার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি দেখিলাম ..... প্রেমের প্রথম আলাপের ন্যায় সেই মুখখানি দেখিলাম — দেখিয়া মজিলাম — মজিয়া জ্বলিলাম — জ্বলিয়া XXX মরিলাম না কেন?' ৫১

'ছদ্মনাম' (মাঘ, ১৩০৮) গল্পের কাহিনী অংশ এইরূপ —
বাল্যকালের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু উত্তর জীবনে একজন হয়েছে বিলাত ফেরত ব্যারিস্টার, সাহেবিয়ানায় পক্ষপাতী, বাংলা ভাষার প্রতি বীতরাগ। অন্যজন বাংলা সাহিত্যকে ভালবেসে বাংলা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক — বাঙ্গালীয়ানার অনুরাগী। এই বিভেদ সত্ত্বেও তাদের বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন রয়েছে। ব্যারিস্টার বন্ধু ভালবেসেছে এXXXXX এক ব্রাহ্মমহিলাকে যার আচার আচরণে রয়েছে আধুনিকতা কিন্তু বাংলা ভাষায় তার অত্যধিক অনুরাগ, তার অনুরাগের আরও কারণ এই, তার এক বিশেষ বন্ধু বাংলা গল্প উপন্যাস লেখেন এবং পত্রিকাতেও সেগুলি প্রকাশিত হয়। বন্ধু প্রণয়ীর অন্য যুবক-বন্ধু থাকায় সম্পাদক-বন্ধুর মনে খটকা লাগে এবং বন্ধুর উপকারার্থে তার প্রণয়ীর বিশেষ বন্ধুর লেখা একটি উপন্যাসের তীব্র বিরূপ সমালোচনা করে সর্বসমক্ষে তাকে হেয় করার উদ্দেশ্যে নিজ প্রকাশিত মাসিক পত্রে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু শেষে জানা গেল তার বন্ধু প্রণয়ীর বিশেষ-বন্ধুটি আর কেউ নয় ছদ্মনামে গল্প লেখক বাংলা ভাষা সাহিত্য বিদ্বেষী তারই বাল্যবন্ধু সতীশ -। অতএব সম্পাদক মহাশয় সমালোচনাটি প্রকাশ না করার জন্য পত্রিকার কার্য্যালয়ে তার করে দিলেন।

গল্পটি 'ভারতী'র কার্য্যালয়ে যাতায়াতকালে লেখকের ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদিকাকে সাহায্য করার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করায়। নূতন লেখকের ছদ্মনাম ধারণ, অন্যাক্ষরে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ইত্যাদি তার পরিচায়ক। তাছাড়া নারী প্রগতি সম্পর্কে গল্পটিতে সম্পাদক মন্মথবাবু মন্তব্য করেছেন 'আমি স্ত্রীশিক্ষার খুব পক্ষপাতী কিন্তু স্ত্রী স্বাধীনতা জিনিষটা দুচক্ষে দেখিতে পারি না।' এখানে প্রভাত-মানসই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

একজন অভিনেত্রীর মেয়েকে পড়াতে গিয়ে তার সঙ্গে প্রেমে পড়া, ঘটনা প্রকাশ পেলে মেয়ের মা মেয়েকে অন্যত্র প্রেরণের ফলে নায়কের মনে হা-হুতাশ, ক্রমে মোহ কাটিয়ে ওঠা, অবশেষে মেয়ে নিজেই যখন পত্রমাধ্যমে নায়ককে তার গভীর প্রেম নিবেদন করে তাকে স্বামীত্বে বরণ করেছে তখন নায়কের নিজের সুনাম এবং চরিত্রের শুদ্ধতা রক্ষার্থে কলকাতায় কলেরার প্রকোপের অজুহাতে বাড়ী ফিরে গিয়ে নৈতিক আত্মরক্ষা করার কাহিনী 'সচ্চরিত্র' (ফাল্গুন, ১৩০৮) গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

গল্পটিতে সংস্কার এবং প্রেমের দ্বন্দ্বে চিরাচরিত সংস্কার জয়লাভ করেছে। অভিনেত্রীর মেয়েকে বিয়ে করে তার প্রেমের মর্যাদা অথবা তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে গেলে যে পরিমাণ সামাজিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে। নায়ক চরিত্রের দৃঢ়তার অভাব সেই পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছে। এইখানেই আধুনিক বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকগণের সঙ্গে প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য। ডা: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পার্থক্য আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন —'আধুনিক ঔপন্যাসিক যে অবস্থায় উচ্চাঙ্গের আর্টের ও সমাজনীতি-সমালোচনার অবসর পাইতেন, প্রভাতকুমার সেই অবস্থায় তাঁহার নায়ককে সমস্ত নায়কোচিত বীরত্ব ও স্বাধীনচিত্ততা বিসর্জন দিয়া আত্মরক্ষার্থ পলায়নতৎপর করিয়াছেন।' ৫০

অবশ্য অনুরূপ সমস্যাকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে প্রভাতকুমারের লেখা 'অলকা' গল্পে সংস্কারের উপর প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে। উভয় গল্পের বিষয় এক হওয়া সত্ত্বেও পরিণামের ভিন্নধর্মীর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডা: সুকুমার সেন লিখেছেন ....' দুইটি গল্পের রচনাকালের মধ্যে ব্যবধান প্রায় বিশ বছরের। এই বিশ বছরের মধ্যে লিখিত বাঙ্গালীর মনে সংস্কারের বন্ধন কতটা শিথিল হইয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণ মিলে গল্প দুইটির বিভিন্ন পরিণামে। সচ্চরিত্রে নায়ক প্রেম উপেক্ষা করিয়া সংস্কার বজায় রাখিল, অলকায় সংস্কারকে উপেক্ষা করিয়া সে প্রেমের মর্যাদা স্বীকার করিল।' ৫২

'মার্মালেড' শব্দের প্রকৃত অর্থ জানা না থাকায় এক সরলমতি বৃদ্ধের মর্মালেডকে বেলের মোরব্বা মনে করে কমলালেবুর মোরব্বা খাওয়ায় তাঁর জীবনের এক অতি গোপনীয় মর্মান্তিক ক্ষতের স্মৃতি সহসা উদ্ভাসিত হয়ে কৌতুক হাস্যময় পরিবেশকে কিভাবে কারুণ্যে প্লাবিত করেছিল, তারই কাহিনী বিবৃত হয়েছে 'ভুলশিক্ষার বিপদ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯) গল্পে। সহজ সরল এই বৃদ্ধ তাঁর জীবনের কুড়ি বৎসর পূর্বে বড় মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে বাজার করতে কলকাতায় গিয়ে এক মেসের বাসায় উঠেছিলেন। সেখানে এক রুগীর ঘরে কিছু কমলালেবু কিনে রেখেছিলেন। রুগী তাঁর অনুপস্থিতিতে লোভ সামলাতে না পেরে বেশ কিছু কমলা খেয়ে ফেলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। মৃত্যুকালে ভদ্রলোকের স্ত্রীর বয়স ছিল বৃদ্ধের মেয়ের বয়সের সমান। সেই থেকে নিজের মেয়েকে দেখলেই সেই না দেখা অকাল বৈধব্যবেশী মেয়েটির কথা তাঁর মনে পড়ে, তার করুণ অবস্থার জন্য বৃদ্ধ নিজেকেই দোষী মনে করতে থাকেন এবং সেই থেকে তিনি কমলালেবু স্পর্শ করেননি। গল্পটির অবতারণা কৌতুকরসে হলেও পরিণতি করুণরসাত্মক। বৃদ্ধের মর্মান্তিক বেদনায় আমাদের হৃদয়ও অভিভূত হয়। বৃদ্ধের চরিত্রাঙ্কণে মানব মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের

পরিচয় পাঠকের মনে অন্যতম আকর্ষণের বিষয় ।

'অযোধ্যার উপহার'(বৈশাখ, ১৩১০) গল্পে পরমাত্মীয় সুলভ আন্তরিকতায় ভরা এক পুরাতন গৃহভৃত্যের বিমুগ্ধ হৃদয়কাহিনী উদ্ঘাটিত হয়েছে। গৃহকর্তার আদেশে কোন প্রতিবাদ না করেই দীর্ঘ আঠারো বৎসরের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে গৃহভৃত্য অযোধ্যা সাশ্রুনয়নে বিদায় নিয়ে দেশে চলে যায়, কিন্তু কর্তা অখিলবাবুর ছেলেমেয়ের জন্য তার মন কেমন করে —'তাহার মনটি অষ্ট প্রহর কলিকাতায় সেই প্রিয় গৃহখানিতে পড়িয়া থাকে।'এভাবে দুইমাস অতিবাহিত হলে নিজেই উদ্যোগ করে, পোষ্টমাষ্টারকে উপঢৌকন দিয়ে ইংরাজীতে চিঠি লিখিয়ে প্রভুর পরিবারের সংবাদ জানতে চেয়ে যখন শোনে মনিবের মেয়ে খুকীর বিয়ে তখন কালব্যয় না করে কলকাতায় রওনা হয়ে পড়ে । সঙ্গে করে নিয়ে যায় সোনার বালাজোড়াটি যা তারই অজান্তে খুকী তার বাক্সে রেখে দিয়েছিল । কলকাতা পৌঁছে কিছু নূতন সোনা কিনে সেই বালাজোড়া ভাঙিয়ে খুকীর জন্য নূতন করে বালা তৈরী করে বিয়ের দিন তাকে বালাজোড়াটি উপহার দিয়ে খুকির প্রতি তার আন্তরিক স্নেহের পরিচয় দেয় ।

রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' (১২৯৮) গল্পের রাইচরণের চরিত্রটিকে স্মরণ করায় অযোধ্যা চরিত্র ।

অযোধ্যা এবং খুকীর কথোপকথনের ভঙ্গীটি রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা' (১২৯৯) গল্পের মিনি এবং কাবুলিওয়ালার কথোপকথনের ভঙ্গীকে মনে করিয়ে দেয় ।

'বলবান জামাতা' (বৈশাখ, ১৩১৩) হাস্যরসাশ্রিত অন্যতম শ্রেষ্ঠগল্প ।'গোলগাল নন্দদুলালি ধরনের' চেহারার জন্য পোষ্টমাষ্টার নলিনীবাবু বিয়ের আসরে শ্যালিকার বিদ্রুপের তীক্ষ্ণবাণ সহ্য করেছিলেন । দেহ সম্পর্কিত এই অপবাদ ক্ষালনের জন্য বিগত দুই বৎসর ব্যায়াম করে 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বিলক্ষণ দৃঢ় হওয়ার' পর গোঁফ পাকিয়ে হাতে লাঠি, সঙ্গে বন্দুকের বাক্স নিয়ে ভুলক্রমে অন্যের শ্বশুরবাড়ী গিয়ে হাজির হন, পরে নিজ শ্বশুরবাড়ীতে যখন উপস্থিত হলেন তখন তাকে বাড়ীর কেউ চিনতে না পেরে জুয়াচোর ভ্রমে গালিগালাজ করে বাড়ীর বহিরাঙ্গন থেকে তাকে বিদায় দেয়। অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই টেলিগ্রাম পাওয়ার সুবাদে শ্বশুরবাড়ীর লোক তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে সাদরে বরণ করে নেয় ।

গল্পে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে শুধু ঘটনাগত অসঙ্গতি অথবা ভুল বোঝার জন্য নয়। নলিনী চরিত্রে বলবান হবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা উভয়ই হাস্যকর। গল্পটি প্রকাশের পর এইভাবে প্রশংসিত হয়েছিল —' বলবান জামাতা' নামক ক্ষুদ্র গল্পটি অতি সুন্দর । আখ্যানবস্তু মনোহর ও হাস্য-রসের কিরণে সমুজ্জ্বল ।বহুদিন আম রা এমন মনোরম গল্প পড়ি নাই।' ৫৩ 'গৃহের ফের'(১৯০১) নামে গল্পটির নাট্যরূপ দেন শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় ।

'খুড়া মহাশয়'(আশ্বিন, ১৩১১) গল্পে একদিকে রয়েছে বৃদ্ধ গগন চক্রবর্তীর জঘন্য অর্থলিপ্সার পরিচয় যেখানে সে ভ্রাতুষ্পুত্র নবকুমারকে ঠকিয়ে সদ্যমৃত সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতার সিন্দুক থেকে দশহাজার টাকা আত্মসাৎ করেছে অন্যদিকে তার ভূতের ভীতি যার সুযোগে নবকুমার নিজেকে মৃত প্রচারিত করে ভূতের ছদ্মবেশে অনুনাসিক সুরে কথা বলে গগন চক্রবর্তীকে ভয় দেখিয়ে সেই দশহাজার টাকা উদ্ধার করেছে ।

বাংলা সাহিত্যে ভূত বা অশরীরী আত্মার অবতারণা ঘটিয়ে গল্পরস জমিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম, প্রমথ চৌধুরী ইত্যাদি অনেকেই। তাঁদের গল্পের অশরীরী আত্মাগুলির কার্যকলাপ গল্পে এক অতি-প্রকৃত আবেষ্টনীর সৃষ্টি করে পাঠকমনে ভীতি শিহরণ জাগিয়ে তুলেছে । ভূতের অতি লৌকিক কার্যকলাপের মাধ্যমে গল্পে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ অথবা রঙ্গ তামাশা যাই করুন না কেন তাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাস পাঠকমনে জাগেনা । প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে','কঙ্কাল' ইত্যাদি, ত্রৈলোক্যনাথের 'ভূত ও মানুষ' এর গল্পগুলি স্মরণ করা যেতে পারে । প্রভাতকুমারের আপাত-ভৌতিক গল্পগুলিতে সেই অপ্রাকৃত অবতারণার সেই ভীতি শিহরণ নাই বরং পাই রহস্য এবং কৌতুকসৃষ্টির প্রয়াস । ঝোপঝাড়ের আড়ালে থেকে, সাদা কাপড় পরে অনুনাসিক সুরে নবকুমার বৃদ্ধ গগন চক্রবর্তীর মনে ভূতের ভয়ের সঞ্চার করলেও পাঠক কিন্তু এতটুকু ভীতত্রস্ত হয়নি বরং মনে মনে কৌতুক অনুভব করে ।

অতিমাত্রায় কল্পনাশ্রয়ী এবং প্রায় অসম্ভব কাহিনী বিবৃত হয়েছে 'গুরুজনের কথা'(ফাল্গুন, ১৩১১) গল্পটিতে। আপন প্রেয়ে বিভোর অধ্যাপক রজনীবাবু এবং ডাক্তার চৌধুরীর কন্যা প্রভাবতী গুরুজনদের কথা উপেক্ষা করে বিয়ের দিন সকালে হুগলী থেকে কলকাতায় উভয়ে বাইসাইকেলে করে গিয়ে বিবাহ বাসরে উপস্থিত হবে এই ধরণের পরিকল্পনা করেছে। বলাবাহুল্য আজকের নারী প্রগতির যুগেও এই চিন্তা কষ্টকল্পনা মাত্র। গল্পে এই

দীর্ঘ পথের সাইকেল যাত্রার কৌতুককর বর্ণনাই কাহিনীর উপজীব্য বিষয়। গল্পরস তেমন জমেনি তবে রচনা সুখপাঠ্য।

(৪)

প্রভাতকুমারের তৃতীয় এবং শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'দেশী ও বিলাতী' র প্রথম প্রকাশ কাল আশ্বিন, ১৩১৬। গ্রন্থটির দুইটি অংশ - দেশী এবং বিলাতী। প্রথম অংশে 'দেশীতে রয়েছে দশটি এবং দ্বিতীয় অংশ 'বিলাতী'তে রয়েছে চারটি গল্প। গল্পগুলি 'ভারতী' এবং 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩০৮ থেকে ১৩১৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে প্রভাত-প্রতিভা পূর্ণ প্রস্ফুটিত। জীবন পর্যবেক্ষণের দক্ষতা, এবং ভাবের গাঢ়তা গল্পগুলিতে লক্ষনীয়। একদিকে গল্পগুলির মধ্যে যেমন প্রবাহিত হয়েছে প্রচ্ছন্ন হাস্যরস, মৃদু-ব্যঙ্গ অন্যদিকে রয়েছে জীবনের ব্যথিত মুহূর্তের গভীর আবেগের সুনিপুণ শান্ত সংযত প্রকাশ। গ্রন্থটি প্রকাশের পর, 'প্রবাসী' গল্পগুলিতে প্রভাতকুমারের গল্পসৃষ্টির পরিণতরূপ লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছে —' বাংলায় ছোটগল্প লেখেন অনেকে, কিন্তু তাহা ছোট মাত্র, তাহাতে ছোটগল্পের আর্ট কিছুমাত্র থাকেনা। এই আর্টে যাহারা সফলতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রবিবাবু শ্রেষ্ঠ, তারপর প্রভাতবাবু একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। তাঁহার ভাষা প্রচ্ছন্ন হাস্যরসে মধুর ও সহজ ভাবে লঘু। রচনার মধ্যে আগাগোড়া আগ্রহ জাগাইয়া রাখিবার মত আয়োজন যথেষ্ট থাকে, ঘটনার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য থাকে এবং উপসংহারে একটি অখণ্ডতা ও জমাটের ভাব দেখা যায়। সবচেয়ে সুন্দর তাঁহার পর্যবেক্ষণ শক্তি — তিনি জানা কথাই নূতন করিয়া বলিয়া প্রাণের মধ্যে পৌঁছাইয়া দেন। বর্তমান গ্রন্থে এই সকল গুণগুলিই আছে। অধিকন্তু রচনা অনেক পরিপক্ক হইয়াছে।' ৫৪

এই দেশের পটভূমিকায় লিখিত 'দেশী' অংশের অন্তর্ভুক্ত নানা রসের গল্পগুলিতে আছে অপূর্ব স্বাদুতা। আর বিদেশের পটভূমিকায় লিখিত 'বিলাতী' অংশের গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকে যেমন বিস্তৃতি দান করেছে তেমনি ভাবে আমাদের পরিচিত করিয়েছে বিদেশী জীবন ও চরিত্রের সঙ্গে। ব্যক্তি-জীবনে বিলাত প্রবাসের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই রচনাগুলি আন্তরিকতার স্পর্শে, মননের গভীরতায় প্রভাত সাহিত্যে এক উজ্জ্বল অধ্যায় অধিকার করে আছে। আধুনিক কালের সমালোচক এই গল্পগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ...... ' এই গল্পগুলি বাংলা গল্প সাহিত্যে নূতন দিগন্ত উদ্বোধন করল। বাংলা সাহিত্যে বিদেশী চরিত্র ও পরিবেশ এইবার অতি প্রত্যক্ষ ও সার্থকভাবে এল। এই গ্রন্থটিতে

প্রভাতকুমারের প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই একটি বিশেষ মান রক্ষা করেছে । ৫৫

'আমার উপন্যাস' (আশ্বিন, ১৩১৬) গল্পে কৌতুককর রোমান্টিক প্রেমের মিলনান্তক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । প্রচুর উপন্যাস পাঠের ফলে দৈনন্দিন জীবনটাকে 'গদ্যময়' মনে হওয়ায় পূর্বরাগবর্জিত, অ্যাডভেঞ্চারলেশহীন বিবাহে অনিচ্ছুক ডাক্তারী পাশকরা জমিদারপুত্র হারাধন জীবনে অ্যাডভেঞ্চারের জন্য আত্মপরিচয় গোপন করে পাচক বৃত্তি অবলম্বন করে। অবশেষে গৃহস্বামীর কিশোরী কন্যার প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে নিজ ইচ্ছার পূর্তি ঘটায় । অবশ্য পাত্রী হারাধনের প্রকৃত পরিচয় বিয়ের আগেই জানতে পেরেছিল । গল্পে কৌতুককর ঘটনা সংস্থাপনের মাধ্যমে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। বিত্তশালীর ডাক্তার-পুত্র হারাধনের নিছক রোমান্টিক প্রেমানুভবের জন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভান করে পাচকবৃত্তি অবলম্বন করা, অনভ্যস্ত বৃত্তি অবলম্বনের ফলে তার ভুলত্রুটিগুলি বেশ কৌতুককর। ততোধিক কৌতুককর যে আত্মপরিচয় গোপন করে সে পাচকবৃত্তি করছে একমাত্র তার প্রেমাস্পদ প্রভুকন্যা প্রিয়ম্বদাকে সর্বশেষে রহস্য উদ্ঘাটন করে চমকে দেওয়ার জন্য সেই প্রিয়ম্বদা কিন্তু পূর্বেই তার প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে নিঃশব্দে পরিণতির অপেক্ষা করে চলেছে। হারাধনের অতি রোমান্টিক ইচ্ছার এই অতি সাধারণ পরিণতিতে হাস্য-কৌতুক-রস গল্পে জমে উঠেছে ।

'বিবাহের বিজ্ঞাপন' (বৈশাখ, ১৩১২) গল্পে বাল্যকালে বিবাহিত দ্বাবিংশতি বৎসরের 'লালাজাতীয়' যুবক রাম অওতার প্রার্থনাসমাজভুক্ত মহিলাগণ সম্পর্কে তার মনের 'অনন্ত কৌতূহল' মেটাতে গিয়ে বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে মিথ্যা পরিচয় দানে অন্যকে ঠকিয়ে নিজের কৌতূহল চরিতার্থতার মানসে চিঠি লিখে নিজে কিভাবে প্রতারিত হয়েছিল তারই এক কৌতুকরসাশ্রিত কাহিনী বিবৃত হয়েছে । সিদ্ধিপানরত রামঅওতার যে বিবাহের বিজ্ঞাপনটি দেখে প্রার্থনাসমাজভুক্ত 'সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা'র প্রতি মনে মনে আকর্ষণ অনুভব করেছিল সেই বিজ্ঞাপনটি ছিল কয়েক বৎসর আগেকার। সময়ের ব্যবধানে বিজ্ঞাপন দাতার ঠিকানা পরিবর্তিত হয়েছে — তাই রাম অওতারের লেখা ঠিকানায় চিঠি গিয়ে পড়লো কাশীর দুই গুণ্ডার হাতে। রাম অওতারের মনের অবস্থা অনুমানে তারা তাকে কন্যার পিতার জবানীতে আহ্বান জানায় । আনন্দোৎফুল্লচিত্তে রাম অওতার তখন হাতে হীরার আংটী, পকেটে ঘড়ি, চেন, রূপার পানের ডিবা এবং নগদ দুইশত টাকা নিয়ে মূল্যবান রেশমী পোষাকে সজ্জিত হয়ে কাশীতে উপস্থিত হলো। স্টেশনেই ছদ্মবেশে গুণ্ডার লোক নিযুক্ত ছিল । পরম যত্নে রাম অওতারকে তারা আপন আড্ডায় নিয়ে গিয়ে সুকৌশলে ধুতরার রস মিশ্রিত সুগন্ধি সিদ্দি পান করিয়ে অচেতন করে

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সবকিছু অপহরণ করে, সন্ন্যাসীবেশে সাজিয়ে মন্দিরের কাছে তার অচেতন দেহ রেখে এল। কিছুদিন পর তার মাতুল তাকে ঐ বেশে দেখে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এর পর থেকে ধার্ম্মিক বলে রাম অওতারের খ্যাতি জন্মে গেছে। এখানে লেখক গল্পে সুকৌশলে ঘটনা সাজিয়ে কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছেন — বিশেষ করে গল্পের পরিণতিতে। একই পন্থায় তিনি কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছেন 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটিতে।

প্রতারক এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর চরিত্র চিত্রিত হয়েছে 'আধুনিক সন্ন্যাসী' (মাঘ, ১৩১১) গল্পে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভণ্ড সন্ন্যাসীদের লোককে প্রতারণা করার রূপটিও যে পাল্টেছে এখানে তার পরিচয় আছে। গায়ে ভস্ম মেখে, হাতে চিমটা নিয়ে, গাঁজা খেয়ে গেরুয়া বসন ধারণ করলেই আজকের বিজ্ঞানের যুগের মানুষের সন্ন্যাসী দেখে ভক্তি জন্মায় না। তাই এই গল্পের সন্ন্যাসীকে দেখি অনেক আধুনিক ভক্ত প্রণাম করলে সে 'Thanks' বলে, জুলিয়াস সীজার, টেমপেষ্ট তার পড়া আছে, হ্যামলেট থেকে সুন্দর আবৃত্তি করেন 'To be, or, not to be, that is the question.' শিক্ষিত লোকের জটিল মনের ভক্তি যেমন ইংরেজী বলে তিনি আদায় করেছেন তেমনি তুলসীদাসের রামায়ণ থেকে আবৃত্তি করে সরল বিশ্বাসীদের মন জয় করেছেন। ভক্তের কাছ থেকে পাওয়া প্রণামী তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের দান করেন বলে ঘোষণা করে তাঁর মনের উদারতার পরিচয় দিতে চেয়েছেন - প্রকৃতপক্ষে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে তাকে প্রতারণা করার এও এক নবতর কৌশল মাত্র। অবশ্য শেষে দেখা গেল কলকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জাল চেক ভাঙ্গিয়ে কুড়ি হাজার টাকা আত্মসাৎ করে তিনি সন্ন্যাসী বেশে আত্মগোপন করে আছেন।

সন্ন্যাস জীবনের প্রতি প্রভাতকুমারের আগ্রহ ছিল না। সম্ভবত: এই কারণেই স্বাভাবিক এবং সৎ সন্ন্যাসীর চরিত্র তাঁর গল্প উপন্যাসে পাই না। তাছাড়া ভণ্ড সন্ন্যাসীদের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন সেগুলি বাস্তব সমাজ জীবনে দুর্লক্ষ্য নয়। আমাদের সংসারের চারিপাশে যে সন্ন্যাসীবেশী লোকগুলিকে দেখি তারা প্রায়শঃই সাধুবেশে আত্মগোপনকারী অসাধু প্রতারক। এই ছদ্মবেশীদের স্বরূপ বর্ণনা স্পষ্ট ভাবেই এখানে করেছেন —'অধিকাংশ সাধুই নিরক্ষর, শাস্ত্রজ্ঞান আদৌ নাই বলিলেই হয়, — কেবল কতিপয় বাঁধা বুলি মুখস্থ আছে। আর গঞ্জিকা ভস্ম করিতে নিতান্তই সুনিপুণ।'[৫৬] মৃদু ব্যঙ্গ এবং কৌতুকের সংমিশ্রণে স্বল্পায়তনে সুলিখিত গল্প 'আধুনিক সন্ন্যাসী'।

সন্ন্যাসের নিরাসক্ত জীবন পরিচয়ের অন্তরালে অর্থলিপ্সার ~~উপস্থিতি~~ অস্তিত্বজনিত অসঙ্গতি হাস্যরসের যোগানদার হয়েছে। সন্ন্যাস নিয়ে গল্প রচনার এও অন্যতম কারণ হতে পারে।

বিত্তশালী পরিবারের সাংসারিক কাজকর্মহীন, অত্যধিক উপন্যাস-পাঠে আসক্ত, কল্পনাপ্রবণ মনের অধিকারী সুকুমারী তার স্বামীর পত্রের ভুল ব্যাখ্যা করে অসম্ভব সব কল্পনায় কিভাবে ক্লান্ত ও পীড়িত হয়ে পড়ে এবং স্বামীর কাছ থেকে প্রকৃত সত্য জানতে পেরে সত্বর আরোগ্যলাভ করে তারই এক কৌতুককর কাহিনী 'একদাগ ঔষধ' (পৌষ, ১৩০৮)। ভ্রান্তিকে কেন্দ্র করে এখানে দাম্পত্য প্রেমে সামান্য জটিলতা দেখা দিয়েছে কিন্তু সত্য তথ্যটি উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে গল্পের মধুরান্তিক সমাপ্তি ঘটেছে। গল্পের ~~স্ব~~ স্বল্প পরিসরে অল্প আয়াসেই কৌতুকরস জমে উঠেছে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যায় উপন্যাস পাঠের আত্যন্তিকতা ও তার হাস্যরসাত্মক বিকারকে ~~উপজীব~~ উপজীব্য করে প্রভাতকুমার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করেছেন। 'বিষবৃক্ষের ফল' গল্পের চার তরুণ 'প্রণয় পরিণাম' গল্পের মাণিকলাল, 'আমার উপন্যাস'এর হারাধন, 'একদাগ ঔষধ' গল্পের সুকুমারী, 'হতাশ ~~প্রেমিক~~ প্রেমিকে'র নির্মলচন্দ্র, 'পরের চিঠি' গল্পের মণিকা ইত্যাদি সকলের ~~xx~~ জীবনের অসম্ভব কল্পনা-বিলাসিতার উৎসভূমি অত্যধিক উপন্যাস - পাঠ। হাস্যরস সৃষ্টির এও এক উত্তম উপকরণ, এর প্রতি প্রভাতকুমারের স্বাভাবিক আকর্ষণ তাই লক্ষ্য করা যায়।

অত্যধিক অর্থলোভের আশায় পুত্রের বিবাহে মত দিয়ে কিভাবে এক বৃদ্ধ প্রতারিত হয়েছিলেন তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'স্বর্ণ - সিংহ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২) গল্পে। উকীল জোয়ালাপ্রসাদের পাটনা কলেজে আইন অধ্যয়নরত পুত্র সুন্দরলাল তাদের গ্রামের পেন্সনপ্রাপ্ত সৈনিকপুরুষ বৃদ্ধ অযোধ্যানাথের পৌত্রী পান্নাকে ভালবাসে। কিন্তু পান্নার কুলগত কোনও দোষ থাকায় জোয়ালা-প্রসাদ কিছুতেই পুত্রের বিবাহ সেখানে দিতে রাজি হন নাই। অযোধ্যানাথের মৃত্যুর সময় উইল করে যান যে তার সম্পত্তির অছির মনোনীত পাত্র যদি পান্নাকে বিয়ে করে তবে তার সম্পত্তির স্বর্ণনির্মিত সিংহটি সে পাবে। এই স্বর্ণ - সিংহের লোভেই বৃদ্ধ জোয়ালা প্রসাদ সমাজ নিন্দা, জাতিভয় তুচ্ছ করে পান্নার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। বিবাহের পর যথারীতি স্বর্ণসিংহ জোয়ালা প্রসাদের ঘরে গেল এবং সেইটি গলাতে গিয়ে দেখা গেল সিংহটা তামার তৈরী, উপরটা খুব পাতলা সোনার পাতে মোড়া ছিল মাত্র। ক্ষিপ্ত বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ পুত্র এবং পুত্রবধূকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন।

গল্পে জোয়ালাপ্রসাদের পুত্রের বিবাহ ব্যাপারে সামাজিক সংস্কার জনিত ভীতি, স্বর্ণ সিংহের লোভে হঠাৎ পরম উদারতা এবং আদর্শ বাদিতায় রূপান্তর, শেষে প্রতারিত হয়ে পুত্র এবং পুত্রবধূর উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার আমাদের চিরন্তন লোভাতুর মনের প্রতি তির্যক দৃষ্টিপাতে কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছে ।

এই গল্পের স্বর্ণসিংহটিকে প্রভাতকুমারের রচনার প্রতীক বলা যেতে পারে । উপরে সোনার চাকচিক্য ও মহার্ঘতা আর তারই ভিতরে পিতলের অনুজ্জ্বল মূল্যহীনতা — আমাদের সংসারের এই অসঙ্গতি প্রভাতকুমারকে আকৃষ্ট করেছে বারবার। জীবনের এই অসঙ্গতিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে তিনি বারবার দেখিয়েছেন — অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাসির উচ্ছলতায় কখনও বা করুণ রসের ধারায় ।

গল্পে বাঙালী উকীলবাবুর ওকালতি করার প্রারম্ভিক বর্ণনা লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কথা স্মরণ করায় ।' ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুরে প্র্যাকটিস আরম্ভ করিলাম, কিন্তু মক্কেল জুটিলনা। মাস - ছয় কাল বার লাইব্রেরীতে বসিয়া অন্যান্য নব্য উকীলগণের সহিত নানাবিধ খোস, গল্প করিয়া ক্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম পশ্চিমে যাই ।' প্রভাতকুমার বিলাত থেকে ফিরে এসে ছয় মাস কাল দার্জিলিঙে প্র্যাকটিস করেছিলেন । সেখানে ব্যবসাগত সুবিধা না হওয়ায় রংপুর এবং পরে গয়ায় গমন করেন ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের প্রচার ও প্রসারের সার্বিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় । এক সময়ে খৃষ্টান ধর্মান্দোলন প্রতিরোধ করার জন্য যেমন ব্রাহ্ম সভা স্থাপিত হয়েছিল তেমনি এই সময়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার প্রভাব মুছে ফেলার জন্য স্থাপিত হয়েছিল 'হরিসভা'। 'কিন্তু ধর্মান্দোলন যখন কোন সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য লোকচিত্ত জয় করতে চায় তখন তার মধ্যে আদর্শবিকার ও ব্যভিচারের একটা ঝোঁক দেখা যায় ।' ৫৭ হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের যুগে বাংলার শিক্ষিত বিশেষ করে স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে আদর্শবিকারের ভাব লক্ষ্য করা গেছে । 'প্রতিজ্ঞা পূরণ' (ভাদ্র, ১৩১১) গল্পে এই ধরণের আদর্শ বিকারগ্রস্থ একটি কলেজে পড়া ছেলের উদ্ভট চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। গল্পের নায়ক ভবতোষ ইংরাজী কলেজে পড়ে বটে কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। এই শিক্ষায় তার বিন্দু মাত্র শ্রদ্ধা নাই। তার মতে ইংরাজী পড়েই দেশটা উৎসন্নে গেল; 'আর্যভাব ক্রমশঃই শেষ হয়ে যাওয়ায় মূলে

এই ইংরাজী শিক্ষা। ইংরাজী পড়া সত্ত্বেও সে আচার ব্যবহার এবং চিন্তায় নব্যহিন্দু। তাই 'বিলাতী আপত্তি'র অনুকরণে সে ছাত্রাবস্থায় অথবা উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা আপত্তি জনক মনে করে না। তাছাড়া শিক্ষিতা নব্যস্ত্রীর প্রতি তার বিরূপতা আছে কারণ তাদের মধ্যে পতিভক্তি নাই এবং তারা বিলাসী। এর উপর মেয়ে যদি সুন্দরী হয় তবে সে অবশ্যই গর্বিতা হবে স্বামী গুরুজন কাউকে ভক্তি করে না। তাই তার সিদ্ধান্ত' একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করবো।' তার মতাদর্শ অনুযায়ী একটি অশিক্ষিত কুৎসিত মেয়েকেই তাকে দেখান হল এবং মেয়ে তার পছন্দ হয়েছে বলে মতও জানিয়ে দিল। কিন্তু যতই বিয়ের দিন এগিয়ে এল তার প্রতিজ্ঞা ক্রমশই শিথিল হতে থাকে, সেই কুৎসিত মেয়েকে স্ত্রীরূপে চিন্তা করতে তার মনে বিভীষিকার সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু 'যুদ্ধকাল সমাগত হইলে ভীরুতম সৈন্যও ভয় ভুলিয়া যায়' তেমনি ভবতোষও অনেকটা নির্বিকার চিত্তে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে অবশ্য তার কপালে চমৎকার সুন্দরী মেয়েই জুটেছে। কারণ পাত্রীপক্ষ ভবতোষের এই উদ্ভট চিন্তার কথা শুনে প্রকৃত পাত্রীর বদলে এক কদাকার কুলকন্যাকে দেখিয়েছিল। ভবতোষের উদ্ভট আদর্শচিন্তা বাস্তবের আঘাতে ধূলিসাৎ হয়ে গল্পে হাস্যরস সৃষ্টি করেছে।

মক্কেলহীন দারিদ্র্যপীড়িত চতুর উকীল সুবোধ চন্দ্র বঙ্গভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দোলনের শাসক শাসিতের উন্মত্ততার অবকাশে কিভাবে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ করে নিয়েছিল তারই হাস্যরসাত্মক কাহিনী 'উকীলের বুদ্ধি' (কার্ত্তিক, ১৩১৪) গল্পে বিবৃত হয়েছে। বঙ্গ ভঙ্গ জনিত শোকে সাধারণের কাছে ঘৃণিত নূতন ইংরেজ বড় লাট ফুলার সাহেবের দিনাজসাহিতে আগমন উপলক্ষে দরিদ্র উকীল সুবোধচন্দ্র তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সন্তুষ্ট করে সুকৌশলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরীর বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। অবশ্য এই জন্য তাকে স্বদেশবাসীর কাছে প্রচণ্ডভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। যে সুবোধচন্দ্র কিছুদিন পূর্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সভায় জোর গলায় বলেছিল 'ভাই বাঙালী — মায়ের অঙ্গে এ খড়্গাঘাত — এ রুধিরপাত — যতদিন এর প্রতিবিধান না হবে, ততদিন যেন কোন বিলাস বিভ্রমে আমরা মগ্ন না হই' — ইত্যাদি ' ৫৮ সেই সুবোধচন্দ্র আবার বলেছে —'আমি যদি একটা সুযোগ পেয়ে নিজের উন্নতি করে নিতে পারি, ত কেন নেব না? সত্যি সত্যি এই নূতনআসাম গভর্ণমেন্টের উপর আমার ভক্তি উছলে উঠছে তা ত নয়। গভর্ণমেন্ট আমাদের সর্ব্বস্বটা নিয়ে যাচ্ছে — আমি গভর্ণমেন্টকে ফাঁকি দিয়ে একটা সরকারী উকীলগিরি যদি নিতে পারি ত ক্ষতিটা কি? কতকাল আর এ রকম করে পাওনাদারের কাছে প্রতিদিন অপমানিত হব। — ছেঁড়া জুতো ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়াব?' ৫৯ প্রকৃতপক্ষে সুবোধচন্দ্রের এই উক্তি দুইটির

মধ্যে সাধারণ মানুষের বৈষয়িক মনোভাবের প্রকাশ। দারিদ্র্যপীড়িত জনসাধারণের স্বদেশী আন্দোলনে মেতে ওঠার পেছনে সব সময়েই যে আন্তরিকতা ছিল তা নয় পারিপার্শ্বিকের চাপে আন্দোলনে যোগ দিলেও অনেকেরই উদ্দেশ্য ছিল আপন স্বার্থসিদ্ধি। প্রভাতকুমার মানুষের মনের ভাবনা এবং কর্মের এই বৈষম্যকে রূপায়িত করে গল্পে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

'হাতে হাতে ফল' (শ্রাবণ, ১৩১৫) গল্পে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এদেশীয় আমলাদের বিশেষত: দারোগা পুলিশের মনোভাব এবং ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে। এই জাতীয় আমলারা নিজেদের পদমর্য্যাদা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারে তথা উৎপীড়ন অত্যাচারে অনেক ক্ষেত্রেই দেশবাসীকে জর্জরিত করে তুলেছিল। গল্পে দারোগা বদনচন্দ্র নিজের চাকুরী স্থলে সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য ডাক্তারবাবুকে মিথ্যা সাক্ষী দিতে বলায় তিনি অপমানিত বোধ করেছেন এবং আপত্তিকর প্রস্তাবের জন্য বদনচন্দ্রকে অপমান করতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তার ফল তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছিল। মিথ্যা অভিযোগে ডাক্তারবাবুর পুত্রদ্বয়কে বদনচন্দ্র গ্রেপ্তার করেছে এবং তাঁর বাড়ী তল্লাসীর অজুহাতে যথেচ্ছ অত্যাচার করেছে। অবশ্য এই অন্যায় অত্যাচারের ফল দারোগাকেও পেতে হয়েছে। ঘর তল্লাসীকালে ব্রাণ্ডি ভ্রমে বিষাক্ত ঔষধ খাওয়ায় বদনচন্দ্রের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য তার স্ত্রীর অনুরোধে এই ডাক্তারবাবুই তাকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলেছেন।

গল্পে শাসন ও বিচার বিভাগীয় আমলাদের প্রতি কটাক্ষ থাকলেও তাদের চরিত্রের অসঙ্গতিপূর্ণ কার্য্যকলাপ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। ডাক্তারবাবু কর্তৃক অপমানিত বদনচন্দ্র তার এ আক্রোশ মেটাবার জন্য মহাক্ষিপ্ত এমন সময় তাকে দেখা গেল কোন এক গোরুচুরির আসামীর কাছ থেকে একশতটাকা ঘুষ নিয়ে 'খাতেমা রিপোর্ট' লিখতে। অশুদ্ধ বানানে ভরা রিপোর্টটি পাঠে পাঠকের মনে স্বতঃই হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। রিপোর্টটি এইরূপ—
—' তদন্তে জানা গেল আসামী নির্দ্দুসী বাদীর বাড়ী হইতে উক্ত গোরু পলাইয়া আসামীর গোহালে অনধীকার প্রবেশ করত: জাব খাইতেছিল, তদা ক্রোধে আসামী উক্ত গোরুকে বাঁধিয়াছিল।' ৬০

ইংরেজের অধীনে চাকুরীরত এদেশীয় ডেপুটিগণ স্বদেশী মামলার বিচার করতে গিয়ে কিভাবে অবস্থাসংকটে পড়তেন তারই কাহিনী বিধৃত হয়েছে 'খালাস' (ভাদ্র, ১৩১৪) গল্পে। দেশে তখন স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ বয়ে চলেছে। বাঙালী ডেপুটি নগেন্দ্রবাবু যে সমাজ এবং সংসারে বাস করছেন সে স্থানটিও স্বাভাবিকভাবে এই আন্দোলনে

প্লাবিত হয়েছে । সুতরাং নিজের অস্তিত্ব বজায়ে রাখার জন্য তিনি গোপনে দেশী কাপড় কিনে, স্বদেশী ছেলেদের চাঁদা দিয়ে তাদের প্রতি সহানুভূতি জানান । আবার চাকুরী বজিয়ে রাখার জন্য, ইংরেজ সাহেবদের মনস্তুষ্টির জন্য তার এজলাসে স্বদেশী বালকদের বিচারে বিরূপ রায় দিতে হয় । এই ধরণের এক বিচারে এক বিরূপ রায় দিয়ে তিনি এবং তাঁর পরিবার স্বদেশবাসীর কাছে ধিকৃত হওয়ায় তার পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন বিপর্য্যস্ত হয়েছে । এমন অবস্থায় স্ত্রী চারুশীলার অলঙ্কারগুলি বিক্রী করে স্বদেশীকরা বালকদের সাহায্য করার কথা ইংরেজ সাহেবদের কানে যাওয়াতে সাহেব নগেন্দ্রবাবুকে অপমান করেন। উভয়ত: অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নগেন্দ্রবাবু চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে মনঃকষ্টের অবসান ঘটান। অবশ্য চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার প্রেরণাটি এসেছে মুখ্যত: চারুশীলার কাছ থেকে ।

ধর্মীয় কুসংস্কার

ধর্মীয় কুসংস্কারজনিত হৃদয়ের সংকীর্ণতার কথা ব্যক্ত হয়েছে 'প্রত্যাবর্তন' (বৈশাখ, ১৩১৬) গল্পে । রামনিধি জাতিতে রজক। তাই সে তার উচ্চবর্ণের হিন্দু সহপাঠীদের দ্বারা ছাত্রাবাস থেকে নির্মম ভাবে বহিস্কৃত হয়েছে। অপমানিত রামনিধি সেই গভীর রাত্রে মনুমেণ্টের নীচে বসে ভাবে —'রজক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহার এতই অপরাধ ? এই রাত্রে পথের কুক্কুরের মত তাঁহাকে আশ্রয়হীন হইতে হইল। কেন তাঁহার বাসার লোকেরা — শরৎবাবু, কার্ত্তিকবাবু, শচীন্দ্রবাবু, জ্ঞানবাবু প্রভৃতি তাঁহার অপেক্ষায় কিসে শ্রেষ্ঠ ? তিনি তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা অল্প ধনী নহেন, অল্প শিক্ষিত নহেন, কাহারও অপেক্ষা তিনি চরিত্রাংশে নিকৃষ্ট নহেন। তবু তাঁহাকে এই সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিতে হইবে ?'[৬১] জাতিতে রজক বলে অন্যত্র মেসেও যখন জায়গা পেল না এমন অবস্থায় হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার তীব্র নিন্দা করে লেখা খৃষ্টান সংবাদপত্রের একটি নিবন্ধ বাইবেলের 'Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest'
কথাগুলি পড়ে তাঁর বড় ভাল লেগেছে, বারবার বাইবেল পাঠ করেছেন এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেছে। কিন্তু খৃষ্টানদের সঙ্গে মেলামেশায় দেখলেন সেখানেও শ্বেতাঙ্গ এবং দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, এমনকি মৃত্যুর পরেও উভয়ের সমাধির স্থান ভিন্ন । অভিজ্ঞতার এই তিক্ততায় রামনিধি আবার মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে স্বধর্মে ফিরে এসেছেন।

প্রভাতকুমার হিন্দু ধর্মের সংস্কারে কোথাও আঘাত হানেন নাই এমনকি নিজে তাঁর গল্পের পাত্র পাত্রীকে সত্যকার প্রেমের অনুরোধেও অসবর্ণ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন নাই । কিন্তু ধর্মীয় সংস্কারের অজুহাতে মানবাত্মার উৎপীড়ন

অপমানকেও তাঁর উদার মন সহ্য করে নাই। এই গল্পটিতে তাই দেখি হিন্দু এবং খৃষ্টান উভয় ধর্মের সংকীর্ণ সংস্কারের প্রতি তিনি ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন। ভট্টাচার্যের উক্তিতে হিন্দু ধর্মের চরম সংস্কারাচ্ছন্ন অনুদারতার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই — ' .... হাজারই বড়লোক হও, তোমরা সেই ধোপাই ত বটে ! তা তোমাদের ছেলেকে ইংরিজি লেখাপড়া শেখাবার জন্যে কলকাতা পাঠাবার কি দরকার ছিল ? এঁটো পাত কখনও স্বর্গে যায় ?' ৬২ অথবা দেশীয় খৃষ্টানদের সমাধিস্থানে দুইজন ইংরেজ পাদ্রীর সমাধি দেখে রামনিধি ভেবেছে ..... ' দেশীয়গণের সহিত এত মাখামাখি করার অপরাধে, এই দুই পাদ্রীর প্রেতাত্মারা সম্ভবত: য়ুরোপীয় পরলোকে জাতিচ্যুত হইয়াছে ।' ৬৩ তার এই ব্যঙ্গোক্তির মধ্যেই খৃষ্টান ধর্মের ধর্মাচরণের হীনতা প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটি পাঠ করে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে এক দীর্ঘ সমালোচনায় মন্তব্য করেন —' আমাদের দেশের এক্ষণকার এই অদ্ভুত উল্টা সভ্যতার উহা একটি সুন্দর দর্পণ — ফটোগ্রাফ বলিলে আরও ঠিক হয় ।' ৬৪

বিলাতের পটভূমিকায় লিখিত 'মুক্তি' (আষাঢ়, ১৩১২) গল্পটিতে মূলত: ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা বিলাতে গিয়ে প্রথম প্রথম যে সমস্ত অসুবিধার মধ্যে পড়ে এবং ধীরে ধীরে ঐদেশীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে গিয়ে অনেকে সঙ্গদোষে কিভাবে বিপথে যায় তারই কাহিনী । সদ্য বিবাহিত নরেন আইন পড়ার জন্য বিলাত গিয়ে প্রথম প্রথম বাঙ্গালীসুলভ সংস্কারে হুইস্কি খেতে লজ্জা পেয়েছে, অহেতুক খরচা বাড়ানোর জন্য পুরানো সুট ব্যবহার করেছে, বয়সে বড় চারুকে দেখে সিগারেট লুকিয়েছে অথচ কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল সেই নরেন চারুর সামনে পাইপ টানছে, তাকে হুইস্কি খেতে অনুরোধ করছে । পানাহারের সঙ্গে গান বাজনায় মত্ত হয়েছে এমনকি স্ত্রীকে ভুলে দুষ্টচরিত্র মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করছে । অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত বিপথে যায় নি, স্ত্রী নির্ম্মলার বিলাতে উপস্থিতিতে এসবের সমাধান হয়েছে।

গল্পটি লেখকের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলে মনে করার যথেষ্ট অবকাশ আছে । কারণ লেখক আইন পাঠোদ্দেশ্যে বেশ কিছুকাল বিলাতে ছিলেন এবং অবস্থানকালে ঐ দেশীয় সমাজ বিশেষত : প্রবাসী বাঙালী সমাজেও তিনি যাতায়াত করেছেন । লেখকের ব্যক্তিগত জীবন আলোচনাকালে আমরা দেখেছি ডা: রমেশচন্দ্র দত্ত প্রবাসী বাঙালী ছাত্রদের অমিতব্যয়িতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পর্কে লেখকের উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

ঐদেশীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য এদেশীয় অনভিজ্ঞ ছাত্র এখান থেকে পেতে পারেন। সেদিক থেকে বিচার করলে গল্পটির বিশেষ মূল্য আছে।

প্রভাতকুমার প্রধানত: বাঙালী জীবনের গল্পকার। বিলাতের পটভূমিকায় লিখিত হলেও এখানকার অধিকাংশ নারীচরিত্রের মধ্যে তিনি দেখেছেন বাঙালীসুলভ প্রেমপ্রীতিপূর্ণ স্নেহকোমল নারীহৃদয়।

'ফুলের মূল্য' (ভাদ্র, ১৩১২) গল্পে ইংলণ্ডের এক দরিদ্র ~~স্বল্প~~ স্বল্পশিক্ষিত পরিবারের মাতা এবং কন্যার মধ্যে, সৈনিকের চাকুরী অবলম্বন করে সুদূর ভারতবর্ষে আগত যথাক্রমে তাদের পুত্র ও ভ্রাতার জন্য পরম উৎকণ্ঠা, পুত্রের সংবাদের জন্য স্নেহশীল মাতৃহৃদয়ে ভারতবর্ষীয় অলৌকিক যাদুযুক্ত অঙ্গুরীয়ে বিশ্বাস স্থাপন অথবা ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন ভগিনীহৃদয়ে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা জ্ঞাপনের জন্য কষ্টার্জিত একটি শিলিং ব্যয়ে তার কল্পলোকে ভারতবর্ষে অবস্থিত ভ্রাতার সমাধিতে পুষ্পপ্রদানের অনুরোধ যেমন করুণ তেমন মর্ম্মস্পর্শী। ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য বালিকা ম্যাগীর এই ত্যাগ যত সামান্যই হোক না কেন, অমূল্য। এই বালিকাহৃদয়ে দেশকাল নির্বিশেষে চিরন্তন ভ্রাতৃপ্রেমের বন্দনাগান গেয়েছে। গল্পটি প্রভাতকুমারের অন্যতম সার্থক সৃষ্টি।

হিন্দুধর্মে আকৃষ্টা জনৈকা ধনী মিস টেম্পলের সরলতার সুযোগ নিয়ে বিলাতে আইন পাঠরত পিতৃমাতৃহীন অবিবাহিত বঙ্গসন্তান বরীন্দ্র ভণ্ড নিষ্ঠাবান হিন্দু সেজে মিস টেম্পলের বিশ্বাস উৎপাদন করে তাঁর পোষ্যপুত্র হয়ে কিভাবে কিছুদিন নিষিদ্ধ বিলাসবহুল জীবন যাপনের পর ভদ্রমহিলার কাছে ধরা পড়ে তার পুরাতন বেজওয়াটের বাসস্থানে ফিরে আসে তারই কৌতুককর কাহিনী 'পুনর্মূষিক' (কার্তিক, ১৩১২) গল্পটি। মিস টেম্পলের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতায় বরীন্দ্র চরিত্রের নীচতা প্রকাশিত কিন্তু তার জীবনচর্য্যা যথেষ্ট কৌতুকবহ। বেজওয়াটের বাসস্থানের ~~স্বত্বে~~ ল্যাণ্ডলেডির কাছ থেকে টাকা ধার করার জন্য তার বাংলা ভাষায় চিঠির একাংশে লেখা — 'এখানে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। বরফের সের একটাকা করিয়া। এর অনুবাদ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছে - 'I am sending you twenty pound next week'। বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞা ল্যাণ্ড-লেডি তার বলার ~~ভঙ্গি~~ ভঙ্গিতেই তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। মিস টেম্পলকে অভিভূত করার পন্থাও তার অনুরূপ — 'উচ্চ অঙ্গের কাব্যমাত্রই দর্শন। আর সুন্দর দার্শনিকতত্ত্বমাত্রই কবিতা।' এই যুক্তিতে 'মেঘদূত'কে দর্শনশাস্ত্রভুক্ত করা তার অভিনব কৌতুককর আবিষ্কার। অথবা মিস টেম্পলকে অভিভূত করার জন্য তার আসল ধর্মশাস্ত্র থেকে দুচার টে সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করা

পোষ্যপুত্র হয়ে মিস টেম্পলের গৃহে নিরামিষ ভক্ষণ অথচ বাইরে গিয়ে তাকে দেখা গেল সম্ভ্রান্ত হোটেলে তার 'সম্মুখে প্লেটে নিষিদ্ধ খাদ্য, পার্শ্বে ফেনমন্ডিত তরল স্বর্ণের ন্যায় মদিরা এবং আপত্তিজনক নারীমূর্তি ।'

'প্রবাসিনী'-(আষাঢ়, ১৩১৬) গল্পে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জনৈক হেমচন্দ্র দত্ত, বাংলাভাষা সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা ইংরেজ মাতার গর্ভজাত অথচ পিতৃসূত্রে বাঙালী কুমারী লীলা রায়ের সঙ্গে কিভাবে প্রেমে পড়েছিল তারই এক রোমান্টিক কাহিনী । লীলা কর্তৃক গীত বার্ণস এর প্রেমের সঙ্গীতে হেম মুগ্ধ এবং এই সঙ্গীত মূর্চ্ছনার মধ্য দিয়ে উভয়ের প্রেমের প্রকাশকে এক অপূর্ব মাধুর্য্যে ভরে দিয়েছে । বিবাহের মাধ্যমে প্রেম তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে । গল্পে হেমের বন্ধু অতুলের ভাবভঙ্গি আচার আচরণ কৌতুক-রসের সৃষ্টি করেছে। স্কচ্ এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি প্রভাতকুমারের অনুরাগ গল্পে লক্ষ্য করা যায় ।

বিলাতের পটভূমিকায় লিখিত প্রভাতকুমারের গল্পগুলি সম্পর্কে ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ ভাবে মন্তব্য করেছেন —' প্রভাতকুমার ইংরেজ জীবনের যে দিক আঁকিয়াছেন তাহা আমাদেরই মত স্নেহপ্রেমে কমনীয়, আশংকা দুর্বল, বিরহ মিলন ব্যাকুল । এখানে রাজনৈতিক হিংসা দ্বেষের চিহ্ন নাই, বিজেতা বিজিতের অহংকার আত্মগ্লানি নাই — এখানে সমস্ত বৈষম্য, ভেদবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া সর্বদেশ - সাধারণ মানব হৃদয়ের মিলনক্ষেত্র রচিত হয়েছে।' ৬৫

(৫)

প্রভাতকুমারের চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'গল্পাঞ্জলি', প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আশ্বিন, ১৩২০ সালে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর মতে প্রথম প্রকাশকাল ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ । এখানে মোট ছয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলি ইতঃপূর্বে 'মানসী,' 'সাহিত্য', 'বঙ্গদর্শন' এবং 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩১৬ থেকে ১৩২০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল । প্রভাতকুমারের জীবিতাবস্থায় তিনটি এবং মৃত্যুর পর গল্পগ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ।'গল্পাঞ্জলি'র প্রথম প্রকাশের পর লেখক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি খন্ড উপহার দিয়েছিলেন। গ্রন্থপ্রাপ্তিতে প্রীত হয়ে তিনি প্রভাতকুমারের গল্প রচনার প্রতিভার প্রশস্তি করেছিলেন । এখানে সংকলিত একমাত্র 'বাল্যবন্ধু' গল্পটি ছাড়া অন্য গল্প-গুলিতে প্রভাত-প্রতিভার সম্যক পরিচয় আছে ।

অতিরিক্ত মদ্যাসক্তি এবং সঙ্গদোষের ফলে জীবনের এক অসহায় অবস্থায় উপনীত নলিনীকে বাল্যবন্ধুত্বের সূত্রে বিপিনবাবু কিভাবে উদ্ধার করে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় দিলেন তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'বাল্যবন্ধু' (মাঘ, ১৩১৯) গল্পে। একদিকে অত্যধিক মদ্যপানের কুফল অন্যদিকে প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় গল্পে প্রদর্শিত হয়েছে। নলিনী চরিত্রে স্ত্রী এবং সন্তানের প্রতি মমতাবোধ এবং মদ্যপ স্বামী কর্তৃক অপমানিত লাঞ্ছিত হয়েও স্বামীর প্রতি নলিনীর স্ত্রী হেমাঙ্গিনীর গভীর ভালবাসা এবং সেবাযত্নের কথা হিন্দু নারীর পাতিব্রত্যে বিশ্বাসী প্রভাত মানসের পরিচয় দিয়েছে।

ইংরেজ সমাজের রীতিনীতি সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা না থাকায় এক ভদ্রমহিলা বিলাত ফেরত নব্য ব্যারিস্টার শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চৌধুরীর বিলাতে থাকা কালীন একটি চিঠির ভুলব্যাখ্যা করে তার মনোনীতা সুপ্রভা এবং তাদের পরিবারের সকলকে অকারণ সন্দেহ এবং দুশ্চিন্তার মধ্যে নিক্ষেপ করে, প্রকাশচন্দ্রের বিবাহে কিভাবে জটিলতার সৃষ্টি করেছিলেন তারই কৌতুককর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'বিলাত ফেরতের বিপদ' (আশ্বিন, ১৩১৮) গল্পে। অবশ্য এই ভুল বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি, পাত্র স্বয়ং পত্রের প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করে অচিরেই সকলের মনে বিশ্বাস স্থাপনে সক্ষম হয়েছে এবং তখন উভয়ের মিলনে আর কোন বাধা থাকেনি। গল্পে নব্য ব্রাহ্ম অতুলবাবুর উক্তিতে তৎকালীন বিলাত ফেরতদের সম্পর্কে নব্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মনোভাব আভাসিত। অতুলবাবুর উক্তি —' বিলাত - ফেরতেরা কি সহজ লোক ? এমন অপকর্ম নেই যা তারা বিলাত গিয়ে করে না। আর এখানে ফিরে এসেই বা কি ? এক একটি মদের পিঁপে বললেই হয়। .... আর ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের যে কি রোগ হয়েছে — বিলাত ফেরত নইলে তাঁদের পছন্দই হয় না। কেন রে বাপু — যারা বিলাত যায়নি তারা কি মানুষ নয় ?' ৬৬

'মাদুলী' (আশ্বিন, ১৩১৮) গল্পে দেশবাসীর প্রতি আন্তরিকতাহীন কূটকৌশল পরায়ণ স্বদেশী আন্দোলনকারীদের প্রতি লেখক কটাক্ষপাত করেছেন। 'গ্রামে গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচারক তথাকথিত দেশসেবক এক সন্ন্যাসীবেশী তরুণ, দেবদ্বিজে - বিশ্বাসজনিত সংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত দারিদ্র্যপীড়িত তাঁতি, রাইচরণের দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাকে কিছু টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সর্ত ছিল রাইচরণ ঐ টাকা থেকে গ্রামে তাঁতশালা স্থাপন করে, মাইনে দিয়ে তাঁতি রেখে কাপড় বুনিয়ে বিনালাভে বিক্রী করবে। পরস্ব-অপহরণকারী গ্রামের ধনী ভট্টাচার্য তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতারণাজালে লোভের বশবর্তী হয়ে আবদ্ধ হয়ে রাইচরণকে টাকা দিয়েছে ঠিকই কিন্তু

রাইচরণ যখনই জানতে পেরেছে তার অর্থপ্রাপ্তির পেছনে প্রতারণা আছে তখনই তার ধর্মভীরু মন 'ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ' করতে অস্বীকার করায় সেই দেশসেবকের 'সবুট পদাঘাতে' ধরাশায়ী হয়ে ধরাধাম ত্যাগ করেছে।

প্রভাতকুমার 'সর্ববিষয়ে স্বদেশী' (কার্তিক, ১৩১৩) প্রবন্ধে বলেছেন—স্বদেশী অর্থে [illegible] বিদেশী সব কিছুকে বর্জন নয়। স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত অর্থ দেশের উন্নতি সাধন করা এবং ধনবৃদ্ধি না হলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। ধনবৃদ্ধির জন্য [illegible] দেশের শিল্পের উন্নতির প্রয়োজন, জাতীয় উন্নতি যেখানে লক্ষ্য সেখানে বিদেশী বর্জনটাই যেন অহেতুক গুরুত্বলাভ না করে। দেশের উন্নতি সাধনের জন্য আমাদের পুরাতন রীতিনীতি অথবা ভাবধারার মধ্যে যা সত্য - শিব - মঙ্গল তাকে কেন্দ্র করেই উন্নতির পথ অবলম্বন করতে হবে। এইগল্পে দেখি [illegible] তন্তুবায় রাইচরণের বস্ত্রবয়নের দক্ষতা কম নয় কিন্তু সনাতন আদর্শে লালিত ধর্মভীরু তার মনটিকে অস্বীকার করা যায় না। প্রভাতকুমারের বক্তব্য দেশবাসীর এই ধর্মভীরুতা সত্যপরায়ণতা এই সকল ভাবধারাকে অক্ষুন্ন রেখেই শিল্পের উন্নতি তথা দেশের উন্নতি করা সম্ভব। কিন্তু তথাকথিত স্বদেশী আন্দোলনের ভক্তগণ দেশের সংস্কারকে অগ্রাহ্য করে, দেশবাসীর মনে আঘাত হেনে নিজেদের অহমিকার পূর্তি ঘটিয়ে দেশোন্নতির নামে দেশের [illegible] শিল্পী এবং শিল্পের অপমৃত্যু ঘটিয়ে দেশের সর্বনাশ ডেকে আনছেন। গল্পে রাইচরণের মৃত্যু তথাকথিত স্বদেশী আন্দোলনকারীদের মূঢ়তাকে নির্দেশিত করেছে।

'রসময়ীর রসিকতা' (পৌষ, ১৩১৬) গল্পটি লেখকের অন্যতম সার্থক সৃষ্টি। রৌদ্ররসের প্রতিমূর্তি 'রণরঙ্গিণী' রসময়ী জীবিতকালে স্বামী ক্ষেত্রমোহনের উপর আপন কর্তৃত্ব খাটিয়ে মৃত্যুর পরও তা অক্ষুন্ন রাখার জন্য স্বামীর কার্যকলাপের ভবিষ্যৎ ধারা চিন্তা করে তার কল্পিত পরিস্থিতি অনুযায়ী এক একটি পত্র রচনা করে সময় মত সেগুলি তার কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থার মাধ্যমে, মৃত্যুর পরেও প্রেতলোকে তার অবস্থিতি জনিত তথাকথিত প্রমাণের সাহায্যে স্বামীর মনে যে ভীতি - শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল তারই এক কৌতুককর কাহিনী 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পটি। রসময়ীর লিখিত এবং তার মৃত্যুর পর দিদি বিনোদিনী কর্তৃক ক্ষেত্রমোহনের ঠিকানায় প্রেরিত পত্রগুলির মধ্যে একটি রহস্যময়তা ঘিরে আছে। যেগুলি পাঠে প্রেতলোক সম্পর্কে পাঠকমনে ধীরে ধীরে বিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কাহিনীর শেষে অবশ্য প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হওয়াতে কৌতুহলের অবসান হয়েছে কিন্তু

কিন্তু রসময়ীর চরিত্রের দুর্দান্ত প্রকৃতির কথা চিন্তা করলে চিঠিগুলিকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। গল্পটির প্লটের গঠন কৌশলে অতি অনায়াসে ডিটেকটিভ গল্পের ঔৎসুক্য ও ভূতের গল্পের ভীতি শিহরণ একত্র সঞ্চারিত। '৬৭ গল্পে থিওজফিস্ট সম্প্রদায়ের প্রতি মৃদু শ্লেষ রয়েছে।

এক ইংরেজ ললনার গভীর প্রেমের বেদনা বিধুর কাহিনী 'মাতৃহীন' (চৈত্র, ১৩১৭) গল্পটি। যৌবনে মিস ক্যাম্বেল লণ্ডন প্রবাসী বঙ্গীয় যুবক জনৈক মিত্রকে ভালবেসেছিলেন, ক্যাম্বেলের প্রতি যুবকের ভালবাসারও অন্ত ছিল না। কিন্তু সামাজিক বিধি নিষেধের জন্য যুবকের পিতার অমতে নিজের সুখের জন্য তাকে বিয়ে করে যুবকের পিতার মনকষ্টের কারণ সে হতে চায়নি। যুবকের অনুরোধ সত্ত্বেও সে নিজ মতে অবিচল থেকেছে এবং আজীবন কুমারীব্রত অবলম্বনে তার একনিষ্ঠ প্রেমের জয়গান গেয়েছে। জীবনের উপান্তে এসে তারই প্রেমিকের পুত্রের সম্মুখে বসে মিস ক্যাম্বেলের স্বীয় জীবনের ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী—কথন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। প্রেমিকের মৃত্যু সংবাদে এই মহিয়সী মহিলার প্রেমিকের দেওয়া হাতের চুড়িগুলি খুলে রাখা এবং প্রেমিক পুত্রের বিবাহ সংবাদে চুড়িগুলি আশীর্বাদস্বরূপ তার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেওয়ার মধ্যে একধারে তার প্রেমিক হৃদয়ের স্ফুরণ এবং মাতৃহৃদয়ের বিগলিত করুণা ধারার পরিচয় রয়েছে। মিস ক্যাম্বেলের চরিত্রটি যুগ্মভাবে সার্বজনীন প্রেমিক হৃদয় এবং মাতৃত্বের আদর্শস্থানীয়া হয়ে উঠেছে। তৎকালীন পাঠকমনকে গল্পটি যে কি পরিমানে অভিভূত করেছিল 'গল্পাঞ্জলি'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখকের বক্তব্য অনুসরণ করলে বোঝা যাবে। ভূমিকায় লিখেছেন — "'মাতৃহীন' গল্প 'মানসী'তে প্রকাশিত হইলে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন ঘটনাটি সত্য। এমন কি, নায়কের পিতা প্রবীণ ব্যারিষ্টারটি কে, কেহ কেহ এ অনুসন্ধানেও ব্যাপৃত ছিলেন। সেই কারণে প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতেছি, উক্ত প্রবীন ব্যারিষ্টারটি কোন বার লাইব্রেরিতে কোনও দিন পদার্পণ করেন নাই — সম্পূর্ণভাবেই কল্পনারাজ্যের অধিবাসী।'

পশুপ্রীতিজনিত করুণ রসাত্মক গল্প 'আদরিনী' (ভাদ্র, ১৩২৫)। সামন্ততান্ত্রিক মেজাজ অথচ অত্যন্ত কোমল এবং অভিমানী হৃদয়ের অধিকারী মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায় কোন এক বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজবাড়ী থেকে হাতী প্রার্থনা করে বিফলমনোরথ হওয়ায় জেদের বশে নিজেই হাতী কিনেছিলেন। অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অনন্যোপায় হয়ে তাঁর সেই সাধের হাতী আদরিনীকে বিক্রয়ের জন্য মেলায় পাঠাতে বাধ্য হন। আপন সন্তান স্নেহে যে আদরিনীকে এতদিন পালন করেছিলেন তার বিদায় বেলায় কোমল হৃদয়ের এই বৃদ্ধ প্রাণ ভরে বিদায়বাণী উচ্চারণ করতে পারেন নি। আত্যন্তিক

দু:খে অতি কষ্টে উচ্চারণ করেছেন —" আদর , যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এস ।" পশুপ্রাণেও বুঝি মানব মনের ব্যথা বেজেছে । আদরিনী মেলায় অবিক্রীত হয়ে বৃদ্ধের গৃহেই ফিরে এসেছে । কিন্তু আদরিনীকে রক্ষা করার বৃদ্ধের কোন সম্বল ছিল না, পৌত্রী কল্যাণীর বিবাহের খরচ সঙ্কুলানের জন্য আদরিনীকে বিক্রয় করা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে তাই পুনরায় বিক্রয়ার্থে মেলায় তাকে পাঠালে পথিমধ্যে পীড়িত হয়ে আদরিনী প্রাণ ত্যাগ করে । আদরিনী-অন্তপ্রাণ জয়রাম মুখোপাধ্যায় এর পর আর বেশীদিন বেঁচে থাকেননি ।

পশুর প্রতি অদ্ভূত সংবেদনশীল মন নিয়ে সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে গল্পটি রচিত। গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন — " আমি মন:কল্পিত ঘটনা লইয়াই অধিকাংশ গল্প লিখিয়া থাকি — তবে কৃচিৎ কখনও বাস্তব - জীবনের দুই - একটা ঘটনা থাকে বটে । কেবল ' আদরিনী ' গল্পটি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। উহার প্রায় চৌদ্দআনা কথা সত্য । গল্পে এত সত্য ঘটনা আর কখনও আমি লিপিবদ্ধ করি নাই ।" বোধকরি এই কারণেই গল্পটি এত মর্মস্পর্শী হয়েছে।

গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের ' মহেশ ' গল্পটিকে স্বতঃই মনে পড়ে । উভয় রচনাতেই গৃহপালিত পশুপ্রীতির কথা আন্তরিকতার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে । কিন্তু 'মহেশে'র করুণ পরিণতিতে গফুর-চিত্তের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে অসহায়, নিপীড়িত, নিরন্ন অবহেলিত বাংলার কৃষিসমাজ, তাই 'মহেশ' গল্পের আবেদন বহুদূর বিস্তৃত । অন্যপক্ষে 'আদরিনী' গল্পে ব্যক্তি-জীবনের দু:খকাতরতা ব্যক্ত হয়েছে । একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হলেও উভয় গল্পের আবেদন ভিন্নতার জন্য দায়ী শিল্পীমনের ভিন্ন সংগঠন । শিল্পীমনের এই পার্থক্য সমালোচক অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ।

'শরৎচন্দ্র সমাজ জীবনের শিল্পী, প্রভাতকুমার পারিবারিক জীবনের , শরৎচন্দ্র 'Unmasking ' এর জন্য তৎপর — প্রভাতকুমার আত্মতৃপ্ত, নির্বিরোধ। সুতরাং শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পে এনেছেন লাঞ্ছিত জনসাধারণের জ্বলন্ত অভিসম্পাত এবং প্রভাতকুমার এনে দিয়েছেন একটি পারিবারিক অশ্রুবিন্দু । " ৬৮

(৬)

'গল্পবীথি' প্রভাতকুমারের প্রথম গল্পগ্রন্থ । প্রকাশিত হয়েছে পয়লা আষাঢ়, ১৩২৩ সালে । এই সময়ে তিনি স্থায়ী ভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেছেন । আইন কলেজে অধ্যাপনা এবং 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সম্পাদনা এই হলো তাঁর প্রধান কাজ ।

'গল্পবীথি'তে মোট আটটি গল্প সংকলিত হয়েছে । গল্পগুলি ইতিপূর্বে ১৩২০ থেকে ১৩২২ সালের মধ্যে 'মানসী' 'সাহিত্য' এবং 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে গ্রথিত গল্পগুলি সুখপাঠ্য হলেও একমাত্র 'যুগল সাহিত্যিক' ছাড়া অন্যত্র লেখকের গল্প প্রতিভার পূর্ণ সাক্ষ্য মেলে না।

'খোকার কাণ্ড' (আশ্বিন, ১৩২১) গল্পে একই পরিবারের ব্রাহ্ম মতে বিশ্বাসী স্বামী এবং ব্রাহ্ম হলেও হিন্দুর দেব দেবতা পূজা পার্বনে আস্থাশীলা স্ত্রীর মতাদর্শ এবং কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে কৌতুকরস পরিবেশিত হয়েছে। অধ্যাপক হরসুন্দরবাবু নব্য ব্রাহ্ম এবং নববিধান সমাজের একজন বিশেষ উৎসাহশীল সভ্য । আইন পাশ করেও ওকালতি করেননি, কারণ এই ব্যবসায়ে মিথ্যা কথা বলতে হয় । ব্রাহ্মধর্মকে তিনি সমগ্র মানবজাতির একমাত্র সত্য ধর্ম বলে বিশ্বাস করেন, স্ত্রী শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহী, বিধবা বিবাহেও তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে, কিন্তু কাসরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি যখন মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়েছেন তখন দেখা গেল বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তাঁর কিছু মত পরিবর্তন হয়েছে । পরিবর্তনের কারণ আর কিছুই নয় তিনি মারা গেলে স্ত্রী পঙ্কজিনী অন্য কোথাও বিয়ে করবে একথা ভাবতে মনে বড় কষ্ট অনুভব করেছেন। আবার স্ত্রী পঙ্কজিনী ব্রাহ্ম হলেও মনে মনে গোঁড়া হিন্দু।- স্বামীর অসুখ যখন কিছুতেই আরোগ্যলাভ করছেনা তখন হিন্দুর জাগ্রত দেবতা বাবা ষণ্ডেশ্বরের পায়ে পূজা মানত করে— আকুল ভাবে তারই কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করেছেন। অত:পর দেখা গেল —'নিরাকার পরব্রহ্মের অনুকম্পাতেই হউক অথবা বাবা ষণ্ডেশ্বরের তেলপড়ার গুণেই হউক, — ডাক্তারী ঔষধের প্রভাবেই হউক অথবা রোগ ভোগের কাল পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, হরসুন্দরবাবু দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন।'[৬১] হরসুন্দরবাবুর আরোগ্যলাভের পর পঙ্কজিনী স্বামীর অজ্ঞাতে বাবা ষণ্ডেশ্বরের পূজো দিয়ে যখন ফিরছেন তখন আকস্মিকভাবে ট্রেনের কামরায় তসরের শাড়ী পরিহিতা, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা আঁকা হিন্দু নারীর পূজারিনী বেশে স্ত্রীকে দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেছেন । এখানে হৃদয় সত্যের কাছে ধর্মীয় সংস্কার পরাভূত হয়েছে । ব্রাহ্ম সমাজ বিধবা বিবাহ অনুমোদন করলেও কোন স্বামীই মনে প্রাণে চান না যে তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী পুনর্বিবাহিত

হোক। আবার স্বামীর প্রাণই যে স্ত্রীর কাছে বড় কথা পঙ্কজিনীর ক্রিয়াকলাপে তার পরিচয় আছে। ঘটনা সমাবেশে গল্পে কৌতুকরসের সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের জীবনের নীতি বোধ বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালে যে অসঙ্গতি অনেক সময় প্রকটিত হয় সেই অসঙ্গতি এখানে কৌতুকরসের উৎস।

রোগাক্রান্ত ভগ্নস্বাস্থ্য হরিধন চরিত্রের নীচতা বর্ণিত হয়েছে 'বায়ুপরিবর্তন' গল্পে (বৈশাখ, ১৩২১)। হরিধনের জ্ঞাতি ভাই ভূপালবাবু দয়াপরবশ হয়ে দরিদ্র হরিধনের স্বাস্থ্যোদ্ধার মানসে পশ্চিমে তার চাকুরীস্থলে নিয়ে যান। কিন্তু পরশ্রীকাতর হরিধন সেখানে নিজেদের গ্রামের জমিদার বলে এবং দেশের বাড়ীতে ভূপালবাবুরা যে তাদের থেকে হীনাবস্থার একথা মিথ্যা প্রচার করে ভূপালবাবুকে তার চাকর বামুনের কাছে ছোট করতে চেয়েছে। সে লোভী এবং নীচ, বামুনকে টাকা দিয়ে মাছের মুড়ো দুধের সর খাওয়ার চেষ্টা করেছে। হরিধন ভূপালবাবুর বাক্স থেকে টাকা সরিয়েছে, কলম ভেঙ্গে মিথ্যা কথা বলতেও তার বাধেনি, ভূপালবাবুর স্ত্রীর লেখা চিঠির খাম খুলে গোপনে পড়েছে। এমনকি মিথ্যা পরিচয়ে জনৈক ভদ্রলোকের কন্যাকে বিয়ে করার আশা দিয়ে তার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা আদায় করেছে। অবশ্য তার সমস্ত চাতুরী শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়েছে এবং ভূপালবাবু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়ে গ্রামে এসে প্রচার করেছে — ভূপালবাবুর বাসায় অনাচার দেখে সে চলে এসেছে। সেখানে শুধু মুর্গী নয় গোমাংস ভক্ষণও চলে। তাই দাদার অনুরোধ সত্ত্বেও সেখানে অন্নজল গ্রহণ না করেই চলে এসেছে। স্বল্প পরিসরে চরিত্রটি সুচিত্রিত হয়েছে।

আত্মকথনমূলক ভঙ্গীতে কোন এক 'আর্যশক্তি' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমনতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন 'সম্পাদকের আত্মকাহিনী' (কার্তিক, ১৩২০) গল্পে। সম্পাদক জীবনের আর্থিক অসঙ্গতি, অর্থাভাবে পত্রিকার নূতন গ্রাহক সংগ্রহের জন্য আড়ম্বরপূর্ণ মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রচার, পত্রিকা গ্রাহকের মনোভাব বুঝে উদ্দীপনাপূর্ণ গল্প প্রবন্ধ প্রকাশ করা অথবা নিজেরাই নিজেদের সুখ্যাতি করে অন্য পত্রিকায় বেনামে নিজ পত্রিকার সমালোচনা প্রকাশ করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রিকা বিক্রয়ের নানা প্রয়াসের কথা বর্ণিত হয়েছে। সবথেকে কৌতুককর ব্যাপার-যে সম্পাদক মহাশয় নিজেই স্বদেশী প্রবন্ধ লিখে কলেজের যুবকদের মাতিয়ে তুলেছেন তিনিই পুলিসের ভয়ে ভীত হয়ে মূর্চ্ছা গেছেন। অবশ্য শেষে প্রমানিত হয়েছে, যে ভদ্রলোককে ডিটেকটিভ পুলিশ সন্দেহে তিনি ভয় পেয়েছেন তিনি পুলিস নন তারই পত্রিকার লেখক। সহকারী

সম্পাদকের কর্তব্যজ্ঞান আরও চমৎকার, পুলিশের চেহারা দেখেই সম্পাদককে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালিয়ে যেতে তিনি আরও বেশী তৎপর। এই কৌতুককর রচনাটিতে ব্যক্তিগতভাবে লেখকের সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতার আভাস আছে ।

'যজ্ঞ ভঙ্গ' (আশ্বিন, ১৩২১) গল্পে একদিকে তথাকথিত সাধুবাবাদের তন্ত্রসাধনার অথবা যাগ যজ্ঞের অন্তরালে ভন্ডামি লুকিয়ে থাকার অন্যদিকে ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের শ্রদ্ধাভক্তি কত অতলস্পর্শী হতে পারে তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । জ্যেষ্ঠ চন্দ্রনাথ জমিদারী দখলের জন্য কনিষ্ঠ সুরেন্দ্র নাথের প্রাণনাশের উদ্যোগ করেছে এবং সেই মারণ যজ্ঞের হোতা তথাকথিত তান্ত্রিক সাধু কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী । কিন্তু কৌশলে সুরেন্দ্রনাথ এই কালিকানন্দের কাছে করকোষ্ঠী বিচার করিয়ে নিজের আয়ুষ্কাল চুয়াত্তর বৎসর বলে লিখিয়ে নিয়ে প্রমাণ করিয়ে দিল-যে কালিকানন্দ একুশ দিনের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর জন্য মারণ যজ্ঞ করছে সেই কালিকানন্দই সুরেন্দ্রনাথের আয়ু চুয়াত্তর বৎসর বলে লিখছে। অতএব এই তথাকথিত মারণ-যজ্ঞ যে মিথ্যা, কালিকানন্দ যে প্রকৃতই ভন্ড এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই । প্রভাত - সাহিত্যে এই ধরনের ভন্ড সন্ন্যাসীর প্রাচুর্য্য লক্ষনীয় ।চন্দ্রনাথের নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেয়েও সুরেন্দ্রনাথ যে ভাবে তাকে ভক্তি করেছে সেখানে আদর্শ ভ্রাতৃত্ববোধ কীর্তিত হলেও গল্পের বাস্তবতা রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং গল্পে বঙ্কুবাবুর চরিত্রটি বাস্তবানুগ। গল্পটি প্রভাতকুমারের সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি ।

একজন হীন প্রবৃত্তির কুমারী লেডী-ডাক্তার বিপত্নীক এবং তরুণ এক ডেপুটিকে তার সঙ্গে অবাধে মেলামেশার সুযোগ দিয়ে, প্রেমের অভিনয়ে নিজের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করে শেষ পর্য্যন্ত নিজের নামে নিজেই বদনাম রটনা করে কিভাবে ডেপুটিকে স্বামী হিসাবে পাবার চেষ্টা করেছিল তারই কৌতুককর কাহিনী 'লেডি - ডাক্তার' (আশ্বিন, ১৩২০) গল্পটি । অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত তার সমস্ত কলা-কৌশল বানচাল হয়ে যায় এবং ডেপুটিও মুক্তি পান ।

গল্পটি প্রকাশিত হলে তৎকালীন পাঠক মহলে সম্ভবতঃ কিছুটা বিরূপ মন্তব্যের ঝড় উঠেছিল। তাই গল্পগুচ্ছের ভূমিকায় প্রভাতকুমার লিখেছেন —' লেডি ডাক্তার' গল্পটি সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে । কেহ কেহ বলিয়াছেন, উক্ত গল্পের নায়িকাকে ওরূপভাবে চিত্রিত করিয়া আমি অন্যায়

কার্য্য করিয়াছি — দেশের সমস্ত লেডি ডাক্তার নাকি এজন্য মর্মাহত হইয়াছেন। আমি কি করিয়াছি ? সুবালাকে আমি অসচ্চরিত্রা করিয়া আঁকি নাই। আমি কেবল দেখাইয়াছি যে সে একটি স্বামী-সংগ্রহের জন্য ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'husband hunting' - বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছে। ইউরোপীয় সমাজে (অর্থাৎ যে সমাজের আংশিক অনুকরণে এই সকল সম্প্রদায় চলেন ফেরেন)ইহা কখনও পাপ কার্য বলিয়া গণ্য হয় নাই। তবে ইহার মধ্যে হীনতা আছে সন্দেহ নাই। একজন লেডি ডাক্তারকে আমি একটু হীনতার রঙে আঁকিয়াছি বলিয়া , সকল লেডি ডাক্তারই ঐরূপ চরিত্রের একথা আমি বলিতেছি না ।.....'

'নীলুদা' (কার্তিক, ১৩২০) গল্পে বাল্যবন্ধুত্বের পরিচয় আছে। অল্প বেতনের কেরাণী নীলমণির স্ত্রীপুত্র নিয়ে সাংসারিক দুরবস্থা দেখে ব্যবসায়ে কৃতী তার বাল্যবন্ধু সুধাংশু সমব্যথিত হয়ে তাকে তার ব্যবসায়ের অংশীদার করে নেয়। নীলমণিও কিছুদিন সুখের মুখ দেখে। কিন্তু বেহিসাবী সুধাংশু ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে না পারায় নীলমণিকে স্ত্রী পুত্র নিয়ে আবার কেরাণীর চাকুরীতেই ফিরে আসতে হয় । ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হলেও সুধাংশু অসৎ নয় নীলমণিকে তার প্রাপ্য সবকিছুই মিটিয়ে দিয়েছে ।

'যুগল সাহিত্যিক' (ফাল্গুন, ১৩২০) গল্পে এক বন্ধুর কবিখ্যাতি অন্যজনকে ঈর্ষান্বিত করে তুলে কিভাবে তাদের বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গতায় ফাটল ধরিয়ে অবশেষে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ।

গল্পে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে। 'ইতিমধ্যে বিলাতে রবীন্দ্রবাবুর বিজয় - দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল।' রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতিতে এদেশে কবিযশপ্রার্থী এবং রবীন্দ্রবিরোধী অনেক কবি তাঁর কাব্যের বিরূপ সমালোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন একথা সর্বজনবিদিত। এখানে ব্যর্থ কবি রাজেন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি লাভের আশায় তারই বন্ধু সফলকাম কবি তিনকড়ির কবিতার বিরূপ সমালোচনা করে 'রত্নাকর' এ প্রকাশের মধ্যে তার অপযশ প্রচারের যে চেষ্টা চলেছে - তা রবীন্দ্রবিরোধী গোষ্ঠীর কার্যকলাপের কথা স্মরণ করায় । প্রভাতকুমার স্বয়ং এই ধরণের রবীন্দ্রবিরোধীদের পরিচয় দিতে গিয়ে ইতঃপূর্বে লিখেছেন —'যুবকদের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে , তাঁহারা কেহ কেহ ব্যর্থকাম কবি। .... ইঁহারা যাহা হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে না পারিয়া, যে হইয়াছে তাহার প্রচুর নিন্দা করিয়া সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। মানুষ যখন প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়, তখন যে জিতিয়াছে, তাহার প্রতি তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ, বিরক্তি, আক্রোশ ও ঘৃণা হইয়া থাকে — এটা নিতান্ত স্বাভাবিক।' ৭০ আধুনিক কবিদের দুর্বোধ্য কাব্যভাষার প্রতিও লেখকের ব্যঙ্গ লক্ষনীয়। ব্যর্থকবি রাজেন্দ্রনাথের

কবিতার নমুনা —

'ঘট্টে ঘট্টে দিক্‌করীগণ শোভিতেছে ঘৃষ্টগাত্রী
জলজিঘৃক্ষু, কেহ পূর্ণিছে পলস্তরক পাত্রী ।'

বলাবাহুল্য রাজেন্দ্রগোষ্ঠী এই কবিতার প্রশংসা করলেও এ কখনই কাব্যভাষা হয়ে ওঠেনি ।

'কুমুদের বন্ধু' (জৈষ্ঠ, ১৩২২) গল্পে লন্ডন প্রবাসী ভাগ্যবিড়ম্বিত জনৈক কুমুদনাথ অর্থকষ্টে পতিত হয়ে কোন উপায়ান্তর না দেখে আত্মহত্যা করতে মনস্থ করে। হাইডপার্কের এক নির্জন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকার অবসরে তার পূর্ব পরিচিত কোন হোটেলের ভোজনকক্ষের পরিচারিকা এথেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় । অন্যমনস্ক কুমুদের সঙ্গে কথার ফাঁকে তার পকেটস্থিত রিভলভার আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই এথেল কুমুদের মনোভিপ্রায় বুঝতে পেরে মারণাস্ত্রটি জলে নিক্ষেপ করে এবং আত্মহত্যার কারণ জানতে পারায় সামান্য পরিচারিকা এথেল তার সঞ্চিত যথাসর্বস্ব এবং অন্য কোন উপায়ে আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ করে কুমুদের ভারতবর্ষে আসার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় দেয় । একটি অখ্যাত, অর্ধশিক্ষিত পরিচারিকার মনে ভিনদেশীয় বন্ধুর প্রতি ভালবাসা যে কত গভীর এবং নিঃস্বার্থ তার পরিচয় পেয়ে আমরা মুগ্ধ হই । অল্প পরিসরে বাহুল্যবর্জিত আলাপনের মধ্যদিয়ে সার্থকভাবে চরিত্রদুইটি উপস্থাপিত করতে লেখক এখানে সক্ষম হয়েছেন ।

(৭)

প্রভাতকুমারের ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'পত্রপুষ্প,' প্রকাশিত হয়েছে ১৩২৪ সালে । বেঙ্গল লাইব্রেরীর মতে প্রকাশকাল ১৮ই আগস্ট, ১৯১৯ সাল। এখানে সঙ্কলিত হয়েছে সর্বমোট ছয়টি গল্প ।গল্পগুলি ইতোপূর্বে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে ১৩২২ থেকে ১৩২৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল ।

বিবাহিত নরনারীর উভয়ত: দুর্বার আকর্ষণে প্রকৃতিগতভাবে স্বাভাবিকতা/ সত্যতা আছে। সেই আকর্ষণ সমাজ সংস্কারের বিধি নিষেধকে যে স্বতই অগ্রাহ্য করে তারই এক হাস্যরসাত্মক কাহিনী 'নিষিদ্ধ ফল'[2] (ফাল্গুন,১৩২২) গল্পটি । জনৈক রায়বাহাদুর প্রফুল্লকুমার মিত্র তাঁর 'সামাজিক - সমস্যা - সমাধান' গ্রন্থে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে পাত্র পাত্রীর বয়স যথাক্রমে চব্বিশ এবং ষোল না হলে উভয়ের মিলন ক্ষতিকারক । সেইজন্য পুত্রবধূকে ষোল

বৎসরের আগে পুত্রের সঙ্গে মিলিত হতে দেবেন না বলে স্থিরপ্রতিজ্ঞ এবং এই মিলনে বাধা দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য উপায়ও তিনি অবলম্বন করেছেন। কিন্তু একদিন রাত্রে দেখা গেল তারই পুত্র চোরের মত লুকিয়ে পুত্রবধুর জানালা থেকে ঝুলে পড়া দড়ির মই বেয়ে তার ঘরে হাজির হয়েছে। পরদিন রায়বাহাদুর তাঁর 'পুস্তকের একস্থান খুলিয়া 'চতুর্বিংশতি' কথাটি কাটিয়া 'দ্বাবিংশতি' এবং 'ষোড়শ' কথাটি কাটিয়া 'চতুর্দশ' করিয়া দিলেন।' ৭১ সুকৌশলে ঘটনা সংস্থাপনে লেখক গল্পে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। রায়বাহাদুরের পুত্র হেমন্তের লুকিয়ে শিবপুরে গিয়ে বধূর সঙ্গে মিলন, অথবা রোমিও জুলিয়েট নাটকপাঠে দড়ির মই বেয়ে ~~স্ত্রর~~ স্ত্রীর কাছে যাওয়ার পরিকল্পনা বেশ কৌতুককর। গল্পটি 'আধুনিক রোমিও' নামে প্রথমে লিখেছিলেন পরে 'নিষিদ্ধ ফল' এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে তদানীন্তন 'সাহিত্য' সম্পাদকের সঙ্গে লেখকের যে পত্র বিনিময় হয়েছিল, লেখকের জীবনালোচনায় তার উল্লেখ করা হয়েছে। ৭২

বাংলাদেশের গোয়েন্দাকাহিনী লেখকদের প্রতি মৃদু কটাক্ষযুক্ত কৌতুককর গল্প 'সখের ডিটেকটিভ' (শ্রাবণ, ১৩২৩) কলকাতা থেকে কোন এক বরযাত্রীদলের ফেলে যাওয়া বইয়ের ভিতর একটি চিঠি ছিল। চিঠিতে রহস্য করে মেয়ের বাড়ীকে 'শত্রুদুর্গ' এবং বিবাহরম্ভকে 'যুদ্ধারম্ভ' বলে লেখা হয়েছিল। দৈবাৎ এক গোয়েন্দাকাহিনী লেখক সেখানে উপস্থিত ছিলেন - তিনি অনেক মাথা খাটিয়ে শেষ পর্য্যন্ত স্থির করলেন নিশ্চয় এই চিঠি কোন স্বদেশী ডাকাতদলের লেখা। তাই এই দলকে ধরিয়ে দিয়ে 'রায়বাহাদুর' উপাধি পাবার লোভে কৌশলে তাদের এক গুদাম ঘরে আটক করেন। কিন্তু সুকৌশলে যুবকদল বেরিয়ে এসে যখনই তাকে দেখতে পেয়েছে — প্রাণ ভয়ে ভীত সেই গোয়েন্দাকাহিনীকার ষ্টেশনের তারের বেড়া টপকিয়ে বনের ভিতর দিয়ে দৌড়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে ঘন জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। গল্পে গোয়েন্দাকাহিনী লেখক গোবর্দ্ধনবাবুর উদ্ভট চিন্তা এবং কার্য্যকলাপ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। তাঁর ইংরেজী নভেল থেকে নেওয়া গোয়েন্দাকাহিনীকে নিজের নামে প্রচারের প্রবৃত্তির উল্লেখ সমকালীন গোয়েন্দাকাহিনীরচয়িতাদের প্রতি লেখকের মৃদু কটাক্ষ অনুভব করা যায়। তৎকালীন স্বদেশী ডাকাতদল সাধারণের মনে যে কতখানি ভীতির সঞ্চার করেছিল গোবর্দ্ধনবাবু এবং ষ্টেশনের ছোটবাবুর ব্যবহারে তার পরিচয় আছে।

মানব চরিত্রে পশু প্রীতির এক সুন্দর আলেখ্য 'কুকুরছানা' (আশ্বিন, ১৩২৩) গল্পটি। গৃহপালিত কুকুরের প্রভুভক্তির কথা সুবিদিত। কিন্তু গল্পে কুকুরছানাটি যেন শরৎকুমারের আত্মীয়রূপে দেখা দিয়েছে, কুকুরের ভাব ভঙ্গীর মধ্যে সে আবিষ্কার করেছে মানুষের অভিব্যক্তি। বরফে ভরা রীজেন্ট্স পার্কের

বেধে পরিত্যক্ত শীতে কম্পমান কুকুরছানাটির লাঙ্গুল আন্দোলনের ভঙ্গীতে সে যেন শুনতে পেয়েছে মানুষের আবেদন —' ওগো, আমার বড় বিপদ। শীতে যে মারা যাইতে বসিয়াছি, আমায় রক্ষা কর।' ৭৩ শরৎ তাকে রক্ষা করে প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে নিজেই তাকে পালন করেছে এবং পালন করেছে মানুষের মত যত্ন সহকারে, কুকুরের বিস্কুট না দিয়ে তাকে দিয়েছে মানুষ যে বিস্কুট খায় তাই। এরপর একদিন প্রকৃত মালিককে কুকুর ফিরিয়ে দিতে হয়েছে কিন্তু কুকুরটিকে ফিরিয়ে দিয়ে সে আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করেছে। খেতে গিয়ে কুকুরের অভুক্ত অবস্থা স্মরণ করে খেতে পারেনি, রাত সাড়ে দশটায় অযাচিত ভাবে কুকুরের খোঁজ নিতে তার নূতন বাসস্থানে গেছে। সেখানে গিয়ে দেখে তার প্রিয় কুকুরটি নাই এবং এও জানতে পেল কুকুরটি মারা গেছে। এ সংবাদে তার সমস্ত হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে -- মাতালের মত টলতে টলতে বাড়ী ফিরেছে। কিন্তু বাড়ী ফিরে দেখে কুকুরটি তার ঘরের মাঝখানে শুয়ে আছে। এর পর আর রীজেন্ট্স পার্কে কুকুর নিয়ে কোনদিন সে বেড়াতে যায়নি। 'সত্যবালা' উপন্যাসেও কুকুর-প্রীতির পরিচয় আছে।

অসৎ প্রকৃতির লোক যে কুযুক্তির অবতারণা করে আত্মপক্ষ সমর্থন করে 'অদ্বৈতবাদ' (ফাল্গুন, ১৩২৩) গল্পের অদ্বৈতচরণ তাদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। সে ধূর্ত এবং তার ব্যবসায়ী বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। সে হীন প্রবৃত্তির। সাধু প্রকৃতির আত্মভোলা ভাইকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে যেমন তার বিবেক-দংশন হয়নি তেমনি আবার নিজেদের কাঠগোলায় নিজেই আগুন দিয়ে, রাতারাতি ব্যবসায়ের খাতা বদল করে বীমাকোম্পানীর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে সে পিছপা নয়। তাই ভাই নিতাই মিথ্যা দাবীপত্রে সই করতে অস্বীকার করলে সে ভাইয়ের সই জাল করে বীমা কোম্পানী থেকে টাকা আদায় করে নিয়ে ব্যবসায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বীমা কোম্পানীকে ঠকিয়ে টাকা আদায় করার পেছনে তার যুক্তি — বীমাকোম্পানী লোকের কাছ থেকে 'বছরে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা তারা নিচ্ছে — কখনও কখনও দশ বিশ হাজার দিচ্ছে। আমায় এই পঞ্চাশ হাজার দিলে তারা কি ফেল হয়ে যাবে।' ৭৪ উপমাটি দিয়েছে আরও চমৎকার —' এই ধর শিবপুরে কোম্পানীর বাগানে গিয়ে, একটা কুলগাছ থেকে আমি যদি দুটো কুল পেড়ে খাই, তাতে কি কোন পাপ আছে? লক্ষ লক্ষ কুল রয়েছে, দুটো যদি আমি পেড়ে খাই ই — যার কুলগাছ সে তো জানতেও পারবেনা। ...... এতে কোনও দোষ নেই, এ ত আমাদের ন্যায্য পাওনা।' ৭৫ এই অভিনব যুক্তির সঙ্গে নিতাই নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে সে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। গল্পটি বাস্তব ভিত্তিক এবং উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত হয়েছে।

' সম্পাদকের কন্যাদায়' (শ্রাবণ, ১৩২৪) গল্পে কোন এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক এবং বিখ্যাত সাহিত্যিক মনতোষ বাবুর কন্যার বিবাহ-সমস্যা এবং সেই সমস্যার কৌতুককর প্রচেষ্টায় সমাধান বর্ণিত হয়েছে। বহুচেষ্টা এবং পরিশ্রম সত্ত্বেও কন্যা মণিমালার বিয়ের জন্য পাত্র সংগ্রহ করতে না পেরে তাঁরই সহকারী সম্পাদক অবিনাশবাবুর পরামর্শে পত্রিকায় কন্যার বিবাহের বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু কোন ফল না হওয়াতে তাঁর পত্রিকা 'আর্যশক্তি'তে কবিতা প্রকাশের জন্য আগত নব্য কবিদের মধ্যে তাঁর স্বজাতি যুবকের অন্বেষণে ব্যাপৃত হন। এমন সময় পিতৃবন্ধুত্ব সম্পর্কে নবীন কবি ললিত মোহন সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে দেখাকরতে আসে। ললিতমোহনকে চাকুরীজীবী তার উপর স্বজাতি এবং বন্ধুপুত্র জেনে অবিনাশবাবুর পরামর্শে মনতোষ বাবু একটু বেশী পরিমানেই তাকে খাতির করতে থাকেন। ললিতমোহনের নিকৃষ্ট কবিতাগুলিও 'আর্য্যশক্তি'র প্রথম পাতায় প্রকাশিত হতে থাকে এবং অযাচিত ভাবে অবিনাশবাবুরা প্রশংসা-ধন্য হয়। বলাবাহুল্য ললিত মোহন ধীরে ধীরে সম্পাদক মহাশয়ের আনুকূল্যে তাঁর ঘরের ছেলে হয়ে ওঠে, ক্রমে মণিমালার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মণিমালাকে বিয়ে করে সম্পাদকের দায়মুক্তি ঘটায়। গল্পকাহিনী সুখপাঠ্য হলেও বহুচরিত্র এবং ঘটনার ভীড়ে ছোটগল্পের সার্থকতা অর্জনে সক্ষম হয়নি।

গল্পে মাসিক পত্রিকার পুস্তক সমালোচনা সম্পর্কে কটাক্ষ আছে — 'পুস্তক ব্যবসায়ীরা মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকগণকে যথেষ্ট খাতির করিয়া থাকেন, নহিলে তাঁহাদের স্বপ্রকাশিত পুস্তকের সমালোচনায় গোলযোগ ঘটে।' ৭৬

'সতীদাহ' (বৈশাখ, ১৩২৩) গল্পটি সতীদাহ সংক্রান্ত একটি সত্য ঘটনার বিবৃতি মাত্র, লেখকের মৌলিক রচনা নয়। গল্পটি সম্পর্কে 'পত্রপুষ্প' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন —' সতীদাহ শীর্ষক ঘটনাটি শেষ গল্প স্বরূপ মুদ্রিত হইল। ক্যাপ্টেন গ্রিণ্ডলে নামক এক ব্যক্তি বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম করিতেন। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার নাম-'Scenery, costumes and Architecture chiefly on the Western side of India;'

এই আখ্যায়িকা সেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি হইতে অনূদিত।'

(৮)

প্রভাতকুমারের সপ্তম গল্পগ্রন্থ 'গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প', প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল শ্রাবণ, ১৩২৮ সালে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকা মতে এর প্রকাশকাল ১৬ই আগস্ট, ১৯২১ সাল। এখানে সাতটি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। প্রথম গল্প 'গহনার বাক্স'এর নামানুসারে গল্পগ্রন্থের নামকরণ করেছেন। গল্পগুলি ১৩২৪ থেকে ১৩২৬ সালের মধ্যে 'ভারতবর্ষ' এবং 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ গল্প 'মাস্টার মহাশয়'।

'গহনার বাক্স' (ফাল্গুন, ১৩২৪) গল্পে কন্যাদায়গ্রস্থ অর্থাভাবে চিন্তাক্লিষ্ট পিতা হঠাৎ গহনার বাক্স প্রাপ্তির মাধ্যমে কিভাবে দায়মুক্ত হয়েছিলেন তারই মধুরান্তিক কাহিনী। জজকোর্টের দরিদ্র উকীল সতীশ চন্দ্র বসু মহাশয় তার অপূর্ব সুন্দরী কন্যা মনোরমার বিবাহ এক সবজজের পুত্রের সঙ্গে স্থির করার পর অর্থসংগ্রহে বিফলমনোরথ হয়ে যখন বাড়ী ফিরছেন তখন তাঁর ভৃত্য তাঁরই আসা ঠিকাগাড়ীতে একটি গহনার বাক্স আবিষ্কার করে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গহনার বাক্সটি প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার মনস্থ করলে দেখা গেল পাত্রের মাতা সবজজপত্নী উক্ত বাক্সের মালিক। তারই দাক্ষিণ্যে — অবশেষে সতীশবাবু কন্যাদায়মুক্ত হয়েছেন। প্রভাতকুমারের গল্পে দৈবানুকূল্য অথবা অযাচিত দাক্ষিণ্য জীবনের জটিলতা এবং সমস্যার প্রায়শই অবসান ঘটিয়েছে। এখানেও সবজজপত্নীর উদারতা, সমস্যার সমাধান করেছে। এইচরিত্রটির সারল্যে এবং উদারতায় আমরা যেমন মুগ্ধ হই তেমনি আলাপের ভঙ্গিমায় কৌতুক অনুভব না করে পারি না। বয়সের প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি — 'আমার বোধ হয় বত্রিশ কি তেত্রিশ। আচ্ছা এর বেশী বলে মনে হয় কি? আমার প্রথম ছেলে অবিনাশ যখন কোলে হল, তখন আমার বয়স চৌদ্দ পেরিয়ে, সবে পনেরোয় পা দিয়েছি। সে ছেলে আমার আজ মেঠের চব্বিশ বছরে, এই কার্ত্তিকে তার জন্মমাস গেছে।' বলাবাহুল্য বয়সের কারচুপিতে নয় তার অজ্ঞতাজনিত সরল উক্তিতে হাস্য রসের সৃষ্টি হয়েছে।

'আম্র - তত্ত্ব' (কার্ত্তিক, ১৩২৪) গল্পে রেলওয়ে কর্মচারীর হীন মনোভাবের পরিচয় থাকলেও লেখকের রচনাগুণে কৌতুকরসাশ্রিত গল্পে পরিণত হয়েছে। রেলওয়ে ট্রেনের গার্ড ডিসুজা ক্ষুধাতুর অবস্থায় পার্শেলে বুক করা ব্রেকভ্যানে রক্ষিত আমের ঝুড়ি থেকে ইচ্ছামত আম বের করে খেতে থাকেন এবং বিভিন্ন স্টেশনে তার পরিচিত কর্মচারীদের আম বিতরণ করতে করতে এক সময় দেখেন ঝুড়ি প্রায় শূন্য হয়েছে। অতএব

শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন লাইনের কতকগুলি পাথর সুকৌশলে ঝুড়ির মধ্যে রেখে ঘটনার পরিণতি চরম কৌতুককর হয়ে উঠেছে যখন বাড়ী এসে মায়ের কাছে গার্ড সাহেব জানতে পারলেন — ঐ আমের ঝুড়িটি তারই ভাবী শ্বশুর তাকেই উপহার পাঠিয়েছেন। গার্ডের এই শিথিলতা অবশ্যই নিন্দনীয় কিন্তু কাহিনী-শেষে যখন দেখা গেল গার্ড সাহেব নিজের চাতুরীতে নিজেই ধরা পড়েছেন তখন তার কার্যকলাপের প্রতি ~~প্রতি~~ ঘৃণার ভাব মুছে গিয়ে স্বভাবতই কৌতুক-বোধ করি। গার্ডের চরিত্রের অতি বাস্তব রূপায়ণ রেলওয়ে পরিবেশের সঙ্গে লেখকের জীবনের গভীর যোগাযোগের কথা ~~xxx~~ স্মরণ করিয়ে দেয়।

'ভাগর মেয়ে' (আষাঢ়, ১৩২৫) গল্পে ~~xxxxx~~ চল্লিশোত্তীর্ণ অবিবাহিত এক ভদ্রলোক একটি বয়স্কা মেয়েকে বিবাহের বাসনা প্রকাশ করলে এক চতুর ~~xxx~~ যুবক তার ব্যর্থ প্রেমের আক্রোশ মেটাতে অতি সঙ্গোপনে ভদ্রলোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে একটি মেয়ে ভদ্রলোককে অত্যন্ত ভালবাসে এবং তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য মেয়েটি তারই পূর্ব প্রণয়ী। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে মেয়েটিকে তিনি ভালবেসে ফেলেন এবং সুযোগমত মেয়েটির কাছে তার মনোবাসনা প্রকাশ করলে আশ্চর্যভাবে জানতে পারেন মেয়েটি অন্য একটি যুবককে ভালবাসে এবং তারই অপেক্ষায় সে রয়েছে। ভদ্রলোক প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বিবাহ বাসনা পরিত্যাগ করেন। অবশ্য প্রেমে ব্যর্থ হলেও তার মনে উদারতার অভাব হয়নি — মেয়েটির বিয়েতে 'ব্যথাতুর' ছদ্মনামে স্বরচিত একখানি ফার্সী কবিতা পুস্তক উপহার পাঠিয়েছেন। গল্পে ব্যর্থ প্রেমের কারুণ্য থাকলেও মেয়েটি সম্পর্কে ভদ্রলোকের কৌতুহল বেশ কৌতুকপূর্ণ। এখানে বাস্তববাদী আধুনিক কবিদের প্রতি মৃদু কটাক্ষ রয়েছে। আধুনিক কবি কাননবালা বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য 'পল্লীগ্রামের' মাঠে গিয়া চাষাদের লাঙলচষা, পুকুরধারে দাঁড়াইয়া জেলেদের মাছধরা, ছুতার-বাড়ী গিয়া ছুতার মেয়েদের চিঁড়ে কোটা — এই সব দেখিয়া বেড়ায়' ৭৭ এবং একখানি ছোটখাতা বের করে নোট করে — 'ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোমরে এক প্রকার রঙিন সুতা বাঁধা থাকে তাহাকে ঘুন্সী বলে। মেয়েরা চেরা বাঁশে নির্ম্মিত এক প্রকার লম্বাগোল (cylindrical) পাত্রে পুকুর ঘাট হইতে চাউল ধুইয়া আনে, ঐ পাত্রের নাম ধুচুনী।' ৭৮

গোঁসাইগঞ্জের সুচতুর স্বল্পশিক্ষিত ব্রজ মাষ্টার কিভাবে সুকৌশলে নন্দীপুরের ইংরেজীজানা হারাণ মাষ্টারকে পাণ্ডিত্যপরীক্ষায় হারিয়ে দিয়ে 'অপ্রতিহত প্রভাবে মাষ্টারী এবং গ্রামস্থ সকলের অপত্য নির্বিশেষে ক্ষীর ননী ছানা' ৭৯ খেয়ে বহাল তবিয়তে গ্রামে বসবাস করতে লাগলেন তারই এক

কৌতুককর কাহিনী 'মাস্টার মহাশয়' (আশ্বিন, ১৩২৬) গল্পটি। প্রকৃত প্রস্তাবে হারাণ মাস্টার কিছু ইংরাজী জানতো, ব্রজমাস্টারের ইংরাজী বিদ্যা 'সেকেন বুক' পর্য্যন্ত কিন্তু তিনি ছিলেন বাক্‌পটু এবং ইংরাজী বিদ্যায় অনভিজ্ঞ গ্রামবাসীর কাছে অনবরত ভুল ইংরাজী বলে সকলের মনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে রেখেছিলেন। পাণ্ডিত্য পরীক্ষার দিন হারাণ মাস্টার যখন তাকে 'Horns of a Dilemma' এর মানে জিজ্ঞাসা করলেন সৌভাগ্যক্রমে শব্দটির মানে জানা থাকায় তিনি বলে দিলেন। এর পর কূটকৌশলী ব্রজ মাস্টার সরবে তার প্রশ্নের জবাব দিতে বলে হারাণ মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন 'I do not know' এর বাংলা। সমবেত জনতার সামনে উচ্চস্বরে হারাণ মাস্টার তার বাংলা বললেন 'আমি জানি না'। আর যায় কোথায়, ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ গ্রামবাসী ধরে নিল হারাণ মাস্টার ব্রজমাস্টারের প্রশ্নের জবাব জানে না। অতএব ব্রজমাস্টারের জয় ঘোষিত হল, খুব স্বাভাবিকভাবে অথচ অপ্রত্যাশিত ঘটনা সমাবেশের দ্বারা কৌতুকরসের বন্যা গল্পে প্রবাহিত হয়েছে।

গৃহাশ্রমের প্রতি প্রভাতকুমারের অনুরাগ ইতিপূর্বে লক্ষ করা গেছে। 'নয়নমণি' (কার্তিক, ১৩২৬) গল্পেও দেখি বাবা বিশ্বনাথের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ বিনোদ তার বিবাহিত স্ত্রী নয়নমণিকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। এমনকি ধরা পড়েও সে ব্রতভঙ্গের ভয়ে স্বীকার করতে চায়নি সেই সত্যকারের নয়নমণির স্বামী বিনোদ। তার শ্যালিকাদের অনুরোধে উপরোধে নিজ পরিচয় গোপন করলেও নয়নমণির সাশ্রুনয়ন তাকে শেষ পর্যন্ত বিচলিত করেছে। নয়নমণিকে লিখেছে —

'... সারাদিন কেবল তোমার সেই অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদুইটি স্মরণ হয়, — যে কাজে নিজেকে নিয়োগ করিয়াছিলাম, সে কাজে আর মন লাগেনা। তোমার সেই মুখখানি, সেই কথাগুলি কেবলই মনে পড়ে — আর বুকের মধ্যে কেমন হু হু করিতে থাকে। কাযের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তোমায় ভুলিতে চেষ্টা করি, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কেবলই মনে হয়, দীন দুঃখী ও আর্তের সেবা শুশ্রূষার জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি ধর্মসাক্ষী করিয়া যাহাকে চিরজীবন রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার উপর কি করিলাম? নিজ ধর্মপত্নীকে চিরদুঃখে ডুবাইয়া আমি এ কি ধর্ম পালন করিতে বসিয়াছি।

একমাসকাল নিজের মনে অনেক বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমি যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা ধর্ম নয়, ঘোর অধর্ম।' ৮০

অতএব পরবর্তীতে বিনোদের অধর্মের পথ পরিত্যাগ করে সংসার ধর্মে ফিরে আসতে কোন দ্বিধা আসেনি।

'বাজীকর' (পৌষ, ১৩২৪) গল্পে প্রভাতকুমারের শিল্পী মানসের

কৌতুক ও বেদনাপ্রিয়তা একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় । বাজীকরের চরিত্রচিত্রণে যেমন তার মুখের হাসিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি হাসির অন্তরালে বুকের নিগূঢ় ব্যথাটিও গল্পে উদ্ঘাটিত হয়েছে। গল্পটি তাঁর অন্যতম সার্থক সৃষ্টি ।

লোলচর্ম বৃদ্ধ বাজীকর এযাবৎকাল আর্থিক অনটনের মধ্যেও সংসার ব্যয় নির্বাহ করে এসেছেন কিন্তু থিয়েটার সার্কাসের কল্যাণে এখন আর কেউ তেমন তার ম্যাজিক দেখেনা । ওদিকে অর্থাভাবে অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসা এবং পথ্য দুই বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বাজীকর কল্পনার চোখে তাঁর আদরিনী কন্যার মুখখানি ভাবেন আর তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে আসে। অর্থের একান্ত প্রয়োজনে দর্শককে আকৃষ্ট করার জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়ে জীবন্ত মানুষ ভক্ষণের অভিনব খেলার কথা হ্যান্ডবিলে ছাপিয়ে সহরময় প্রচার করে দিলেন। প্রচুর জনসমাগম হলো - টিকিট বিক্রী হয়েছে বিস্তর বাজীকর স্টেজে দাঁড়িয়ে খেলার অছিলায় সত্য সত্যই কিন্তু একটি ছেলের কাঁধে কামড় বসিয়ে দিলেন। যন্ত্রনাকাতর ছেলেটি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল । উত্তেজিত জনতা বাজীকরের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য উপস্থিত পুলিশের বড় সাহেবের কল্যাণে এ যাত্রা তিনি রক্ষা পেয়ে গেলেন। বাজীকরের চাতুর্যে আমরা কৌতুক অনুভব করলেও জীবনের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করলে আমাদের হৃদয় ব্যথিত না হয়ে পারে না ।

কবি কালিদাসের বিবাহ সম্পর্কিত পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত একটি কিংবদন্তী অনুসরণে 'কালিদাসের বিবাহ' (আশ্বিন, ১৩২৫) গল্পটি রচিত হয়েছে। লেখক সংক্ষিপ্তাকারে বাংলা দেশে কালিদাসের বিবাহ সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীটি উল্লেখ করে পশ্চিমাঞ্চলের কাহিনীটি বলেছেন । গল্পটি বেশ উপভোগ্য ।

প্রভাতকুমারের অষ্টম গল্পগ্রন্থ 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প'। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল পৌষ, ১৩৩০ সাল। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকা অনুযায়ী ২২শে জানুয়ারী, ১৯২৪ সাল। সর্বমোট নয়টি গল্প এখানে সঙ্কলিত হয়েছে। গল্পগুলি 'বঙ্গবাসী', 'মাসিক বসুমতী' এবং 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় ১৩২৮ থেকে ১৩৩০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থে 'হীরালাল'এর মত নিষ্ঠুর গল্পের সঙ্গে 'প্রেম ও প্রহার'এর মত কৌতুক রসাশ্রিত গল্পও গ্রথিত হয়েছে। প্রথম গল্প 'হতাশ প্রেমিক'এর নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে।

'হতাশ প্রেমিক' গল্পটি

(পৌষ, ১৩২৮) ডায়েরির আকারে লিখিত। কিশোর প্রেমের অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ মন নিয়ে আই - এ পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্র নির্ম্মলচন্দ্র যৌবনে উপনীত তার বাল্যকালের খেলার সাথী শৈলকে দেখে তার প্রতি প্রণয়ানুভব করেছে। হৃদয়ের আবেগে তার স্কুলের ঠিকানায় চিঠি লিখে বাবার কাছে কানমলা এবং মায়ের কাছে গালি খেয়েও দমে যায়নি। ইতিমধ্যে জনৈক প্রবোধ গুপ্তের সঙ্গে শৈলর বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু উপন্যাস পাঠে নির্ম্মলচন্দ্রের মন নিশ্চিত ভাবে জেনেছে' লোকে যাহাকে পাওয়া বলে তাহাই প্রকৃত পক্ষে হারানো — এবং যাহাকে না পাওয়া বলে, তাহাই যথার্থ পাওয়া।'[৮১] কারণ তার সঙ্গে শৈলর বিয়ে হলে সে কালক্রমে তার পুত্র - কন্যার জননী হয়ে শেষ পর্য্যন্ত 'প্রৌঢ়ত্বে' উপনীত হতো কিন্তু তাদের মিলন না হওয়ায় ফলেই শৈল চিরকাল তার 'হৃদয় মন্দিরে স্থির যৌবনা চির বধূ - প্রেম প্রতিমার ন্যায় বিরাজ,[৮২] করবে। শৈলর ধ্যানে মগ্ন নির্ম্মলের মন তাকে স্বপ্নে দেখেছে বাস্তবে দুচোখ ভরে দেখার জন্য তাই শ্যামবাজারে শৈলর শ্বশুরবাড়ীর আশেপাশে ঘোরাঘুরি শুরু করে এমনকি মধুপুরে হাওয়া পরিবর্তন করতে শৈল তার স্বামীর সঙ্গে এলে সেখানেও সে হাজির হয়েছে। দর্শনও মিলেছে। প্রেমকাতর নির্ম্মল নিজেকে সংযত করতে না পেরে কৌশলে তার মনোভাব পত্র মারফৎ শৈলকে জানিয়েছে। শৈলরা কলকাতায় ফিরে এলে আবার সে কলেজ পালিয়ে শৈলর শ্বশুরবাড়ীর আশে পাশে ঘুরেছে, শৈলর বাড়ীর দাসীর সঙ্গে আলাপ করে শৈলর মনের প্রকৃত অবস্থা জানতে চেষ্টা করেছে। কারণ নির্ম্মলের নিশ্চিত ধারণা। শৈল তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে ঠিকই কিন্তু লোকলজ্জার জন্য কিছু বলতে পারছেনা। বলাবাহুল্য এধারণাও তার উপন্যাস পাঠের ফলশ্রুতি। কারণ কয়েকটি আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের লেখকগণ স্পষ্টই দেখিয়েছেন —' মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিলেই যথার্থ বিবাহ হয় না পরস্পরের প্রতি প্রেম থাকলেই তাহাই আসল বিবাহ। যে নরনারী প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ নহে, কেবল-

মাত্র লৌকিক বিবাহের বন্ধনই যাহাদের মধ্যে একমাত্র বন্ধন, তাহাদের পরস্পর সাহচর্য্যকে একটা অতি কদর্য্য আখ্যা দিয়াছেন। প্রেমের মিলনকেই তাঁহারা যথার্থ পবিত্র মিলন বলিয়া মনে করেন।'[৮৩] আধুনিক ঔপন্যাসিকের প্রেম সম্পর্কে এই মতবাদ ভালভাবে শৈলকে বুঝিয়ে দেবার জন্য ঝি মারফৎ কয়েকটি ভাল আধুনিক উপন্যাস শৈলকে পাঠিয়ে দিয়েছে, যেখানে লেখক অকাট্য যুক্তিতে দেখিয়েছেন —'প্রেমহীন বিবাহের স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ও সতীত্ব রক্ষার প্রবৃত্তি, নারীচিত্তের একটা সেকেলে অন্ধ কুসংস্কার মাত্র।'[৮৪] ফলশ্রুতি হয়েছে ভয়াবহ — শৈলর স্বামী শৈলর ছদ্মবেশে এসে মোটরে করে তাকে এক নির্জন বাগানে নিয়ে গেছে এবং পরস্ত্রীর প্রতি কলুষ-দৃষ্টি জনিত অপরাধে তার নাক কান কেটে চাবুক মেরে সমুচিত শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করেছে। অবশ্য শৈলর অনুরোধে নির্ম্মলের নাককানকাটা যায়নি এবং চাবুক মারতে উদ্যত হলে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে সে আত্মরক্ষা করেছে।

গল্পে কৌতুকরস সৃষ্টি হলেও আধুনিক ঔপন্যাসিকদের প্রতি লেখকের স্পষ্ট কটাক্ষ তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিকে এখানে কিছুটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

রূপমুগ্ধ যুবকের প্রেমের কাহিনী 'অলকা' (আশ্বিন, ১৩২১) গল্পটি। কলেজে পড়া ছাত্র বিনোদ তারই ছাত্রী অলকাকে দিনের পর দিন কাছে বসে পড়াতে গিয়ে প্রথমে অনুভব করেছে —'তাহার ছাত্রীর স্বভাব বড় মধুর। তারপর মনে হইল, তাহার দেহের গঠন — বিশেষতঃ চক্ষু দুইটি বড়ই-সুন্দর, মেয়েটি যেরূপ রূপবতী, বাঙ্গালীর ঘরে সেইরূপ সচরাচর দেখা যায় না। তার পর মনে হইতে লাগিল, তাহার কন্ঠস্বরটি বড় মিষ্ট, শুনিলে আবার শুনিতে ইচ্ছা করে। .... তাহার পর বিনোদ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া বসিল, অলকাকে সে অতিশয় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে।'[৮৫] ক্রমে বিনোদের মনে হয়েছে অলকাকে না পেলে তার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এমন মানসিক অবস্থায় অলকার অভিভাবকের কাছ থেকে অভাবনীয় ভাবে অলকাকে বিয়ে করার প্রস্তাব এলে ~~এসেছে তখন~~ সে 'সানন্দে সম্মতি' দিয়েছে। কিন্তু বন্ধু মুখে যখনই শুনেছে অলকার মা তার পিতার বিবাহিতা স্ত্রী নয় তখন ধর্ম্মভ্রষ্টার কন্যাকে বিয়ে করে সমাজচ্যুত হতে তার মন সায় দেয় নাই। আবার ~~কিন্তু~~ যখন জানতে পেরেছে বিশ বৎসর আগে পাঞ্জাবে আর্য্যসমাজের মতে উভয়ের বিয়ে হয়েছিল তখন সংশয়মুক্ত হয়ে নিজেই অলকার পানিপ্রার্থী হয়ে তাকে লাভ করেছে। ইতিপূর্বে লেখকের সচ্চরিত্র গল্পেও নায়কের মনে এই ধরণের সুনাম এবং সমাজভীতি আমরা লক্ষ্য করেছি। এখানে অতি অল্প আয়াসে বিনোদের মনের প্রেম বিকাশের পর্য্যায়গুলি সুপরিস্ফুট হওয়ায় চরিত্রাঙ্কণে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

১৫০

চঞ্চলাপ্রকৃতির ছোটবউ কুসুমকুমারী বাড়ীর সবার অলক্ষ্যে মই বেয়ে ছাদে উঠে আম পেড়ে খেতে গিয়ে নিজে কিভাবে বিপদে পড়ে বাড়ীর সকলকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল তারই এক কৌতুককর গল্প 'কুসুমকুমারীর গুপ্তকথা' (অগ্র:, ১৩২৯)। কুসুমকুমারী ছাদে ওঠার পর অস্থানে মইটিকে দেখে বাড়ীর বড়কর্তা যথাস্থানে মইটিকে সরিয়ে দেন ফলত: রাত্রে আর সে ছাদ থেকে নামতে পারেনি, লজ্জাবশে বাড়ীর ছোটবউ কাউকে ডাকতেও পারেনি। অন্ধকার হলে এক সময় সে ছাদেই ঘুমিয়ে পড়ে। সারারাত ধরে সম্ভাব্য জায়গায় খোঁজ করেও তাকে না পেয়ে সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত; এমন সময় শেষরাত্রে গোয়াল ঘরের ছাদে শাড়ীর আঁচল উড়তে দেখে ছোটকর্তা তাকে আবিষ্কার করলেন। কুসুমকুমারীর কার্য্যধারা যেমন কৌতুককর, লোমহর্ষক ডিকেটটিভ নভেল পড়া ছোটকর্তার চিন্তাধারা ততোধিক কৌতুকবহ। ছাদের উপর কুসুমের শাড়ীর আঁচল দেখেই তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন — কেউ তাকে হত্যা করে লাস ছাদে রেখে গেছে নতুবা শাড়ী তো আর একা একা ছাদে উঠতে পারে না। তার বক্তব্য —'কাপড় যখন রয়েছে, তখন লাসও নিশ্চয় ছাদের উপর আছে — এ সবই তক্কু কিনা। লাসটা আলসের জন্য দেখা যাচ্ছেনা।'[৮৬] অতএব তাঁর মতে — এখন প্রথম কর্ত্তব্য পুলিশে খবর দেওয়া। লাস যে অবস্থায় আছে ঠিক সেই অবস্থায় পুলিশ এসে দেখুক। এই হচ্ছে নিয়ম — তবে ঠিক সুরতহাল হবে, ডিটেকটিভ এসে ক্রমে খুনের কিনারা করবে। ছাদে এখন আমাদের কারু ওঠা উচিত নয়।'[৮৭] বলাবাহুল্য নিচে দাঁড়িয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে ছোটকর্তা যখন এত জল্পনা - কল্পনা করছেন কুসুমকুমারী তখন ছাদের উপর নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন। সাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়ে কৌতুকরস সৃষ্টির যে অসাধারণ - সামর্থ প্রভাতকুমারে বর্তমান এই গল্পটি তার নিদর্শন।

এক ব্যভিচারিনী বিবাহিতা নারী নিজ দুষ্কর্মের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য বিদেশ-প্রত্যাগত-স্বামী-হত্যার ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে ধরা পড়ে কি ভাবে পতিতালয়ে নির্বাসিত হয়েছিল তারই নিষ্ঠুর কাহিনী 'হীরালাল' (শ্রাবণ, ১৩৩০) গল্পটি। নারী চরিত্রে এতখানি নির্মমতার পরিচয় লেখক অন্য কোথাও দেন নাই। সেই হিসাবে গল্পটিকে প্রভাত সাহিত্যের ব্যতিক্রমও বলা যেতে পারে। ডা: সুকুমার সেন এই গল্পটিকে 'প্রভাতকুমারের একমাত্র নির্মম গল্প'[৮৮] বলে অভিহিত করেছেন। হিন্দুঘরের বিবাহিতা নারীর চারিত্রিক স্খলন এবং স্বামীহত্যাজনিত বীভৎস চিন্তা বোধকরি প্রভাতকুমার সহ্য করতে পারেন নি। তাই দেখি অশিক্ষিত নীচজাতীয় হীরু ডোমের মধ্যে অর্থে নিস্পৃহতা উদার মানসিকতা শুধু নয়, সমাজের নৈতিক শাসক হিসাবেও চিত্রিত করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। হীরু ডোম এই স্খলিত নারীকে বিষের পরিবর্তে ঘুমের ঔষধ দিয়েছে। গভীর রাত্রে তার বাড়ীতে ঢুকে তার উপর হুকুম চালিয়ে ঘর থেকে বের করে কলকাতায় পৌঁছে দিয়েছে সেইখানে, যেখানে তাদের

চরিত্রের নারীর অভাব নাই। কুলটা নারী নীরদার যে জীবন যাপনের ইঙ্গিত লেখক নির্দেশ করেছেন সেই জীবন যে কোন নারীর পক্ষেই চরম অবমাননা কর।

গল্পে হীরু ডোমের কাছে নীরদার বিষ প্রার্থনার ভাব ভাষাতেস্পষ্টতই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'এর হীরা চরিত্রের বিষ চাওয়ার কথা স্মরণ করায়। এখানে নীরদা 'হীরু বিষবৃক্ষ পড়ে নাই, ইহা মনে নিশ্চয় জানিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, 'শেয়ালের বড় উপদ্রব হয়েছে বুঝেছ। রান্নাঘরের বেড়া ফাঁক করে, রোজ রাত্রে শেয়াল ঢুকে, আমার হাঁড়ি খেয়ে যায়। দুটো শেয়াল মরে, এই রকম খানিকটা বিষ তুমি আমায় দিতে পার?'[৮৭]

গয়লা - জাতীয় এক দম্পতির কৌতুককর প্রণয় কাহিনী 'প্রেম ও প্রহার' (কার্তিক, ১৩৩০) গল্পটি। দৈনন্দিন সংসারে অর্থাভাবের জন্য উভয়ের মধ্যে কলহ প্রায়শই হয়, আবার উভয়ের প্রেমও গভীর। একদিন ঝগড়ার সময়ে উত্তেজনাবশে স্বামী ভজহরি স্ত্রী মোক্ষদার মুখ লক্ষ্য করে জ্বলন্ত কলকে ছুড়ে মারলে মোক্ষদা স্বামীকে বেদম প্রহার করে। অপমানিত ভজহরি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় এবং মোক্ষদাকে জব্দ করার ফন্দি আঁটে। মোক্ষদা মাছ খেতে ভালবাসত, তাই তাকে বিধবা করতে পারলে মাছ খাওয়া তার বন্ধ হয়ে জব্দ হবে এই চিন্তা করে ভজহরি আত্মহত্যা করার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়েছে অবশ্য ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে। মোক্ষদা এই সংবাদ শ্রবনে বৈধব্য বেশ ধারণ করে এবং চার বৎসর এইভাবে থেকে কলকাতায় দাসীবৃত্তি করার সময়ে ভজহরিকে দেখে চিনতে পেরে উভয়ে মিলনে আকুল হয়েছে। লজ্জায় আত্মপরিচয় গোপন করে উভয়ে গোপনে মিলিত হতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছে। অবশ্য শেষ কালে সুখ-সমাপ্তি ঘটেছে। গল্পে কৌতুকরস জমে উঠেছে উভয়ের অতি মূর্খজনোচিত কার্যকলাপের মাধ্যমে। ইতরজনের স্বাভাবিক ভাব-ভাষা এবং চরিত্রের বাস্তববর্ণনার জন্য গল্পটি সুখপাঠ্য।

নবযুগের নূতন সাহিত্যের ভাবধারায় ভাবিত এক ঔপন্যাসিক সাহিত্যে বাস্তবতা রক্ষার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় মানসে পতিতালয়ে উপস্থিত হলে কি ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন তারই এক কৌতুককর গল্প 'ঔপন্যাসিক' (কার্তিক, ১৩৩০)। প্রকৃত পক্ষে গল্পটিতে আধুনিক সাহিত্যিকদের চিন্তাধারাকে স্পষ্টতঃ ব্যঙ্গ করতে গিয়ে লেখক কৌতুকরসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদের জীবন হয়েছে জটিলতর। এই জটিলতর জীবনের রূপ রহস্য, নর নারীর আকর্ষণ বিকর্ষণের উৎস-সন্ধানে তৎপর তৎকালীন অনেক ঔপন্যাসিক জীবন বিশ্লেষণের নামে তার নগ্নতা এবং কুশ্রী রূপটিকেই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় করে তোলেন। বাস্তবজীবনচিত্র রূপায়ণের অছিলায় যে অশ্লীলতা উপন্যাসে গল্পে স্থান পেয়েছিল, প্রভাত-

কুমার এই গল্পে তাঁদের প্রতি ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন।

গল্পের সময়কাল নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন — 'তারপর বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের 'আর্ট'এর যুগ আরম্ভ হইল, এবং যাঁহারা আর্ট মূলক উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন, তাঁহাদের পুস্তক (বিশেষ করিয়া বিদ্যালয়গামী বালক ও তরুণ যুবকগণের মধ্যে) হু হু করিয়া বিকাইতে লাগিল। এই উপন্যাসগুলি, নানা কাগজে যতই অশ্লীল বলিয়া গালি খাইতে লাগিল, ততই উহাদের কাটতি বাড়িতে লাগিল।' এখানে লেখকের মতে তথাকথিত 'আর্ট' এবং অশ্লীলতা সমার্থক হয়েছে। গল্পের নায়ক ঔপন্যাসিক নগেন্দ্রকুমার উপন্যাসের স্বরূপ বুঝতে গিয়ে বলেছেন — '৩/৪ মাস পরিশ্রম করিয়া আর্টমূলক একখানি উপন্যাস লিখিলেন। ইহাতে তিনি দেখাইলেন, স্ত্রীলোকের সতীত্ব এমন কোনই মূল্যবান জিনিস নহে, যাহার জন্য প্রাণ পাত করিতে হইবে। পুরুষেরা যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব সতীত্ব বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে, তাহার মূলে ঘোর স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নাই। শাস্ত্র ও সমাজ মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া এতকাল স্ত্রীজাতির প্রতি যে অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, এ নূতন আলোর যুগে আর তাহা চলিবেনা। পুরুষের যেমন যা খুশী করিবার অধিকার আছে স্ত্রীলোকেরও সেইরূপ অধিকার থাকাই ন্যায়সঙ্গত — ইত্যাদি।'[১০] কিন্তু এখানেও আর্টের নগ্নচিত্র পরিস্ফুট না হওয়ায় তার পরবর্তী উপন্যাসে তিনি — 'বেশ নির্ভীক'ভাবেই এবার আর্টের নগ্নচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই উপন্যাসে তিনি দেখাইয়াছেন, আমাদের মূর্খ অন্ধ সমাজ যাহাদিগকে পতিতা বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, তাহারাই যথার্থ স্বর্গের দেবী — তাহাদের হৃদয়গুলি কুসুমের মত কোমল ও পবিত্র — দয়া মায়া, স্নেহ মমতা, পরদুঃখকাতরতা, আত্মমর্য্যাদাবোধ প্রভৃতি সদ্গুণাবলীতে তাহারা ভূষিত, অপর পক্ষে গৃহস্থ মেয়েদের মন অতি নীচ, অতি সঙ্কীর্ণ, তাহারা নিতান্ত স্বার্থপর, ক্রোধী, কটুভাষিনী — এককথায় তাহাদের হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি।'[১১] তাছাড়া উপন্যাসে বাস্তবতার খাতিরে 'বিলাতী ঔপন্যাসিকেরা' যেমন তাদের ব্যক্তিগত জীবনে বর্ণনীয় জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেষ্টা অনেকে করেছেন তেমনি সকলেরই বর্ণনীয় জীবন সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

প্রবৃত্তি দমনে অক্ষম এক নারীর করুণ পরিণতির আত্মকথন 'বিনোদিনীর আত্মকথা' (আশ্বিন, ১৩৩০) গল্পটি। বিনোদিনী কৈশোরে ভালবেসেছিল শচীনকে কিন্তু অর্থাভাবে বিয়ে হ'ল তার দ্বিতীয় পক্ষে এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে। শচীনকে সে ভুলতে পারেনি আবার স্বামীকেও ভালবাসতে পারলনা। এরকম মানসিক যন্ত্রনায় হাতে এল তার নব যুগের নূতন আলোকে' লেখা কিছু উপন্যাস। সেগুলি গলাধঃকরণে ধীরে ধীরে মনে এল পরিবর্তন, তার কথায় 'আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, এতকাল মা দিদিমার কাছে পতিভক্তি সম্বন্ধে যে শিক্ষা

আমি পাইয়া আসিয়াছি, তাহা নিতান্তই ভুল শিক্ষা ।..... যে পতিকে অন্তরের সহিত ভালবাসিনা, তাহাকে ভক্তি করা নিজেকে অপমান করা মাত্র ।..... প্রাণ যাহাকে চায় তাহাকে লাভ করিতে পারিলেই নারীর নারীত্ব সফল হয়, তাহার জীবন যৌবন ধন্য হয়, সকল যুবতীরই এই বিষয়ে যত্নবতী থাকা উচিত।'[১২] ইতিমধ্যে শচীনের কথা জানতে পেরে স্বামী তাকে সন্দেহ করতে থাকে। এমন সময় একদিন গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে বিনোদিনী ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। হঠাৎ শচীনের সাক্ষাৎ পেয়ে সে স্বামী ভুললো, সংসার ভুলে গেল। শচীনকে নিয়ে নূতন ঘর বেঁধেছে, তিনটি বৎসর সুখেই কেটে গেল। একদিন বিনোদিনীকে অকূলে ভাসিয়ে শচীন পরপারে পাড়ি জমালো । পেটের দায়ে ঝিয়ের কাজ করছে কিন্তু সেখানেও এক ভদ্রলোকের প্রলোভনে পড়ে প্রতারিত হয়েছে । অবশেষে পেটের দায়ে জঘন্য জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়ে শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রনায় ক্ষয়রোগ-গ্রস্থ হয়েছে ।

প্রভাতকুমার ছিলেন সনাতন সামাজিক আদর্শ এবং রীতি নীতিতে আস্থাবান। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যে 'আর্ট' অথবা 'নারীত্ব' 'নারীর অধিকার' ইত্যাদি সম্পর্কে মতবাদ মোটেই গ্রহনযোগ্য বলে মনে করেন নি। এই গল্পে তিনি আধুনিক ঔপন্যাসিকদের প্রতি স্পষ্টতঃই কটাক্ষ করেছেন। বিবাহিতা নারীর স্বামীসেবাই একমাত্র কর্তব্য। অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তির পরিণাম যে কত ভয়াবহ বিনোদিনী চরিত্রের করুণ পরিণতিই তার পরিচয় বহন করছে। লেখকের মতবাদ এবং উদ্দেশ্য ধ্বনিত হয়েছে বিনোদিনীর কথায় —' নব যুগের নূতন আলোক' বলিয়া যাহা এখন কথিত হইতেছে, তাহা যে আলোক নহে — তাহা যে আগুন, সেই কথা বুঝাইবার জন্যই, আমার সেই আগুনে পুড়িয়া, মরিবার ইতিহাস আমি লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি, ইহা পাঠ করিয়া, যদি বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের একটি মেয়েও ভুল পথে পা দিতে দিতে, পা উঠাইয়া লইয়া ফিরিয়া আসে, তবে পরলোকে আমার আত্মা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিবে।'[১৩] এই উদ্দেশ্যমূলকতা এবং ব্যঙ্গ গল্পের রসহানি ঘটিয়েছে । 'হীরালাল' গল্পেও বিবাহিতা নারীর বিপথগামীতার ভয়াবহ পরিণতি লেখক দেখিয়েছেন ।

'ঔপন্যাসিক' (কার্ত্তিক, ১৩৩০) এবং 'বিনোদিনীর আত্মকথা' (আশ্বিন, ১৩৩০) গল্প দুটিতে প্রভাতকুমার 'আর্টমূলক উপন্যাস, নারীর সতীত্ব এবং উপন্যাস রচনায় আধুনিক ঔপন্যাসিকদের ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি করেছেন। তাঁর এই ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে আধুনিক ঔপন্যাসিক তথা শরৎচন্দ্রের প্রতি একথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না ।

প্রভাতকুমারের সাহিত্যদর্শের প্রতি শরৎচন্দ্রের বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ ছিলনা। একথার প্রমান পাওয়া যাবে ইতঃপূর্বে প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত শরৎচন্দ্রের কিছু চিঠিপত্র থেকে। শরৎচন্দ্র লিখেছেন —

' কৈ প্রভাত বাবুর লেখা দেখিলাম না ত ? ও ভদ্রলোক প্রায় শতাবধি গল্প লিখিয়াছেন । আর যে কি চর্বিত চর্বণ করিবেন আমি ত ভাবিয়াই পাই না । [১৪]

অন্যত্র প্রমথনাথকে জানিয়েছেন —' প্রভাতবাবুকে দাদন দিয়ে রেখেছ , গল্প কই হে ? তার পরে তোমরা টাকা দিবার অধিকারে গল্পের জন্য যখন তাগাদা শুরু করবে, তখন তেমনি গল্পই বোধ করি তিনি দেবেন।' [১৫]

১৩২০ - ১৩২১ সালে 'যমুনা' পত্রিকায় 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি প্রকাশকালে শরৎচন্দ্রকে অনেক বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমালোচনায় ক্ষুব্ধ শরৎচন্দ্র প্রমথনাথকে লিখেছেন —' আমি জিজ্ঞাসা করি কি আছে ওতে ? একজন ভদ্রঘরের মেয়ে যে কোন কারণেই হৌক, বাসার ঝি-বৃত্তি করিতেছে — (character unquestionable নয়) আর একজন ভদ্র যুবা তারই প্রেমে পড়িতেছে — অথচ শেষ পর্য্যন্ত এমন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছেনা । অথচ রবিবাবুর চোখের বালি' ভদ্রঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যেই এমন কি আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে — কেহ কথাটি বলে নাই। (কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিনীকে মনে পড়ে ?) 'মানসী'তে প্রভাতবাবু এক ভদ্র যুবার মুখে আর এক ভদ্র বিধবার সতীত্ব হরণের মতলব আঁটিতেছেন ! সোণার হরিণ কত কি কীর্ত্তিই সুরু করিয়া দিয়াছে । (অবশ্য এটা বটতলার উপযুক্ত। Detective story ছাড়া তিনি কিছুই প্রায় লিখিতে পারেন না। 'ডাকাতে ঠানদি' গোছের বই। যেমন নবীন সন্ন্যাসীর 'গদাই পাল' আর সেই মাগীটা তেমনি এও) কোন দোষ নাই কেন না নাম 'রত্নদীপ' ! (এবং লেখক প্রভাত বাবু) আর আমার চরিত্রহীন যত অপরাধে অপরাধী ?' [১৬]

উদ্ধৃতাংশগুলিতে প্রভাতকুমারের রচনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বিরূপ মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । বস্তুত: নারীর সতীত্ব সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ধারণা (রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে) তাঁর পূর্বসূরী লেখকদের গতানুগতিক পথ ধরে আসেনি। সতীত্ব সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য 'সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবেনা । একনিষ্ঠ প্রেম এবং সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয় একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি না স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়। ' [১৭] অন্যত্র-সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলি নে, কিন্তু একেই তার নারী জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়:

জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি।[৯৮]

অন্যপক্ষে নারীর সতীত্ব সম্পর্কে প্রভাতকুমারের ধারণা ছিল প্রথাগত হিন্দু ধর্মাদর্শ ভিত্তিক। 'রত্নদীপ'র বৌরাণীর চরিত্রচিত্রণে তার প্রমান আছে। উভয় লেখকই সমাজের বিধিনিষেধকে অতিক্রম করতে না পারলেও প্রভাতকুমার আমাদের প্রথাগত সামাজিক বোধকে কোথাও আঘাত করার চেষ্টা করেননি। কিন্তু শরৎচন্দ্র সামাজিক ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েও অনুভব করেছেন —

'সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত নরনারীর বহু মিথ্যা, কু - সংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে।.... পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তাঁর ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিস্কৃতির পথ নেই, শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য।'[৯৯]

নারীর প্রতি অসীম সহানুভূতির ফলেই সামাজিক বিধিনিষেধের কুৎসিত ক্ষতগুলিকে তিনি উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর দরদী মনের ফসল রমা, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী। পতিতা-নারী-চরিত্রগুলিকেও তিনি মানবিক মহত্ত্বদানে কুণ্ঠিত হন নাই কিন্তু সেই জন্য 'যা অসুন্দর যা immoral যা অকল্যাণ' তাকে art বলে স্বীকার করেন নাই।

'অদৃষ্ট পরীক্ষা' (বৈশাখ - আষাঢ়, ১৩২৯) গল্পে এক নব্য উকীল হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রেনের কামরায় হঠাৎ একলক্ষ টাকা কুড়িয়ে পেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যখন কোন মালিকের হদিস পেলেন না তখন টাকাগুলি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে তার সুদ থেকে ধীরে ধীরে সাংসারিক অবস্থার উন্নতি ঘটান। অতঃপর ত্রিশ বৎসর কেটে গেছে। তারই বাল্যবন্ধু মৃত্যু শয্যায় শায়িত জমিদার ইন্দ্রভূষণের স্বীকারোক্তি থেকে জানতে পারলেন সেই এক লক্ষ টাকার প্রকৃত মালিক হেমন্ত কুমার নিজেই। কারণ অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য দুইখানি লটারীর টিকিট দুই বন্ধুর নামে ইন্দ্রভূষণ কিনেছিলেন। হেমন্তকুমারের টিকিটটি একলক্ষ টাকা প্রাইজ পেয়েছিল কিন্তু লোভের বশে ইন্দ্রভূষণ টাকা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে যখন ব্যাঙ্কে জমা দিতে আসেন তখন গাড়ীতে সেই টাকা হারিয়ে যায়। এই খবর জানার পর প্রকৃত বন্ধুজনোচিত ঔদার্যে হেমন্তকুমার দুরবস্থায় পতিত ইন্দ্রভূষণের পুত্র সুরেন্দ্রভূষণকে একখানি গ্রামের দানপত্র লিখে দেন। অবশ্য গ্রামটি ঐ কুড়িয়ে পাওয়া টাকা থেকেই কিনেছিলেন। কাহিনী রূপায়ণে প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনার বিবরণ থাকলেও গল্পটি বেশ সুখপাঠ্য।

তথাকথিত জ্যোতিষীগণের প্রতি মৃদু [struck-out text] কটাক্ষপূর্ণ কৌতুককর কাহিনী 'জ্যোতিষী মহাশয়' (আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৩০)। জ্যোতিষীগণের শাস্ত্রজ্ঞান থেকে সাংসারিক জ্ঞান যে অনেকবেশী এবং অর্থের প্রতি লোভ বশত: মিথ্যার আশ্রয় নিতে যে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ এঁদের মধ্যে নেই, সেই পরিচয় এখানে গল্পের জ্যোতিষী চরিত্রে আছে। বাংলা উপন্যাস পাঠে কল্পনাপ্রবণ মনের অধিকারী জ্যোতিষী মহাশয়ের স্ত্রীর চরিত্রটি বেশ কৌতুককর। পাড়ার বখাটে ছেলে উঠতি মস্তান কেবলরামের চরিত্রটিও বেশ বাস্তব এবং জীবন্ত।

(১০)

প্রভাতকুমারের নবম গল্পগ্রন্থ 'বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প'। প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ সাল। 'মানসী মর্ম্মবানী,' 'সচিত্রশিশির', 'বার্ষিক বসুমতী' এবং 'শরতের ফুল' পত্রিকাগুলিতে ১৩৩০ থেকে ১৩৩২ সালের মধ্যে প্রকাশিত নয়টি গল্প এখানে সঙ্কলিত হয়েছে। এখানকার 'ভোজরাজের গল্প' টি আশ্বিন, ১৩৩১ সালের সচিত্র শিশির পত্রিকায় 'স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে স্বর্গবৈদ্যের উপদেশ' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থের প্রথম গল্প 'বিলাসিনী'র নামানুসারে গল্পগ্রন্থের নামকরণ হয়েছে।

সহানুভূতির অভাবে সামান্য ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চিরবিচ্ছেদ নেমে আসার মুহূর্তে প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়ে পুনরায় তাদের মিলনকে কিভাবে সম্ভব করে তুলেছিল তারই কৌতুককর কাহিনী 'বিলাসিনী' (১৩৩২)। কোন এক অসৎ চরিত্র যুবকের কাছ থেকে বেনামী চিঠি পেয়ে ব্রজমাধববাবু তার ধনীর দুলালী বিলাসিনী স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হয়ে স্ত্রীর সহানুভূতির অভাবে সন্দেহভঞ্জনের কোন চেষ্টা না করেই স্ত্রী উষাকে ত্যাগ করে চাকুরী নিয়ে বিলাতে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল ব্রজবাবুর সন্দেহ অমূলক কারণ স্ত্রীর পরিধানে যে শাড়ী, গলায় নেকলেস এবং টেবিলের উপর রাখা সুগন্ধির শিশি স্ত্রীর প্রেমিক প্রদত্ত বলে মনে করেছিলেন সেগুলি প্রকৃত পক্ষে সে স্বামীর অজান্তে বাপের বাড়ী থেকেই এনেছিল।

স্ত্রীর চরিত্রে অত্যধিক বিলাসিতা এবং আধুনিক প্রথায় চলাচল বোধকরি লেখক অনুমোদন করতে পারেন নি। তথাকথিত নারী স্বাধীনতা যে দাম্পত্য জীবনে অশান্তির কারণ, এ বিশ্বাস তিনি পোষণ করেছেন। গল্পে ব্রজমাধববাবু স্ত্রীকে বলেছেন — 'আমি ত বিলাতফেরৎ নই যে তোমাকে মেম সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে বেড়াব।' [১০০] অন্যত্র স্ত্রীর প্রতি তার [struck-out text] বক্তব্য 'এটা ত হচ্ছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগ কিনা! এ যুগে ত স্বামী স্ত্রী আর

পরস্পরের অধীন নয়।' ১০১ ব্রজমাধববাবুর স্ত্রীর প্রতি এই ব্যঙ্গোক্তির মধ্যেই প্রভাতমানসের প্রতিফলন আছে ।

'চিরায়ুস্মতী(আশ্বিন, ১৩৩২) গল্পটি পৌরাণিক যুগের সাবিত্রীর সতীত্বকে স্মরণ করায়। অভিভাবক কর্তৃক বিবাহ স্থির হওয়ার পর দুইটি কিশোর কিশোরীর মনে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়। ইতিমধ্যে পাত্র ক্ষয়রোগাক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হলে পাত্রীর বিবাহ অন্যত্র স্থির হয়। কিন্তু পাত্রী তার মরণাপন্ন প্রেমাস্পদ ভিন্ন অন্যত্র বিবাহে অনিচ্ছুক এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায় সেই মৃত্যুপথযাত্রী পাত্রের সঙ্গেই তার বিবাহ হয় । এবং আশ্চর্য্যজনকভাবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাশাস্ত্রকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে পাত্র ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করে। গল্পটি সতীত্বের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছে তবে অবিশ্বাস্য পরিণতি এবং বহুঘটনার বিবৃতিতে সার্থক রসপরিণতি লাভ করেনি ।

'প্রজাপতির পরিহাস' (আশ্বিন, ১৩৩২) কৌতুকরসাশ্রিত গল্প। 'বিবাহপণ — নিবারণী' সভার সম্পাদক কলেজে পড়া যুবক সুরেন ঋণগ্রস্থ পিতার আর্থিক দুরবস্থার কথা জেনেও, এবং মাতাপিতার অনুরোধ সত্ত্বেও তার পণ নিয়ে বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞায় অটল স্থির। কিন্তু দেখা গেল তারই পিতৃবন্ধুর মেয়ের প্রেমে পড়ার পর তার অর্থশালী পিতা পণ না দিয়ে মেয়েকে সুরেনের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না ঘোষণা করায় তার প্রতিজ্ঞায় জলাঞ্জলি দিয়ে মাকে লিখেছে —' টাকা না পাইলে বাবা জেলে যান। সেটা ঘটিতে দেওয়া আমার পক্ষে ঘোর অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হয়, তাহাতেও সন্দেহ পূর্বেও ছিল না, এখনও নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি স্থির করিয়াছি , আমার পরম গুরু পিতৃদেবের মঙ্গলার্থে আমার আদর্শ, আমার প্রতিজ্ঞা , আমার কর্তব্যজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই বলি দিয়া , তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইব।' ১০২ যুবকের আদর্শের এই ধূলিশয্যা গ্রহণ কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছে ।

'সতী' (বৈশাখ, ১৩৩২) গল্পে , বার্থা ম্যাকজন নামে জনৈকা ইংরেজ-তরুণী তার প্রেমাস্পদ বঙ্গীয় যুবকের বসন্তরোগ শয্যায় আত্মীয় স্বজনের কথা অমান্য করে নিজেই অক্লান্ত সেবা করেও প্রেমাস্পদকে বাঁচাতে পারেনি। প্রেমাস্পদের মৃত্যুর পূর্বেই তার শরীরেও ঐ রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল এবং সপ্তম দিনে বার্থার আত্মা তার প্রিয়তমের আত্মার অনুসরণে অনন্তের পথে ছুটিল।'১০৩ বার্থার প্রেম আন্তরিকতা এবং একনিষ্ঠতায় সমুজ্জ্বল। চরিত্রসৃষ্টির পটুতায় গল্পটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে ।

এদেশে এসে আহ্বান জানায় জমিদারের বাগান বাড়ী অথবা রক্ষিতার মেয়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্গীত সাধনার প্রকৃত মূল্য আমাদের দেশে প্রভাতকুমারের আমলেই যে দিতে শেখেনি ব্যঙ্গচ্ছলে লেখক সে কথাই এখানে ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত:স্মরণ করা যায় প্রভাতকুমার ছিলেন সঙ্গীতকলারসিক এবং এক সময় নিজেও তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন । ১৭ ই শ্রাবণ, ১৩০২ সালে রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন —' একবৎসর পূর্বে কলিকাতায় উল্লিখিত বন্ধুর কাছে আপনার শুধু যাওয়া আসা' গানটা একটা মনগড়া সুরে গাহিয়াছিলাম। সেদিন বন্ধু লিখিয়াছেন —' তোমার শুধু যাওয়া আসা' গানটা , পাশের বাড়ীতে কে হারমোনিয়মে বাজাইতেছে ।' তবে ত আমি সুর ঠিকধরিয়াছি। সম্প্রতি জানিলাম, আমিও একজন কালোয়াৎ' (দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫ পৃ: ১৫১)।

অম্বরপতি মানসিংহ এবং রাণী অম্বালিকার দাম্পত্য জীবন বিষয়ক গল্প 'রাণী অম্বালিকা' (ফাল্গুন, ১৩৩৯)। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত এইটি প্রভাতকুমারের একমাত্র গল্প। ইতিহাস পাঠে রাজা মানসিংহের শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় পেয়ে আমাদের মনে যে শ্রদ্ধা জাগে এখানে সে পরিচয় নাই বরং তার অল্পবয়স্কা মহিষীতে আসক্তি-জনিত স্ত্রৈণ রূপটির পরিচয় আছে । একসময়ে অপরূপ সুন্দরী রাণী অম্বালিকা তাঁর প্রিয়পাত্রী ছিলেন কিন্তু নূতন মহিষী-আগমনে তিনি পরিত্যক্ত হয়েছেন । এখানে অম্বালিকা বা মানসিংহ কোন চরিত্রেই ইতিহাস পরিচিত ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয় নাই। তাছাড়া রাণী অম্বালিকা রাজা মানসিংহকে সরবৎ পানে অজ্ঞান করে যেভাবে পিতৃগৃহে নিয়ে গেছেন তা যথেষ্ট কৌতুকাবহ। রাজা মানসিংহ এবং রাণী অম্বালিকার ঐতিহাসিক পরিচয় এখানে পারিবারিক পর্য্যায়ে নেমে এসেছে ।

বল্লাল সেন রচিত ভোজপ্রবন্ধ অবলম্বনে 'ভোজরাজের' গল্পটি (আশ্বিন, ১৩৩১) টি লিখিত হয়েছে। ভোজরাজ সম্পর্কিত গল্পটিকে প্রভাতকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকরসে জারিত করে পরিবেশন করেছেন। ভোজরাজের মাথার যন্ত্রনার উপশমের জন্য স্বর্গের রাজা ইন্দ্র স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারকে মর্ত্যে যেতে আদেশ করলে তিনি 'ব্যাগে যন্ত্রপাতি, ব্যান্ডেজের সরঞ্জাম ও ঔষধপত্র ভরিয়া' ভোজরাজার নগরীতে এসে হাজির হয়েছেন। চিকিৎসার প্রারম্ভে অশ্বিনীকুমার ভেবেছেন —' যে রকম শক্ত অপারেশন, আর রোগী যে রকম দুর্বল, এ যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে যদি পটল তোলে ? তার চেয়ে ক্লোরোফর্ম্ম করি। (পাঠক ইহা পরিহাস ভাবিবেন না। মূল ভোজপ্রবন্ধে আছে, ' মোহচর্ণেন মোহায়িত্বা শির:কপালমাদায়' ...')।[১০৫] বলাবাহুল্য অশ্বিনীকুমারকে আধুনিক চিকিৎসকের বেশে সাজিয়ে তাঁর মুখে যে ভাষা লেখক আরোপ করেছেন তা যথেষ্ট কৌতুকাবহ । এই ধরণের গল্পগুলি সম্পর্কে ডা: সুকুমার সেন যথার্থভাবে মন্তব্য করেছেন —'এগুলিতে সেকালের উইটের সঙ্গে একালের হিউমারের যোগ হইয়াছে ।'[১০৬]

(১১)

প্রভাতকুমারের দশম গল্পগ্রন্থ 'যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩৫ সালে। এখানে সাতটি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। গল্পগুলি ১৩৩০ থেকে ১৩৩৩ সালের মধ্যে 'মানসী' ও 'মর্ম্মবাণী', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'বার্ষিক বসুমতী' এবং 'নিরুপমা বর্ষস্মৃতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখানকার অধিকাংশ গল্পেই আছে রোমান্টিক প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ এবং তার কৌতুককর পরিণতি, বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি। প্রথম গল্প 'যুবকের প্রেম'-এর নামানুসারে গল্পগ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে।

সদ্যমৃতা পত্নীর বিরহ যন্ত্রনায় কাতর যুবক মহেন্দ্র পুনর্বিবাহের জন্য আত্মীয় স্বজনের পীড়াপীড়িতে উত্যক্ত হয়ে গৃহত্যাগ করে চাকুরীর সন্ধানে কলকাতায় এসে অল্পদিনের মধ্যে এক ইংরেজ মহিলার প্রণয়াসক্ত হওয়ায় জীবনসঙ্কট উপস্থিত হলে কিভাবে প্রাণ ভয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তারই কৌতুককর কাহিনী 'যুবকের প্রেম' (কার্তিক, ১৩৩১) গল্পটি। অধিকাংশ যুবকের প্রেম এবং বিরহব্যথা উভয়ই যে কত অগভীর, লেখক সুকৌশলে সে কথাই ব্যক্ত করেছেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে যুবক মহেন্দ্র 'কিছুদিন যেন পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। সারা সকাল বেলাটা মাথাটি নীচু করিয়া, উদ্যানের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারী করিয়া বেড়ায়, সাত ডাকেও কেহ তাহার উত্তর পায় না। শ্রান্ত হইলে, তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে।'[১০৭] ছয়মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই দেখা গেল সেই মহেন্দ্র মেজর গ্রীণের পত্নী এলসির সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং 'গোলাপী চোখে, এলাসির পানে চাহিয়া মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, এ যেন মূর্ত্তিমতী কবিতা — এমন সুরসিকা রমণীরত্ন জগতে দুর্লভ।'[১০৮] অবশ্য সেজন্য মহেন্দ্রের মনে সামান্য অনুশোচনা দেখা দিলেও ক্ষণস্থায়ী হয়েছে। তবে তার এই প্রেমের অবসান ঘটিয়েছে মেজর গ্রীণের উদ্ধত রিভলভার। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসার সময় মহেন্দ্র বিগতা স্ত্রীর চিঠির বান্ডিলটি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়ে, গ্রামে এসে এক মাসের মধ্যেই 'ডাগর' মেয়ে বিয়ে করে ফেলেছে। মহেন্দ্র-চরিত্রের চিন্তাধারা এবং বাস্তবে তার কার্য্যপ্রণালীর অসঙ্গতি কৌতুকরসের উৎস।

'হারাধন' (চৈত্র - বৈশাখ, ১৩৩১) গল্পে একটি ভুল ধারণাকে কেন্দ্র করে কৌতুকরসের সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন এক নষ্ট চরিত্রের মেয়েকে খুন করে হারাধন ছদ্মবেশে পালিয়ে বেড়ায়। সহোদরা বিধবা বোনের ভাসুরের বাড়ীতে এসে আত্ম পরিচয় গোপন করে আশ্রয় নিয়েছিল। অর্থাভাবে পড়ায় বোনের কাছ থেকে কিছু টাকা নেবার জন্য গোপনে তার সঙ্গে

শলাপরামর্শ করতে গিয়ে প্রতিবেশীর নজরে পড়ায় বিধবা বোনের নামে পাড়ায় কুৎসা রটনা হয়ে যায়। অবশেষে ভাসুর রামলোচনের মনেও ভ্রাতৃবধূ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। একদিন গোপনে জানালা দিয়ে বোনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে ধরা পড়ে। বোনের ভাসুর হারাধনকে খুন করতে উদ্যত হলে প্রাণ নিয়ে সে পলায়ন করে। অবশেষে অবশ্য রামলোচনের কাছে প্রমানিত হয়েছে হারাধন আর কেউ নয় তারই ভ্রাতৃবধূর সহোদর ভাই। লেখক গল্পে প্রথমাবধিই হারাধন সম্পর্কে একটা ঔৎসুক্য পাঠকের মনে জাগিয়ে রাখতে চেয়েছেন কিন্তু ব্যবসায়ী রামলোচন অজ্ঞাতকুলশীল হারাধনকে যেভাবে বিশ্বাস করে আশ্রয় দিয়েছেন তাতে কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে বলে মনে হয়।

'উপন্যাস কলেজ' (অগ্র; ১৩৩৩) গল্পে আধুনিককালের শিক্ষিত শিক্ষিত যুবকের মনে শিক্ষিতা স্ত্রী সম্পর্কে সুউচ্চ ধারণা এবং আধুনিক গল্প উপন্যাসে পরকীয়া প্রেমতত্ত্বের বর্ণনার প্রতি লেখক কটাক্ষ করেছেন। মেধাবী ছাত্র অবিনাশের আকৈশোর প্রতিজ্ঞা শিক্ষিতা মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবে না। তাই 'পুষ্পহার' কবিতা পুস্তকের লেখিকা দরিদ্র অধ্যাপকের কন্যা সুষমাকে বিয়ে করেছে। কবিতা পুস্তকটি সমালোচক এবং পাঠক উভয়ের পরিত্যক্ত হলেও অবিনাশের ধারণা কবিতাগুলি অতি উচ্চমানের শুধু রসবোধের অভাবেই পাঠকসমাজ এর মর্মোদ্ধার করতে পারছেনা। এমন সময় উপন্যাস এবং ছোটগল্প রচনা প্রণালী শিক্ষা দেবার জন্য 'উপন্যাস কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সুষমার অমত সত্ত্বেও অবিনাশ তাকে উক্ত কলেজে ভর্তি করে দেয়। ছোটগল্পের ক্লাসে অধ্যাপকের পরকীয়া প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা ভাবভঙ্গি সুষমার অপছন্দ হওয়ায় অবিনাশকে অভিযোগ করলে অবিনাশ এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেয় না।- একদিন দেখা গেল সুষমাকে ক্লাসে একা পেয়ে ছোটগল্পের অধ্যাপক সুষমার মুখচুম্বন করে বসেছে। শেষ পর্য্যন্ত অবিনাশের মোহভঙ্গ হয়েছে। পরিবেশনের কৌশলে গল্পটি উপভোগ্য হয়েছে।

একদা গ্রামের সখের থিয়েটার দলের পান্ডা, বখাটে, গঞ্জিকাসেবী অবিবাহিত বিমলচন্দ্র, গ্রামের পোষ্টমাষ্টারের চাকুরী পেয়ে অন্যের প্রেমপত্র গোপনে পড়ে পত্রের সঙ্কেতানুযায়ী প্রেমাভিসারে গিয়ে প্রহৃত হয়ে উপস্থিত বুদ্ধির বলে পোষ্টঅফিস স্বদেশী ডাকাতেরা লুণ্ঠন করেছে বলে প্রচার করে কৌশলে ইনস্পেক্টারের পদে কিভাবে বহাল হয়েছিল তারই এক হাস্যরসাত্মক কাহিনী 'পোষ্টমাষ্টার' (চৈত্র, ১৩৩৩) গল্পটি। বিমল চরিত্রের জঘন্য মনোবৃত্তি, তার অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি কার্য্যকলাপে আমাদের মনে ঘৃণা জন্মালেও তার প্রেমাভিসারে গিয়ে নিগৃহীত হওয়া অথবা নিগৃহীত হয়েও কূটকৌশল অবলম্বনে পদোন্নতিজনিত পরিণাম পাঠককে হাসতে বাধ্য করে। নামসাদৃশ্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটির কথা মনে এলেও উভয়ের রসাবেদন ভিন্ন।

ডা: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন —' রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার বর্ষাঘন নির্জন সন্ধ্যায় এক অনাথ বালিকার সহিত নিজের একটা অবিচ্ছেদ্য প্রীতিসম্পর্ক রচনা করিয়াছিল ; প্রভাতকুমারের পোস্টমাস্টার অপরের প্রেমপত্র চুরি করিয়া পড়িয়া বিকৃত রোমান্স প্রবণতার চরিতার্থতা সম্পাদন করে ; চোরাই পত্রের সংকেতানুযায়ী প্রেমাভিসার তাহার পক্ষে কতকটা হাস্যকর, কতকটা শোকাবহ পরিণতির সৃষ্টি করিয়াছে —'। ১০৯

নি:সন্তান এক দম্পতীর গভীর প্রণয়ে কৌতূহলী হয়ে , রঙ্গোপভোগ মানসে তাদের প্রতিবেশীগণ চক্রান্ত করে উভয়ের মনে উভয় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে এই দম্পতীর জীবনে কি ভাবে অশান্তি ডেকে এনেছিল তারই এক কৌতুককর গল্প 'দাম্পত্য প্রণয় '(জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২)। দম্পতির মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টির জন্য প্রতিবেশীগণ যে ক্রিয়া কৌশল অবলম্বন করেছে সে সমস্ত কৌতুককর হলেও সহজে বিশ্বাস করা কঠিন। তারকেশ্বরের মেলাতে এই প্রতিবেশীগণের একজন সিদ্ধ পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়ে স্ত্রী কুসুমকুমারীর হস্তরেখা বিচার করে বলেছে তার সন্তান হবার কোন সম্ভাবনা নাই, এটা তার গতজন্মের কর্মফল। তার এজন্মের স্বামী নরহরি গত জন্মে ছিল তার কর্মচারী। চুরির দায়ে ধরা পড়ে তারই আদেশে সরকারের লোক কর্মচারীকে দশঘা জুতা মারলে মনের দু:খে গঙ্গায় ডুবে সে আত্মহত্যা করে এবং পরজন্মে তার প্রতিশোধ নিতে চায়। সিদ্ধপুরুষ আরও বলেন কুসুমকুমারীর একথা যদি বিশ্বাস না হয় তবে যেন রাত্রে স্বামী ঘুমোলে তার পিঠ চেটে দেখে আজও সেখানে লবনের স্বাদ সে পাবে। এই সিদ্ধপুরুষ নরহরিকে হাত দেখে বলে গত জন্মে তার কুকর্মের ফল স্বরূপ এজন্মে স্ত্রী তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করবে। পূর্বজন্মে তার স্ত্রীছিল কুকুরী, তাই এখনও রাত্রে নরহরি ঘুমিয়ে পড়লে স্ত্রী তার পিঠ চাটে। তাছাড়া তার স্ত্রীর এজন্মের নাম কুসুমকুমারী শব্দটির দ্বিতীয় তৃতীয় এবং পঞ্চম অক্ষর বাদ দিলে কুকুরী শব্দটাই থাকে। যাহোক রাত্রে নরহরি ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকলে টের পায় স্ত্রী তার পিট চাটছে এবং স্ত্রীও অনুভব করে স্বামীর পিঠের ঘাম লবনাক্ত । সিদ্ধপুরুষ অবশ্য এ সমস্ত কথা প্রকাশ করতে উভয়কে বারণ করে দিয়েছিলেন তাই সঙ্গোপনেই উভয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। তাহলেও এ ধরণের কল্পিত কাহিনী বিশ্বাস করা কঠিন বলেই মনে হয়। অবশ্য পরিণতিতে সব ভ্রান্তির অবসান হয়ে স্বামী স্ত্রীর মিলন সম্পন্ন হয়েছে ।

'সুশীলা না পিপুলা' (আশ্বিন , ১৩৩৩) গল্পে আকৃতিগত সৌসাদৃশ্যের সুযোগ নিয়ে মৃতা কন্যার স্থলে বিধবা কন্যাকে পিতামাতা জামাতার হাতে কিভাবে তুলে দিয়েছেন তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । সুশীলা এবং পিপুলা

দুই জমজ বোন, সুরেন্দ্রনাথ তাদের বাল্যকালের খেলার সাথী। খেলার ছলেই সুরেন্দ্রনাথ ছোটবেলায় একদিন তাদের প্রশ্ন করেছিল কে তাকে বেশী ভালবাসে। উভয় বালিকাই সমান দাবী জানায়। সুরেন্দ্রনাথও বালসুলভচাপল্যে বলেছিল বড় হলে সে দুজনকেই বিয়ে করবে। সুরেন্দ্রনাথের এই বাল্যকালের প্রতিশ্রুতিকে সম্মান জানাতে গিয়ে লেখক গল্পে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। বড় হয়ে সুরেন্দ্রনাথ সুশীলাকে বিয়ে করেছে কিন্তু পিপুলার অন্যত্র বিয়ে হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তার স্বামী মারা গেছে। আবার কিছুদিনের মধ্যেই মা বাবার সঙ্গে ওয়াল-টেয়ারে হাওয়া বদল করতে গিয়ে সুশীলাও হঠাৎ মারা গেল। যে গেছে সে তো চলেই গেছে এই যুক্তিতে মা বাবাও বিধবা পিপুলাকে সুশীলা বলে সুরেন্দ্র-নাথের হাতে তুলে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য এই ধরণের কাহিনীর পরিণতি আমাদের বাস্তববোধকে আঘাত করে। অবশ্য লেখক গোপনে শৈবমতে সুরেন্দ্রনাথ এবং পিপুলার বিয়েটি দিয়ে দিয়েছেন।

অর্থশালী এব বঙ্গীয় যুবক উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতে গিয়ে ঘটনাচক্রে ঐ দেশীয় এক যুবতীর প্রেমের অভিনয়ে মোহিত হয়ে কিভাবে বিপথে পা বাড়িয়েছিল এবং সময় মত পিতার হস্তক্ষেপে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সেই পথ থেকে ফিরে আসে তারই কৌতুককর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'বিলাতী রোহিনী' (আশ্বিন, ১৩৩২) গল্পে। নায়িকা নোরা নায়ক সুধাংশুভূষণকে ভালবেসেছিল তার অর্থের লোভে। এই সত্য প্রমানিত হয়েছে যখন নায়কের পিতা বিলাতের জীবন যাত্রায় অভিজ্ঞ জনৈক দত্তসাহেবকে নবাবের পরিচয়ে বিলাত পাঠিয়েছেন পুত্রকে মোহগ্রস্থতা থেকে উর্দ্ধার করতে। নোরা টাইপিস্টের চাকুরী করে শুনে ছদ্মবেশী নবাব দত্তসাহেব তার ব্যবসায়ের খাতিরে একজন টাইপিস্টের প্রয়োজনে নোরাকে নিযুক্ত করেন। ক্রমে একদিন দেখা গেল, মিথ্যাকথা বলে সুধাংশুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নোরা অধিক অর্থশালী নবাবের সঙ্গে বসে প্রেমানন্দে থিয়েটার দেখছে। বাবার সঙ্গে সুধাংশু সেই থিয়েটারে উপস্থিত ছিল, এই দৃশ্য দেখে তার চৈতন্য সহজেই উদয় হয়েছে এবং সুবোধ বালকের মত গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে।

প্রভাতকুমারের অনেক গল্পেই বিলাতের রমণীর প্রেমের গভীরতা এবং মাধুর্য্যের পরিচয় পেয়েছি এমনকি আজীবন কুমারী থেকে তারা প্রেমের মূল্যও দিয়েছে। এখানে দেখি সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাবের রমণীকে। প্রকৃতপক্ষে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যে ভালমন্দের অবস্থিতি প্রভাতকুমারের মন সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে তারই পরিচয় দিয়েছে।

(১২)

প্রভাতকুমারের একাদশ গল্পগ্রন্থ রচনা 'নূতন বৌ ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩৫ সালে। এখানেসন্নিবিষ্ট নয়টি গল্পের মধ্যে প্রতিটি গল্পই ইতঃপূর্বে ১৩৩৩ থেকে ১৩৩৫ সালের মধ্যে বার্ষিক 'বসুমতী,' 'নিরুপমাবর্ষস্মৃতি,' 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' এবং 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত হয়েছিল। একমাত্র 'বাপকী বেটী' গল্পটি ১৩৩৫ সালে 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রাপ্ত হয়। প্রথম গল্প নূতন বউ' এর নামানুসারে গল্পগ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে।

দাম্পত্য প্রেম বিষয়ক মধুরান্তিক গল্প 'নূতন বউ' (আশ্বিন, ১৩৩৪)। স্বামীর শত অপরাধ সত্ত্বেও পরম উদারতায় তাঁর সেবা যত্ন করে অনুবর্তিনী হওয়াই হিন্দু নারীর সনাতন আদর্শ। এই গল্পে ~~নির্ম্মল~~ নির্ম্মলা চরিত্রের মাধ্যমে সেই আদর্শকেই রূপায়িত করতে চেয়েছেন লেখক। গঙ্গায় ~~xxxxxxxxxx~~ ডুবে যাওয়া নির্ম্মলার প্রাণ রক্ষা করাতে অজ্ঞাতকুলশীল বসন্ত বসুর সঙ্গে নির্ম্মলার বিয়ে দিয়েছিলেন নির্ম্মলার বাবা। বসন্ত নিজেকে দরিদ্র দালালীর কারবারি বলে পরিচয় দিয়েছিল এবং অর্থের অনটনের জন্য নির্ম্মলাকে সে বাপের বাড়ীতেই রেখে যায়। একসময়ে আবিষ্কৃত হল বসন্তবসু মোটেই দরিদ্র নয় বরং বেশ অর্থশালী, সে বিবাহিত এবং এক পুত্রের জনক। অবশ্য যে দিন ঘটনা প্রকাশিত হ'ল সেইদিনইতার আগের স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছে। আশ্চর্য্য, বসন্তের এই প্রতারণাতে নির্ম্মলা মোটেই বিচলিত হয়নি, স্বামীর সব কিছুকেই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়ে নির্বিবাদেই তার ঘর করেছে। নির্ম্মলা চরিত্রের উদারতায় মুগ্ধ হলেও তার নির্বিকারত্ব যতখানি তাকে আদর্শ জগতের অধিবাসী করে তুলেছে ততখানি রক্তমাংসের মানুষ করে তুলতে পারেনি।

'ভুল' (১৩৩৩) গল্পে বিবাহ সম্পর্কে জটিল মানসিকতার অধিকারী খৃষ্টান যুবতী লীলা সান্যালের প্রেম ও পরিণয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। লীলাবতী বা লিলিনিজে ডাক্তার, গভীর ভাবে ভালবাসে নিজ সম্প্রদায়ের এক কেরাণী যুবক সরোজকে। বিপত্নীক বৃদ্ধ পিতার প্রতি কর্ত্তব্যবোধে সরোজের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিবাহে লীলার আপত্তি। লীলার বিয়ের পর পিতা তার কাছে থাকবে এই মত দিলে লীলা বিবাহে সম্মত হয়। কিন্তু ইতঃমধ্যে সরোজ লটারীতে প্রচুর অর্থ পাবে এমন সংবাদ পাওয়ায় লীলা সরোজকে বিয়ে করতে অসম্মত হয়। সরোজ লীলার এই ব্যবহারে আঘাত পায়। সরোজকে বিবাহে লীলার আপত্তির কারণ লটারীর টাকায় সরোজ অর্থশালী হয়ে ~~পড়েছে~~ পড়বে। সরোজকে লীলা জানিয়েছে —'এখন তুমি রাজার ঐশ্বর্য্য লাভ করেছ — আমি যে ফকীরের মেয়ে সেই ফকীরের মেয়েই আছি। অবস্থাগত সাম্য না থাকলে, সে মিলন কি কখনও সুখের হতে পারে? তাই আমি তোমায় বিবাহ না করাই স্থির করেছি।' প্রকৃতপক্ষে লীলার মনে এখানে হীনমন্যতা

প্রকাশ পেয়েছে।.... সরোজের প্রতি গভীর ভালবাসা থাকলেও এই মানসিকতা তার মিলনে বাধা সৃষ্টি করেছে। প্রভাতকুমারের গল্পে জীবনের কোন জটিলতা বিশেষ দীর্ঘস্থায়ী হয় না, এক্ষেত্রেও দেখি প্রকৃতপক্ষে সরোজ লটারী পায়নি ভুলক্রমে তার নাম ছাপা হয়েছিল মাত্র। অতএব বাধা অপসারিত হয়ে লীলা - সরোজের মিলন ত্বরান্বিত করেছে। গল্পটি মিলনান্তক হলেও লীলার বিশেষ মানসিকতার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ভাবে ব্যথার সুর ধ্বনিত হয়ে গল্পের আবহাওয়াকে ভারি করে তুলেছে।

মধুর প্রতারণার মধ্য দিয়ে প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পরকে লাভ করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'যোগবল না সাইকিক ফোর্স' (পৌষ, ১৩৩৩) গল্পে। প্রেমের আকর্ষণে আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ সংঘটিত হয়েছে এখানে।

রোগশয্যায় শুশ্রূষাকারিনী এক খৃষ্টান নার্সের প্রতি প্রণয়ানুভব এবং নার্সটি যে নায়কেরই বোন এই সত্য আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভগিনী স্নেহে তাকে সাদরে বরণ করার একটি মধুর গল্প 'ডোরা' (বৈশাখ, ১৩৩৫)। গল্পের নায়ক নিরঞ্জন অসুস্থাবস্থায় নার্স ডোরার আন্তরিক সেবাযত্নে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালবেসে ফেলে এবং বিবাহ প্রসঙ্গ উঠলে ঘটনাচক্রে প্রকাশ পায় ডোরা তারই জমিদার পিতার অবৈধ সন্তান। অতএব সম্পর্কে ভগিনী হওয়ায় নিরঞ্জনের মনে ভগিনী স্নেহ দেখা দেয়। অবশ্য ইতঃপূর্বে ডোরা নিরঞ্জনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানতে পেরেও প্রকাশ করেনি। তার সেবা যত্নের মূলে ছিল ভ্রাতৃপ্রেম। এরপর নিরঞ্জন ডোরাকে তার নিজের বাসায় নিয়ে আসে এবং ভগিনী সুলভ স্নেহ আদরে লালন পালন করে বিলাত ফেরত সমাজে তার বিয়ে দেয়। ডোরা নিরঞ্জনের ভগিনী এই সত্য আবিষ্কার হওয়ার পর ডোরার প্রতি তার প্রেমকে কেন্দ্র করে নিরঞ্জন চিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশের অপূর্ব সুযোগ লেখক অবলীলাক্রমে এড়িয়ে গেছেন। প্রেম সম্পর্কায়িত কোন বিক্ষোভই নিরঞ্জন চিত্তকে উদ্বেলিত করেনি। অবশ্য চরিত্রচিত্রণে প্রভাতকুমারের এইটি সাধারণ রীতি। ডোরা চরিত্রের নিষ্কলুষ আন্তরিকতা এবং সেবা যত্নের পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই।

আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক ঢাকার যুবক ওকালতিতে পসার জমাতে না পেরে কলকাতার কোন এক রায়বাহাদুরের গৃহে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে সুকৌশলে রায়বাহাদুরকে কন্যা বিবাহের প্রলোভনে মুগ্ধ করে ডেপুটির চাকুরী বাগিয়ে নিয়ে কি ভাবে তাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তারই এক কৌতুকপূর্ণ সরস কাহিনী 'ঢাকার বাঙ্গাল' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩) গল্পটি। চিরকাল কলিকাতার বাসিন্দারা নিজেদের সুচতুর মনে করে এবং পূর্ববঙ্গবাসীদের প্রতি তাঁদের একটু উপেক্ষার ভাবও আছে।

গল্পে রায়বাহাদুরকে বলতে শুনি 'আমরা গর্বকরে থাকি আমরা কলকাতার লোক ভারি হুঁসিয়ার — কিন্তু ঢাকার বাঙ্গালটা এসে আমাদের কি ঠকানটাই ঠকিয়ে গেল বল দেখি।' উভয় বঙ্গের বাসিন্দাদের এই তিক্ত মনোভাবকে কেন্দ্র করেও — লেখক নিরপেক্ষ থেকে, ঘটনা বিবৃতির মাধ্যমে আশ্চর্য্যভাবে কৌতুকরস সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। বাঙ্গাল যুবক পরেশনাথের রায়বাহাদুরের গৃহে শিক্ষকতা গ্রহণ, এই পরিবারের প্রতি তার আন্তরিকতা পূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে রায়বাহাদুরের মনে তাকে জামাতা হিসাবে বরণের ইচ্ছা, ভাবী জামাতার আর্থিক অসুবিধা দূরীকরণের জন্য রায়বাহাদুর চেষ্টা করে তাকে ডেপুটির চাকুরীতে বহাল করান অথবা শিক্ষানবীশি কালে যুবকের মৃগীরোগের ভাণ ইত্যাদি কোন ঘটনাই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। অথচ শেষে দেখা গেল সে বিবাহিত এবং পুত্র কন্যার জনক তাই রায়বাহাদুরের মূল ইচ্ছা বানচাল হয়ে গেল। যুবক রায়বাহাদুরকে প্রতারণা করেছে ঠিকই কিন্তু গল্প-কৌশলে পাঠক তার উপর বীতরাগ হওয়ার কোন অবকাশ পায় নাই। গল্পটি প্রভাতকুমারের অন্যতম সার্থক সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

'বেকসুর খালাস' (আশ্বিন, ১৩৩৫) গল্পে এক সদ্‌গোপ জাতীয় যুবক রাম প্রসাদ সহরে গিয়ে ইংরাজী পড়ে চাকুরী নিয়ে বাবু হবার ইচ্ছায়, সহরে গেলে মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে এক বাইজীর ঘরে স্থান পায়। অসৎ চরিত্রের বাইজী মেয়ে বিক্রি করে টাকা উপার্জন করার মানসে লায়লী নামে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে তার কাছে রেখেছিল। কোন দেশীয় নৃপতির কাছে তাকে শীঘ্রই বিক্রয় করা হবে বুঝতে পেরে রামপ্রসাদ ভগিনী জ্ঞানে তাকে উদ্ধার করে দেশের বাড়ীতে নিয়ে আসে। কিন্তু পুলিশের কাছে বাইজীর অভিযোগক্রমে সে গ্রেপ্তার হলে সে সমস্ত সত্য ঘটনা প্রকাশ করে বেকসুর খালাস পেয়ে যায় এবং সাহেব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুলিশের সাব-ইনস্‌পেক্‌টারের চাকুরীতে বহাল করে। কিন্তু চাকুরীতে একটি সর্ত আরোপিত হয় রাজাদের এই কেলেঙ্কারির কথা কোন দিন সে প্রকাশ করতে পারবে না। লায়লীকে শেষ পর্য্যন্ত এক ব্রাহ্ম মহিলাদের আশ্রমে রেখে পরে ব্রাহ্মসমাজের উচ্চশিক্ষিত এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়।

গল্পটি নেহাতই ঘটনার বিবৃতি হয়ে পড়েছে, কাহিনী পরিকল্পনা অথবা চরিত্র চিত্রণে সর্বত্র স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয় না। রাম প্রসাদের মত গ্রাম্য যুবকের পক্ষে প্রতিপত্তিশালী বাইজীর ঘর থেকে লায়লীকে নিয়ে পলায়ন অসম্ভব বলে মনে হয়।

সমসাময়িক ব্রাহ্ম সমাজের কথা, করদ নৃপতিদের ব্যভিচারের কথা এবং ইংরেজ শাসনও যে কিভাবে তাঁদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন গল্পে তার উল্লেখ আছে। লায়লাকে অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োগ জনিত ঘটনায় 'করদ নৃপতির নাম শুনিয়া, লাট সাহেব বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং এ ব্যাপারে নাকি 'হাস্ আপ' করিতে (চাপিয়া যাইতে) আদেশ দেন।'

লায়লার ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয়প্রাপ্তির ঘটনা ব্রাহ্ম নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের অনুরূপ ঘটনাকে স্মরণ করায়। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন — 'একটি পলায়িতা ও আশ্রয়ার্থিণী কুলটার কন্যাকে আশ্রয় দেওয়াতে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আদালতে উপস্থিত হইতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজ বিচারপতির বিচারে ঐ কন্যার অভিভাবকতার ভার তাহার মাতার হস্ত হইতে লইয়া নবকান্ত বাবুর প্রতি অর্পিত হইল।'[১১৩]

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যায় ইংরেজ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে তৎকালীন করদ-রাজাদের যে সব সময় সখ্যতা ছিল এমন নয়। ইতঃপূর্বে ১৮৭৫ সালে বরোদার রাজা মালহার রাও গাইকোয়াড়কে জব্দ করবার জন্য তদানিন্তন পশ্চিম প্রান্তের রেসিডেন্টকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগ এনেছিলেন। বিচারের জন্য ইংরেজ গভর্ণমেন্ট সেই সময়ের কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কাউচ এবং কয়েকজন দেশীয় নৃপতিদের নিয়ে কমিশন গঠন করেন। গাইকোয়াড় মহারাজের ব্যারিস্টার সার্জেন্ট ব্যালেন্টাইন সাক্ষীদের জেরা করে গাইকোয়াড়ের নির্দোষিতা প্রমান করলেন মহারাজ কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেন্টের শাস্তি থেকে রেহাই পান নাই। এই সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলায় বেশ কয়েকটি নাটক প্রহসন রচিত হয়েছিল। যেমন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়াড় নাটক' উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের 'গুইকোয়ার নাটক' (১৮৭৫), অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ নাটক' (১৮৭৫)। রচনাগুলির মধ্যে 'হীরকচূর্ণ' নাটকটি তথ্যনিষ্ঠ এবং নাট্যগুণ সমৃদ্ধ।

প্রভাতকুমারের 'বেকসুর খালাস' গল্পটি এই ধরণের কোন সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করে রচিত হওয়া সম্ভব।

একবালবিধবার একনিষ্ঠ স্বামীপ্রেমের করুণ কাহিনী 'বাপকী বেটী' (১৩৩৫) গল্পটি। পিতৃমাতৃহীন স্বামীহারা সুষমা আর্থিক স্বচ্ছলতা, শিক্ষা রূপ-গুণ সব থাকা সত্ত্বেও পুনর্বিবাহের আবেদন এলে স্বামীপ্রেমের জোরেই সব কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। কিছুদিন মেলামেশার পর ডাঃ ঘোষের হয়ে, আত্মীয়বৎ লাহিড়ী গিন্নী যখন তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে তখন সুষমা

জানিয়েছে, যে আজও তার স্বামীকে ভালবাসে তাই তার পক্ষে আর বিয়ে করা সম্ভব নয় । ডা: ঘোষের সদ্য উপহৃত ফুলগুলি তার কাছে বিষবৎ মনে হয়েছে। সেদিন রাত্রে —' জেঠাইমা চলিয়া গেলে সুষমা দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া, যে দেরাজে তার মৃত স্বামীর ছবি থাকিত, উহা খুলিল। ছবিখানির চারিদিকে অদ্য প্রাপ্ত তাজা গোলাপ ফুলগুলি তুলিয়া লইয়া সুষমা জানালা গলাইয়া ফেলাইয়া দিল, বস্ত্রাঞ্চলে ছবিগুলি বেশ করিয়া মুছিয়া, উহা মাথায় ঠেকাইয়া বলিতে লাগিল, —' তুমি আমায় ক্ষমা কর — ক্ষমা কর — আমি ত জানতামনা যে ও ফুলগুলোর সঙ্গে অলক্ষে একজনের বাসনার কালি মাখানো আছে ।' প্রকৃত-পক্ষে সুষমা চরিত্রের মধ্যে হিন্দু নারীর আদর্শ স্বামী প্রেম রূপায়িত হয়েছে । সুষমা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে লালিতা, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়েও যে স্বামী প্রেমের বন্দনাগান গেয়েছে, তাতে লেখক প্রমান করতে চেয়েছেন প্রেম বস্তুটি আন্তরিক এবং সমাজ নিরপেক্ষ। গল্পে স্ত্রীর প্রতি লাহিড়ী সাহেবের উক্তি —'ওটা ভাবা কিন্তু তোমার ভুল । জুতো মোজা পরে বেড়ায়, বাবুর্চির রান্না খায়, ওগুলো সবই বাইরের জিনিষ। কোনটা কর্তব্য, কোনটা অকর্তব্য, কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম, — এসব হল অন্তরের জিনিষ । বাইরের আচারের সঙ্গে তার বড় বেশী যোগ আছে তা নয় ।' প্রকৃতপক্ষে এই উক্তির পেছনে প্রভাতকুমারের বক্তব্য লুকিয়ে আছে।

'কানাইয়ের কীর্ত্তি' (কার্তিক, ১৩৩৫) গল্পে একদিকে যেমন বেয়ারার কাজেনিযুক্ত দারিদ্র্য পীড়িত কানাইয়ের বালসুলভ ঔৎসুক্য, চপলতা এবং সততার কথা আছে অন্যদিকে তেমনি আছে তথাকথিত বাঙ্গালী খৃষ্টান সাহেবদের ধর্ম্মীয় গোড়ামির কথা । কানাই ক্ষুধার তাড়নায় সাহেবের ফল চুরি করে খেয়েছে কিন্তু সাহেবের ছেলের মনিব্যাগ পেয়ে ফেরত দিয়েছে । আলমারী খোলা পেয়ে সে ছোটসাহেবের পোষাক পরে আয়নার সামনে দাড়িয়ে ছেলে মানুষের মত নিজের প্রতিমূর্তি দেখেছে কিন্তু আলমারীতে রক্ষিত টাকা সুযোগ থাকলেও চুরি করেনি। সাহেব কন্যা মিস বীণা এক যুবকের সঙ্গে প্রেমপত্র বিনিময় করেছে , এবং বাবার অমতে সেই যুবককে বিয়ে করতে চেয়েছে — কানাই অন্যায় ভাবে সেই প্রেমপত্র খুলে পড়েছে ঠিকই কিন্তু সাহেবকে সব কথা বলে বীণার পালানোর পথ বন্ধ করেছে। তার মতে —' যার নুন খাই তার কোন অনিষ্ট জেনেশুনে হতে দেওয়া আমার কর্তব্য না ।' কানাইয়ের চপলতা যেমন কৌতুককর সততাও তেমনি প্রশংসনীয় ।

দেশীয় খৃষ্টান ব্যানার্জী সাহেবের চরিত্রে এদেশের ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। বাবুর পরিবর্তে সাহেব সম্বোধন তারা বেশী পছন্দ করেন। খৃষ্টান হলেও হিন্দুধর্মের জাত্যভিমানের সংস্কার তার মনে দানা বেধেই আছে । পূর্বে ব্রাহ্মন ছিলেন তাই ধোপা থেকে খৃষ্টান হওয়া ছেলেকে তিনি জামাই করতে সম্মত হন নাই। ব্যানার্জী সাহেবের উক্তি —' না হয় খ্রীষ্টানই

হয়েছি, বামুনের ছেলে হয়ে ধোবা জামাই প্রাণ থাকতে আমি করতে পারবো না।'

কৌতুক এবং মৃদু ব্যঙ্গের সংমিশ্রনে গল্পটি বেশ উপভোগ্য।

কৌতুকাশ্রিত দাম্পত্য প্রেমের গল্প 'পরের চিঠি' (ফাল্গুন, ১৩৩৫)। বাক্সে কতকগুলি প্রেমপত্র দেখে বাংলা উপন্যাসের একনিষ্ঠা পাঠিকা স্ত্রী মণিকা ধারণা করে নেয় চিঠিগুলি প্রাক-বিবাহ জীবনে তার স্বামীকে লিখিত কোন মেয়ের প্রেমপত্র। মণিকার স্বামীর নাম সুরেন্দ্রনাথ দেব, বাক্সের গায়ে লেখা আছে সংক্ষেপে S.D., চিঠিতে কোন নাম না থাকলেও বাক্সের গায়ে যেহেতু ~~লেখা~~ লেখা আছে অতএব বাক্সটি যে তার স্বামীর এধরণের সিদ্ধান্তে আসতে তার দেরি হয় নাই। ফলশ্রুতি মণিকার প্রচণ্ড অভিমান, মনোবেদনা ইত্যাদি। কারণ উপন্যাসপাঠে ইতিপূর্বেই তার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল — 'প্রত্যেক মানুষ জীবনে একবার মাত্র ভালবাসতে পারে। যদি কেহ প্রথমা স্ত্রীকে ভালবাসিয়া তাহার মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করে, তবে সেই দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর প্রতি তথাকথিত ভালবাসা জাল ও জুয়াচুরি মাত্র। উহাতে দেহের মিলন হয় বটে, প্রাণের মিলন ও আত্মার মিলন অসম্ভব।' কিন্তু মণিকার মানসিক অশান্তি বেশীদিন স্থায়ী হতে পারেনি স্বামী সুরেন্দ্রনাথ জানান S.D. অর্থে Sarat Dutta তার বন্ধু এবং যার জীবনের ~~xx~~ প্রেমের কাহিনী ~~ইতিপূর্বে~~ ইতঃপূর্বে সে মণিকাকে বলেছে। সন্দেহের অবসানে মণিকার আরোগ্যলাভে বিলম্ব হয়নি। এই ভ্রান্তিকে কেন্দ্র করে গল্পে কৌতুকরসের সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রেমকাহিনী সর্বস্ব অত্যধিক উপন্যাস পাঠই যে মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে জীবনে অশান্তিকে আহ্বান জানায়, গল্পে তার ইঙ্গিত আছে। শিক্ষিতা নারীর অত্যধিক উপন্যাস পাঠের প্রতি লেখকের মৃদু কটাক্ষ অনুভূত হয়।

'বনফুল' লিখিত 'স্ত্রীর চরিত্র' গল্পটির সঙ্গে 'পরের চিঠি'র কাহিনীগত কিছুটা সাদৃশ্য ~~আছে~~ থাকলেও উভয়ের রসাবেদন ভিন্ন। 'স্ত্রীর চরিত্র' গল্পে নারী মনের দুর্জ্ঞেয়তার পরিচয় আছে 'পরের চিঠি'তে নারীমনের স্বাভাবিক সন্দেহ - ভ্রান্তিকে আশ্রয় করে কৌতুকরসের সৃষ্টি করা হয়েছে।

(১৩)

লেখকের দ্বাদশ এবং সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ 'জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প'। এখানে সর্বমোট এগারটি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে তন্মধ্যে নয়টি মৌলিক রচনা এবং পরিশিষ্টে সংযোজিত আইনের গল্প নামধেয় 'মাতঙ্গিনীর কাহিনী' ও 'বেশ্যা খুন' ~~গল্প পরিবেশনের সাহায্যে~~ ~~লিখিত এই~~ গল্পদুইটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩৩৮ সাল।

গল্পগুলি ইতঃপূর্বে 'মাসিক বসুমতী,' 'পথ্যপুষ্প,' 'নিরুপমা বর্ষস্মৃতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থের প্রথম গল্প 'জামাতা বাবাজী'র নামানুসারে গল্প-গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে।

স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারী এক কলেজে পড়া যুবকের কর্ম ও চিন্তা কেন্দ্রিক কৌতুকরসাশ্রিত গল্পকাহিনী 'জামাতা বাবাজী' (কার্তিক, ১৩৩৭)। সদ্য বিবাহিত শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র মেসবাড়ী থেকে উধাও হয়ে যায়। পরিবারস্থ সকলেই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ, এমন সময় চিঠি লিখে স্ত্রী লীলাবতীকে জানায় সে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে সংসার ত্যাগ করে পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী এই নামেই দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। বহুসন্ধানেও তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। একদিন স্বদেশী ডাকাতি করতে গেলে দারোগা মামাশ্বশুর তাকে ধরে ফেলেন এবং আর কখনও স্বদেশীর দলে যোগদান করবেনা, মন দিয়ে পড়াশুনা করবে এই রকম প্রতিজ্ঞা করাতে তাকে মুক্তি দেন। পূর্ণচন্দ্রের মহৎ ব্রতের শোচনীয় পরিণতি গল্পে কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছে। স্বদেশী আন্দোলনের হুজুগে মেতে অতিরিক্ত বাড়াবাড়িকে লেখক পছন্দ করেন নাই পূর্ণচন্দ্রের পরিণতি তার সুন্দর উদাহরণ। সংসারে স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্যের অবহেলা করে আন্দোলনে মেতে ওঠাকে তিনি পাপ বলেই মনে করেছেন। গল্পে প্রমথবাবুর স্বগত উক্তি —'হা রে ভ্রান্ত নির্বোধ পাষণ্ডগণ! এইরূপ মহাপাপ করিয়া তোরা দেশ উদ্ধার করিবি? সেই সত্যযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত, পাপের ফল কি কখনও শুভ হইয়াছে, না হইতে পারে।' মজঃফরপুরের কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ীতে বোমাবর্ষণ, ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির হুকুম ইত্যাদি সত্যঘটনার উল্লেখে গল্পে বাস্তবতা রক্ষার চেষ্টা করেছেন।

একটি কৌতুকপূর্ণ মধুরান্তির গল্প 'দিব্যদৃষ্টি' (আশ্বিন, ১৩৩৬)। সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক যুবক বি.এ পরীক্ষায় মনোবিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার করাতে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করেছে। ভোজসভায়, সংবাদপত্রে প্রকাশিত কুন্দমালা দেবীর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান অধিকারের সংবাদ শুনে সেই ভোজসভায় জনৈক অতুলবাবু প্রচার করেন তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছেন সুরেন্দ্রনাথ এবং কুন্দমালার মধ্যে বিবাহযোগ রয়েছে। সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে ওঠে এবং কৌতুক অনুভব করে। ক্রমে উভয়ের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। ফুলশয্যার রাত্রে সুরেন্দ্রনাথ অতুলবাবুর দিব্যদৃষ্টির কথা কুন্দমালাকে জানালে সে বলে অতুলবাবু সম্পর্কে তার দাদা এবং কুন্দমালার জন্য একটি সুপাত্র দেখে দেবার জন্য তার বাবাই অতুলবাবুকে অনুরোধ করেছিল। অতুলবাবুর দিব্যদৃষ্টির রহস্যভেদ হওয়ায় মহাহাসির ধূম পড়ে যায়। ঘটনা-বিন্যাস-চাতুর্যে গল্পে পাঠকমনে কৌতূহল সঞ্চার করে সার্থকভাবে কৌতুকরস পরিবেশিত

হয়েছে ।

সাহিত্যিক যশ - প্রার্থী এক নারীর কৌতুকপূর্ণ গল্প 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' (কার্তিক, ১৩৩৬)। অধ্যাপক পত্নী সুষমা 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন। স্বামীর প্রশংসাধন্য নাটকটি কিন্তু প্রকাশক এবং পাঠক কাউকেই আকৃষ্ট করতে পারেনি । স্বামী অবিনাশবাবু এবং তাঁর প্রিয় ছাত্র পঞ্চানননের চেষ্টাতেও যখন কোন অভিনয় সংস্থা নাটকটিকে গ্রহন করেনি তখন দারুণ হতাশায় সুষমা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে সুস্থ করার জন্য অবিনাশবাবু এবং পঞ্চানন নানা ছলনার আশ্রয়ে নাটকটির প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা এবং অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। সুষমার রোগমুক্তি ঘটলে অবশ্য প্রকৃত সত্য তার অজ্ঞাত থাকে না। সুষমার মনে নিজের রচনা সম্পর্কে প্রশংসা লাভের গোপন ইচ্ছা সত্ত্বেও বাইরে রচনা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য অর্থাৎ চিন্তা ও কাজে অসঙ্গতির মাধ্যমে লেখক গল্পের কৌতুকরস সৃষ্টি করেছেন । গল্পটিকে লেখকের 'উপন্যাস কলেজ' গল্পের পরিপূরক বলা চলে ।

মানুষের জৈবিক প্রয়োজন তার আদর্শকে যে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয় না তারই কৌতুককর কাহিনী 'হারানো মেয়ে' গল্পে বিবৃত হয়েছে । সদ্য পত্নীহারা যুবক কুলদাচরণ স্ত্রী বিয়োগে কাতর হয়ে স্থির করেছে বাকি জীবনটা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে কবিতা লিখে কাটিয়ে দেবে । শিবপুরের বাগানে গিয়ে নির্জনে সে মৃতা পত্নীর জন্য অশ্রুজল বিসর্জন করে মাতাপিতার অনুরোধ সত্ত্বেও পুনর্বিবাহে আপত্তি জানিয়েছে । একদিন সেই নির্জন উদ্যানে হারিয়ে যাওয়া রোরুদ্যমানা কিশোরী কমলাকে দেখে বাড়ীতে নিয়ে আসে । কিছু দিনের সান্নিধ্যেই দেখা গেল 'কুলদার পিপাসিত চক্ষু' অফিস থেকে এসে কমলাকে সন্ধান করে 'কমলার রান্না পাঞ্জাবী ব্যঞ্জনগুলি তাহার মুখে লাগে যেন অমৃত।' কমলার বিয়ে তৃতীয় পক্ষে স্থির হয়েছে, কুলদার মায়ের এই ধরণের প্রচারে 'কুলদার বুকের ভিতরটা যেন মোড় দিয়া উঠিল, চোখে জল আসিল। জননীকে জানাইল, অমন সুন্দরী ভাল মেয়েকে ও রকম পাত্রের হাতে কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না । তার চেয়ে না হয় অগত্যা নিজেই সে উহাকে বিবাহ করিবে। বলাবাহুল্য কুলদার আদর্শের এই বিপরীত পরিণতি গল্পের কৌতুক - হাস্যের উৎস ।
গল্পে পত্নী বিয়োগে যুবকের মনে শ্মশান বৈরাগ্যের প্রতি কটাক্ষ আছে। মনে হয় প্রভাতকুমারের ব্যক্তি - মানসে সংসার ধর্মের প্রতি আসক্তি এর মূল কারণ। কমলাকে তার বাবা শিবপুর বাগানে একা ফেলে কুলদাকে আকৃষ্ট করার জন্য যেভাবে এগিয়ে দিয়েছেন আমাদের সমাজে এই ধরণের প্রচেষ্টা শুধু নিন্দনীয় নয় অসম্ভব বলেই মনে হয় । লেখকের 'প্রজাপতির পরিহাস' গল্পেও এই ধরণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে ।

ইতঃপূর্বে কুড়ানো মেয়ে' গল্পে দেখেছি পাত্রীর জন্মসংক্রান্ত অজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কাহিনীতে জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। এখানে সুশোভনা' (পৌষ, ১৩৩৬) গল্পেও নায়িকা সুশোভনার অজ্ঞাতকুলশীলতাকে কেন্দ্র করে কাহিনীতে কিছু রহস্য সৃষ্টির চেষ্টা আছে । প্রভাতকুমারের গল্পে কোন রহস্য বা সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি, এখানে সুশোভনার জন্মরহস্য সহজেই আবিষ্কৃত হয়ে তার প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হয়েছে করেছে ।

পাহাড়ী কন্যা ঘড়ি, প্রেমের অভিনয়ে বায়ুপরিবর্তকারী কলকাতার কলেজে পড়া যুবক সুধাকে কিভাবে জয় করতে চেয়েছিল তারই এক কৌতুককর গল্প 'ঘড়ি' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭) মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী সুধা খদ্দর পরে, বিলাতী দ্রব্য খাওয়া ছেড়েছে, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অণুপ্রাণিত হয়ে জাতিভেদ প্রথায় অবিশ্বাসী তাই পাহাড়ী মেয়ে ঘড়িকে বিয়ে করতে তার আপত্তি নাই । সুধার বিশ্বাস ঘড়ির মত স্বাধীনচেতা মেয়েই তার রাজনৈতিক আদর্শের উপযোগী। ঘড়ি সুধার কাছে এই মতাদর্শে পূর্ণ সমর্থন জানালেও দেখা গেল তার অসাক্ষাতে বিলাতী সিগারেট ছাড়া তার ধূমপানে তৃপ্তি আসে না, পাহাড়ী ছেলের সঙ্গে আপত্তিকর মেলা-মেশাতেও সে পিছুপা নয়। হঠাৎ একদিন ঘড়ির জীবনের এসব দৃশ্য দেখে সুধার মোহ ভেঙ্গে গেছে ।

গান্ধীজি প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিকৃত ব্যাখ্যা সুধার চরিত্রে লক্ষ্যনীয়। সুধা নিজে খদ্দর ব্যবহার করে, পরিবারের সকলকে খদ্দর পরানোর চেষ্টা, ইংরেজের চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার জন্য বাবাকে পীড়াপীড়ি, জাতিভেদ প্রথার প্রতিবাদের জন্য ঘড়িকে বিয়ে করার ইচ্ছা ইত্যাদি ঘটনায় ভাবালু আবেগ যতটা আছে যুক্তি সেই পরিমানে নাই । বিদেশী দ্রব্য বর্জন, এবং আমাদের সংস্কারকে আঘাতের মধ্যেই যে স্বদেশিকতার পরিচয় নাই একথা লেখক অন্যত্র এক প্রবন্ধে বলেছেন ।

মাসিক বসুমতী'তে গল্পটি প্রকাশকালে তদানীন্তন কার্শিয়াং সহরের যে ছয়টি ফটো সন্নিবিষ্ট হয়েছিল তার বিশেষ মূল্য আছে ।

প্রকৃতির অমোঘ আকর্ষণ যে সামাজিক বিধি-নিষেধ অথবা গুরুজনের রক্ত চক্ষুকে কৌশলে উপেক্ষা করতে পারে তারই এক সরস কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ' একালের ছেলে' (আশ্বিন, ১৩৩৭) গল্পে। পূজাপার্বনে তত্ত্ব পাঠানোর অপ্রতুলতাহেতু নির্দয় এবং মুখরা শাশুড়ী তার পুত্রবধূকে বাড়ীতে আনেন না । কলেজে পড়া বিবাহিত পুত্র ছুটিতে এসে স্ত্রীকে কাছে না পেয়ে মনঃক্ষুন্ন হয়ে ফিরে যায় । ক্রমে দেখা গেল ছুটি উপলক্ষে পুত্র প্রফুল্ল বাড়ীতে না এসে গোপনে শ্বশুরবাড়ীতে স্ত্রী উষার সঙ্গে মিলিত হয়েছে । পুত্রের সমব্যথী পিতার গোপন অর্থানুকূল্যে একবার বেহাই-

বাড়ী থেকে আশাতীত তত্ত্ব এলে শ্বাশুড়ী পুত্রবধূকে গৃহে আনেন কিন্তু পুত্রবধূ গর্ভবতী জেনে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। কুলটা সন্দেহে পুত্রবধূকে গৃহথেকে বিতাড়িত করার মুহূর্তে প্রকৃত সত্য জানতে পেরে নিরস্ত হন। ঘটনাবিবৃতির কৌশলে গল্পপাঠে লজ্জাজনিত চাপাহাসিতে আমরা মুগ্ধ হই। ইতিপূর্বে 'নিষিদ্ধ ফল' গল্পে অনুরূপ সমস্যাকে কেন্দ্র করে লেখক গল্পরস জমিয়ে তুলেছিলেন।

'সুধার বিবাহ' (বৈশাখ, ১৩৩৪) গল্পটির প্রায় একই সমস্যা নিয়ে লিখিত। কন্যা সুধার ষোল বৎসর বয়স না হলে পিতা সারদাকিঙ্কর তার বিয়ে দেবেন না স্থির করেছিলেন কিন্তু দেখা গেল চোদ্দ বৎসর বয়সেই সুধা যুবক অতুলের প্রেমে পড়েছে। এ সংবাদ জানতে পেরে ক্রুদ্ধ পিতা অন্যত্র সুধার বিবাহের উদ্যোগ করেন। সুধা তার বিবাহিতা ভগিনী নির্ম্মলার সাহায্যে আরক সেবনে গাত্র বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ করে তোলে ফলে পাত্র পক্ষের অমনোনীত হওয়ায় বিয়ে ভেঙ্গে যায়। পরে অতুলের সঙ্গেই সুধার বিবাহ হয়। পিতার মনোনীত অর্থশালী পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করে কলেজ-শিক্ষক দরিদ্র অতুলকে বিবাহ করে সুধা প্রেমের মর্য্যাদা দিয়েছে।

বিবাহ সমস্যা নিয়ে সুধার মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও সেই দ্বন্দ্ব সুচিত্রিত হয়নি। এই মানসিক দ্বন্দ্বকে এড়াতে গিয়ে বোধ করি লেখক সুধাকে আরক সেবনে গাত্রবর্ণ পরিবর্তনহেতু পিতার মনোনীত পাত্রপক্ষের অপছন্দ করিয়ে সমস্যার সমাধান করেছেন। লেখকের এই ধরণের চেষ্টায় কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে বলে মনে হয়। গল্পে কৌতুকরসও ঠিক দানা বাঁধতে পারেনি।

দাম্পত্য প্রেমের করুণরসাত্মক কাহিনী 'বি.এ. পাস কয়েদী' (আশ্বিন, ১৩৩৮)। স্বদেশী আন্দোলনে ধৃত জনৈক বি.এ. পাশ কয়েদী শরৎ বাঁড়ুয্যের স্ত্রী মোক্ষদা শুধুমাত্র স্বামী সন্দর্শনের জন্য আত্মপরিচয় গোপন করে জেলর সাহেবের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করে এবং কয়েদীও স্ত্রী সঙ্গ লাভের জন্য একই বাড়ীতে পাচক বৃত্তি অবলম্বনে কিভাবে মিলিত হয়েছিল তারই কৌতুককর অথচ করুণ কাহিনী এই গল্পের বিষয় বস্তু। লেখকের দাম্পত্য জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা এখানে প্রকাশিত। ইতিপূর্বে 'নূতন বউ' 'বাপ কা বেটা' ইত্যাদি গল্পেও লেখকের এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

গল্পগুচ্ছের পরিশিষ্টে সংযোজিত 'মাতঙ্গিনী কাহিনী' ও 'বেশ্যা খুন' গল্প দুইটি সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। 'মাতঙ্গিনী কাহিনী' গল্পে লেখক জানিয়েছেন — 'এই ঘটনাটি বিখ্যাত সাহিত্যিক কৃষ্ণনগর নিবাসী রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুরের মুখে যেমন শুনিয়াছি, নিম্নে তাহাই বর্ণনা করিলাম।' শ্রুতিমূলক এই গল্পটিতে মাতঙ্গিনী নাম্নী এক ব্যাভিচারী স্ত্রী দীর্ঘদিন

পর তার প্রবাস-ফেরত স্বামীকে গৃহে উপস্থিতির দিনেই প্রেমিকের সাহায্যে হত্যা করে ধরা পড়ে দ্বীপান্তরিত হয়েছিল তারই করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ইতঃপূর্বে তিনি 'হীরালাল' গল্পটি রচনা করেছেন।

'বেশ্যা খুন' গল্পে কলকাতার কোন এক কু-পল্লীতে এক বারবণিতার মৃত্যুর করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অপূর্ব সুন্দরী এক বিধবা, প্রেমিকের হাত ধরে একদিন গৃহত্যাগ করেছিল এবং প্রতারিত হয়ে পতিতা জীবনযাপনে বাধ্য হয়। দশ বৎসর পর তারই ঘরে আগত যুবককে তার সহোদর ভাই বলে চিনতে পেরে সে অনুশোচনায় আত্মহত্যা করে। যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয় এবং যুবক মুক্তি পেয়েছিল। বারবনিতাদের প্রতি প্রভাতকুমারের সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় গল্পটিতে আছে।

উপরে আলোচিত বারটি গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি ছাড়া আরও আটটি গল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলি তাঁর কোন গল্পগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়নি। সেই গল্পগুলির পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত, ছদ্মনামে লেখা 'পূজার চিঠি' (১৩০৪) শীর্ষক গল্প দুইটি প্রভাতকুমারের গল্প হিসাবে মোটেই উল্লেখ যোগ্য রচনা নয়। পূজা উপলক্ষে গৃহে আগত স্বামীকে পত্র লিখে স্ত্রী অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে একশিশি কুন্তলীন সুগন্ধি আনতে অনুরোধ করেছে। বিরহী স্ত্রীর মানসিকতার পরিচয় পত্র দুইটিতে রয়েছে। গল্পদুইটি লেখকের অল্প-বয়সে লিখিত। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে শরৎচন্দ্র তাঁর 'মন্দির' গল্পটি লিখে ১৩০৯ সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

অবৈধ সন্তানের জন্মদাত্রী মাতার সন্তান স্নেহ এবং সেই অবৈধ সন্তানের পালক এক নি:সন্তান দম্পতির সন্তান বাৎসল্যের কথা দুধ - মা (চৈত্র, ১৩৩৮) গল্পে বর্ণিত হয়েছে। গল্প কাহিনী এইরূপ —

খৃষ্টান পাদ্রীপুত্র জোসেফ এবং নিম্নবর্ণের ফুলটুসিয়ার অবৈধ সম্পর্কে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। শিশুর প্রাণ রক্ষার্থে গোপনে তাকে এক নি:সন্তান দম্পতির বাড়ীর দরজায় রেখে আসা হলে এই দম্পতি সন্তানস্নেহে তাকে লালন পালন করেন। অর্থের বিনিময়ে ফুলটুসিয়াকে তাঁরা দুধ-মা হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। অবশ্য ফুলটুসিয়া যে এই সন্তানের প্রকৃত জননী একথা তারা জানতেন না। দম্পতীর অকৃত্রিম সন্তান স্নেহ এবং আদর যত্নকে উপেক্ষা করে, বসন্তরোগাক্রান্ত হয়ে ঝি হিসাবে নিয়োজিত এই ফুলটুসিয়ার কোলে

মাথা রেখে যখন শিশুটি মারা গেল তখন ফুলটুসিয়ার বুকফাটা কান্না এবং শিশুটির সংস্কারের প্রশ্নেই প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে । একটি শিশুকে কেন্দ্র করে – কয়েকটি হৃদয়ের সন্তানস্নেহ লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সমাজের যৌন সম্পর্কের জটিলতার কথা প্রভাতকুমার তাঁর এই গল্পটি ছাড়া অন্য কোথাও এমন স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন নাই ।

'গুল বেগমের আশ্চর্য গল্প(১৩১৬) ভাষান্তর থেকে গৃহীত রচনা । ১৩১৬ সালে 'মুসলমানী কেচ্ছা নং ৩' নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ।

'আমলার নমুনা' (ভারতী, পৌষ, ১৩০৬) গল্পে জজ আদালতের আমলাগণের চরিত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে । সেরেস্তাদার রাধামাধববাবু প্রাক্তন জাঁদরেল পুলিশ ইনস্পেকটর । আত্মসম্মানবোধহীন রাধামাধববাবু এজলাসে বসে সারাদিন তার প্রাক্তন চাকুরীর জীবনে কিভাবে মিথ্যা প্রবঞ্চনা, অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করতেন তারই কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনায় এবং তাম্রকূট সেবনেই অফিস মাতিয়ে রাখতেন।এই আমলাটির বুদ্ধিও ছিল কিছুটা স্থূল, পদগৌরবে নিজেকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলে মনে করতেন, সবার উপরেই মাতব্বরী করার চেষ্টায় থাকতেন এবং নিজের প্রাধান্য খর্ব হলে সকলকেই শুনিয়ে দিতেন-তার মাইনে আসে খোদ Impercial Government Fund থেকে অতএব তাঁর চাকুরী খাবার কোন ভয় নাই । মোটকথা সেরেস্তাদারবাবু ছিলেন সুচতুর এবং অর্থলোভী, অন্যপক্ষে অফিসের অন্য একজন আমলা রুক্মিনীবাবু ছিলেন ক্ষমতালোভী । কৌতুকপূর্ণ ঘটনার উল্লেখে অতি সরসভাবে চরিত্রগুলি বর্ণিত হয়েছে ।তাঁদের কুৎসিৎ চরিত্রের কথা বর্ণনা করলেও কোথাও ব্যঙ্গবিদ্রূপের স্থূল নাই ।

প্রভাতকুমারের গল্প উপন্যাস মূলত: বয়স্কদের জন্যই রচিত হয়েছে । তাঁর রচনাধারায় ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় ১৩৩৪ - ৩৫ সালে। এই সময়ে অল্প বয়স্কদের জন্য কিছু গল্প রচনা করেছেন, অবশ্য এইগুলি তাঁকে প্রিয়জনের অনুরোধেই রচনা করতে হয়েছে । 'রামধনু' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাজির বিচার' (মাঘ, ১৩৩৪) এবং 'বীরবলের গল্প' (কার্তিক, ১৩৩৫) শীর্ষক গল্প দুইটি, রংপুরে বসবাসকালে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু মহকুমা হাকিম বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের অনুরোধক্রমে রচিত । বিশ্বেশ্বরবাবু ছিলেনছোটদের মাসিক পত্র 'রামধনু'র তৎকালীন(মাঘ,১৩৩৪) সম্পাদক ।

'কাজির বিচার' অল্পবয়স্কদের জন্য লিখিত নীতিকথামূলক গল্প। অলস, অকর্মণ্য ধনী লোকদের সঙ্গে দরিদ্র এবং পরিশ্রমী লোকদের পার্থক্য কোথায় এবং পরিশ্রমী লোকেরা সর্বত্র কিভাবে পূজিত, পারস্য দেশের কাহিনী অবলম্বনে এই নীতিকথাই গল্পে বিবৃত হয়েছে। শিশুমনোপযোগী কাহিনী এবং সহজ সরল ভাষায় বর্ণনাগুণে গল্পটি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

বীরবলের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত একটি কৌতুককর কাহিনী 'বীরবলের গল্প' (কার্তিক, ১৩৩৫)। কোন কারণে একবার সম্রাট আকবর তাঁর সভাসদ বীরবলের প্রতি রুষ্ট হয়ে তাঁকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেন — বীরবলও অম্লান বদনে বেরিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকেন। আকবরের মনে তার কৃতকার্য্যের জন্য অনুশোচনা হয় এবং বীরবলের অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে কৌশলে তাঁর অবস্থিতি জানবার জন্য তাঁর অধীনস্থ পঞ্চাশ জন সামন্ত রাজার কাছে একটি করে মেড়া পাঠিয়েদেন। এবং আদেশ দেন রোজ প্রত্যেক মেড়াকে চার সের করে দানা খাওয়াতে হবে। কিন্তু একমাস পর রাজকর্মচারীরা মেড়াটিকে যখন ফিরিয়ে আনবে তখন কোনক্রমেই যেন তার ওজন না বাড়ে। সামন্তরাজারা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। একমাস পর মেড়াগুলি ফিরে এলে দেখা গেল একটি ছাড়া সব কয়টির ওজন বৃদ্ধি ঘটেছে। অপেক্ষাকৃত কৃশ মেড়াটিকে যে রাজ্যে পাঠানো হয়েছিল সেই রাজ্যের রাজাকে তলব করে আকবর জানলেন কোন এক ব্রাহ্মনের পরামর্শে তিনি মেড়াটিকে বাঘের সামনে বেঁধে রেখে দানা খেতে দিতেন। প্রাণ ভয়ে ভীত মেড়া প্রায় কিছুই খেতনা এবং ক্রমাগত শীর্ণকায় হতে থাকে। আকবর বুঝলেন এই ব্রাহ্মণ বীরবল ছাড়া অন্য কেউ নয়। অনুচর পাঠিয়ে বীরবলের খোঁজ করেন এবং অতিসমাদরে তাঁকে রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কাহিনীর সরসতা এবং ভাষার সরলতা গল্পটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

তৎকালীন 'রংমশাল' পত্রিকার সম্পাদক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১০ - ৬৯) অনুরোধক্রমে প্রভাতকুমার 'কাজির বুদ্ধি' (মাঘ, ১৩৩৫) গল্পটি লিখেছিলেন। কৌতুকরসাশ্রিত এই গল্পটিতে বাদশাহী আমলের দিল্লীর জনৈক প্রধান বিচারপতি সুকৌশলে কি ভাবে বন্ধুর লক্ষটাকা আত্মসাৎকারীকে লোভের বশবর্তী করে টাকা আদায় করে দিয়েছিলেন তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কৌতুক এবং কৌতুহলের সংমিশ্রনে গল্পটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

প্রভাতকুমারের গল্পপাঠে দেখা যাবে তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রীর অবস্থিতি লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের পরিচিত সীমানার খুব বেশী দূরে নয়। ছাত্রাবস্থায়-বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল, কর্মসূত্রে-সিমলা, উত্তর বঙ্গের রংপুর, দার্জিলিং গয়া, কলকাতা এবং আইন পড়ার সুবাদে-বিলাত, এসমস্তই তাঁর পরিচিত ভূখণ্ড। আবার জীবনযাত্রায়ও নানা পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছেন — রেলওয়ের সাধারণ কর্মচারীর পুত্র, ব্যক্তিগত জীবনে কেরানীগিরীর, ওকালতির, অধ্যাপকের এবং সম্পাদকের বিভিন্ন জীবন পরিধিতে তাঁর পরিক্রমা চলেছে। তাই তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে রেলওয়ের গার্ড ডিসুজা, মাসিক পঁয়ষট্টি টাকার বেতনের কেরাণী নীলমণি, উর্দ্দুওয়ালা উকিল জোয়ালা প্রসাদ, দিনাজসাহীর পসারহীন উকীল সুবোধচন্দ্র, মাসিক দেড় শত মুদ্রা বেতনে বেসরকারী কলেজের বিনয়নম্র অধ্যাপক ব্রজমাধববাবু, কন্যাদায়গ্রস্ত সুনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধরা পড়েছে লণ্ডনের বিত্তশালী ল্যাণ্ডলেডী, দারিদ্র্যক্লিষ্ট কিশোরী ম্যাগী, হোটেলের পরিচারিকা এথেল আরও অনেকে। পাত্র পাত্রীর চরিত্রগুলিও কি বিচিত্র — অসৎ প্রতারক ভণ্ড, সুযোগসন্ধানী, অর্থলিপ্সু, নেহাত ভালমানুষ, ধর্মীয় গোঁড়ামি, রাজনৈতিক উন্মত্ততা ইত্যাদি ভালমন্দ কোন গুণেরই অভাব নাই এদের চরিত্রে। কিন্তু সৎ অথবা অসৎ যে প্রবৃত্তির অধিকারী তারা হোক না কেন লেখকের সহানুভূতি থেকে কেউ বঞ্চিত হয়নি। এমনকি 'হীরালাল' গল্পের কুলটা রমনীকে পতিতালয়ে নির্বাসিত করলেও তাকে গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত লেখক করে দিয়েছেন। এর মধ্যে হীনতা আছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেটা তার পাপের শাস্তি বিশেষ। জীবনের প্রতি যাঁর এত গভীর সহানুভূতি, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে 'অগভীর'[১১১] বলা হয়ত ঠিক হবেনা। বরং বলা যায় জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধের ফলে তিনি জীবনের অসঙ্গতিগুলিকে আবিষ্কার করেছেন এবং আশ্চর্য নিরপেক্ষতা অবলম্বনে ঘটনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে কৌতুক অনুভব করেছেন। সমাজ অথবা ব্যক্তিজীবনের অসঙ্গতির বিচার বিশ্লেষণ অথবা তীব্র কষাঘাতে জীবনকে জর্জরিত করে তুলতে চাননি, যেমন করেছেন চেকভ্ বা মোপাসাঁ। বাস্তববাদী মোপাসাঁ তাঁর সমকালীন ফরাসী দেশের সমাজ জীবনে ব্যভিচারের তিক্ততাকে, সুবিধাভোগী সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গ্লানিকে উন্মুক্ত করে প্রচণ্ডরোষে তাকে তীব্র কষাঘাত করেছেন। সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, বঞ্চিত জীবনের হাহাকারের প্রতি গভীর সমবেদনায় তিনি বঞ্চনাকারীদের প্রতি নির্মম হয়ে উঠেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি চরমপন্থী। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ধর্ম অথবা নীতিবোধকে তিনি বজ্রমুষ্টিতে আঘাত হেনেছেন। জীবনের প্রতি প্রভাতকুমারেরও সহানুভূতির অন্ত নেই, তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রচণ্ড রাজনৈতিক অথবা ধর্মান্দোলনের মধ্যেও অসঙ্গতিকে আবিষ্কার

করেছেন, দারিদ্র্য পীড়িত উকীল সুবোধচন্দ্রের ফুলার সাহেব-অভ্যর্থনার মধ্যে নীচতা আছে ঠিকই তার জন্য লেখক সুবোধচন্দ্রের মাথায় গোবর ও কাদা-গোলা জল নিক্ষেপ করালেও ডেপুটির চাকুরী শেষ পর্য্যন্ত পাইয়ে দিয়েছেন। আসলে তিনি মোপাসাঁর মত কোথাও চরমপন্থী হতে পারেন নি। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তাঁর গল্পে থাকলেও তাদের মৃদু পদক্ষেপ কোথাও যন্ত্রনাদায়ক হয়ে ওঠেনি। তিনি কোথাও সংস্কারক অথবা বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি, বোধকরি তাঁর মধ্যবিত্ত মানসিকতা কোন কিছুর চরমে পৌঁছতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে সমস্ত পরিস্থিতিতে যেমন রয়েছে একটি মানিয়ে চলার স্বভাব, সাহিত্য ক্ষেত্রেও ঘটেছে তারই প্রতিফলন। আমাদের সমাজে নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত তখনও হয়নি, প্রভাতকুমার নারীর শিক্ষাদীক্ষাকে স্বীকার করে নিলেও তার স্বাতন্ত্র্যবোধকে আমন্ত্রন জানাতে পারেন নি। তাই দেখি 'বিলাসিনী' গল্পের ব্রজমাধববাবু ব্যঙ্গচ্ছলে স্ত্রীকে বলেছেন 'এটাতো হচ্ছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগ কিনা ! এ যুগে ত স্বামী স্ত্রী আর পরস্পরের অধীন নয় ।' প্রভাতকুমার এবং মোপাসাঁর দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যের সার্থক বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় —' মোপাসাঁর কৌতুক ব্যঙ্গের ছুরির ফলায় সমাজকে দীর্ণ বিদীর্ণ করেছে, প্রভাতকুমারের কৌতুক সামাজিক স্বীকৃতির অক্ষয়বটের প্রাচীন ছায়ায় সহজ সরল প্রমোদরসে উচ্ছলিত হয়েছে । নরম্যাণ্ডির কৃষক নীচু তলার মানুষ এবং অরণ্য বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতার' জীবনোচ্ছ্বাস প্রভাতকুমারের দৃষ্টি সীমার বহির্ভাগে 'Maupassant invites a selected company or else a very tolerant one' আর প্রভাতকুমারের সাহিত্যে সকলের অবাধ উদার আমন্ত্রণ । মোপাসাঁ জ্বালাতে জানেন প্রভাতকুমার ভোলাতে জানেন ।'[১১২]

প্রভাতকুমার প্রধানত: বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনধারার রূপকার। কোন বিশেষ আদর্শায়িত অথবা আবেগমথিত জীবন-চিত্রণ নয়, সাধারণ বাঙালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নিত্যদিন যে সমস্যার উদ্ভব ও সমাধান প্রায়শই ঘটে, প্রভাতকুমারের গল্পকাহিনীর পটভূমি তাকেই আশ্রয় করেছে। তাঁর সমকালীন পারিবারিক - সামাজিক আচার ও সংস্কারে লালিত বাঙালীমনের বিস্তৃত পরিচয় প্রভাতকুমারের গল্পে পাওয়া যায় । বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলন বাঙলার শিক্ষিত তরুণ যুবক সম্প্রদায়ের একাংশকে তথাকথিত সন্ন্যাস জীবন যাপনে যে প্রেরণা দান করেছিল, যে স্বদেশীয়ানার ঢেউ দেশপ্রেমের উদ্দামতা একদা আমাদের শান্ত জীবনে উত্তাল তরঙ্গ তুলেছিল, তারই দুই চারিটি তরঙ্গ প্রভাতকুমার তাঁর গল্পে অনায়াস ভঙ্গিতে সকৌতুকে আহরণ করেছেন । স্ত্রী শিক্ষার প্রসার প্রচেষ্টা, নারী স্বাধীনতা আন্দোলন , স্বল্প শিক্ষিতা নারীর উপন্যাস পাঠে অত্যধিক আসক্তি, সাধারণ বাঙালীর বিলাতী বা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের অনুকরণে জীবন যাপন ইচ্ছার কথাও তাঁর গল্পের পটভূমিকা রচনা

করেছে। প্রগতিশীল ব্রাহ্ম, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু, রেলওয়ে, কোর্ট কাছারির কর্মচারী, বিচারক, আইনজীবী করণিক থেকে দারোগা- পুলিশ -প্রহরী সকলেই তাঁর গল্পকাহিনীর ছত্রচ্ছায়ায় স্থানলাভ করেছে। এমনকি সংসার - পালিত পশুও সেখান থেকে বাদ পড়েনি।

সংসারী মানুষের এই বিচিত্র জীবনাচরণের ছোটখাট নানা অসঙ্গতি-বিরোধকে কেন্দ্র করেই মূলত: প্রভাতকুমারের গল্পকাহিনী গড়ে উঠেছে। ব্যবহারিক জীবনাচরণে প্রায়শই যে সব বিরোধ অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় কাহিনী নির্বাচনে প্রভাতকুমারের রসদৃষ্টি x x রসদৃষ্টি প্রধানত: সেই অসঙ্গতি - বিরোধের সন্ধান করেছে। এই অসঙ্গতিকে তিনি লক্ষ্য করেছেন দেশের ধর্ম এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে, স্বামী - স্ত্রী, প্রেমিক - প্রেমিকার হৃদয় সম্পর্কে, আইন ব্যবসায়ীর জীবনে, দারোগা-পুলিশের আচার আচরণে, শ্বশুর জামাই এমনকি প্রভু ভৃত্যের সম্পর্কের মধ্যে। এই অসঙ্গতি শুধু ঘটনাগত নয় চারিত্রিকও বটে। 'প্রনয় পরিণাম' 'বলবান জামাতা', 'রসময়ীর রসিকতা', 'বায়ুপরিবর্তন' ইত্যাদি গল্পে এর পরিচয় আছে। এছাড়াও প্রভাতকুমারের কয়েকটি গল্প ভারাক্রান্ত হৃদয়ের অশ্রু-সজলতায় পরিপূর্ণ। 'দেবী', 'কাশীবাসিনী', 'আদরিনী', 'ফুলের মূল্য' গল্পসমষ্টিকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

প্রভাতকুমারের গল্পকাহিনী গঠনের মূল রীতি গল্পে ভ্রান্তি-জনিত জটিলতার সৃষ্টি এবং কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে জটিলতার বন্ধন মুক্তি ঘটিয়ে প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটন এবং সমাপ্তিতে ভ্রান্তির মধুরান্তিক অবসান। এরই মধ্য থেকে কিছু অসঙ্গতিজনিত কৌতুকরস আবিষ্কার প্রচেষ্টা প্রায় সর্বত্রই বর্তমান। 'বউচুরি' (বৈশাখ, ১৩০৭) গল্পের কলেজেপড়া শিক্ষিত অনাথশরণের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে দৃঢ় ধারণা জন্মেছে-যেহেতু মন্দাকিনীকে সে ভাল-বেসে বিয়ে করেনি তাই মন্দাকিনী তার স্ত্রী নয়, — ভগিনী। কলিকাতা ভ্রমন-কালে অসুস্থা মন্দাকিনীর সেবা এবং সঙ্গ লাভে প্রকৃতির আহ্বানেই তার এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে উভয়ের মিলনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। বলাবাহুল্য অনাথশরণের চিন্তাধারা যেমন অসঙ্গতিপূর্ণ তেমনি কৌতুককর। এখানে গল্প-মধ্যে ভ্রান্তির অবতারণা এবং অবসান ঘটিয়ে মিলনান্তক পরিণতিতে পাঠক মনে যুগপৎ কৌতুকপূর্ণ আনন্দরসের সঞ্চার হয়েছে। 'নিষিদ্ধ ফল' (ফাল্গুন, ১৩২২) গল্পে দেখি ষোল বৎসর বয়: প্রাপ্তির পূর্বে পুত্র বধূকে পুত্রের সঙ্গে মিলনে বিরতরাখা জনিত দুর্গাচরণ বাবুর ভ্রান্ত ধারণাই কাহিনীতে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। আবার যখন দেখেন প্রকৃতির অমোঘ আহ্বানে তারই পুত্র রাতের অন্ধকারে বধূ-মিলনের আশায় জীবন বিপন্ন করেও বধূর কক্ষে উপস্থিত হয়েছে তখনই দুর্গাচরণবাবুর ভ্রান্ত ধারণার অবসান সঙ্গে সঙ্গে গল্পের মিলনা-

-তক পরিণতি ত্বরান্বিত হয়েছে। 'বিলাসিনী' (পৌষ, ১৩৩২) গল্পেও অধ্যাপক ব্রজমাধববাবুর মনঃকষ্টের কারণ—ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে স্ত্রী চরিত্রে সন্দিহান হওয়া। এই সন্দেহ ভঞ্জন হলে উভয়ের মিলনের বাধা অপসারিত হয়ে গল্পে সুখান্তক পরিণতি এসেছে। প্রকাশের চিঠি সম্পর্কে ভ্রান্তধারণাই 'বিলাত ফেরতের বিপদ' (আশ্বিন, ১৩০৮) গল্পে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। অবশ্য প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের মাধ্যমে পাত্রপাত্রীর মিলনে বিশেষ বাধা হয় নাই।

প্রভাতকুমার তাঁর গল্পে প্রধানত: কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে অসঙ্গতি জনিত কৌতুকরসের সৃষ্টি করলেও চরিত্রগত অসঙ্গতিও অনেক সময় গল্পরস নিষ্কাষণে সহায়ক হয়েছে। 'বলবান জামাতা' গল্পে নলিনী তার দেহের নারী-সুলভ লাবণ্য দূর করে কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে দেহে পুরুষ সুলভ কাঠিন্য আনয়নের চিন্তা এবং চেষ্টায় তার চরিত্রগত অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। 'রসময়ীর রসিকতা', 'বায়ুপরিবর্তন' ইত্যাদি গল্পগুলি এই সাক্ষ্য বহন করে।

প্রভাতকুমারের কয়েকটি গল্পের হাস্যরস নিষ্কাষণের মাধ্যম হয়েছে—আমাদের মনের দৈব ও আধিভৌতিক অন্ধবিশ্বাস। অনেক সময় আমাদের মনের এই অন্ধবিশ্বাসের ফলে এমন সব কার্য্যকলাপ আমরা করি যা বাস্তববুদ্ধি মতে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং হাস্যকর। 'সারদার কীর্ত্তি', 'খুড়া মহাশয়', 'যজ্ঞভঙ্গ' ইত্যাদি গল্পে এর পরিচয় আছে।

কয়েকটি গল্পে হাস্যরস স্ফূর্তির কারণ হয়েছে উদ্ভট অনুকরণ প্রবৃত্তি। 'আমার উপন্যাস' (আশ্বিন, ১৩১৩) গল্পে, অতিরিক্ত উপন্যাস পাঠে নায়-কের মনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'এর দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের অনুকরণে ক্ষুধার তাড়নায় ইন্দুর ভক্ষণের ইচ্ছা অথবা উপন্যাসের অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ কাহিনী পাঠে নিজ জীবনেও অ্যাডভেঞ্চার উপলব্ধির ইচ্ছায় ডাক্তারী পাশ করেও পাচকবৃত্তি গ্রহন ব্যাপারটি একদিকে যেমন কৌতুককর অন্যদিকে তরুণমতিদের অত্যধিক উপন্যাস পাঠের প্রতি মৃদু কটাক্ষ অনুভব করা যায়। 'বিষবৃক্ষের ফল' (কার্তিক, ১৩০৬), 'ঔপন্যাসিক' (কার্তিক, ১৩৩০) ইত্যাদি গল্পেও ব্যঙ্গ কৌতুক একই আধারে পরিবেশিত হয়েছে। প্রভাতকুমারের গল্পে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ থাকলেও প্রায়ই অত্যন্ত মৃদু, হাস্যকৌতুকের আলোক ছটায় বিদ্রুপের জ্বালা ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে।

শুধু মাত্র হাস্য কৌতুক, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কটাক্ষ নয়, মানব মনের গভীর আর্তি, দু:সহ বেদনার কথাও কয়েকটি গল্পে সুপ্রকাশিত। 'কাশীবাসিনী' গল্পে স্খলিত-চরিত্র মাতার সন্তান-স্নেহের গভীরতা, 'ফুলের মূল্য' গল্পে এক দারিদ্র্য-

পীড়িত বিদেশী কিশোরীর ভ্রাতৃপ্রেম, 'আদরিনী' গল্পের পৌরুষদীপ্ত জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের গৃহপালিত পশু অবলম্বনে স্নেহ বিগলিত চিত্তের মর্মস্পর্শী প্রকাশ আমাদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত ও অশ্রুসজল করে তোলে।

প্রভাতকুমারের গল্প পরিবেশনের নিপুণ ভঙ্গি উচ্চাঙ্গের শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। স্বল্প কথায় অতিঅল্প আয়োজনে ত্বরিতে গল্প পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠকমনকে সহজে আকৃষ্ট করার দুরূহ কৌশলের কুশলী শিল্পী তিনি। গল্পপরিবেশনার সহজ সরল ভাব, ভাষার আন্তরিকতায় পাঠকমনকে সহজেই সম্মোহিত করে, গল্পের উপযুক্ত স্থলে আকস্মিক অথচ নির্ভুল ইতিরেখা টানায় তাঁর পারঙ্গমতা অবিস্মরণীয়। যেমন ছোটগল্প রচনার শিল্পগত ত্রুটি সত্ত্বেও 'গহনার বাক্স' গল্পটির প্রাথমিক অবতারণা ——

'ছিন্নপুরাতন কালো সার্জের চাপকানের উপর পাকানো দড়ির মত চাদর ঝুলাইয়া, একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক শীতসন্ধ্যার অনতিপূর্বে আলিপুর হইতে খিদিরপুরের রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছেন। লোকটির বয়স ৪০ পার হইয়াছে; রংটি ফর্সা, গোঁফগুলি বড় বড়, দাড়ি কামানো, দেহখানি কৃশ ও দুর্বল, চক্ষুদুইটি কোটরগত। ধীরে ধীরে পথ চলিতেছেন — যেন বড় ক্লান্ত, বড় পথশ্রান্ত।'

এখানে ভদ্রলোকটির পোষাক পরিচ্ছদের জীর্ণতা, ধীরে ধীরে পথ চলা ইত্যাদি বর্ণনার মাধ্যমে একটি দারিদ্র্যপীড়িত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ চিত্তের সুন্দর চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। অথচ বর্ণনায় কোন বাহুল্য অনুপস্থিত। ভদ্রলোকটির দারিদ্র্যই গল্পটির মূল সমস্যা। তাই গল্পে দেখা যায় যে মুহূর্তে ভদ্রলোকের অযাচিতভাবে অর্থপ্রাপ্তি ঘটেছে তৎক্ষনাৎ লেখক সমস্ত সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে গল্পের যবনিকা টেনে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের গল্প রচনার কাব্যময়তা – তাঁর সূক্ষ্ম মনন, প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় যোগাযোগজনিত লীলামাধুর্যের আস্বাদ অথবা শরৎচন্দ্রের তীব্র আবেগময়তা প্রভাতকুমারের গল্পে হয়ত তেমন ভাবে উপস্থিত হতে পারেনি কিন্তু তাঁর গল্পের সহজ আন্তরিকতাময় পরিবেশের মধ্যে পাঠক তার ঘরের কথার পরিচয় পেয়েছে এবং এইখানেই তাঁর জনপ্রিয়তার উৎস।

একগভীর সহানুভূতিশীল হৃদয় নিয়ে, বাঙালীর রস সংস্কারকে ভিত্তি করে প্রভাতকুমার আমাদের গল্প পরিবেশন করে অপরূপ তৃপ্তিলাভের আনন্দলোকে উত্তরণ করিয়েছেন। তাঁর রঙ্গ-ব্যঙ্গ কৌতুকে ত্রৈলোক্যনাথের (১৮৪৭ - ১৯১৯) ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাতের জ্বালা অথবা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১২৬১ - ১৩১২) বা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯ — ১৯১১) উদ্দেশ্যমূলক পক্ষপাতিত্ব বিশেষ দৃষ্ট নয়। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের (১৮৪৮ - ১৯২৫) রচনাতেও যে নিরপেক্ষতার অভাব মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা গেছে প্রভাতকুমারের রচনা অনেকাংশে সেই দোষ মুক্ত। বরং দীনবন্ধু মিত্রের লেখনী লেখকের নিরপেক্ষ কৌতুকপ্রিয় দৃষ্টির যে পরিচয় দিয়েছে, প্রভাতকুমার যেন সেই পথ অবলম্বনেই প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ কৌতুকপ্রিয়তার গুণে তাঁর সমৃদ্ধ, সহানুভূতিশীল হৃদয়ের পরিচয় বহু গল্প সেকালের গণ্ডী অতিক্রমনে একালের পাঠক মনে স্থায়ী আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।

— : উল্লেখ পঞ্জী : —

১। প্রবাসী — মাঘ, ১৩১৮

২। প্রভাতকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ১৬ই অগ্রহায়ণ,—১৩১৮ সালের পত্রাংশ — দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫, পৃষ্ঠা ১৭৬

৩। আধুনিক বাংলা সাহিত্য — মোহিতলাল মজুমদার পৃঃ ১১৬

৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২১৭

৫। ঐ ঐ পৃঃ ২১৭

৬। ঐ ঐ পৃঃ ২২২

৭। বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থখণ্ড) — সুকুমার সেন পৃঃ ৫৫

৮। ঐ (ঐ) ঐ পৃঃ ৫৫ -৫৬

৯। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (ভূমিকা) — জগদীশ ভটাচার্য পৃঃ ৮

১০। বাংলা গল্প বিচিত্রা — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পৃঃ ২৫

১১। ঐ ঐ পৃঃ ২১

১২। ঐ ঐ পৃঃ ১৯

১৩। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার — ভূদেব চৌধুরী পৃঃ ২০৭

১৪। সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার — বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৫৪ - ৫৫

১৫। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন কথাসাহিত্য — ডঃ গোপীনাথ রায়চৌধুরী পৃঃ ৮৭

১৬। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৮৮

১৭। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৯১

১৮। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন কথাসাহিত্য — ডঃ গোপীনাথ রায়চৌধুরী পৃঃ ৯২

১৯। বাংলা উপন্যাসের ধারা — অচ্যুত গোস্বামী পৃঃ ২১৩

২০। বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাস(ভূমিকা, প্রথম খণ্ড) — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ৩৭ - ৩৮

২১। প্রভাতকুমার জীবন ও সাহিত্য—ডঃ শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ১৩

২২। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৩

২৩। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৮১

২৪। প্রভাতকুমারের প্রথম গল্প রচনা সম্পর্কে ডাঃ শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় 'প্রভাতকুমার : জীবন ও সাহিত্য গ্রন্থে'(অষ্টম পৃষ্টায়) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২৫। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সালের পত্রাংশ — দেশ, সাহিত্য সংখ্যা - ১৩৭৫, পৃঃ ১৪৮

২৬। ঐ ঐ পৃঃ ঐ

২৭। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার — ভূদেব চৌধুরী পৃঃ ১১১ - ১২

২৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) — সুকুমার সেন পৃঃ ২২১

২৯। ঐ (ঐ) ঐ পৃঃ ২৩৩

৩০। জীবনস্মৃতি — রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রকাশিত, শতবার্ষিক সং

৩১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড) — সুকুমার সেন পৃঃ ২৯৯

৩২। প্রভাতকুমার : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে — ডঃ শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় মাত্র চারিটি গল্পের উল্লেখ করেছেন।

৩৩। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ৭ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সালের পত্রাংশ — দেশ, সাহিত্য সংখ্যা — ১৩৭৫ পৃঃ ১৬৫

৩৪। হেমচন্দ্র — মন্মথনাথ ঘোষ, মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ, ১৩৩০।

৩৫। প্রভাতগ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড) শ্রীভবন প্রকাশিত পৃঃ ৬০

৩৬। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের ৭ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সালের পত্রাংশ — দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫ পৃঃ ১৬৫

৩৭। ঐ ঐ ঐ ৪ চৈত্র, ১৩০৫ ঐ ঐ পৃঃ ১৬৪

৩৮। ঐ ঐ ঐ ৬ আশ্বিন, ১৩০৬ ঐ ঐ পৃঃ ১৬৭

৩৯। বাংলা গল্প বিচিত্রা — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পৃঃ ২৮

৪০। প্রভাতগ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড) — শ্রীভবন প্রকাশিত পৃঃ ১৬৪

৪১। ঐ (ঐ) ঐ পৃঃ ১৭০

৪২। ঐ (ঐ) ঐ পৃঃ ১৯০

৪৩। ঐ (ঐ) ঐ পৃঃ ১৯৭

৪৪। ঐ (ঐ) ঐ পৃঃ ১০২

৪৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ(নিউ এজ, সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬২)— — শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ ২৪০।

৪৬। সাহিত্য – আষাঢ়, ১৩০৭

৪৭। মনীষা মন্দিরে – সঙ্কল্প, অগ্রহায়ণ, ১৩২২ [illegible]

৪৮। সাহিত্য শ্রাবণ,– ১৩০৮

৪৯। সাহিত্য – আশ্বিন, ১৩০৮

৫০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ২২০

৫১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ –(প্রকাশ ১৩৭৬) বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ পৃ: ২৫৩

৫২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(চতুর্থ খণ্ড) – সুকুমার সেন পৃ: ৫৮

৫৩। সাহিত্য – জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩

৫৪। প্রবাসী – অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

৫৫। বাংলা ছোটগল্প – শিশির কুমার দাশ পৃ: ১৫৪

৫৬। আধুনিক সন্ন্যাসী - প্রভাত গ্রন্থাবলী(তৃতীয় খণ্ড) শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ৩৩

৫৭। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা – বিনয় ঘোষ পৃ: ৩২০

৫৮। প্রভাত গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড)-শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ৭৭

৫৯। ঐ (ঐ) – ঐ পৃ: ৭৪ - ৭৫

৬০। ঐ (ঐ) – ঐ পৃ: ৯৮

৬১। ঐ (ঐ) – ঐ পৃ: ১৪৩

৬২। ঐ (ঐ) – ঐ পৃ: ২৫১

৬৩। ঐ (ঐ) – ঐ পৃ: ১৬৬

৬৪। ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর - দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬

৬৫। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ২২১

৬৬। প্রভাত গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড) - শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ৫২

৬৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) – সুকুমার সেন পৃ: ৫৮

৬৮। সাহিত্যে ছোটগল্প (ফাল্গুন, ১৩৬৫) – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পৃ: ২৪৯

৬৯। প্রভাত গ্রন্থাবলী (চতুর্থ খণ্ড) – শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ৯

৭০। চিত্রা – প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় – দাসী, মে, ১৮৯৬

৭১। প্রভাত গ্রন্থাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) – শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ১৯

৭২। বর্তমান আলোচনার পৃ: নং ৯৮-৯৯।

৭৩। প্রভাত গ্রন্থাবলী (৪র্থ খণ্ড) – শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ৪১

৭৪। ঐ (ঐ) – ঐ পৃ: ৭৮

৭৫। ঐ (ঐ) – ঐ পৃ: ৭৯

৭৬। ঐ (ঐ) – ঐ পৃ: ৯০

৭৭। ঐ (ঐ) – ঐ পৃ: ১৫০

৭৮। প্রভাত গ্রন্থাবলী (ষষ্ঠ খন্ড) — শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ১৬৩

৭৯। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ১৭৭

৮০। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ২০২

৮১। ঐ (সপ্তম খন্ড) — ঐ পৃ: ২

৮২। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ২

৮৩। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ১৪

৮৪। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ১৪ - ১৫

৮৫। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ২৭

৮৬। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ৪৩

৮৭। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ৪৩

৮৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(চতুর্থ খন্ড) — সুকুমার সেন পৃ: ৫৮

৮৯। প্রভাত গ্রন্থাবলী (সপ্তম খন্ড) — শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ৪৭

৯০। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ৭২ - ৭৩

৯১। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ৭৩

৯২। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ৯১- ৯২

৯৩। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ১০৭

৯৪। শরৎ পরিচয় — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১৩৮

৯৫। ঐ — ঐ পৃ: ১৪১

৯৬। ঐ — ঐ পৃ: ১৭২

৯৭। স্বদেশ ও সাহিত্য — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃ: ৯২

৯৮। ঐ — ঐ পৃ: ১৬

৯৯। সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — মাসিক বসুমতী চৈত্র, ১৩৩১।

১০০। প্রভাত গ্রন্থাবলী (সপ্তম খন্ড) — শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ২৪৭

১০১। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ২৫৪

১০২। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ২৭৯ - ২৮০

১০৩। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ২৮৯

১০৪। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ৩০৮

১০৫। ঐ ঐ — ঐ পৃ: ৩৪৬

১০৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড) — সুকুমার সেন পৃ: ৫৯

১০৭। প্রভাত গ্রন্থাবলী (পঞ্চম ভাগ) — বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত পৃ: ২৯৯

১০৮। ঐ ঐ ঐ পৃ: ৩০৭

১০৯। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ২১৯

১১০। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ, এজ)-শিবনাথ শাস্ত্রী পৃ: ২৭৮

১১১। 'প্রভাতকুমার : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে ড: শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন' প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অগভীর' পৃ: ৮১

১১২। বাংলা গল্প বিচিত্রা — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পৃ: ২০ - ২১

—: প্রবন্ধ - নিবন্ধ । :—

গল্প উপন্যাস ছাড়া প্রভাতকুমার কিছু গদ্য নিবন্ধ রচনা করেছেন। এই সমস্ত রচনাগুলিতে তাঁর সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রীতি, সমসাময়িক জীবনধারার পর্যবেক্ষণ এবং ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনার উল্লেখ রয়েছে । তাঁর এই ধরণের মোট ছত্রিশটি গদ্য নিবন্ধের সন্ধান এযাবৎকাল পাওয়া গিয়েছে । তন্মধ্যে বাইশটি রচনা বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে স্থান পেলেও চোদ্দটি রচনা এখনও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতেই আত্মগোপন করে আছে । রচনাগুলিকে বিষয়ানুযায়ী নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করে দেখা যেতে পারে ।

(১) সাহিত্য আলোচনা বিষয়ক – (ক) চিত্রা , (খ) চিত্তবিকাশ (গ) সমালোচন খেয়াল (ঘ) সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর (ঙ) রসসাগরের সমস্যা-পূরণ (চ) মাধবিকা (ছ) ভূমিকা (ঘরের কথা)

(২) ভ্রমন বিষয়ক — (ক) য়ুরোপে xx পদার্পণ (খ) ষ্ট্রাটফোর্ড-অন্ -এভনে একবেলা (গ) অ্যাবটস্‌ফোর্ড (ঘ) ব্রাইটন (ঙ) সিমলা-শৈল ।

(৩) জীবনী বিষয়ক — (ক) বিলাতে মহারাণীর অন্ত্যেষ্টি (খ) রমেশচন্দ্র-স্মৃতি (গ) রাজকাহিনী (ঘ) যোগেন্দ্রচন্দ্র (ঙ) প্রভাতকুমারের স্মৃতিকথা (হেমচন্দ্র সম্বন্ধে) (চ) ৺ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ছ) বঙ্কিমচন্দ্র-জীবনপঞ্জী (জ) চিত্তরঞ্জনের বাণী (ঝ) অমৃতলালের xxxxx স্মৃতিতর্পণ।

(৪) লোককথা ও কিম্বদন্তীমূলক — (ক) নীলকুল বাসুদেব ব্রতকথা (খ) পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত কালিদাসের গল্প (গ) কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব সূচক একটি কিম্বদন্তী ।

(৫) নাট্যকলা সম্পর্কিত আলোচনা — (ক) যাজ্ঞসেনী (খ) বিলাতী থিয়েটার ।

(৬) স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ক – (ক) সর্ব বিষয়ে স্বদেশী (খ) বাবুর আক্ষেপ ।

(৭) বিবিধ — (ক) ইংরাজ রমণী (খ) ডাইনি চরিত (গ) ছেলে মানুষ করা (ঘ) গাজিপুরে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় (ঘ) ভূতনামানো (চ) কুমীর পোষা (ছ) নববর্ষের নিবেদন (জ) চন্দ্রের কলঙ্ক ।

(১) সাহিত্যালোচনা বিষয়ক :—

(ক) চিত্রা (মে, ১৮৯৬)– রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ । রবীন্দ্রনাথ লেখককে গদ্য রচনার নির্দেশ দিলে তিনি এই গদ্য নিবন্ধটি রচনা করেন । রবীন্দ্রনাথের চিত্রা কাব্যের প্রকাশকাল ফাল্গুন, ১৩০২ (ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬) প্রভাতকুমার সমালোচনাটি লেখেন ঐ বৎসর মে মাসে সমসাময়িক সমালোচনা হিসাবে রচনাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। প্রবন্ধটিতে লেখক চিত্রা কাব্যগ্রন্থের বাহ্যিক সৌন্দর্যের পরিচয় থেকে আরম্ভ করে কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন । রবীন্দ্রকাব্যের সার্থক সমালোচনা হয়ত এইটিকে বলা যায় না, তথাপি ' এই গদ্য রচনাটি শুধু প্রভাতকুমারের গদ্য রচনার ইতিহাসে নয় সমসাময়িক সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও মূল্যবান । রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেকালের তরুণ ও অতরুণ শিক্ষিত সমাজকে কি ভাবে আলোড়িত করিয়াছিল তাহার নির্দেশ এই প্রবন্ধটিতে লভ্য।' ১

(খ) চিত্তবিকাশ (ফাল্গুন, ১৩০৫) — কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্ত বিকাশ' (১৩০৫) কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা, প্রকৃতপক্ষে রচনাটি হেমচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভার প্রশস্তি । হেমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু সংবাদ রচনাটিতে রয়েছে । যেমন সাধারণলোকে হেমচন্দ্রকে অন্ধ বললেও তখনও তিনি সত্যকারের অন্ধ হয়ে ~~যান~~ যান নাই — অস্ত্রোপচারে একটি চোখ নষ্ট হলেও অন্য চক্ষুতে ছানি পড়া সত্ত্বেও তিনি সামান্য দেখতে পেতেন। কবির আর্থিক দুরবস্থার কথাও উল্লেখিত হয়েছে ।

(গ) সমালোচন-খেয়াল (আষাঢ়, ১৩১৩) — বেণোয়ারীলাল গোস্বামী রচিত 'খিচুড়ী' ব্যঙ্গকাব্যের সমালোচনা । সমালোচনামূলক হলেও রচনায় বেণোয়ারীলালের প্রতি লেখকের উষ্মা প্রকাশিত হয়েছে। প্রভাতকুমার লিখেছেন —' কথিত আছে, কাব্যে কবির হৃদয়ের পরিচয় পরিস্ফুট হয় । বেণোয়ারী বাবু দ্বিপদ মনুষ্যকে গালি দিয়া' ভূত ভাগাইয়া' দিয়াছেন । কিন্তু গ্রন্থের এক স্থানে চতুষ্পদ প্রাণীর প্রতি তাঁহার যথেষ্ট প্রেমের পরিচয় আছে । ....ঘোড়া না হইয়া গাধা হইলে বেণোয়ারীবাবু বোধ হয় তাহাকে আরও অধিক সমাদর করিতেন । ধন্য কবির স্বজাতি প্রেম । অহো আমরা দ্বিপদ হইয়া জন্মিয়াছি বলিয়াই কি তাহার নিকট এত অপরাধী ?' ২ এই বেণোয়ারীলাল তাঁর 'খিচুড়ী 'ব্যঙ্গকাব্যে' প্রভাতকুমারকে আক্রমন করেছিলেন, তাঁর পোলাও ব্যঙ্গকাব্যেও প্রভাতকুমারের প্রতি ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বোধকরি এই কারণেই প্রভাতকুমার বেণোয়ারীলালকে আক্রমন করেছেন ।

(ঘ) সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর — (আষাঢ়, ১৩২২) ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যরচনার উৎস সন্ধানে লেখক এখানে ব্যাপৃত হয়েছেন। কথিত আছে কোন সংস্কৃত কাব্য-নাটকের অনুসরণে ভারতচন্দ্র তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যটি রচনা করেছেন। কিন্তু প্রবন্ধকার সেই সংস্কৃত কাব্যের নামোল্লেখ কোথাও পান নাই। লেখকের মতে চৌরকবি রচিত 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্যের মাত্র তিনটি শ্লোকের অনুবাদ বিদ্যাসুন্দর কাব্যে স্থান পেয়েছে। এ থেকে 'বিদ্যাসুন্দর যে সংস্কৃত কাব্যের ছায়া অবলম্বনে রচিত এমন কথা বলা ঠিক নয়। প্রবন্ধকার দেখেছেন চুয়ান্নটি শ্লোক সম্বলিত কোন এক অজ্ঞাত নামা কবির বিদ্যাসুন্দরম্' নামে খণ্ডকাব্যের তৃতীয় শ্লোকে নায়িকার নাম রয়েছে বিদ্যা, কিন্তু কাব্যে কোথাও সুন্দরের নাম পাওয়া যায় না এবং কাহিনীটিও ভারতচন্দ্রের কাব্যের অনুরূপ নয়। বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর সমাচার প্রেস থেকে যে 'বিদ্যাসুন্দরম্'ও 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্যের সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে সেখানে ভূমিকায় সুন্দর নামে কবি এবং বিদ্যা নাম্নী সুরূপা রাজকন্যার প্রেম কাহিনী বিধৃত আছে। কিন্তু লেখক কোথা থেকে এই কাহিনী পেয়েছেন তার উল্লেখ করেন নাই। বোম্বাইয়ের নির্ণয়সাগর প্রেস 'কাব্যমালা' নামে একটি সিরিজ বের করেছিলেন। সেই সিরিজের তেরশ গুচ্ছকে একশত পঁয়ষট্টি শ্লোকে 'বিহ্লণ কাব্য' অথবা 'বিহ্লণ চরিত' নামে একটি কাব্য আছে। কাব্যের রচয়িতা কবি বিহ্লন। এই কাব্যের কাহিনী অনেকাংশে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অনুরূপ। এই বিহ্লণ কাব্যটি কিন্তু বাংলাদেশে অপ্রচলিত। এই কাব্যে উল্লিখিত বীরসিংহ ভারতচন্দ্রের পিতা বীরসিংহের নাম স্মরণ করায়। বিহ্লণ নামে এক কাশ্মীরী তরুণ পণ্ডিত এই বীরসিংহের কন্যা শশীলতাকে শাস্ত্রশিক্ষা দেবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্যচর্চার মাধ্যমে উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়েন। পরে বিহ্লণ রাজার আদেশে ধৃত হন এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। শশীকলা এই সংবাদে প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হলে রাজা কবিকে মুক্তি দেন এবং কবির সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন।

প্রবন্ধকারের মতে এই 'বিহ্লণ কাব্যের' ছায়া অবলম্বনে ভারতচন্দ্র তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্য যদি রচনা করেও থাকেন' তবে তাঁহার কাব্যের পনেরো আনা ভাগই তাঁহার স্বকীয় প্রতিভা প্রসূত, এক আনা আন্দাজ ধার করা। পিতামাতার অনভিমতে গোপনে গান্ধর্ব বিবাহ, ক্রমে জানাজানি, প্রাণদণ্ডের আদেশ এবং অবশেষে প্রাণরক্ষা ও জামাতা প্রসাদন — এইটুকু মাত্র ভারতচন্দ্র ধার করিয়াছিলেন, বাকি সমস্ত — মালিনী চরিত্র, বিদ্যার পর্ণ, সুড়ঙ্গ - খনন, সন্ন্যাসী বেশে সুন্দরের রাজসভায় যাতায়াত, কোতোয়াল কাহিনী, মশানের আকাশে কালীর আবির্ভাব প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার নিজস্ব।' ৩

'বিদ্যাসুন্দর কাব্য সম্পর্কিত তথ্যপূর্ণ এই প্রবন্ধটিতে প্রভাতকুমারের সংস্কৃত কাব্য পাঠের গভীরতা এবং অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। যুক্তিনিষ্ঠ এই রচনায় কোথাও ভাবাবেগ প্রশ্রয় পায় নাই অথচ ভাষারীতি সহজ সরল হওয়ায় প্রবন্ধপাঠের সত্যকারের আনন্দ উপভোগ করা যায়।

(ঘ) রসসাগরের সমস্যা পূরণ (আশ্বিন, ১৩২৮) — কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি.এ, কাব্যরত্ন কর্তৃক সম্পাদিত 'রসসাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের সমস্যাপূরণ' নামক গ্রন্থটির আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে নির্দোষ আমোদ আনন্দ উপভোগের অন্যতম বাহন হল প্রহেলিকার উত্তর দেওয়া এবং সমস্যা পূরণ করা। সংস্কৃতে সমস্যাপূরণের মত বাংলাতেও একসময় সমস্যাপূরণের রেওয়াজ ছিল। এই সমস্যাপূরণ কবিদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান ছিলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজা গিরিশচন্দ্রের সভাপন্ডিত কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী। এই কবির লুপ্তপ্রায় বহু-সংখ্যক সমস্যা' উদ্ধার করে প্রকাশ করার জন্য প্রভাতকুমারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন।

(চ) মাধবিকা (আগষ্ট, ১৮৯৬) — বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মাধবিকা' কবিতা পুস্তকটির সমালোচনা। গদ্য-লেখক হিসাবে সুপরিচিত বলেন্দ্রনাথকে নব-কবি হিসাবে স্বাগত জানিয়ে সমালোচক বলেছেন তাঁর অধিকাংশ গদ্যই গদ্যচর্ম্মাবৃত কবিতা' গদ্যের সেই ললিত সুন্দর ভাষা শুধু ছন্দ এবং মিল নিয়ে 'মালবিকা'য় কবিতা হয়ে উঠেছে। মালবিকার অধিকাংশ কবিতাই সনেট ভাবে নূতনত্ব আছে, নব্য কবিদের মত অর্থশূন্য হা - হুতাশে পূর্ণ নয়। কবিতা পুস্তকটির প্রকৃত মূল্যায়ণে সমালোচক সক্ষম হয়েছেন।

(ছ) ভূমিকা (ঘরের কথা, ভাদ্র, ১৩১৭) — প্রভাতকুমারের অন্যতম সুহৃদ ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ 'ঘরের কথা'র ভূমিকায় লেখা প্রসঙ্গে ছোটগল্পের রচনা পদ্ধতি এবং রসাবেদন সম্বন্ধে লেখক কিছু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন।

এখানে লেখক বলেছেন ছোটগল্পের জন্ম আমেরিকায় হলেও সমধিক বিকাশ ঘটেছে ইংরাজী সাহিত্যে এবং পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে ফরাসী সাহিত্যে।' ইংরাজী ছোটগল্প ঘটনাপ্রধান। ফরাসী ছোটগল্পে রসের প্রাধান্য পরিস্ফুট। ছোটগল্পে চরিত্র বিকাশের স্থান নাই। বর্ণিত চরিত্র বিকশিত ভাবেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, এবং ঘটনাটির সঙ্গে সেই চরিত্রের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিতে পারিলেই লেখকের কার্য্য

সম্পন্ন হইল।' ৪ উদাহরণ সহযোগে তাঁর এই মন্তব্যগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা এখানে করেছেন। প্রসঙ্গত: বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই যে ছোটগল্পের প্রথম এবং সার্থক লেখক একথাও উদাহরণ সহযোগে বলেছেন। পরিচিত পরিবেশ থেকে আহৃত কাহিনী অবলম্বনে লেখা ফকিরচন্দ্রের গল্পগুলির যে একটি আকর্ষনীয় শক্তি আছে লেখক তা অনুভব করেছেন। ছোটগল্প সম্পর্কে আধুনিককাল পর্য্যন্ত বহু আলোচনা হলেও লেখক ছোটগল্প সম্পর্কে যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন অনেকাংশে আজও সেইটি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

সাহিত্য তত্ত্ব এবং গ্রন্থ সমালোচনামূলক এই নিবন্ধগুলি প্রভাতকুমারের সাহিত্যপ্রীতি ও গভীর জ্ঞান অনুসন্ধিৎসার পরিচয় বহন করে। সমালোচনার যথার্থ অর্থ বন্ধন নয় মুক্তি। অর্থাৎ সাহিত্য কর্ম্মের যথার্থ রসাস্বাদনে পাঠককে সাহায্য করা। রচনার স্বরূপ নির্ণয়ে, রসের যথার্থ পরিচয় প্রদানে সমালোচক যখন পাঠকের কাছে রচনাটির প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হন তখনই সমালোচনাটি যথার্থ সাহিত্য হয়ে উঠে। অবশ্য সেজন্য সমালোচককেও পক্ষপাতহীন দৃষ্টির অধিকারী হতে হয়। এখানে আলোচিত 'চিত্তবিকাশ' বা 'সমালোচন খেয়াল' কোন প্রবন্ধেই লেখক নিরপেক্ষ থাকতে পারেন নি। ফলে সমালোচনাগুলি ঠিক প্রবন্ধ পর্যায়ভুক্ত হতে পারেনি। 'চিত্রা'র আলোচনাটিও এই দোষমুক্ত নয়। 'সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর' রচনাটিতে প্রভাতকুমারের প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়কে ধারাবাহিকভাবে সংযত ভাষায় সংহত ভাবে উপস্থাপিত করে পাঠকের মনে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। 'চিত্রা' প্রভাতকুমারের প্রথম গদ্য রচনা। প্রবন্ধ হিসাবে এর সার্থকতা বিশেষ না থাকলেও রবীন্দ্রকাব্যচর্চ্চার ইতিহাসে রচনাটি বিশেষ মূল্য বহন করছে।

(২) ভ্রমন বিষয়ক ----- (ক) য়ুরোপে পদার্পণ (পৌষ, ১৩১৫)—প্রভাতকুমার আইন অধ্যয়ণের জন্য জানুয়ারী, ১৯০১ সালে লন্ডনে গমন করেন। সেখানে ডা: অসওয়ালের বাড়ীতে অবস্থান করে শ্রদ্ধেয় রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সাহায্যে Middle Temple এ ভর্ত্তি হন। 'য়ুরোপে পদার্পণ' মূলত: লেখকের ভারতবর্ষ থেকে লন্ডনে যাত্রাপথের ভ্রমন কাহিনী। লেখক তাঁর এই অপরিচিত ভূখন্ডে কৌতুহলের দৃষ্টি নিয়ে সব কিছুকে দেখেছেন, এখানকার বাসিন্দাদের আচার ব্যবহার, রীতি - নীতি তাকে মুগ্ধ করেছে। লেখকের সেই মুগ্ধ দৃষ্টির পরিচয় অতি অন্তরঙ্গভাবে এখানে বিধৃত হয়েছে।

(খ) ষ্ট্র্যাটফোর্ড - অন - এভনে একবেলা (কার্ত্তিক, ১৩১০) মহকবি সেক্ষপীয়ারের স্মৃতি বিজড়িত ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড - অন - এভনে লেখকের ভ্রমনকথা বিধৃত হয়েছে। শুধু এই তীর্থ দর্শনই নয় এর মাহাত্ম্য কীর্তনও তিনি করেছেন। সেক্ষপীয়ার সম্বন্ধীয় তাঁর অনুসন্ধিৎসা এবং অনুসন্ধানের পরিচয় এখানে আছে। ভ্রমন কাহিনী হলেও বিবৃতিতে পান্ডিত্যের পরিচয় পাই।

(গ) অ্যাবট্‌সফোর্ড (অগ্রহায়ণ, ১৩১০) — ঔপন্যাসিক ওয়ালটার স্কট সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য সহ তাঁর স্মৃতি বিজড়িত আবাসস্থল অ্যাবট্‌ফোর্ডে লেখকের ভ্রমন কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কাহিনীতে স্কটের জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্যের সন্নিবেশ লেখকের পান্ডিত্যের কথা স্মরণ করায়।

(ঘ) ব্রাইটন্‌ (পৌষ, ১৩১৫) — লন্ডনে অবস্থানকালে লেখক একবার গ্রীষ্মাবকাশে সমুদ্রতীরবর্তী সহর ব্রাইটনে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। ব্রাইটনের বিস্তৃত বিবরণ সহ সেখানকার রীতি-নীতি-আচার-ব্যবহার সম্বলিত একটি মনোজ্ঞ ভ্রমন কাহিনী 'ব্রাইটন' রচনাটি।

(ঙ) সিমলা - শৈল - (ফাল্গুন, ১৩০৪)— ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীরূপে লেখক কিছুদিন সিমলায় অবস্থান করেছিলেন। সেই অবস্থানের অভিজ্ঞতা প্রসূত রচনা 'সিমলা শৈল'। সিমলা সহরের যাত্রাপথ তার ভৌগোলিক অবস্থিতি, অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সেখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছুর মনোজ্ঞ বিবরণ এখানে বিধৃত হয়েছে।

প্রভাতকুমারের ভ্রমন কাহিনীমূলক রচনাগুলিতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু ঘটনার আন্তরিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে। বিশেষ ভাবে বিলাতে ভ্রমন বিষয়ক প্রবন্ধগুলি থেকে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় উদ্ঘাটন করা সম্ভব। ভ্রমন কাহিনী হলেও শুধুমাত্র ভ্রমন স্থলের ভৌগোলিক অথবা ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ রচনা এইগুলি হয়ে ওঠেনি— রচনা সমষ্টির মধ্যে সর্বত্রই প্রায় লেখকের হাস্যরসিক মেজাজের পরিচয় আছে। অবশ্য সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' অথবা রবীন্দ্রনাথের 'ছোটনাগপুর' ইত্যাদি রচনায় লেখকমনের যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ দক্ষতা এবং ব্যক্তিত্বের ছাপ মেলে প্রভাতকুমারের ভ্রমন কাহিনী সেই স্তরে উন্নীত না হলেও, ভ্রমন কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাল্কা হাসির ঢেউ পাঠকমনকে আনন্দ রসে ভরিয়ে দিতে সমর্থ।

(৩) জীবনী বিষয়ক — (ক) বিলাতে মহারাণীর অন্ত্যেষ্টি সমারোহ (বৈশাখ, ১৩০৮) — মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অন্ত্যেষ্টি যাত্রার লেখকের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিবরণ। শুধু দেখা নয়, এই অভূতপূর্ব শোকযাত্রা দর্শনে তাঁর অনুভবের কথাও এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যে অনুভবে শোকের চেয়ে তামাসা দেখার আগ্রহই প্রবল হয়ে উঠেছিল।

(খ) রমেশচন্দ্র-স্মৃতি (পৌষ, ১৩১৬) — মনীষী রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি তর্পণ। প্রভাতকুমার বিলাত-প্রবাসকালে রমেশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারের কিছু পরিচয় লেখক এখানে দিয়েছেন। উভয়ের মধ্যে আলাপ আলোচনা মুখ্যত: সাহিত্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই জমে উঠতো। এই সময়ে রমেশচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Economic History of British India রচনা শুরু করেন এবং এই কারণে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন। সরলাদেবীর নির্দেশে প্রভাতকুমার এই সময়ে রমেশচন্দ্র দত্তকে দিয়ে 'ভারতী' পত্রিকার জন্যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়ে নেন। রমেশচন্দ্রের চরিত্রের বালকোচিত সরলতায় এবং চরিত্র-মাধুর্যে লেখক মুগ্ধ হয়েছিলেন। রমেশচন্দ্রের 'জীবনসন্ধ্যা' পাঠে বালক প্রভাতকুমার যে একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন রচনাটিতে সে কথারও উল্লেখ আছে। মোটকথা 'রমেশচন্দ্র স্মৃতি'তে লেখক রমেশচন্দ্রের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

(গ) রাজ কাহিনী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭) — সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু সংবাদ পাঠে লেখক এখানে তাঁর স্মৃতিচারণা করেছেন। লেখক ১৯০৩ সালের নভেম্বর টার্মে 'বার - এ - কাণ্ড' হয়েছিলেন এবং সৌভাগ্যবশত: মিডিল টেম্পলে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সঙ্গে একরাত্রে ভোজনের সুযোগ পেয়েযান। সেই দুর্লভ সঙ্গ-লাভের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে সম্রাটের তৎকালীন জনপ্রিয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন। রচনায় হাস্যরসিক প্রভাতকুমারের পরিচয় পাওয়া যায়।

(ঘ) যোগেন্দ্রচন্দ্র (২ ভাদ্র, ১৩৩৩) 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের দ্বাবিংশ স্মৃতি সভায় পঠিত প্রভাতকুমারের ভাষণ। ভাষণটি অন্যান্য অনেকের রচনার সঙ্গে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। রচনা-টিতে যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার বিশেষত: 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের কথা আলোচিত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে, লেখকের সঙ্গে যোগেন্দ্র-চন্দ্রের কোন পরিচয় ছিল না কিন্তু তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গবাসী' এবং অপূর্ব রসঘন 'মডেল ভগিনী', 'রাজলক্ষ্মী' ইত্যাদি রচনা লেখককে যোগেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে। লেখকের মতে যোগেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন যথার্থই

সাহিত্য-রসিক এবং সকল প্রকার লোকের প্রতি সহানুভূতিশীল। সাহিত্যিক যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয়ের জন্য রচনাটি মূল্যবান।

(ঙ) প্রভাতকুমারের স্মৃতিকথা (হেমচন্দ্র প্রসঙ্গে) বৈশাখ, ১৩৩০ — কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের স্মৃতিচারণা লেখক এখানে করেছেন। গুণীজনের প্রতি লেখকের যে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ইচ্ছা কত প্রবল ছিল রচনাটিতে তার প্রমাণ আছে। কবি নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য সম্পর্কে হেমচন্দ্রের মতামত এখানে বিধৃত হয়েছে। মন্মথনাথ ঘোষ বিরচিত 'হেমচন্দ্র' জীবনী গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে রচনাটি সংযোজিত হয়েছিল।

(চ) ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (আগষ্ট, ১৮৯৬) বঙ্কিমযুগে উপন্যাস রচনায় যাঁরা স্বকীয়তা দেখিয়েছিলেন 'স্বর্ণলতা' প্রণেতা তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'স্বর্ণলতা' লেখকের প্রথম উদ্যম এবং এই উপন্যাসখানি তাঁকে যশস্বী করে তুলেছিল। প্রভাতকুমারের আক্ষেপ যে ৺তারকনাথের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরেও তাঁর কোন জীবনী রচিত হয়নি। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ৺তারকনাথের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু তথ্য আলোচ্য রচনাটিতে পরিবেশন করেছেন। ৺তারকনাথের জন্মস্থান, জন্মসন, শিক্ষা, ব্যক্তিগত জীবনের দোষগুণ, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কে তার মতবাদ ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় রচনাটিতে রয়েছে। ব্যক্তিগত ভাবে তারকনাথের সঙ্গে লেখকের পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। এইজন্য তারকনাথের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে আলোচ্য রচনাটির বিশেষ মূল্য বহন করছে।

(ছ) বঙ্কিমচন্দ্র জীবনপঞ্জী (চৈত্র, ১৩২১)— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্য সম্ভারের কালানুক্রমিক তথ্য সম্বন্ধীয় নিবন্ধ। প্রধানত: শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম জীবনী' গ্রন্থ অবলম্বনে এবং সমসাময়িককালের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি বঙ্কিম বিষয়ক রচনার সাহায্যে লেখক এই জীবনপঞ্জী রচনা করেছেন। তবুও বঙ্কিমের এই জীবনপঞ্জী যে অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমাত্মক তথ্য এখানে থাকতে পারে লেখক নিজেই সেকথা স্বীকার করেছেন। সাহিত্যিকগণের জীবনী রচনায় প্রভাতকুমারের যে বিশেষ আগ্রহ ছিল এখান থেকে সেই পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য সাহিত্যিকের জীবন পরিচয়ও যে আবশ্যক বোধ করি এই তথ্য প্রভাতকুমারের অজ্ঞাত ছিল না। অন্ততপক্ষে এই জীবনপঞ্জী রচনার কৌশলে তার পরিচয় আছে।

(জ) চিত্তরঞ্জনের বাণী (আষাঢ়, ১৩২২) — প্রবন্ধটিতে লেখক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে তাঁর জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। লেখকের মতে চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন সাধক পুরুষ, তবে তাঁর কামনার ধাম স্বর্গ নয় স্বর্গাদপিগরীয়সী এই ভারতভূমি, ভারতবর্ষকে তিনি স্বর্গ থেকেও বেশী ভালবেসেছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভাবের পূর্বে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ করে পদাবলীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি পদাবলী গান শুনতেন। পদাবলীতে যেমন আছে —

' জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি।

দেশবন্ধুও ঠিক এমনিভাবেই মাতৃভূমিকে সেবা করার জন্য জন্ম জন্মান্তরের প্রার্থনা করেছেন। চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রেমকে লেখক কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের তুলনা করেছেন। কৃষ্ণপ্রেমের জন্য রাধাকে যেমন অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল দেশপ্রেমের জন্য দেশবন্ধুও তেমনি অশেষ লাঞ্ছিত হয়েছেন। চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রেম সম্পর্কে লেখকের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এখানে প্রকাশিত।

(ঝ) অমৃতলালের স্মৃতিতর্পণ (শ্রাবণ, ১৩৩৬) — নাট্যকার অমৃতলাল বসুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখক এখানে অমৃতলালের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়, তাঁর চরিত্রমাধুর্য্যের কথা বলেছেন। কৈশোরকালে লেখক অমৃতলালের বিবাহ বিভ্রাট নাটকটি পড়েছিলেন কিন্তু তখন তার রসগ্রহণের ক্ষমতা জন্মে নাই। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সম্পাদনাকালে ব্যক্তিগত ভাবে অমৃতলালের সঙ্গে লেখকের পরিচয় হয় এবং তারই অনুরোধে অমৃতলাল 'মানসী'তে লেখা দিয়েছিলেন। অমৃতলালের সৌজন্য সহৃদয়তা, সরল বাক্যবিন্যাস' লেখককে মুগ্ধ করেছিল। লেখকের প্রতি অমৃতলালের অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। পথি মধ্যে কোথায় দেখা হলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। ২০শে বৈশাখ, ১৩৩৬ সালে শিশির কুমার ভাদুড়ীর নাট্যমন্দিরে 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটকের অভিনয় দেখতে লেখকের অনুরোধেই অমৃতলাল উপস্থিত ছিলেন। অমৃতলালের শ্মশানে লেখক উপস্থিত ছিলেন। উভয় চরিত্রের ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য সমৃদ্ধ রচনাটি জীবনী রচনার ক্ষেত্রে বিশেষমূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে।

জীবন-স্মৃতিচারণা বিষয়ক রচনাগুলিতে গুণীজনের বিশেষতঃ তৎকালীন প্রথিতযশা সাহিত্যিকগণের স্মৃতির প্রতি প্রভাতকুমারের আন্তরিকতা-পূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদনের পরিচয় আছে। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনকালে কোন কোনও ক্ষেত্রে এইসবসাহিত্যিকগণের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় প্রসঙ্গ, তাঁদের চারিত্রিক মাধুর্য্যের পরিচয় এবং সাহিত্যকৃতির উল্লেখ করেছেন। লক্ষনীয় এই, আলোচ্য

মনীষীবর্গের কয়েকজনের মানসিকতার সঙ্গে প্রভাতক মানসিকতার সমধর্মীতা অনুভব করা যায়। যোগেন্দ্রচন্দ্র অথবা অমৃতলাল বসুর স্ত্রী-শিক্ষা অথবা সামাজিক অনুশাসন বিষয়ক চিন্তাধারার সঙ্গে প্রভাতকুমারের অনুরূপ বিষয়ে ভাবনার একসূত্রতা অনুভবনীয়। প্রবন্ধগুলিতে প্রভাত-চিত্তের আবেগ তন্ময়তা অপেক্ষা জীবন অর্থের প্রতি অধিক অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। প্রবন্ধ হিসাবে রচনাগুলির মূল্য যাই হোক না কেন, আলোচিত সাহিত্যিকগণের জীবনী রচনার উপকরণ হিসাবে রচনাগুলি একটি বিশেষ মূল্য বহন করে।

(৪) লোককথা ও কিম্বদন্তীমূলক —

(ক) নীলকুল বাসুদেবের ব্রতকথা (পৌষ, ১৩০২) — আমাদের দেশের ধর্মীয় সংস্কারে নানা ব্রত উদযাপনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এইসব ব্রত উদযাপনে আশ্চর্য ফললাভ হয়ে থাকে বলেই লোকমানসে দৃঢ়বিশ্বাস। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় এই সব ব্রত পালন পুণ্যকর্মের অঙ্গীভূত। এই সব ব্রত ঘরে ঘরে প্রতিনিয়তই পালিত হোত। অবশ্য আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমশঃই এসব লুপ্ত হতে চলেছে। সাধারণত: লোকমুখে প্রচলিত এইসব ব্রতকথা অঞ্চলবিশেষে ভিন্নরূপ। নীলকুল-বাসুদেব ব্রতকথাও ভিন্নরূপে আমাদের দেশে কথিত হয়ে আসছে। তবে 'দূরের সুসমাচার নিকটে' আনার উদ্দেশ্যেই সাধারণত: এই ব্রত কথিত হয়। যে নারী পিতা, পতি বা পুত্রের বহুদিন সংবাদ পান নাই তিনি পানসুপারী হাতে নিয়ে এই কথা শুনে থাকেন। আলোচ্য 'নীলকুলবাসুদেব ব্রতকথা' প্রবন্ধে লেখক এই ব্রতকথার লোকমুখে প্রচলিত একটি অবিকল গ্রাহ্য রূপকে উপস্থাপিত করেছেন। প্রবন্ধটিকে আমাদের দেশের লোকসাহিত্য আলোচনার প্রাথমিক পর্বের উদ্যোগ বললে অত্যুক্তি হবে না।

(খ) কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব-সূচক একটি কিম্বদন্তী (পৌষ, ১৩২৮) — মহাকবি কালিদাস মাছ খেতেন এই ধরণের এক জনশ্রুতিকে অবলম্বন করে আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক প্রমান করতে চেয়েছেন যে কবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন। কালিদাসের মৎস্যপ্রিয়তা সম্পর্কে এই কিম্বদন্তীর কথা, বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস থেকে প্রকাশিত 'ভোজ ঔর কালিদাস' নামক হিন্দী গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। বাঙ্গালীর মৎস্যপ্রিয়তা সর্বজন বিদিত। কালিদাসের মৎস্যপ্রিয়তা তাই তাঁর বাঙ্গালীত্বকে সূচিত করে। প্রাবন্ধিকের এই যুক্তি জোরালো না হলেও কালিদাস সম্পর্কে কৌতুককর জনশ্রুতির অবতারণায় প্রবন্ধটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

(গ) পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত কালিদাসের গল্প (ভাদ্র, ১৩২৫) —

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক একাধিক কবি কালিদাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে পন্ডিতগণের মধ্যে মতভেদের কথা উল্লেখ করে কালিদাস সম্পর্কিত পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি কৌতুককর চাতুর্যপূর্ণ গল্পের অবতারণা করেছেন ।

পন্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা - তিনজন কালিদাস ছিলেন। তন্মধ্যে 'রঘুবংশ' 'কুমারসম্ভব' ইত্যাদি প্রণেতা মহাকবি কালিদাস, অপর দুইজন কালিদাসের কাব্য বিস্মৃতির সাগরে নিমজ্জিত । কালিদাস সম্বন্ধীয় কোন কোন গল্পে তাঁকে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে । কবি বল্লাল প্রণীত 'ভোজ প্রবন্ধে' ও মেরুতুঙ্গাচার্য্য প্রণীত 'প্রবন্ধচিন্তামনি' পুস্তকে কালিদাসকে ভোজরাজের সভাকবি বলা হয়েছে । তবে অধিকাংশ পন্ডিতের স্থির সিদ্ধান্ত—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে কবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর পুত্র কুমারগুপ্তের সভাকবি ছিলেন । সুতরাং একাদশ বা দ্বাদশ শতকে ভোজরাজের সভায় তাঁর অস্তিত্ব সমর্থনযোগ্য নয় ।

প্রবন্ধটিতে কালিদাসের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হিসাবে কয়েকটি কৌতুককর গল্পের অবতারণা করা হয়েছে । যেমন (১) এস মূর্খ (২) দারিদ্র্য দাহন (৩) গর্বিত কবি (৪) মূর্খ ব্রাহ্মণ (৫) আসল ও নকল (৬) কালিদাসের বৈরাগ্য ।

কালিদাস সম্পর্কিত আলোচনায় প্রভাতকুমারের পান্ডিত্যের পরিচয় এখানে আছে । তথ্য সমৃদ্ধ বিবৃতিমূলক এই রচনাগুলিতে লোকমুখে প্রচলিত কিম্বদন্তী এবং লোকসাহিত্যের প্রতি লেখকের প্রীতির কথা স্মরণ করায়।

(৫) নাট্যকলা সম্পর্কিত আলোচনা —

(ক) যাজ্ঞসেনী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫) — রসরাজ অমৃতলাল বসুর পৌরাণিক নাটক 'যাজ্ঞসেনী'র সমালোচনা। মিনার্ভা থিয়েটারে অমৃতলালের বেনিফিট নাইট উপলক্ষে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং প্রভাতকুমার সেই অভিনয় রজনীতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয় দর্শনে আলোচ্য সমালোচনাটি তিনি লিখেছিলেন । নাটকটির নাতিদীর্ঘ আলোচনায় তিনি অমৃতলালকে শুধু হাস্যরসের স্রষ্টা হিসাবেই নয় গম্ভীর বিষয়ে নাটক রচনায় তাঁর যে দক্ষতা কতখানি 'যাজ্ঞসেনী'কে তার উদাহরণস্বরূপ দেখিয়েছেন। 'যাজ্ঞসেনী'কে খাঁটি নাটক বলেছেন প্রধানত: দুইটি কারণে। প্রথমত: 'মনুষ্যত্বের স্ফুরণে স্বামীর সহায়তা করাই স্ত্রীর ধর্ম' এই ধরণের উচ্চ-আদর্শ নাটকটিতে অনুসৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত: 'ইহার ভিতর কোন ম্যাজিক নাই' অর্থাৎ

অহেতুক আড়ম্বর বর্জিত হওয়ায় নাটকটির স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়েছে। বলাবাহুল্য প্রভাতকুমারের সমসাময়িক কালে নাটকের অভিনয়ে এবং দৃশ্যপটে যে অতিরঞ্জনপ্রিয়তা ছিল, দর্শককে আনন্দ দিলেও সেই প্রক্রিয়া নাট্যরস সৃষ্টিতে যে বাধা স্বরূপ হয়ে উঠতো প্রভাতকুমার এখানে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

(খ) বিলাতী থিয়েটার (ভাদ্র, ১৩১৩) — প্রবন্ধটিতে লেখক মূলত: বিলাতের রঙ্গালয়, রঙ্গমঞ্চ, দর্শকগণের মানসিকতা এবং অভিনয়-কলা আলোচনা প্রসঙ্গে কলকাতার নাট্যশালা এবং নট -নটীর কলাকুশলতার তুলনা মূলক আলোচনা করেছেন। বিলাতে জনমানসে অভিনয়কলা সম্পর্কে স্বাভাবিক প্রীতি এবং অত্যুৎসাহীতা লেখক লক্ষ্য করেছেন। তাই সেখানে থিয়েটার গৃহে দর্শকের অভাব হয় না, গৃহগুলিও সুসজ্জিত, অবশ্য বাইরে তেমন কিছু জাঁকজমক নাই।' তবে নাট্যকলা সম্বন্ধে চাতুর্য্য কলিকাতার থিয়েটা-রেরই সমকক্ষ।' প্রসঙ্গত: লেখক তৎকালীন কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে 'ভ্রমর' নাটকটির অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর নাট্যরূপ 'ভ্রমর'। রূপদাতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বয়ং গোবিন্দলালের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু নাট্যরূপ এবং অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথের যে ত্রুটির কথা লেখক উল্লেখ করেছেন সেখানে তাঁর নাট্যশিল্প সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িক কালে 'ভ্রমর' এর অভিনয় দর্শক এবং অনেক সমালোচকের প্রশংসাধন্য হলেও প্রভাতকুমারের সূক্ষ্ম রসবোধের কাছে তার ত্রুটি ঠিকই ধরা পড়ে গেছে।

এখানে রচনা দুইটিতে লেখকের নাট্যকলা সম্পর্কিত জ্ঞান এবং রসবোধের পরিচয় আছে। প্রভাতকুমারের সমসাময়িক কালে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ এবং বিলাতের রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট সাজসজ্জা অথবা অভিনয় সম্পর্কে কিছু তথ্য রচনা দুইটিতে পরিবেশিত হয়েছে। লেখক এখানে নাট্যকলা সম্বন্ধীয় তত্ত্ববিচার অপেক্ষা তথ্য পরিবেশনেই সচেষ্ট হয়েছেন এবং সেই-সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মিশ্রিত হওয়ায় রচনাদুইটি রসসমৃদ্ধ না হলেও মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

(৬) স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা ——

(ক) 'বাবু'র আক্ষেপ (অগ্রহায়ণ, ১৩১৩) — নামের পুরোভাগে 'বাবু' শব্দটি লেখাকে বাঙ্গালী এক সময়ে অত্যন্ত সম্মানজনক মনে করেছে। বিলাত-ফেরতেরা 'বাবু'র পরিবর্তে 'মিস্টার' লেখাতে গৌরব বোধ করেছে বরং 'বাবু' শব্দটি অনেক সময় তাঁদের বিরক্তির কারণ হয়েছে। আবার 'বাবু' শব্দটিকে ইংরেজগণ যখন তুচ্ছার্থে ব্যবহার করেছে তখন দেখা গেল তথাকথিত স্বদেশী আন্দোলনকারী স্বদেশভক্তগণ 'বাবু'র পরিবর্তে 'শ্রীযুত' শব্দটিকে নামের পুরোভাগে ব্যবহার করেছেন। লেখকের বক্তব্য শব্দের মোহে নিজেদের দুর্বলতাকে ঢাকার অপচেষ্টা না করে আমাদের চরিত্রের অপদার্থতাকে দূর করতে পারলে যে কোন শব্দ ব্যবহারই সম্মানজনক হবে। এই রম্য রচনাটির মাধ্যমে সার্থকভাবে লেখক তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন।

(খ) সর্ব বিষয়ে স্বদেশী (কার্ত্তিক, ১৩১৩)- স্বদেশী আন্দোলন এবং স্বদেশপ্রীতি সম্পর্কে লেখকের সুচিন্তিত মতামত প্রবন্ধটিতে ব্যক্ত হয়েছে। লেখকের মতে স্বদেশপ্রীতি অন্তরের অনুভূতি বিশেষ, বাহ্যিক পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। বিদেশ গমন, বিদেশী পোষাক ইত্যাদি বিদেশী সবকিছুকে বর্জন করলেই স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। পরন্তু Patriotism অর্থাৎ 'স্বদেশপ্রীতি'র বোধটাকে আমাদের মনে জাগিয়ে তোলা দরকার। আমরা ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়েছি কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ দিতে শিখিনি। বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্' গান শুনে মহেন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করে বলছে' এ ত দেশ, এ ত মা নয়'। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় দেশকে মা বলে ভাবতে পারেনি। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে লেখক দুইটি ভাবকে দেখেছেন প্রথমত: ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড দেশরূপে দ্বিতীয়ত: জন্মভূমি জননী মত পুজনীয়া তাই দেশের শ্রীবৃদ্ধি এবং কল্যানেই আমাদের ধনপ্রাণ উৎসর্গ করা। সামগ্রিকভাবে জাতীয়তার ভিত্তিস্থাপনের জন্য স্বদেশপ্রীতিকে বীজমন্ত্র হিসাবে নিতে বলেছেন। এছাড়া আরও কয়েকটি মন্ত্রসাধনের কথা বলেছেন যেমন প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ প্রজারাই প্রকৃত রাজা। দেশের উন্নতি করাই লেখকের মতে প্রকৃতপক্ষে স্বদেশপ্রীতি। দেশের উন্নতি করতে হলে চাই দেশের ধনবৃদ্ধি এবং শিল্পকলার উন্নতি। সেইজন্য বিদেশ থেকে শিক্ষা নিতেও লেখকের আপত্তি নাই। পুরাতনের মধ্যে যা সত্য এবং শিব তাকে রক্ষা করেই জাতীয় উন্নতির পথ বেছে নিতে হবে এজন্য তিনি আমাদের আহার - বিহারে গোঁড়ামী, ছুঁৎমার্গ এবং অত্যধিক আবেগ প্রবণতা ইত্যাদিকে বর্জন করতে বলেছেন। দেশের উন্নতি আমাদের লক্ষ্য স্বদেশীয়তা তার উপায় মাত্র — আমরা যেন স্বদেশিকতা করতে গিয়ে দেশের উন্নতিতে ব্যাঘাত না ঘটাই —

এটাই লেখকের অনুরোধ ।

প্রবন্ধটিতে লেখকের আবেগবর্জিত যুক্তিনিষ্ঠ স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় ।প্রসঙ্গত: স্মরণ করা যায় স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারীদের আচার আচরণের অসঙ্গতিকে নিয়ে প্রভাতকুমার'উকিলের বুদ্ধি','খালাস', 'পোস্টমাস্টার'প্রভৃতি কয়েকটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ-কৌতুককর গল্প রচনা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের'বিজাতীয় রকমে স্বদেশোন্নতি' (প্রবাসী , ফাল্গুন,১৩১৩) নিবন্ধটিকে স্মরণ করা যায় ।এই প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে প্রভাতকুমারের কোন যুক্তি - মতবাদকে প্রায় স্বীকার করেন নাই, উপরন্তু প্রভাতকুমারের মতবাদকে অনেক স্থলেই ব্যঙ্গ করেছেন । অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির কিয়দংশ উদ্ধার করা গেল ।

' প্রবাসীর কার্তিক সংখ্যায়' সর্ববিষয়ে স্বদেশী' প্রবন্ধকার নানারূপ নিষেধ বিধান অনুসার বিসর্গের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বদেশোন্নতিকে জীবনের একমাত্র মহাব্রত করিবার জন্য বজ্রগম্ভীর স্বরে আমাদের আহ্বান করিয়াছেন । কিন্তু তাঁহার নির্বাচিত উন্নতির পথটি একান্ত বিভীষিকাপূর্ণ, হঠাৎ সে পথে পদার্পণ করিতে — এতকাল সাহেবিয়ানার বিড়ম্বনা সহিবার পরে — আর তো সহজ হয় না । হইতে পারে বিলাত গিয়া কিছুকাল সাহেবি হাওয়া গায়ে লাগাইয়া আসিলে সাহেবিয়ানার বিভীষিকাগুলা আপনা হইতে সহিয়া যাইতেও পারে কিন্তু তথাপি আজন্ম অভ্যস্ত পোষাক পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম - কর্ম্ম বিসর্জন দিতে কষ্ট হয়, দু:খ হয় ।প্রবন্ধকার বলেন'যদি সেটা স্বজাতির পক্ষে স্বদেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তবে সে দু:খ কষ্ট বক্ষ পাতিয়া পুরুষের মত বহন করিতে হইবে, নাকে কাঁদিলে চলিবেনা ।'এখন দেখা যাক এই শক্তিশেলটা'বক্ষ পাতিয়া' বহন করিয়া বাস্তবিক আমরা স্বর্গের পথ উন্মুক্ত করিব কি 'পপাত চ'হইয়া যন্ত্রণা ভুমিতে থাকিব।' ৫

প্রভাতকুমার তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন বন্দেমাতরম্ বা স্বদেশ প্রীতির ভাবের জন্য আমরা ইংরেজদের কাছে ঋনী । কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ সেখানে তীব্র প্রতিবাদ করে লিখেছেন —

' ... মিস্টার মুখার্জি'বন্দেমাতরমের' গায়ে বিলাতি রকমের গন্ধ পাইয়াছেন কেমন করিয়া এবং সেরূপটা হইলে সেটাকে মহারত্নবোধে আমাদের বক্ষে ধরিতে বলেন কি জন্য জানিনা, সহজ বুদ্ধিতে এই বুঝি যে, বিলাতি হইতে দেশীয়ের উদ্ভব'ওক্'গাছে আম্রফলের ন্যায় রাসায়নিক

প্রক্রিয়ায় সুসাধ্য হইলেও প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ ।দেশীয় ভাব স্বদেশপ্রীতির জন্ম দেয় , মানুষ মানুষ প্রসব করে — গরুর জননীহইতে পারে না । আমাদের পাঁজীপুথিতে দেশপূজার পদ্ধতি না পাইয়া লেখক স্থির করিয়াছেন যে দেশকে মা বলিয়া পূজা করাটা বিলাতি প্রথা ! বিলাতি কোন্ ধর্ম্মপুস্তকে ও পত্রিকায় দেশমায়ের পূজার তারিখ ও মন্ত্র পদ্ধতি তিনি দেখিলেন ? বাইবেলে'যিশুরই একাধিপত্য, পত্রিকায় ও Kings Birth day, X mas day প্রভৃতি ছাড়া Motherland day বলিয়া কোন তো উল্লেখ দেখি না ? যে পাশ্চাত্য জাতিকে তিনি দেশপূজায় আমাদের গুরু-ঠাকুর বলিয়া প্রমান করিতে চাহেন সেই পাশ্চাত্য জাতিই দেশ পূজাপদ্ধতিতে আমাদের অপেক্ষা যে বিশেষ পন্ডিত নয় একথা নি:সঙ্কোচে বলা চলে ।' ৬

তৎকালীন 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও স্বদেশিকতা সম্পর্কে প্রভাতকুমারের চিন্তাধারাকে মেনে নিতে পারেন নাই । প্রভাতকুমারের বক্তব্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত ~~প্রভাতকুমারের কিছু আলোচনা করে প্রবাসী~~ প্রবন্ধের শেষ অংশে তিনি প্রভাতকুমারকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ~~পত্র লিখেছিলেন~~ জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু প্রভাতকুমার অন্যত্র কোথাও এ বিষয়ে আর আলোচনা করেন নাই ।

ফলকথা স্বদেশিকতা ~~স্ব~~ সম্পর্কিত প্রভাতকুমারের এই প্রবন্ধটি সমসাময়িককালে বেশ বিতর্কিত হয়ে দেখা দিয়েছিল ।

স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কিত মতবাদ সমৃদ্ধ এই রচনাগুলিতে আন্দোলনের তত্ত্বগত দিকটা লেখক বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রবন্ধে তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখকের নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করার প্রয়োজন আছে কিন্তু লেখক এখানে ব্যর্থ হয়েছেন ।অবশ্য আমাদের সাহিত্যের প্রথম যুগের প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও আমরা এই শিথিলতাকে লক্ষ করেছি ।তথ্যনিষ্ঠ অথবা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অপেক্ষা সেখানে হৃদয়াবেগ প্রাধান্য পেয়েছে । প্রভাতকুমারের এই রচনাগুলিতে আবেগের প্রাধান্য না থাকলেও ব্যক্তিগত মতামতের অনুপ্রবেশ রচনাগুলিকে আদর্শ প্রবন্ধের সার্থকতার স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হয় নাই ।

(৭) বিবিধ — (ক) ইংরাজ রমনী (১৩২১ সাল) প্রবন্ধটিতে লেখক বাঙ্গালী ও ইংরেজ সমাজের নারীররূপ - রুচির ~~বিষয়ে~~ তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। অবশ্য আলোচনায় তাঁর ব্যক্তিগত ভালমন্দের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমত: ইংরেজ রমনীর দৈহিক সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্র নাথ তাঁর ~~য়ুরোপ~~

'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী'তে প্রশংসা করলেও তাদের গাত্রবর্ণ ,চোখের রং লেখকের ভাল লাগেনি ।দ্বিতীয়ত: আমাদের দেশের নারীচিত্তে যে দয়া, মায়া স্নেহ ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তিগুলি আছে - ইংরেজ নারীর মনে তার অভাব প্রায়শঃই চোখে পড়ে । সেজন্য তাদের নির্দয় বলা যায় না বরং তাদের মন কিছুটা বীরভাবে ভাবিত । তৃতীয়ত: ইংরেজ নারীর একটি প্রবল ব্যক্তিত্ব-বোধ আছে এবং যার ফলে তারা স্বাবলম্বী হতে চায় । আমাদের দেশের নারী ঠিক তার বিপরীত । চতুর্থত : ইংরেজ নারী স্বভাবতই সৌন্দর্যপ্রিয়। আমাদের দেশের নারীর মধ্যে তার নিতান্তই অভাব লক্ষনীয় । সর্বশেষে নারীর সতীত্বের কথা বলেছেন । মধ্যবিত্ত ইংরেজ রমনীর মধ্যে সতীত্ববোধ আমাদের দেশের নারীর মতই কিন্তু নিম্নবিত্তের মধ্যে এর অভাব লেখক লক্ষ্য করেছেন ।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই রচনাটি বক্তব্য ও ভাষার প্রাঞ্জলতায় বেশ উপভোগ্য ।

(খ) ডাইনী - চরিত (শ্রাবণ, ১৩০৮) — ভূতপ্রেত সম্পর্কে আমাদের দেশে কুসংস্কার আছে কিন্তু 'সুসভ্য' ইউরোপবাসীগণও সেই কুসংস্কারমুক্ত নন। এমনকি বিধিবদ্ধ আইনের সাহায্যে 'শত্রু বা ঘৃণিতকে ডাইনীত্ব অপবাদ' দিয়ে তাদের বিনাশ করতো। লেখক দুইশত বৎসর পূর্বেকার পুঁথি থেকে দুইটি ডাইনী কাহিনী উদ্ধার করে সেই সত্যটি 'ডাইনী চরিত' আলোচনায় প্রমান করেছেন । রচনাটিতে লেখকের অনুসন্ধিৎসার পরিচয় রয়েছে ।

(গ) ছেলে মানুষ করা (আশ্বিন, ১৩০৩) —— শিশুর লালনপালন এবং চরিত্র গঠন সম্পর্কে কিছু যুক্তিপূর্ণ মূল্যবান নির্দেশ আলোচ্য প্রবন্ধটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে । প্রবন্ধটি প্রকাশ কালে 'বারান্তরে সমাপ্য' লিখিত হলেও পরবর্তীকালে আর কোন অংশ প্রকাশ লাভ করে নাই। প্রবন্ধটি মাদ্রাজ খ্রিস্টান ভার্ণাকুলার এডুকেশন সোসাইটি' কর্তৃক প্রকাশিত The Training of Chindren for Indian Parents ' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয়েছে ।

'ভারতী'তে(আশ্বিন, ১৩০৩) রচনাটি প্রকাশিত হলে 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন —

' শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ছেলেমানুষ করা' প্রবন্ধ সকলেরই পাঠ করা কর্তব্য ।'

(ঘ) গাজিপুরে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় (আষাঢ়, ১৩০৭) — গাজিপুরে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্যবহুল এই প্রবন্ধটিতে গোলাপ ফুলের চাষের পদ্ধতি এবং তা থেকে সুগন্ধি দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী, প্রস্তুত আতরের বাজার-মূল্য, এই সমস্ত সুগন্ধিদ্রব্যের প্রধান ক্রেতা, অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক আতরে ভেজাল দেওয়ার কথা, এবং ভারতের অন্যত্র আতর প্রস্তুতের কারখানা কোথায় কোথায় আছে ইত্যাদি তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গোলাপ ফুল থেকে কিভাবে আতর প্রস্তুত হয় সুন্দর একটি চিত্রের সাহায্যে তা দেখান হয়েছে। প্রবন্ধের উপকরণ জনৈক হাফেসজী থেকে লেখক পেয়েছিলেন সে কথা উল্লেখ করেছেন। রচনাটির সাহিত্যিক সার্থকতা বিশেষ না থাকলেও সুগন্ধ দ্রব্যের ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য কিছুটা মূল্যবান।

(ঙ) কুমীর পোষা (কার্তিক, ১৩১৭?) — প্যর্ণলে নামক জনৈক ফরাসী ভদ্রলো-কের কুমীর পোষার এক মনোজ্ঞ বিবরণ রচনাটিতে দেওয়া হয়েছে। ভদ্রলোকের কুমীর ধরা, খাওয়ানো, প্রাণীটিকে নিয়ে রাস্তায় খেলা করা ইত্যাদির জন্য যে কৌশল অবলম্বন করতেন তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে আছে। প্রথমে তিনি আপন সখেই কুমীর পুষতেন পরে ফরাসী জনসমাজ এমনকি ইংরেজদের কাছেও তার কুমীর পোষার আপন নৈপুণ্য প্রদর্শন করতেন।

কুমীরগুলিকে তিনি আফ্রিকা অথবা আমেরিকায় নদী থেকে সংগ্রহ করে এই কদাকার প্রাণীগুলিকে 'সুন্দর', 'মনোরঞ্জন' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করতেন। কুমীরের বুদ্ধি সামান্য অথচ সহজেই মানুষের পোষ মানে। মোটকথা কুমীর জীবনের নানা কৌতুককর তথ্য এখানে রয়েছে। চারিটি ফটো সম্বলিত এই রচনাটি বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

(চ) ভূত নামানো (চৈত্র, ১৩১৪) — ভূতের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের মনে চির প্রচলিত সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে আছে। আত্মকথনের ভঙ্গীতে লেখা এই রচনাটিতে লেখকের পাঠ্যাবস্থায় গ্রামের নিষ্কর্মা ছেলেদের সঙ্গে মিশে কিভাবে ভূত নামানো শিক্ষা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন জায়গায় তার অনুশীলনে যে সমস্ত চমৎকার কাণ্ড ঘটেছিল, অভিজ্ঞতা প্রসূত সেইসব কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন।

লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের অলক্ষ্যে একটি অজ্ঞাত শক্তি সর্বদা ক্রিয়াশীল এ সম্পর্কে 'প্রবাসী'র পাঠকদের কাছে অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রার্থনা করেছেন।

(জ) চন্দ্রের কলঙ্ক (শ্রাবণ, ১৩২২) — এই রম্য রচনাটিতে লেখক সংস্কৃত কবিদের চাঁদের কলঙ্ক সম্পর্কিত নানা অভিমত এবং চাঁদের কলঙ্কের স্বরূপ নির্ধারণে তাঁদের চিন্তাধারার কৌতুককর পরিচয় দিয়েছেন।

চাঁদ সমস্ত দেশের কবিদের প্রিয়বস্তু, ততোধিক প্রিয় প্রিয়ার মুখ-সৌন্দর্যকে বর্ণনা করতে গিয়ে চাঁদকেই প্রায়শ: তাঁরা তুলনাস্থল করেছেন। লেখকের মতে চাঁদের দুর্ভাগ্য এই, সংস্কৃত কবিগণ প্রিয়ার মুখসৌন্দর্য অতুলনীয় করার জন্য প্রায়শঃই চাঁদের মধ্যে কলঙ্ক আরোপ করেছেন, কবি কালিদাসও এর ব্যতিক্রম নন। চাঁদে কলঙ্ক আরোপ করেই তারা ক্ষান্ত হন নাই , সংস্কৃত কবি থেকে আরম্ভ করে ভোজরাজা এমনকি কবি তুলসীদাসও এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন ।

রচনাটিতে লেখকের সংস্কৃত এবং উদ্ভট শ্লোক সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে ।

(জ) নববর্ষের নিবেদন (ফাল্গুন, ১৩৩২) — মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুর পর 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সম্পাদক হিসাবে প্রভাতকুমার পরলোকগত রাজার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে 'নববর্ষের নিবেদন' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধটি রচনা করেন । মহারাজের গুণকীর্ত্তন ছাড়াও এখানে সাহিত্য সম্পর্কে প্রভাতকুমারের কিছু মতামত আছে ।

'বিবিধ' শিরোনামায় উল্লিখিত রচনাগুলিতে লেখক বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা করেছেন — নারীর সৌন্দর্যতত্ত্ব, অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব, পুত্রসন্তান লালন - পালন, ব্যবসায়িক চিন্তা ইত্যাদির আলোচনায় লেখকের চির অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায় ।রচনাগুলি প্রধানত: বিবৃতি-মূলক আবার স্থল বিশেষে অন্য গ্রন্থের আলোচনা অবলম্বনে নিবন্ধ রচনা করেছেন । কিন্তু উপস্থাপনায় তাঁর নিজস্ব সহজ সরল ভঙ্গীটি লক্ষ্য করা যায় ।তত্ত্ব বিশ্লেষণ নয়,তথ্যের সমাবেশই এখানে প্রাধান্যপেয়েছে ।

ইংরাজী সাহিত্যে Essay অর্থে যে বিশেষ সাহিত্যকৃতিকে চিহ্নিত করা হয় আমাদের বাংলায় তারই সমার্থক প্রবন্ধ শব্দটি ব্যবহার হয়।যদিও সূক্ষ্ম বিচারে উভয় রচনার রীতি-প্রকৃতিতে কিছুটা ভিন্নতা বর্তমান।প্রবন্ধ সাহিত্যের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা অত্যন্ত দুরূহ। তবু একথা বলা চলে—প্রবন্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য বন্ধন নয় - মুক্তি। অর্থাৎ কোন বিষয়বস্তু বা রচনার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য যুক্তি বুদ্ধি চালিত সংযত -সংহত ভাষায় রচনা-রস উদ্ঘাটন করা ।রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচিত্র - প্রবন্ধ' গ্রন্থের

তার প্রথম গদ্যরচনা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের সমালোচনা(দাসী, মে, ১৮৯৬) । ঐ বৎসরই রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচক প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্র-নাথের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন(দাসী, বৈশাখ, ১৩০৩)

পরিচয় প্রদানকালে বলেছেন —'ইহার যদি' কোন মূল্য থাকে, তাহা বিষয়-বস্তু গৌরবে নয়, রচনা - রস - সম্ভোগে।'অর্থাৎ প্রবন্ধে বস্তু অপেক্ষা রসের প্রাধান্য অধিকতর। রবীন্দ্রপ্রতিভার কথা স্বতন্ত্র। আমাদের সাহিত্যে প্রবন্ধ - রচনার ক্রমবিকাশ অনুধাবন করলে দেখা যাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে বাঙালীর বিভিন্নমুখী ধর্ম এবং সমাজ-চিন্তা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হবার চেষ্টা করেছে। রাজা রামমোহন রায় এবং তদনুগামীদের রচনায় তার নিদর্শন রয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত সর্বপ্রথম ইংরাজী Essay এর আদর্শে প্রবন্ধ রচনা করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের হাতে অনেক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানগর্ভ তথ্যনিষ্ঠ অথচ সাহিত্য-রস-সমৃদ্ধ রচনার প্রথম পরিচয় আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ'এ। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রপ্রতিভার সংস্পর্শে এই সাহিত্য শাখা ফুলে ফলে পল্লবিত হয়েছে। তাঁর গৌরবদীপ্ত গভীর মনন এবং ভাবের স্পষ্টতা, বিশেষ লিখন ভঙ্গী বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে।

প্রভাতকুমারের প্রবন্ধ - নিবন্ধ বিষয় বৈচিত্র্যের অভাব না থাকলেও দেখা যায় ধর্ম্ম বা দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা কোথাও করেন নাই। হয়ত এই গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করা তাঁর মানসিকতার অনুকূল ছিল না। রামমোহন, ভূদেব অথবা বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ রচনা রচনা করেছেন অনেকাংশে সমাজ সংস্কারের তাগিদে। কিন্তু প্রভাতকুমারের সমসাময়িককালে এই ধরণের সমাজ-সংস্কারের কোন তাগিদ ছিল না। যে স্বদেশী আন্দোলনকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেই আন্দোলনের রীতি - নীতি-কে তিনি যে মনে প্রাণে মেনে নিতে পেরেছিলেন এমন কথাও বলা যায় না। তাঁর স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধটি আলোচনায় সে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে। সাহিত্যপ্রাণ প্রভাতকুমারের অধিকাংশ আলোচনাই সাহিত্য সম্পর্কিত— কখনও প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার প্রচেষ্টা অথবা সমসাময়িক সাহিত্যালোচনা। প্রাচীন সাহিত্য অথবা সাহিত্যিক সম্পর্কিত লোক-প্রচলিত মতবাদকে, একদিকে ভাবী-কালের জন্য সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন অন্যদিকে সমসাময়িককালের সাহিত্যালোচনার মাধ্যমে লেখক— পাঠক উভয়েরই উপকারের প্রচেষ্টা করেছেন। হয়ত তাঁর সামর্থ্য সীমিত কিন্তু আন্তরিকতা ও উদ্যমের অভাব ছিল না। তাঁর প্রথম গদ্যরচনা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের সমালোচনা(দাসী, মে, ১৮৯৬)। ঐ বৎসরই রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচক প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্র-নাথের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন(দাসী, বৈশাখ, ১৩০৩)

তুলনামূলক বিচারে প্রিয়নাথ সেনের সমালোচনা-পদ্ধতি প্রভাতকুমারের থেকে শ্রেষ্ঠ একথা নি:সন্দেহে বলা চলে । সমালোচক এখানে 'মানসী' কাব্যের কবিতাগুলির ওপর সৌন্দর্য-বৈচিত্র্য ভাব - ভাষা - ছন্দের প্রয়োগ কৌশল, কবিতাগুলির ব্যঞ্জনাশক্তির পরিচয় এবং বিদেশী কবির রচনার সঙ্গে তুলনা করে 'মানসী' কাব্যের অন্তর্নিহিত রসতত্ত্বটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন । অন্যপক্ষে প্রভাতকুমারের চিত্রা কাব্যের আলোচনায় সমসাময়িককালে রবীন্দ্র-ভক্ত এবং বিরোধী দলের পরিচয় এবং তাঁর রবীন্দ্রপ্রীতির কথা যতখানি বিবৃত হয়েছে; চিত্রা-কাব্য সৌন্দর্য ততখানি উদ্ঘাটিত হয় নাই । তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধে এই ধরণের আত্মপ্রক্ষেপ লক্ষনীয়। 'ইংরাজ - রমনী' প্রবন্ধে ইংরাজ রমনীর রূপ সম্পর্কিত আলোচনায় লিখেছেন — '..... প্রথমত: বর্ণের কথা — অত শাদা আমার ভাল লাগেনা । যেন চক্ষু ঝলসিয়া যায় । বরং ইতালীয় বা স্পেন দেশীয় যুবতীর দেহবর্ণ আমার নিকট সমধিক মনোরম । তাহারাই যথার্থ গৌরী। ইংরাজের মেয়ে গৌরী নহে - শ্বেতা ।' ৭ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী'তে ইংরাজ রমনীর রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন —' এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে । সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই । শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন তো আমায় ক্ষমা করবেন, আমার বিশ্বাস, ইংরাজ মেয়ের মত সুন্দরী পৃথিবীতে নেই । নবনীর মত সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা এবং দীর্ঘপল্লববিশিষ্ট নির্মল নীল নেত্র, — দেখে পথকষ্ট দূর হয়ে যায় ।' ৮ রবীন্দ্রনাথ এখানে নিজের সৌন্দর্যানুভূতিকে অন্যমনে সঞ্চার করে দিয়েছেন কিন্তু প্রভাতকুমারের অনুভূতি অনেকাংশেই ব্যক্তিগত হয়ে পড়েছে।

প্রভাতকুমারের প্রবন্ধগুলিতে তথ্যের অভাব নাই । সিমলা পাহাড়ের ৪৭০০ ফীট উচ্চতা থেকে জানুয়ারী মাসের ৪৫° নিম্নতম তাপের কথা 'সিমলা - শৈল'তে লিপিবদ্ধ আছে । কিন্তু যে অনুভূতির স্পর্শে এই তথ্য সাহিত্যিক প্রবন্ধে রূপান্তরিত হতে পারে প্রভাত - প্রতিভা প্রবন্ধ রচনায় সর্বত্র তার পরিচয় রেখে যেতে পেরেছেন এমন কথা বলা যায় না । অবশ্য তাঁর বিলাত - ভ্রমন বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে এই প্রতিভার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, লেখকের সকৌতুক আত্মমুগ্ধ ভঙ্গি হৃদয়ের গভীর অনুভূতিকে এখানে প্রকাশ করেছে ।

' প্রবন্ধে বিষয়ীর চেয়ে বিষয়ের গৌরব অধিক, যুক্তির সূত্রে তথ্য বা ভাবকে গেঁথে তুলতে হয়, অবান্তর কথা বা অনাবশ্যক অলঙ্কার আমদানি করতে গেলে সূত্র ছিন্ন হয়ে যায় ।' ৯ উপন্যাস রচনার ভাষায় বঙ্কিম-চন্দ্রের অলংকার প্রিয়তা থাকলেও তাঁর প্রবন্ধ রচনার ভাষা তুলনামূলক ভাবে

সরল এবং ঋজু । কিন্তু গল্প -উপন্যাস লেখক প্রভাতকুমার এবং প্রবন্ধ - নিবন্ধ লেখক প্রভাতকুমারের ভাষাভঙ্গিতে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। প্রায় একই সময়ে লিখিত তাঁর গল্প - উপন্যাস এবং প্রবন্ধজাতীয় রচনার নমুনা উদ্ধার করা গেল ।

' ধনী পিতার একমাত্র পুত্র কুমুদ, যখন যত টাকা চাহিত পিতা তাহাই পাঠাইয়া দিতেন ,, মাসিক বরাদ্দও অন্যান্য ছাত্রের অপেক্ষা কুমুদের অনেক অধিক ছিল। সুতরাং তাহার চাল অত্যন্ত লম্বা হইয়া পড়িয়াছে ।('কুমুদের বন্ধু' (গল্প) – প্রকাশ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২) । ১০

'ইহার নাম গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় – পুরুষানুক্রমে ত্রিবেণী গ্রামে বাস করিতেছেন । বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ বৎসর। কিঞ্চিৎ জমিদারী আছে – টাকা কর্জ দিবার ব্যবসায়ও করিয়া থাকেন। গ্রামের মধ্যে ইনি একজন সম্পন্ন ব্যক্তি ।'

('জীবনের মূল্য'-(উপন্যাস) – ১৩২২ সালে লিখিত প্রকাশিত ১৩২৩ সাল ।' ১১

'চন্দ্র, সকল দেশের কবিগণেরই বর্ণনার প্রিয়বস্তু, কিন্তু চন্দ্রের কলঙ্ক লইয়া সংস্কৃত কবিগণ যে প্রকার মস্তিষ্কচালনা করিয়াছেন, অন্য কোনও ভাষার কবি সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না । প্রিয়ার মুখচন্দ্রখানি নিষ্কলঙ্ক, আকাশের চন্দ্রমা কলঙ্কযুক্ত — এই কথা বলিয়া সংস্কৃত কবি - সম্প্রদায় চাঁদকে যে কত ধিক্কার দিয়াছেন, তাহার আর সীমা নাই ।তাই কি সরলভাবে বলিয়াছেন ? – কেবল ঠেস দিয়া দিয়া কথা ।

('চন্দ্রের কলঙ্ক'-(প্রবন্ধ) ভাদ্র, ১৩২২)। ১২

প্রায় একই সময়ে রচিত এই গল্প - উপন্যাস-প্রবন্ধের ভাষা, প্রয়োগ কৌশলের কোন বিশেষ ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় না ।ভাব প্রকাশে ভাষা সর্বত্রই সহজ সরল । বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের আসরে প্রভাতকুমারের এই রচনাগুলি কোন বিশিষ্ট স্থান হয়ত অধিকার করতে পারে নাই কিন্তু প্রভাত মানসিকতার পরিচয় প্রবন্ধগুলিতে উদ্ঘাটিত ।

—

-: উল্লেখ পঞ্জী :-

১। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড)-সুকুমার সেন পৃ: ৪৯

২। প্রভাত গ্রন্থাবলী (পঞ্চম খন্ড)-শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ৪২৯

৩। সচিত্র শিশির — অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ পৃ: ৫১

৪। ঘরের কথা (ভূমিকা)-ফকির চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

৫। প্রবাসী - ফাল্গুন, ১৩১৩ - পৃ: ৫৯৩

৬। ঐ - ঐ ঐ পৃ: ৫৯৪

৭। প্রভাত গ্রন্থাবলী (চতুর্থ খন্ড) — শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ৪৪৫

৮। ঐ (ঐ) — ঐ পৃ: ৪৪৫

৯। বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক — প্রমথনাথ বিশী পৃ: ১৩০

১০। প্রভাত গ্রন্থাবলী (চতুর্থ খন্ড) — শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ১৮৯

১১। ঐ (ঐ) — ঐ পৃ: ২০৮

১২। ঐ (ঐ) — ঐ পৃ: ৩৭৭

— : অনুবাদ : —

প্রভাতকুমারের জীবন আলোচনায় আমরা জেনেছি বি.এ. কোর্সে তিনি ছিলেন বিজ্ঞান শাখার ছাত্র। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সারাজীবন তিনি বাংলা সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। এই সূত্রে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য এবং ছন্দ অলংকারও গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও উদ্ভট শ্লোক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন রচনায়, যথাস্থানে সেগুলি আলোচিত হয়েছে। ইংরেজী সাহিত্য চর্চা ও বিদেশ ভ্রমণের ফলে এই ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট অধিকার জন্মেছিল। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর পারঙ্গমতার পরিচয় রয়েছে, তাঁর কৃত কিছু বাংলা গল্পের ইংরেজী অনুবাদে। রবীন্দ্রনাথের এবং নিজের কয়েকটি বাংলা গল্পের ইংরাজী অনুবাদও প্রভাতকুমার করেছিলেন। যে কয়েকটির সন্ধান আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে নিম্নে তার উল্লেখ করা হলো।

(১)	The Riddle Solved	অনুবাদক -প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথের 'সমস্যাপূরণ'
(২)	Swift Retribution	ঐ	প্রভাতকুমারের 'হাতে হাতে ফল'
(৩)	The Crown Thee King	ঐ	রবীন্দ্রনাথের 'রাজটিকা'
(৪)	The Skeleton	ঐ	'রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল'
(৫)	The Lady from Benaras	ঐ	'প্রভাতকুমারের কাশীবাসিনী'
(৬)	The Trust Property	ঐ	'রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি-সমর্পণ'
(৭)	The Renunciation	ঐ	রবীন্দ্রনাথের 'ত্যাগ'
(৮)	The Wiles of a Pleader	ঐ	প্রভাতকুমারের 'উকিলের বুদ্ধি'
(৯)	His release	ঐ	প্রভাতকুমারের 'খালাস'

(১০) এছাড়াও আটটি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ বা ভাবানুবাদ করেছেন। অনুবাদ কবিতা রচনা প্রসঙ্গে সেইগুলি আলোচিত হয়েছে।

প্রভাতকুমার কৃত ইংরাজী অনুবাদের কিছু নমুনা উদ্ধার করা গেল

' It was a full-moon night early in the month of Phagun. The youthful spring was sending forth in all direction its breeze landen with the fragrance of mango-blossoms. The melodious notes of an untiring *Papiya concealing itself within the thick foliage of an old lichi tree standing by the side of a tank, were penetrating into a sleepless bed-room of the Mukherjee family. ' 1.

উপরের উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'ত্যাগ' গল্পের ইংরাজী অনুবাদ । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

' ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে । পুষ্করিণীতীরের একটি পুরাতন লিচু গাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে একটি নিদ্রাহীন অশ্রান্ত পাপিয়ার গান মুখুজ্জেদের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়নগৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছে ।' ১

' সম্পত্তি সমর্পণ ' গল্পের শেষ কয়েকটি পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —'সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর হইতে উঠিবার মই খুঁজিয়া না পাইয়া আবার সে ধপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের লুকোচুরি খেলায় যেখানে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেইখানে অন্তর্হিত হইল ।

উদ্ধৃত অংশের প্রভাতকুমার অনুবাদ করেছেন —

'unable to find the ladder for climbing out of his terrible dungeon where there was no light to see and no air to breathe he fell on his bed once more and disappeared into the region where no one has ever been found out in the eternal game of world's hide and seek.'২

প্রভাতকুমার 'হাতে হাতে ফল' গল্পে লিখেছেন —'সন্ধ্যা হইয়াছে। সিরাজপুর ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ আফিসে বসিয়া, ডাক্তার হরগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সিগনালারবাবুকে বলিতেছেন, তা, কিছু ভয় নেই। আমার সঙ্গে একজন লোক দিন, একটা পাউডার আর একটা মিকশ্চার এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, দু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন।"

অংশটির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন —

' It was evenøing.Sitting inside the telegraphic office at Sirajpur Railway station,Dr. Hara Gobind Chatterjee addressing the young operater said -- " you needn't feel anxious.Send somebody with me and I will give him a powder and mixture for your little baby,to be taken once in two howers. It is nothing serious "....১

প্রভাতকুমারের কিছু বিখ্যাত গল্পের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী মিরিয়ম.এস্. নাইট, শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী, শ্রী হিরন্ময় ঘোষাল এবং শ্রীমতি লীলা রায়। গল্প এবং অনুবাদকের নামের উল্লেখ করা গেল।

শ্রীমতি নাইট অনুবাদ করেছেন — কলির মেয়ে (Signs of the time), বন্য শিশু (The forest child), কুড়ানো মেয়ে (The foundling), প্রতিজ্ঞা পূরণ (The fulfilment of a vou), ভুল শিক্ষার বিপদ (The danger of being wrongly taught), ছদ্মনাম (Pseudonyms),

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী পুনর্মূষিক' গল্পটির অনুবাদ করেছেন 'The prodigal's Return' নামে। শ্রীহিরন্ময় ঘোষাল'ফুলের মূল্য' গল্পটির 'A Shilling for flowers'নামে অনুবাদ করেছেন। শ্রীমতী লীলা রায়ও'ফুলের মূল্য'গল্পটির অনুবাদ করেছেন 'Price of flowers' নামে।

হিন্দী, মারাঠী, তামিল, উর্দ্দু ভাষাতেও প্রভাতকুমারের'দেশী ও বিলাতী' গল্পগ্রন্থের কিছু গল্প অনূদিত হয়েছে। 'রত্নদীপ' উপন্যাসটি হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করেন পণ্ডিত জনার্দন ঝা এবং মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন ভার্গবরাম ভিটল বরেরকর।

---

*One of the sweetest songsters in Bengal.Anglo-Indian writers have nick named in the "brain-fever bird" which is a xj sheer libel.

1. The Renunciation-(Translated by Prabhat Kumar Mukherjee) Modern Review,August 1910.

-: উল্লেখ পঞ্জী :-

১। ত্যাগ — রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ।

২। The Trust Property - The modern Review,May,1910.

৩। Swift Retribution - ,, ,, ,, Oct.,1909.

প্রহসন ।

সূক্ষ্মলোম - পরিণয় :- ' শ্রীজানোয়ারমোহন শর্ম্মা' এই ছদ্মনামে গদ্য-পদ্যে লিখিত প্রভাতকুমারের একমাত্র প্রহসন রচনা 'সূক্ষ্মলোম - পরিণয়'। পঞ্চম অঙ্ক বিশিষ্ট এই প্রহসনটি 'মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় ১৩২২ সালের শ্রাবণ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ।প্রহসনটি রচনার পেছনে নাট্যকার অমৃতলাল বসুর প্রেরণা থাকা অসম্ভব নয়। কারণ - প্রহসনটি রচনার প্রায় বৎসরকাল পূর্বে 'মানসী ' পত্রিকায় এক প্রীতি সম্মিলনে অমৃতলালের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল এবং অমৃতলাল স্বয়ং প্রভাতকুমারের কিছু কিছু গল্পের নাট্যরূপ দেবার ইচ্ছা করেছিলেন । এই বিষয়ে তিনি প্রভাতকুমারের সহযোগিতাও কামনা করেন। অমৃতলালের এই ইচ্ছার সূত্রে হয়ত প্রভাতকুমার প্রহসনটি রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। উপরন্তু জামালপুর অবস্থান কালে তিনি অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রহসনটির অভিনয়ও দেখেছিলেন ।

প্রহসনটির অভিনবত্ব এই — এখানে পাত্রপাত্রীরা সবই জীবজন্তু। কিন্তু জীবজন্তু হলেও তাদের পদবীগুলি অনেকাংশে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের পদবীর অনুসরণে লিখিত , যেমন কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায়, শৃগাল ভট্টাচার্য, ঋজুশৃঙ্গ ছাগোপাধ্যায়, নীলচক্ষু শৃগালোপাধ্যায় ইত্যাদি। তাদের আচার ব্যবহার কথোপকথন সবই মনুষ্য সমাজের অনুরূপ।

মৃদু ব্যঙ্গ মিশ্রিত মূলত: কৌতুক রসাশ্রিত প্রহসনটির বর্ণিত বিষয় বাঙ্গালী সংসারে পুত্র - কন্যার বিবাহ - ব্যবস্থা ।বাঙ্গালীর সংসারে সাধারণত: দেখা যায় পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে যৌতুক স্বরূপ পিতা কন্যা-পক্ষ থেকে কিছু ধন দৌলত আদায়ের চেষ্টা করেন, সুযোগ বুঝে ব্রাহ্মণ পুরোহিত উভয় পক্ষ থেকেই কিছু প্রাপ্তিযোগের চেষ্টায় থাকেন। বলাবাহুল্য এই প্রাপ্তির জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সকলেই কিছু ছল - চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন । আবার এই অবসরে সুযোগমত পূর্বের আক্রোশ মেটাতে অনেকে সচেষ্ট হন। স্বাভাবিক ভাবেই বিবাহ অনুষ্ঠানে অনেক ক্ষেত্রেই জটিলতার সৃষ্টি হয়। প্রহসনটিতে কয়েকটি পশু চরিত্রের অন্তরালে বাঙ্গালী গৃহস্থের এই অবস্থাকে রূপদান করা হয়েছে । অবশ্য সাময়িক জটিলতার সৃষ্টি করলেও সমস্ত সমস্যার মধুর সমাধান শেষ পর্য্যন্ত হয়েছে ।

প্রহসনটিতে সমস্যার উত্থাপন হয়েছে 'জনৈক মধ্যবিত্ত বনস্থ' কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায়ের পুত্র সূক্ষ্মলোম মেষোপাধ্যায়ের বিবাহ 'বনান্তর-বাসী' স্থূলপুচ্ছ মেষোপাধ্যায়ের কন্যা শ্বেতলোমার সঙ্গে স্থির করার ব্যাপারে। কন্যা দেখার জন্য কৃষ্ণলোম তার প্রতিবেশী ঋজুশৃঙ্গ ছাগোপাধ্যায়কে পাঠায়।

বিপদে টাকা ঋণ না পাওয়ায় কৃষ্ণলোমের উপর ঋজুশৃঙ্গের পূর্বের আক্রোশ ছিল। এই সুযোগে কন্যা পক্ষের কাছে সুচতুরভাবে পাত্রের দুর্নাম করে বিবাহ সম্বন্ধে গোলযোগের সৃষ্টি করে। পাত্রীর পিতা, পাত্রের কিছু দোষ থাকা সত্ত্বেও কন্যার বিবাহ এইখানেই স্থির করতে মনস্থ করেন। কারণ পাত্রের লেখাপড়া না জানা থাকলেও বিষয় সম্পত্তির অভাব নাই। পাত্রীর মাতার এই বিবাহে ঘোরতর আপত্তি দেখা দেয়। কারণ তাস পাশা গীত বাদ্য নিয়ে মত্ত পাত্রের স্বভাবে তিনি সন্দিহান। স্বাভাবিকভাবে স্বামী-স্ত্রীতে কলহ উপস্থিত হয়। অবশেষে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মাতা গৃহত্যাগ করেন। অসাবধানতাবশত: কন্যাও একদিন পথিমধ্যে হারিয়ে যায়। এদিকে পাত্রীর রূপগুণের কথা বন্ধুমারফৎ পাত্র জানতে পেরে বিবাহের জন্য আকুল হয়ে ওঠে এবং পাত্রীর গৃহত্যাগের কথা জানতে পেরে মনের দু:খে সেও গৃহত্যাগ করে বানর মহারাজের রাজ্যে আশ্রয় নেয়। সেখানেই একদিন তার অসুস্থ অবস্থায় সেবা যত্নের জন্য নিযুক্ত এক সুন্দরী কন্যার পাণি-গ্রহণ করে। পরে অবশ্য জানা গেল সেই কন্যাই তার পিতার মনোনীতা পাত্রী; [redacted] যে পাত্রীর রূপের কথা শ্রবণে সে বিবাহে আকুল হয়েছিল এবং দু:খে গৃহত্যাগ করেছে।

প্রহসনটির নাম নির্বাচন থেকে কাহিনী পরিকল্পনা সবই কৌতুককর এবং কিছুটা উদ্ভটও বটে। মনুষ্যসমাজে অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহের প্রচলন আছে কিন্তু লেখকের মনে পশুসমাজের সূক্ষ্মলোম পরিণয়ের চিন্তা অনেকাংশে উদ্ভট পরিকল্পনা বিশেষ। পশুচরিত্রগুলির মনুষ্যসমাজের মত আচার ব্যবহার কথোপকথন সর্বত্রই কৌতুকবহ — যেমন পশুর ক্ষুর জোড় করে নমস্কার করা, শিলায় উপবেশন করে মানুষের মত গড়গড়া সেবন ইত্যাদি দৃশ্যগুলি যথেষ্ট কৌতুকবহ। কিন্তু এই কৌতুক পরিবেশনের মধ্যেও মাঝে মাঝে মৃদু ব্যঙ্গের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

পুত্রের বিবাহ স্থাপনের মারফৎ পিতার মনে অন্যের সম্পত্তি কিছু আত্মসাৎ করার যে বাসনা প্রায়শ:ই লুক্কায়িত থাকে কৃষ্ণলোমের বক্তব্যের অন্তরালে লেখক সেই মনোভাবকে ব্যঙ্গ করেছেন —

'আর শুন —
(এদিক ওদিক চাহিয়া, নিম্নস্বরে)
শুনিয়াছি বেয়াইয়ের হাতে কিছু আছে —
জামাতা হইবে তার উত্তরাধিকারী —
সে গুজব সত্য কি না, গোপনে গোপনে
একবার লইও সন্ধান।

(সুর তুলিয়া)

তাহা যদি

সত্য হয় মেয়েটি সুশ্রী নাহি

হইলেও চলিবে রে দাদা। রূপ নিয়ে

কি কাজে লাগিবে বল ? আখেরটা ভাবা

নিতান্ত উচিত।'[১] (১ম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

আবার শৃগাল ভট্টাচার্যের চরিত্র-রূপায়ণে বাঙালী সমাজের ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কার্য্যকলাপের প্রতি কটাক্ষ আছে। পুত্রের বিবাহের দিন ধার্য করবার জন্য কৃষ্ণলোম তাঁকে পাত্রীপক্ষের গৃহে যেতে বললে সে তাঁর দৈনন্দিন ক্রিয়া কর্মের অজুহাত দেখায়। কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ পথের খরচ প্রাপ্তিমাত্র তার উক্তি —

'ভট্টা। (ট্যাঁকে গুঁজিয়া) আহা, আমি না গেলে কি ভাল হয় ?
তোমরা আমার বনিয়াদি যজমান, পুরুষানুক্রমের
সম্বন্ধ — আমি পুরোহিত — তোমার হিতের কার্য্য
না সাধিয়া আগে, অন্য কর্মে হাত দিতে পারি
কভু দাদা ?'[২]

(দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

তথাকথিত পুরোহিতগণের শাস্ত্রজ্ঞানে অজ্ঞতা এবং সেই অজ্ঞতাগোপনের জন্য সুচতুর মিথ্যা ভাষণের প্রতিও লেখক ইঙ্গিত করেছেন। বিবাহের দিনস্থির ব্যাপারে শৃগাল ভট্টাচার্যকে বলতে শুনি —

'থাকিবেনা কেন ?
অগাধ এ জ্যোতিষ সমুদ্র, যা খুঁজিবে তাহাই মিলিবে।
ভাল, আটুই না হয় আঠারই, আটাশে, আটত্রিশে —'[৩]

(দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য)

আটত্রিশ দিনে মাসের কথা শ্রবনে কৃষ্ণলোম প্রতিবাদ করলে ভট্টাচার্য উত্তর করেন কলিকালে হয়না বটে, তবে সত্যযুগে কখনও কখনও আটাত্তর দিনেও মাস পূর্ণ হতো। তার এই মিথ্যাভাষণকে সত্য প্রতিপন্ন করবার জন্য যুক্তি দিয়েছেন—

'কিন্তু বুদ্ধি যদি থাকে, ভেবে দেখ তবে,
সেকালে মানুষগুলা শতহস্ত ছিল,
পরমায়ু ছিল পুরা সহস্র বৎসর —
তবে কি হিসাবে দাদা অনুমান করি
মাসগুলা ছিল মাত্র ত্রিংশ দিবসের ?'[৪]

বলাবাহুল্য এই ধরণের মূঢ় যুক্তিতেই আমাদের সমাজের তথাকথিত পুরোহিতবর্গ যজমানের হিতকর্ম সমাধান করে থাকেন।

বানর রাজার প্রশস্তি কীর্তন করায় রাজা ভট্টাচার্যগণকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করেন। রাজস্তুতিতে সন্তুষ্ট হলে আমাদের দেশের রাজন্যবর্গ যে অনেক সময় এইভাবে অপাত্রে উপাধি বিতরণ করতেন — সেই ঘটনার প্রতি লেখকের কটাক্ষ লক্ষ্য করা যায়। বি,এ, এম.এ. পাশ করা পাত্র থেকে বিয়ের বাজারে পিতার অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পাত্রের কদর বেশি—বাঙ্গালী মানসের এই মনোভাবের কথাও প্রহসনটিতে ব্যক্ত হয়েছে। প্রহসনটিতে ব্যঙ্গ - বিদ্রূপ থাকলেও সেইগুলি তীক্ষ্ন হয়ে বিদ্ধ করে না।

'সূক্ষ্মলোম - পরিণয়ে' কোথাও কৌতুক হাস্যের অসদ্ভাব ঘটে নাই। চরিত্রগুলির কথায় ও কাজের অসঙ্গতিতে অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিকভাবে হাস্য-রসের সৃষ্টি হয়েছে, আবার মহিষ-বানরের যুদ্ধের দৃশ্য বর্ণনাও যথেষ্ট কৌতুককর। কাহিনী রচনায় একটি সমস্যার ইঙ্গিতও আছে। এতৎ সত্ত্বেও রচনাটি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রহসন হয়ে উঠতে পারেনি।

'উচ্চাঙ্গের প্রহসনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে তাহার মধ্যে মানব জীবনের যত গভীর সত্যই রূপায়িত হউক না কেন, তাহা গম্ভীর হইবে না। সহজ -সরল হাস্যরসের অবতারণার মধ্য দিয়া সমাজ-জীবনের দুষ্টতার একটি সহনযোগ্য নগ্নরূপ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে যাহার ফলে সমাজ সংশোধনের পথে অগ্রসর হয়। এই সংশোধন গুরু -মহাশয়ের বেত্রাঘাত নহে।'৫

লেখক এখানে বিবাহ ঘটিত যে সমস্যা উপস্থাপিত করেছেন তার মর্মমূল পরিবার - মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ বাঙ্গালী ঘরের পুত্রকন্যার বিবাহ সমস্যা একটি সামাজিক সমস্যা বলে সহজেই পরিগণিত হতে পারে। কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে যে অন্যায় অবিচারের সম্মুখীন কন্যাপক্ষকে প্রায়শঃই হতে হয় প্রভাত কুমারের সমসাময়িক সমাজে সেই দৃষ্টান্তের অপ্রতুলতা ছিল না। সার্থক প্রহসন রচনায় হাস্য-রসিকতার অন্তরালে এমন একটি সামাজিক সমস্যার বাস্তবরূপ প্রকাশের প্রয়োজন আছে। রামনারায়ণের 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটক এ (১৮৫৪) কুলীন কুলের বহুবিবাহ প্রথা, তাঁদের স্ত্রী ব্যভি-চার অনাচারের বাস্তব সমস্যাটি রূপায়িত করেছেন। বহু বিবাহজনিত কুফল সামাজিক সমস্যারূপেই পরিগণিত হয়েছে। স এখানে বাস্তব সমস্যার রূপায়ণ থাকলেও অতিরিক্ত -ব্যঙ্গ রচনাটিকে সার্থক প্রহসনে উন্নীত করতে

পারেনি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সাহিত্যে প্রথম সার্থক প্রহসন রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৫৯) এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৫৯) সমস্ত রোমান্টিকতা বর্জিত বাস্তব সামাজিক সমস্যা ভিত্তিক সার্থক প্রহসন। এখানে লেখক হাস্যরসের আধারে সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় তরুণ যুবকের মদ্যাসক্তি এবং গর্হিত আচার আচরণ এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে কপটাচারী জমিদারের ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে ব্যভিচার বৃত্তির নিখুঁত চিত্র অতি সহজ এবং সংগত ভাষায় হাস্যরসের আধারে পরিবেশন করেছেন। প্রভাতকুমারের প্রহসনটিতে সমস্যার গুরুত্ব সমাজদেহকে কেন্দ্র করে বিকশিত হতে পারেনি তাই তার আবেদন হয়েছে সীমিত।

কাহিনী রচনায় এখানে শিথিলতা লক্ষণীয়। বানর মহারাজের সভার অথবা বানর ও মহিষ রাজার যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গ যতই কৌতুককর হউক না কেন মূল সমস্যা-রূপায়ণের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না। বরং বলা যায় এই দীর্ঘ বর্ণনা কাহিনীকে সংহত হতে দেয়নি। কাহিনী রচনায় এই অসংযত ভাব লেখকের উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা গেছে। তবে ঘটনা ও চরিত্রের অসংগতি রূপায়ণের মাধ্যমে কৌতুক-হাস্য সৃষ্টি করার অপূর্ব কৌশল যেমন তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প রচনায় দেখা গেছে এখানেও তার পরিচয় আছে। এখানে শৃগাল ভট্টাচার্যের চরিত্রটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। সে পরহিতসাধন বৃত্তির সোচ্চার ঘোষণা করে কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় আত্মহিতই তার প্রধান কথা। আবার দেখা যায় যে কৃষ্ণলোম পুত্রের বিবাহে ধন সম্পদের আশা করেছিল সে ঘটনার আবর্তে কি ভাবে বিপাকে পড়ে সব আশা ত্যাগ করেছে। সূক্ষ্মলোমের চরিত্রটিও বেশ কৌতুককর। পরমুখে পাত্রীর রূপের কথা শুনেই সে তাকে পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে এমনকি পাত্রী তার মায়ের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে শুনে সেও বেদনাহত চিত্তে নিরুদ্দেশ হয়েছে। অথচ বিদেশে গিয়ে অতি সহজেই সে অন্য তরুণীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে দ্বিধাবোধ করেনি। তার এই বক্তব্য এবং কার্যের অসঙ্গতিপূর্ণ মনোভাব সত্যই হাস্যকর। অবশ্য যে পাত্রীকে সে বিয়ে করেছে সে পিতারই পূর্বকার মনোনীতা পাত্রী।

'সূক্ষ্মলোম পরিণয়ের' কাহিনী পরিকল্পনায় আংশিকভাবে অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪) প্রহসনটির কাহিনীকে স্মরণ করায়। 'বিবাহ বিভ্রাটে' দেখি কন্যাদায়গ্রস্ত মন্মথ মিত্রকে একেবারে নিঃস্ব করে নির্দয় ভাবে গোপীনাথ সরকার তার এল.এ. পড়া ছেলের বিয়েতে বরপণ আদায় করেছে। অথচ সেই ছেলে নন্দলাল বাবাকে ফাঁকি দিয়ে বরপণের টাকা নিয়ে বিলাতে চলে গেছে।

'সূক্ষ্মলোম পরিণয়ে দেখি কৃষ্ণলোম মুখোপাধ্যায় পুত্রের বিবাহে কিছু বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্তির আশা করেছে কিন্তু সেই পুত্রও পিতার আশা ধূলিস্যাৎ করে পাত্রীর বিরহে কাতর হয়ে গৃহত্যাগ করেছে। কিন্তু অমৃতলাল তাঁর প্রহসনে বরপণ প্রথার জঘন্যতাকে কঠোর ভাবে ব্যঙ্গ করেছেন প্রভাতকুমার কিন্তু সমস্যার সমস্ত তিক্ততাকে কৌতুক রসে জারিত করে পরিবেশন করেছেন। তাই রচনাটি প্রহসন হিসাবে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতে না পারলেও এর সহজ কৌতুককর রসাবেদন পাঠকমনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

রূপকের আধারে সাহিত্যসৃষ্টির নজির বাংলা সাহিত্যে কমই। রচনাটিকে সেইদিক থেকে উল্লেখনীয় বলে মনে করার কারণ আছে।

উল্লেখ পঞ্জী

১। প্রভাত গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)–শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ৪৬১
২। ঐ (ঐ) – ঐ পৃ: ৪৭৬
৩। ঐ (ঐ) – ঐ পৃ: ৪৭৪
৪। ঐ (ঐ) – ঐ পৃ: ৪৭৫
৫। বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা –বৈদ্যনাথ শীল পৃ: ১৪১

ভাষা ও রচনারীতি।

প্রত্যেক সার্থক শিল্প সৃষ্টি আমাদের একটি নূতন রহস্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় - শিল্পীমনের জাদুস্পর্শে চিরপরিচিত এবং পুরাতনের মধ্যেও আমরা নূতনত্বের আস্বাদ অনুভব করি । পরিচিতকে নূতন করে উদ্ঘাটনের কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবেই শিল্প স্রষ্টার। শিল্পীর এই সৃজনশীলপ্রতিভা অনেকাংশে নির্ভরশীল তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং মানসধর্মের উপর। সমসাময়িক সমাজমন হয়ত কিছুটা তাঁকে সাহায্য করে । সাহিত্যে এই রূপান্তরকরণের রীতি বা স্টাইল সাহিত্যিকের নিজস্ব সম্পদ । সার্থক সাহিত্যিক যে ভাব-ভাষার অলৌকিক মহিমায় আমাদের এক অভিনব রসলোকে উপস্থিত করান তার মূলে নিহিত থাকে তাঁর বিশিষ্ট জীবন-দর্শন । এই জীবন দর্শনের স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রভাতকুমারের 'আদরিনী' এবং 'শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের বিষয়বস্তু একে অন্যেকে স্মরণ করালেও উভয়ের স্বাদ ভিন্ন ।প্রভাতকুমারের শান্ত , স্নিগ্ধ, স্নেহকোমল মন 'আদরিনী'কে পারিবারিক স্নেহপ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছে আর শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহী আত্মা 'মহেশ' এর বিয়োগ ব্যথার মাধ্যমে বাংলার কৃষক সমাজের চিরবঞ্চিত আত্মার ক্রন্দনধ্বনিকে মুক্তি দিয়েছে ।

শিল্পীমানসের এই ভাবাদর্শের বিশিষ্টতার সঙ্গে তাঁররচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । শিল্পীর জীবনাদর্শের আলোকেই তাঁর শিল্পরীতি আলোকিত হয়ে ওঠে । বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি বিশ্লেষণে দেখা যাবে তাঁর রচনারীতির পশ্চাৎপটে ক্রিয়াশীল হয়েছে তাঁর জীবনাদর্শ এবং ব্যক্তিত্ব । সমাজপরিবেশ এবং যুগমানুষের দাবীতে যেমন একটি সুস্থ জীবনাদর্শের ইঙ্গিত সাহিত্যিক বঙ্কিমকে দিতে হয়েছে তেমনি তাঁর বাহুল্য বর্জিত ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত জীবনের সময়-স্বল্পতা তাঁর গদ্য রচনার বাক্যগঠনগুলিকে স্বাভাবিকভাবে হ্রস্ব করে তুলতে সাহায্য করেছে , ভাষা-ভঙ্গীতে এনে দিয়েছে ঋজুতা এবং ক্ষিপ্রতা ।প্রবন্ধিক বঙ্কিমের রচনাসমষ্টি এর প্রকৃষ্ট পরিচায়ক । আবার রসপিপাসু বাঙালী পাঠকের জন্য ভাবানুষঙ্গিক আলংকারিক ভাষা প্রয়োগও বঙ্কিমের রসরচনায় অনুপস্থিত নয় । বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতির কৃতিত্ব এই - তিনি বিদ্যাসাগরীয় তৎসম শব্দবহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ গদ্যভাষাকে লেখকের মনের সর্বপ্রকার ভাবের ও রসের বাহনে উন্নীত করেন , তিনি 'লেখার ভাষা এবং মনের কথার মধ্যে ব্যবধান ' কমিয়ে আনেন— বাঙালী পাঠক বঙ্কিমী গদ্যরীতিতে রসের তৃষ্ণা মেটাতে সমর্থ - হয়েছে ।সমাজ ও যুগের দাবীতে বঙ্কিম-প্রতিভা বিদ্যাসাগরীয় গদ্য রীতির সন্ধি - সমাস - তৎসম শব্দের বাহুল্য বর্জন করেছে ।প্রয়োজনবোধে তৎসম শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন তদ্ভব ও দেশী শব্দ, অধিক সংযোজক অসমাপিকা ক্রিয়া পদের জায়গায় সমাপিকা ক্রিয়া পদের ব্যবহার । অপ্রয়োজনে বিশেষণের ব্যবহার বাক্যে কমিয়ে বাক্যকে সরল এবং আয়তনে ছোট করেছেন । বাগ্‌ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য আনবার জন্য প্রশ্নাত্মক বাক্যের ব্যবহার, বর্ণনভঙ্গির অন্তরঙ্গতায়

ঘটনায় আকস্মিক পরিবর্তন এনে পাঠকের মনে নাটকোচিত অনুভূতির সঞ্চার, অনুচ্ছেদের শেষে আপ্তবাক্যের প্রয়োগরীতি বঙ্কিম রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অনাবশ্যক অলংকারপ্রয়োগ করতে দেখা গেলেও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি অত্যন্ত সতর্কভাবে অগ্রসর হয়েছেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের রচনারীতি ধারায় বিদ্যাসাগরীয় রচনারীতিকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য রচনা সুরু করলেও আপন প্রতিভাবলে তিনি বাংলা গদ্যরীতির একটি বিশিষ্ট রূপদানে সক্ষম হয়েছেন। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা গদ্য শ্রীমন্ডিত হয়ে আত্ম-প্রকাশ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত রচনারীতিকে স্বীকার করে নিয়ে গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'বৌঠাকুরানীর হাট'(১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭), এমনি কি 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের রচনারীতিতে বঙ্কিম রচনা-রীতির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু স্বকীয় প্রতিভাবলে বঙ্কিম-রচনারীতিকে তিনি শুধু অতিক্রম করেন নি, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের রচনারীতিতে একটি নূতন ধারার সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন, মানসিকতা, জীবনপরিবেশ নিশ্চয় বঙ্কিমচন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র এবং এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর রচনারীতিতে সুস্পষ্ট। রবীন্দ্র-জীবনদর্শনে আমাদের বাস্তব জীবনের কোলাহল-মুখর ব্যস্ততার পরিচয় থাকলেও প্রায় সর্বত্রই তিনি এক আনন্দ লোকের সন্ধান করেছেন যেখানেই সবকিছুই এক ঐশ্বরিক মহিমায় মহিমান্বিত। তাঁর নিগূঢ় মনন অতিসূক্ষ্ম ভাবপ্রবণ মন এমন এক আদর্শলোকের চড়াসুরে বাঁধা পড়েছে যেখানে জীবন হয়ে উঠেছে বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ - জীবনের সবকিছুই এক বিশেষ অর্থ বহন করেছে। ইন্দ্রিয়গত হয়েও ইন্দ্রিয়াতীত তাঁর এই ভাবকল্পনা যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে সেই ভাষা গদ্য হলেও কাব্যসুষমা-মন্ডিত। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ কবি তাই তাঁর গদ্য রচনার মধ্যেও কাব্যের লালিত্য লক্ষণীয়। অবশ্য তাঁর এই ভাষা এবং রচনারীতি গঠনের পশ্চাতে দীর্ঘদিনের পরীক্ষা - নিরীক্ষা বর্তমান। তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাট' অথবা 'রাজর্ষি'তে বঙ্কিম-রচনারীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। 'চোখের বালি'র সাধুভাষা, ছোট ছোট বাক্যগঠন, পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের ব্যবহার বঙ্কিম প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দিলেও এখানে গদ্য-রচনায় কাব্যসুষমামন্ডিত হয়ে ভাষাকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করেছে। এর পর 'গোরা' (১৩১৪ - ১৩১৬) উপন্যাসে দেখা গেল মুখের ভাষার সংলাপ, কিন্তু মুখের ভাষা হলেও সে ভাষায় ঋজুতা, তীক্ষ্ণতা আছে সর্বোপরি ভাষা প্রসাদগুণ বিশিষ্ট। 'জীবনস্মৃতি'র (১৩১৮ - ১৩১৯) ভাষা আরও হৃদয়গ্রাহী, ভাষা ভাবকে কোথাও আচ্ছন্ন করে নাই। ১৩২১ সালে 'সবুজপত্র' প্রকাশের পর থেকে দেখা গেল গল্প উপন্যাসে তিনি পুরোপুরিভাবে কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'ঘরে বাইরে' (১৩২২), 'যোগাযোগ' (১৩৩৬) চলিতভাষায় লিখেছেন। 'শেষের কবিতায়' (রচনা-কাল ১৩৩৫) উপন্যাস রচনায় নূতন রীতি প্রবর্তন করলেন, গদ্যের মধ্যে কবিতার

অস্তিত্ব অনুভব করা গেল। রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসে যে অলঙ্কারভূষিত গদ্যের পরিচয় পাই তার প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও সেই গদ্যভাষার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এমনকি তাঁর তথ্যমূলক প্রবন্ধ গুলির ভাষাও অলঙ্কারভূষণ ত্যাগ করতে পারেন নাই। 'বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে গদ্য লাভ করেছিল দার্ঢ্য, যুক্তিনিষ্ঠা এবং লাবণ্য। রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ করে ছিলেন নমনীয়তা, কমনীয়তা ও কাব্যশ্রী যার ফলে অন্তর্লোকে ও বহির্বিশ্বে সঞ্চরণের ক্ষমতা হঠাৎ বেড়ে গেল ভাষার। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা যদি হয় অর্জুন, রবীন্দ্রনাথের ভাষা বৃহন্নলা, দুজনেই স্বরূপে এক কেবল রূপে ভিন্ন। অর্জুনে যে তেজ প্রকট, বৃহন্নলায় সেই তেজ প্রসাধনে প্রচ্ছন্ন। নৃত্যকলায় সে আচার্য্য বটে কিন্তু প্রয়োজন হইলেই সেই বেশটাকে ঘুচিয়ে দিতে দ্বিধা করেনা, তখন বীণা ফেলে দিয়ে তার হস্ত ধারণ করে, গান্ডীব আর মণিবলয়ভ্রষ্ট মণিবন্ধে বেরিয়ে পড়ে শতযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন কিণাঙ্করেখা, বুঝতে পারা যায় সৌন্দর্য্যের ছদ্মবেশের তলে শৌর্য্যের বহ্নিশিখা তেমনি উর্দ্ধ। তেমনি অচপল আছে।' ২

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই প্রভাতকুমার গদ্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ের জীবনপরিবেশ, জীবনদর্শন এবং ব্যক্তিত্বের পার্থক্য হেতু রচনায় ভাবের ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার যেমন রবীন্দ্র অনুগামী হয়েও রবীন্দ্র অনুসারী হয়ে উঠেননি তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট। প্রভাতকুমারের জীবন পরিচয় বহুবিস্তৃত, জীবনপ্রীতিও গভীর, মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতির অভাব নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানে মানুষের চাওয়া পাওয়ার উর্দ্ধে জীবনের একটি বিশেষ তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান করেছেন প্রভাতকুমার কিন্তু সেই বিশেষ তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যস্ত করেন নাই। দৃশ্যত: মানুষের জীবনচারণার অতীত কোন কিছুতেই তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হন নাই বরং এদের সুখ-দু:খ, হাসি-কান্না, ঐশ্বর্য্য বিড়ম্বনা, জীবনের অসঙ্গতিপূর্ণ আচার আচরণগুলি গভীর অভিনিবেশে পরম সহানুভূতিতে লক্ষ্য করেছেন। প্রবঞ্চিত জীবনের সীমাহীন বেদনায় দেহ সীমার অতীত এক আনন্দলোকের, এক আদর্শলোকের সন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমারের সমকালীন লেখক শরৎচন্দ্রও সীমাহীন সহানুভূতিতে বঞ্চিত জীবনের মর্ম্মবেদনার কথা উদ্ধার করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রভাতকুমারের জীবনদৃষ্টিতে সমবেদনা আছে, আনন্দ সন্ধানের চেষ্টাও তিনি অবিরাম করেছেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের মত বিশেষ তাৎপর্যমন্ডিত অথবা শরৎচন্দ্রের মত অতলস্পর্শী হয়ে উঠতে পারেন নাই। এই দৃষ্টি স্বাতন্ত্র্যের জন্যই রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র বিধবা বিনোদিনী, শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'এর বিধবা রমা এবং প্রভাতকুমারের 'রত্নদীপ'এর বিধবা বৌরাণীর প্রণয় তৃষ্ণা বাহ্যত: এক হলেও স্বরূপে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় ভাব ভাবনাকে প্রকাশ করবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ইঙ্গিতবহুল লালিত্যপূর্ণ আলঙ্কারিক ভাষা, সে ভাষা গদ্য হলেও কাব্যপাঠের আস্বাদ অনুপস্থিত নয়। শরৎচন্দ্রের

মন সুগভীর সহানুভূতিপূর্ণ তাই তাঁর ভাষাও বেদনামথিত হৃদয়ের নম্র স্পর্শে বর্ণে বর্ণে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। জীবনকে শরৎচন্দ্র দেখেছেন মরমীর দৃষ্টিতে সেই দেখার পরিচয় প্রদানে তাঁর লেখনী স্থল বিশেষে অশ্রু নির্ঝর সৃষ্টি করেছে। সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ মানুষের লাঞ্ছিত এবং প্রবঞ্চিত জীবনের প্রতি সহানুভূতিতে স্থলবিশেষে ভাষা হয়েছে বাষ্পাকুল। আবার সামাজিক অবিচারে ক্ষুব্ধ মানবাত্মার বিদ্রোহের সুরও শরৎচন্দ্রের ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে। প্রভাতমানসে আবেগ অনুপস্থিত নয় কিন্তু আবেগ অধীর হয়ে কোন আদর্শায়িত সৌন্দর্য্য ভূমিতে পদার্পণ করার চেষ্টা তিনি করেন নাই অথবা শরৎচন্দ্রের মত হৃদয়রহস্য উদ্ঘাটনেও সদাব্যস্ত নন। তাঁর অনুভূত হৃদয়াবেগ আমাদের সাধারণ - জীবনের হৃদয়োচ্ছ্বাসকেই স্মরণ করায়। তাই প্রভাতকুমারের ভাষারীতিতে সাধারণ জীবনের ব্যবহৃত ভাষার আধিক্য। হৃদয়ের অনুভবকে প্রকাশের জন্য কাব্যসুষমামণ্ডিত ভাষার প্রয়োজন তিনি বিশেষ বোধ করেন নাই।

প্রভাতকুমারের নায়িকার আবেগতাড়িত চিত্তের ভাবপ্রকাশে এবং ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের নায়িকার অনুরূপ মানসিক অবস্থার প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। ভবেন্দ্রবেশী রাখালকে নিজ স্বামী জ্ঞানে প্রথম সন্দর্শনে বউরাণী প্রনাম করতে উদ্যত হলে অশৌচের অজুহাতে রাখাল তাকে বাধা দেয়। তখন - 'বউরাণী মুহূর্তকাল দ্বিধা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল বলেন, আমার কাছে তুমি কোনও অবস্থাতেই অশুচি নও। - কিন্তু সে কথা উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। রাখালের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবলমাত্র বলিলেন -" তা হোক "। - বলিয়া প্রনতা হইলেন।' ৩ (রত্নদীপ - প্রভাতকুমার)

অচলার চোখ দিয়া জল পড়িতেই ছিল, সেই অশ্রুভরা দু'চক্ষু তুলিয়া সুরেশের মুখের প্রতি নিবদ্ধ করিল, কিন্তু ওষ্ঠাধর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তার পরে দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া সেই কম্পন নিবারণ করিতে গিয়া অকস্মাৎ ভগ্নকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, আমার কাছে আর তুমি কি চাও, আর আমার কি আছে? এই বলিতে বলিতেই মুখে আঁচল গুঁজিয়া বাহির হইয়া গেল।' ৪ (গৃহদাহ - শরৎচন্দ্র)

'চলো, চলো, এইবার বেরিয়ে পড়ো সকল ভালোবাসা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেছে সেই সাগরসংগমে। সেই নির্মল নীলের অতলের মধ্যে সমস্ত পঙ্কের ভার মিলিয়ে যাবে। আর আমি ভয় করি নে, আপনাকেও না, আর কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, যা পোড়বার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ

করেছেন ।৫ (ঘরে বাইরে - রবীন্দ্রনাথ)

গদ্য রচনার প্রাথমিক পর্য্যায়ে প্রভাতকুমার সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'চিত্রা' নিবন্ধটি সাধু ভাষায় রচিত । প্রাথমিক পর্বেরগল্পগুলি 'ভূত না চোর', 'কাজির বিচার', 'কাটামুন্ড', 'বেনামী চিঠি', 'হিমানী ইত্যাদি গল্পের সল্লাপও সাধু-ভাষায় রচনা করেছেন । আবার 'একটি রৌপ্য মুদ্রার জীবনচরিত', 'অঙ্গহীনা', 'ভুলভাঙ্গা', 'কুড়ানো মেয়ে', পত্নীহারা', ভিখারী সাহেব' ইত্যাদি গল্পগুলির সল্লাপে সাধু এবং চলিত ভাষার মিশ্রন লক্ষ্য করা যায় । এই সমস্ত গল্পের সল্লাপ-অনুধাবনে দেখা যায় যেখানে চরিত্রগুলির ব্যবহারে অত্যন্ত আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে সংলাপের ভাষ া সেখানে রচিত হয়েছে কথ্য ভাষায়। কিন্তু একই ব্যক্তির অপরিচিত পরিবেশে কথোপকথনের ভাষা হয়ে উঠেছে সাধুভাষা। 'পত্নীহারা' গল্পে স্বামী সুবোধ স্ত্রী সুনীতিবালার সঙ্গে কথোপকথনের অংশবিশেষ উদ্ধার করছি —

' সুবোধ হাসিয়া বলিল -" সহ্য হয় না নাকি ?"

" না"

" কেন ?"

" তুমি বাইরে থেকে হাসতে হাসতে এসেছ । তা ত হবে না । আমার কাছে এসে আমাকে দেখে তবে তুমি হাসবে ।"

" তুমি কি শুধু ঘরে আছ ? তুমি কি বাইরে নেই ?" ৬

এই গল্পেই থিয়েটার হলের টিকেট বিক্রেতার সঙ্গে' সুবোধের কথোপকথনের ভাষা -

' ভিড় ঠেলিয়া ফটক পার হইয়া সুবোধ থিয়েটারের অঙ্গনের ভিতর প্রবেশ করিল । যে ব্যক্তি টিকিট বিক্রয় করে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল —" ইংরাজীবেশধারিণী কোনও বঙ্গমহিলা টিকিট ক্রয় করিয়াছেন কি ?"

সে ব্যক্তির নাম ভবচরণ, বলিল -" মহাশয় কত লোক টিকিট লইয়াছে, এই ভীড়ে কি কাহারও মুখের পানে চাহিয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছি ! তবে মনে হইতেছে যেন একজন লইয়াছেন ।" ৭

একমাত্র দেবী গল্পটি ছাড়া 'নবকথা' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে প্রায় এই ধরণের সংলাপরীতি দেখা যায়। 'দেবী' গল্পটির সল্লাপ অংশ কথ্য ভাষা এবং বর্ণনার অংশ সাধু ভাষায় লিখিত ।' নবকথা'র পরবর্তীকালে রচিত গল্প উপন্যাসের কথোপকথনের ভাষায় তিনি এই রীতিই মুখ্যত: গ্রহণ করেছেন ।তবে অবাঙ্গালীর মুখে বাংলা ভাষায় কথোপকথন হলে সে ভাষা সাধু-বাংলা হয়েছে । 'বন্য-শিশু' গল্পে অবাঙ্গালী পুরোহিতের কথোপকথনের ভাষা-'বাবুজি আজ দুই দিন

উহাকে লইয়া মহাবিপদে পড়িয়াছি ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা উপন্যাস সার্থক শিল্পমূর্তি লাভ করেছে- তিনি আখ্যানের ভাষাকে সামগ্রিক ভাবে সমৃদ্ধি দান করেছেন । কিন্তু বর্ণনার ভাষা এবং সংলাপের ভাষার সূক্ষ্ম ব্যবধান তিনি সর্বত্র রক্ষা করেন নাই । তবুও তাঁর রচনায় বর্ণনা এবং সংলাপের ভাষায় বৈচিত্র্যের অভাব নাই । বিষয় বিশেষে বর্ণনার ভাষা এবং চরিত্র বিশেষে সংলাপের ভাষার ব্যতিক্রম দেখা গেছে ।অভিজাত চরিত্রগুলির মুখে তিনি তৎসম প্রধান সাধু ভাষা দিয়েছেন কিন্তু সাধারণ অথবা লঘুমনোভাবাপন্ন অভিজাত চরিত্রের মুখে মোটামুটিভাবে কথ্য ভাষার অনুগত ভাষা প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন । শুধু তাই নয় অনেকক্ষেত্রে পরিবেশ ও চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য বাংলা ছাড়াও হিন্দুস্থানী ওড়িয়া ইত্যাদি সংলাপ ব্যবহার করেছেন । বর্ণনা ও সংলাপের ভাষায় - বিষয় অনুযায়ী এই তারতম্যের সৃষ্টি বাংলা আখ্যান রচনায় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত । রবীন্দ্রনাথও বর্ণনায় সাধু এবং সংলাপে চলিত ভাষার ব্যবহার করেছেন । 'গোরা' উপন্যাসে এই রীতির পরিচয় আছে ।অবশ্য পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই রীতি পরিবর্তন করে কথ্য ভাষার দিকেই মনোযোগ দিয়েছেন । তবুও বলা যায় আখ্যান রচনার ভাষারীতিতে বঙ্কিম যে সূচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের হাতে তার পূর্ণপরিস্ফুটন সম্ভব হয়েছে ।

গদ্য রচনার ভাষায় প্রভাতকুমার কোন নূতন রীতি প্রবর্তনার চিন্তা বা চেষ্টা করেন নাই ।পূর্ববর্তী প্রথা অনুসারে সংলাপ রচনায় কথ্য ভাষা এবং বর্ণনার অংশে সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন , তবে এইটুকু বলা যেতে পারে প্রভাতকুমারের সাধুভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের মত তৎসম শব্দের বাহুল্য, সন্ধি সমাসের আড়ম্বর অথবা রবীন্দ্রনাথের মত উপমা অলংকারবহুল লালিত্যপূর্ণ নয় । প্রভাতকুমারের সাধুভাষাতে তৎসম শব্দ থাকলেও সেই সমস্ত অতি প্রচলিত তৎসম শব্দ সাধারণ পাঠকের কাছেও যার অর্থ সহজবোধ্য । তাঁর সাধুভাষা অত্যন্ত সরল । প্রচলিত প্রথার অনুসরণে এই সাধুভাষার ক্রিয়া এবং সর্বনাম একটু দীর্ঘতর করেছেন মাত্র, সামান্য পরিবর্তনেই এই ভাষা সংলাপের কথ্য-রীতিতে পরিবর্তিত হতে পারতো । যেমন -' দুই সপ্তাহ কাটিয়াছে । আজ শনিবার, ঘোষ সাহেব আজ কলিকাতা থেকে মেলে আসিয়া পৌঁছিবেন, গতকল্য এই মর্মে টেলিগ্রাম আসিয়াছে ।

এই দুই সপ্তাহে কিন্তু একটি কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে । দুইটি নবীন যুবক যুবতী দিনের পর দিন নিভৃতে কাব্যালোচনা করিতে থাকিলে তাহার পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে । কিশোরী ও সত্যবালা পরস্পরের প্রণয়ে মশগুল হইয়া পড়িয়াছে । তবে তাহার প্রেমনিবেদন একটু

নূতন ধরণের - মুখে কেহ কাহাকেও কিছু বলে না নূতন নূতন কবিতায় আপন আপন মনের ভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকে ।' ৮

অন্যত্র — 'বাঁকীপুরে কলেজে পড়িতাম, হিন্দুয়ানির দিকে ঝোঁকটা অত্যন্ত প্রবল ছিল । মস্তকে প্রকান্ড একটি শিখা ছিল । প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতাম । মাছটা খাইতাম, কিন্তু মাংস খাইতাম না । আমাদের মেসের বাসায় সপ্তাহে একদিন করিয়া মাংস হইত । সেদিন ম্যানেজার আমার জন্য পায়সের বন্দোবস্ত করিতেন ।' ৯

সংলাপ রচনায় প্রভাতকুমারের বৈচিত্র্য লক্ষনীয় । তাঁর গল্প উপন্যাসে বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে । চরিত্র অনুযায়ী তাদের কথ্য - ভাষারীতি অবলম্বনে প্রভাতকুমার সংলাপ রচনায় সচেষ্ট হয়েছেন । সেইজন্য সংলাপ রচনায় ভাষা নিতান্ত ঘরোয়া এবং আটপৌরে হলেও প্রায় সর্বত্রই জীবন্ত । আমাদের সাধারণ জীবনে সুউচ্চ ভাবকল্পনা অথবা আদর্শের স্থায়িত্ব অতি অল্প, জীবনাদর্শের গভীরে অবগাহন থেকে আমরা সাধারণতঃ উপরিতল সন্তরণ বিলাসী । প্রভাতকুমার মুখ্যতঃ সেই উপরিতলচারীর জীবন ব্যাখ্যাতা। তাই তাঁর ভাষাভঙ্গীতে সেই সহজ সরল সুরটি সর্বত্রই ধ্বনিত। সংলাপ রচনার কথ্য-ভাষা রীতিতে চরিত্রানুযায়ী তাদের ব্যবহৃত মুখের ভাষাকে প্রভাতকুমার প্রায়শঃই অবলম্বন করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রভাত রচনাবলী থেকে কিছু সংলাপ উদ্ধার করা গেল ।

(ক) <u>শিক্ষিত লোকের সংলাপের ভাষা ।</u>

(১) " দেখ হে - আমি বলে দিচ্ছি - তুমি শীগগিরই পসার করে তুলতে পারবে । তুমিই বারের উপযুক্ত লোক" ১০

(২) ' ডাক্তারবাবু বলিলেন, — " এ যুক্তির অবতারণা করে তুমি নিজের জাতিকে অপমান করছ । একজন ইংরেজ, সেও একজন মানুষ মাত্র । হলই বা সে রাজপুরুষ, হলই বা সে রাজজাতীয় । সে রাজপুরুষ বা রাজজাতীয় বলে কি সে গায়ে বেশী জোর পাচ্ছে ?" ১১

(৩) 'কিশোরী গলা ঝাড়িয়া বলিল, '' তোমার ত কেবল মুখই সার । প্রেমে পড় কই ? তোমার মত সুযোগ পেলে আমরা এতদিন কোন্ কালে বিয়ে থাওয়া করে ভদ্রলোক হয়ে যেতাম । তোমার হৃদয়টি পাষাণের মত কঠিন , কন্দর্পের বাণ ওতে ঠেকে ডগা ভেঙ্গে ভোঁতা হয়ে পড়ে যায় ।'' ১২

(৪) 'সতী বলিল, " আমি যাচ্ছি পড়তে। মাদাম লেভেরো বলে' একজন ফ্রেঞ্চ শিক্ষয়িত্রী আছেন, আমি রোজ দুপুরবেলা তাঁর বাড়ীতে ফ্রেঞ্চ পড়তে যাই। চলুন, সেখানে আমায় পৌঁছে দেবেন? - আপনার কোনও কাজ ত এখন নেই?" ' ১৩

(খ) অর্ধশিক্ষিত অথবা অল্প শিক্ষিত লোকের সংলাপের ভাষা।

(১) " আমি যা চাই, তা ক্রমে নিবেদন করছি। সে অনেক কথা। যদি দয়া করে শোনেন, তবে কৃতার্থ হই।" - ১৪

(২) " হ্যাঁ গো হ্যাঁ — তাই খুলেছে। একজন ম্যাষ্টার নিয়ে এসেছে। ইঞ্জিরি পাঠশালের গুরুমশায়কে নাকি ম্যাষ্টার বলে, দাশু ঘোষের চণ্ডিমণ্ডবে হুস্কুল বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম, ম্যাষ্টার বসে' দশ বারোজন ছেলেকে ইঞ্জিরি পড়াচ্ছে।'' ১৫

(গ) নিম্ন শ্রেণীর মানুষের ভাষা।

(১) ' ঝি তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, ' যেওনি মা, যেওনি। ওটা কোন জানোয়ার, জলে ভেসে এসেছে, কি হয়ত কুমীর ডাঙ্গায় উঠে গা শুকুচ্ছে। যদি কামড়ায় ত আর বাঁচবে না।" ১৬

(২) ' ভজহরি কয়েক টান তামাক টানিয়া আবার আরম্ভ করিল — " আর তাও বলি - বাড়ীতে কি আমি বসেই থাকি? তুই খাটিস আর আমি খাটিনে? তুই দুটো ক্ষুদকুঁড়ো নিয়ে আসিস বটে। কিন্তু আমি মাছ ধরে না আনলে খেতিস কি দিয়ে বল্ দেখি? এদিকে মাছ না হলে নোলা যে একেবারে খাবি খায়, একটি গেরাস ওঠেনা। মনে করি খোঁটা দেবো না, তা, তোর স্বভাবের গুণে দিতে হয়।" — বলিয়া ভজহরি ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া আবার তামাক টানিতে লাগিল।

মোক্ষদা দেওয়ালের কাছে সরিয়া বসিয়া, পা দুইটা ছড়াইয়া দিয়া নিজ হাঁটু দুইটিতে সকরুণ ভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিল, " ন্যাকা মিনসের ন্যাকামি দেখে আর বাঁচিনে! ভারি খোঁটার কাজ করেছেন কিনা! মাছ ধরে আনেন তবেই ত সংসারের সকল দুঃখুই ঘুচে গেল। কাল থেকে আমার শরীলটে খারাপ, গায়ে গতরের ব্যথায় মরে যাচ্ছি, বল্লাম মুখুজ্যেদের বাসন ক'খানা মেজে দিয়ে আয় ত! তাতে অমনি বাবুর অপমান হল! অ্যাঁ, আমি পুরুষ

মানুষ হয়ে বাসন মাজবো ?' আমি বল্লাম ,যে পয়সা রোজগার করতে পারে না সে আবার পুরুষ মানুষ কিসের ? এই ত বলেছি ! এতেই অমনি জুতিয়ে আমার মুখ ছিঁড়ে দিতে এলেন্ ! এমন লোকের হাতেও আমি পড়েছিলাম , মাগো: - উঠতে বসতে আমায় নাতি ঝাটা মারে ।" - ১৭

(গ) ' ওনার নাই পেয়ে পেয়েই ত দাদাবাবুর এত বাড় বেড়েছে । গিন্নীমা ও - সব কিছু বিশ্বেস্‌ই করে না ।'কাল রেতে বাড়ী এসনি কেন বাবা ? — একজন মাড়োয়ারী মক্কেলের মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন ছিল মা, খাওয়া দাওয়া হতে বেশী রাত হয়ে গেল তাই সেখানে শুয়ে ছিলাম । কোন দিন বা বললেন, ' থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম , অত রাত্রে ট্যাক্সি পাওয়া গেল না , তাই একজন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে শুয়ে ছিলাম ।' — দাদাবাবু যা বলবেন গিন্নীমার তাই বিশ্বেস । — অত কথায় কাজ কি, সে দিন , জান বৌদি দাদাবাবু, মোটরে করে' সেই মাগীকে কালীঘাটে আরতি দেখাতে এনেছিল । আমিও সেদিন মরতে কালীঘাটে গিয়েছি । মাগীর পরণে একখানা বেগুনী রঙের বেনারসী, হাতে মানতাসা, গলায় একজোড়া সাপে নাউলে লেকলেস, দাদাবাবু তাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে যেন কুলের কুলবধুটি ! মুখ্যে আগুন — মুখ্যে আগুন ! দেখে ত মা আমি নজ্জায় মরি ! পাছে দাদাবাবুর সাথে আমার চোখাচোখি হয়ে যায়, এই ভয়ে আমি ভিড়ের মধ্যে ঢুকেমিশিয়ে গেনু । গিন্নীমাকে এসে বনু, তা তিনি বিশ্বেসই করলে না , বল্লে দূর ! কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস । শুনলে একবার কথা ! আমি স্বচক্ষে দেখে এনু, উনি বল্লে, কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস ! বেশী কথা কি, মাগীকে পরিবার সাজিয়ে থিয়েটরে নিয়ে যায় , বক্সে নেটের পর্দ্দা টাঙিয়ে তাকে নিয়ে বসে থিয়েটর দেখে — ঘোষেদের বউয়েরা সেদিন থিয়টরে গিয়েছিল, স্বচক্ষে দেখে এসে আমায় বলেছে । আমি বল্লাম এসে গিন্নীমাকে - উনি ত হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বল্লে, ওটা চোখের ভুল । ওনার বিশ্বেস, ওনার ছেলে একবারে শিবতুল্যি — কলিকালে এমন চরিত্তির হয় না ! তাই বলছিনু বৌদি তুমি এ সময় এসে পড়েছ খুব ভাল হয়েছে - দেখ যদি সামলাতে মার ।" ১৮

(ঘ) ভদ্র গৃহস্থের মেয়েদের ~~xxxxx~~ ভাষা।

নয়। সিমলায় শীত ভারি সুন্দর

(খ) ওমা! তুমি যে অবাক্ কল্লে ভাই! তুমি কি সেই মানুষ যে আমার জিনিষ তছরূপ করবে ? তা যদি হত - তাহলে ত সবই নিতে পারতে , বিজ্ঞাপন দিতে যাবে কেন ? তা ভাই, আমায় যে বাক্স নিয়ে যেতে বলছ, তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করবেনা ? গহনার লিষ্টিও আমি এখনও তোমায় বলিনি ।" ২০

(গ)' গৃহিনী বলিলেন -" হাট খারাপ হলে মরে পর্যন্ত যায় । মানুষের বুকের মধ্যে হাট থাকে , তাই খারাপ হয় যায়। ইংরিজি ব্যামো আর কি ! সে চুলোয় যাক, তুই পড় । তারপর কি হল রে ? কোনখানটা হচ্ছিল ? ভুলেও গেলাম ছাই ।" — বলিয়া তিনি আরও কিঞ্চিৎ জর্দ্দা লইয়া মুখে দিলেন ।' ২১

(ঙ) অভিনেত্রীদের মুখের ভাষা ।

(ক)' মাথা নাড়িয়া কনক বলিল, —" বকেন কেন ? বাংলাদেশের জন্যে ত রাত্রে আপনার ঘুম হচ্ছে না । বলি ঐ বউরাণী কি 'অত্র এস্টেটের' মালিক ?" ২২

(খ)'হ্যাঁ — তারপর , আমি একটা থিয়েটারের গান গাইলাম , ইচ্ছে করে, বেছে বেছে, একটা বেশ লপেটি ধরণের, বুঝেছেন ? আমার উদ্দেশ্য ছিল — একটু টোপ ফেলে দেখা আর কি । ও মশায় ! — গান শুনে তার মুখ কান রাঙা হয়ে উঠল — গম্ভীর হয়ে বসে রইল । দেখলাম বেজায় চটেছে । বললে —'এসব গান কোথায় শিখলে ?' — আমি নেকু সেজে বললাম -'কেন, থিয়েটারে । আপনি যে থিয়েটারের গান গাইতে বললেন । আমি ছেলেবেলায় একবার থিয়েটার শুনতে গিয়েছিলাম — তাই শিখেছিলাম ।' .. ২৩

(চ) শিশুদের মুখের ভাষা।

(ক) 'এন্দনের উপক্রম করিয়া খোকা বলিল , " হাঁ আমাল্ বাবা। আমি বাবাল্ কাছে যাব ।" ২৪

(খ)' না, আপনি থায়েব । উলথনেল হোতেলে থাকেন ।" সরলা উৎসাহিত হইয়া বলিল , —" ডোঃ পোঃ কোলে বাঁশি বাদিয়ে হাওয়া গালীতে আথেন ।"' ২৫

(ছ) মুসলমানের মুখের XXXXXX বাংলা ভাষা)।

(১) " তবে সে মাগী ঠিকই কয়েছিলো। কাল, দাদাঠাউর, এক পওর রাত বাকী থাকতে, রোঁদ দিতে বেরিয়েছিনু ।দিব্যি ফুটফুটে চাঁদনী রাত। যখন গেরাম ছেরিয়ে পেরায় কোশখানেক পথ গেছি, গাজনতলার সরহদ্দের কাছাকাছি পৌঁছেছি ,তখন দেখি যে রাস্তা দিয়ে দুইজনা বিটীছাওয়া যাচ্ছে । একজন বেওয়া ,একজন সধবা । যে বেওয়া সে বুড়ী, যে সধবা সে মুখে ঘোমটা দিয়ে ছেলো, বয়সটা ঠাওর পেনু না । অত আত্রে, মাঠের পথে দুইজন বিটীছাওয়া , সাথে কেউ মরদ নেই, দেখে আমার মনে কেমন সন্দ হল । তাই বনু — এত আত্রে কে যায় ? — হাঁক দিতেই তারা থমকে দাঁড়াল । ' ২৬

(২)"কি জানি হুজুর - ওনার ছেলেপিলে ত এখানে কেউ থাকে না।তবে শুনেছি ওনার বিবি জিন্দা নেই - এক বছর হল মরেছে ।" ২৭

(৩) '' আমাদের পরশী এক মুসলমান মাস ছয় হল ইন্তেকাল করেছে । তবে একটি বেওয়া আছে , কমসিন্ আর বেশ খাপ সুরতি — তারই সঙ্গে আমি নিকা বসবার বন্দোবস্ত করেছি । তারই জন্য কিছু জেওর খরিদ করতেই এখানে আসা । কিন্তু তখন কিজানি কলকাতায় এ রকম হল্লা তা হলে আসতাম না । যা হোক এসে যে XXXX আপনাদের খেলাফতের পাহানা পেকড়েছি , তাই খয়ের , নৈলে নসীবে কি হত বলা যায়না ।" ২৮

(জ) নেশাগ্রস্ত লোকের ভাষা ।

(১) 'খগেন্দ্র যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চক্ষু খুলিয়া বলিল, " খি ?"

'' আপনি অমন XXX করছেন কেন ?"

" খেন — খি খরেছি ? "

" আপনার ভয়ানক নেশা হয়েছে । আবোল তাবোল বকছেন ।"

" খি আবোল তাবোল বকছি ? হু: ।" ২৯

(২) রমেশ তাহার পানে চাXXXX চাহিয়া বলিল , " এ কি ? আজ হেন বেশ কেন পি - পি প্রিয়ে ?সাবান পাউডার, ভেঞ্জুসা সব ফু: ফুরিয়ে গেছে ? ধোবা আসেনি ? আহা কি পরিতাপ ! কী পরিতাপ ! কিঙ্গ পরিতাপ !

একাকিনী শোকাকুলা এ রাম্নাগানে
কাঁদেন পেচার বাচ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে ।"

— বলিয়া রমেশ ধপাস করিয়া তাহার কাছে বসিয়া বলিল, 'হরিবাবু, প্রিয়ে ! আজ কেমন বন্ধু ? বল হরি — হরিবোল !" ' ৩০

(৩) ' চিঠি রাখিয়া, আর কিঞ্চিৎ পান করিয়া, গম্ভীর মুখে কি ভাবিতে লাগিল, অর্ধমুদ্রিত নেত্রে মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল — " এ চিঠি ত তুমি পাবে না মনি। খাম খানাই যে ছিঁড়ে ফেলেছি। আগেকার চিঠি মত তুমি ছনিবারে রাত বারোটায় এসে ছিবমন্দিরে কাছে দাঁড়াবে ত ? তার আছা পথ চেয়ে - দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে — শেবছেছে ক্লান্ত হয়ে বছে পড়বে — বছে বছে ক্রমে ছুয়ে পড়বে। কিন্তু সেত হায় আছবে না। অলরাইট — আমি যাব, আমি গিয়ে তোমায় বলবো —

উঠ উঠ হে সুন্দরী,
তব পদছ পচ্ছ যোগ্য নহে এ ধরণী।
তুমি কেন ধূলায় পতিত ?

তুমি চল— আমার সঙ্গে চল? ছলি ছখি, তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী হবে। হৃদয়ের ছরি - না ছুরি ? হৃদয়ের ছুরি হোয়েনা দোহাই বাবা, ছাত দোহাই তোমার।' ৩১

(ঝ) হিন্দী ভাষীদের মুখে হিন্দী সংলাপ ।

(১)' প্রকাশ্য আদালতে হাকিমকে বলিলেন —" হুজুর, দেখিয়ে তো তমাশা ! কলকত্তা সে এক উকিল আয়েহেঁ, — ন মোচ ন দাড়ী - ঔর বহস কে লিয়ে টৌকড়ি ভরকে কিতাব লে আয়েহেঁ। হুজুরকো কানুন শিখলানে মাঙ্গতেহেঁ —যেয়সে কি হুজুরকো কানুন মালুম নেহি হায় !" ৩২

(২) " বহুত আচ্ছা —, বহুত আচ্ছা। মৎ পী - গাঁজা মৎ পী - তু অভি বাচ্চা হ্যায়। গাঁজা পিয়েগা তো পাগল হো যায়েগা - মর যায়গা। ভাঙ্গ পী — গাঁজা মৎ পী। ভাঙ্গ আচ্ছা হ্যায়। ' ভাঙ্গ পিয়ে মৌজ করে বনা রহে অবধূত' —ইয়ে কবিৎ হ্যায়। যব তেরা চালিশ বরষ কা উমর হো - তব গাঁজা পী, অভি ভাঙ্গ পী।" ৩৩

(৩) " ভাঙ্গ নেহি পীতা হ্যায় ! তব শুনু, এক কবিৎ শুনু —

জিস্‌নে ইস দুনিয়ামে আ - কর্ -একদিনভি পিয়ে ন ভাঙ্গ,

উসনে সচ শ ছোতো ক্যা দেখা জানাহকা আবুঙ্গ ?
সমঝা ? নেহি সমঝা ? জিস্‌নে ইস দ নিয়ামে আ কর্ ইয়ানে জনম্ লে কর্, একদিনভি ভাঙ্গ নেহি পী লিয়া উসনে জাহানকা - জাহান্ কহতেহেঁ দুনিয়াকো — ফার্সী হায় - উসনে দ নিয়াকা রং ঢং ক্যা দেখী ? ক ছ নেই দেখা ।" — ৩৪

(৪) "হ জ র — পাত্থলসে মহাবীর সিংকা কপার ফোড় দিহিস হে ।" ৩৫

(৫) " রোজ সবেরে, ছোটা হাজরী খাকে, একঠো বেগ লেকে বাহর হোতেহেঁ। ফির এগারো বারো বাজে আতেহেঁ । ফির দো তিন বাজে বাহর যাতেহেঁ, রাত সাত আঠ বাজে আতে হ্যায় ।" ৩৬

(৬)" ক্যা জানে ভাই ।একঠো গালি হোগা । সাহেব লোগকো দেখনেসেই আজকাল লেড়কালোগ ঐ বাৎ বোল্‌তা হায় ।" ৩৭

(ঞ) অহিন্দীভাষীদের ম খে অশ দ্ধ হিন্দী সংলাপ ।

(১) কর্তা বলিলেন,'' ক্যা হ য়া রে শালা ? তোর বাবার সাপ ?" ৩৮

(২)' একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন , " মহেন্দ্রবাব উকীলকা বাসা জানতা" ৩৯

(৩)' পৈরাগকে ~~xxxxx~~ কঙ্কলাল জিজ্ঞাসা করিল, ''এ জি, নিকটমে কোথাও চায়ের দোকান হ্যায় ? " ৪০

(৪)'বলিয়া তখনও কাতরাইতেছে দেখিয়া বলিলাম, " এজী! ত মারা পিঠমে একট হাত ব লায় দেগা ?" ৪১

(৫)' গৃহিনী ছ করীলালকে বলিতেছেন , " ত মকো এৎনা করকে বোলতা হায়, হামলোগ বাহার যানেসেই পাংখা বন্ধ কর্ দিও, ত মারা হঁ স নেই হোতা হায় ! দেখোতো সাঁঝসে রাত এগারো বাজেতক পাংখাঠো চলা , ~~xxx~~ ইস্কা লোকসান কৌন দেগা ?" ৪২

(ট) অবাঙ্গালীর ম খে বাংলা সংলাপ ।

(১)' নায়েক - বাব নায়েক। ~~xxxxxxxxx~~ পাঁচকৌড়ি বাব গাঁজা খেয়ে ভারি গালাগালি ~~xxx~~ দিয়েছে । আজকার বাস্‌স মতী - বিয়োম কান্ড হল বাব - বাস্‌স মতী" - ইত্যাদি ৪৩

(২() সাহেব আম খাইতে খাইতে বলিল, " কুছু না ।" ৪৪

(৩) চেয়ার খানিতে একবার এপাশ একবার xxxx ওপাশে হেলিয়া বলিল,— " হামি বাংলা ভালু বলিতে পারে না, থোড়া থোড়া বুঝিতে পারে" লোকটি বলিল, না মোহাশে, হামি মান্দ্রাজী আছে । লেকিন , হামারা মেমসাহেব বাঙ্গালী আছে ।" ৪৫

(৪)' পল দুই কর্ণ অবধি দন্তপুঙ্ক্তি বিকাশ করিয়া কহিল , "বোলো — বোলো — তুমি লোগ বাঙ্গালাতেই কথা বলো । হামি বুঝিতে পারে, বলিতে পারেনা। " ৪৬

(৫)' পুলিশ সাহেব তাঁহার মেমকে হাসিতে হাসিতে কি বলিতেছিলেন , রামরতনের ক্রন্দন ও দোহাই শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন , " এ xxx বুঢ়া টুমি ভয় করিও না ।কেহ টোমায় মারিটে পারিবে না। (পশ্চাৎ ফিরিয়া) বাবুলোগ, টোমরা সব চুপচাপ আপন আপন গৃহে গমন কর। বে - আইন জনটা করিলে গ্রেফটার হইবে।" ৪৭

(ঠ) পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় সংলাপ ।

(১)' ডাক্তার সাহেবের প্রস্তাবটা শুনিয়ে সারেঙ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিল, বলিল , '' ইষ্টীম লান্‌ছো ডুববে কেন কত্তা ? আর আধঘন্টা পৌণে ঘন্টায় কলকাত্তায় পৌঁছায়ে দিমু" ৪৮

(২)' নাগরিক ব্যক্তি উত্তর করিল -" আমার পছন্দ হয় , বাবুর জ্যাল হইছিল , আজ খালাস হইছে । আজকাল দেহি বাবুদের জ্যাল থেহে খালাস হইলে এই রকমডা করে ।" ৪৯

(৩)' মুসলমানটি বলিল , " ঠাউর সেলাম । আপনি ত হেঁদুদের সাধু , আপনি কন্ ত । আমি এই ভেড়াটি আপনার পুতের মত পেলেছি পুষেছি । নিজে না খেয়ে ওকে খাওয়াইয়েছি ।খাইয়ে এত বড়টা করেছি । আমার পেয়ারের জানোয়ার, আমি xxx দিমু কেন হুজুর? নিয়ে গিয়ে ওকে জবা করবে !" ৫০

প্রভাতকুমারের সর্বত্রই চরিত্রানুগ সংলাপ রচনার প্রয়াস লক্ষ্যনীয় । শিক্ষিত ব্যক্তির কথ্য ভাষা এবং অশিক্ষিতের ভাষা একই ভূখন্ডের অধিবাসী হলেও এক হতে পারে না । আবার সম্মাননীয় অথবা শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনে অশিক্ষিতের মুখেও যে কিছু শিক্ষিত

ব্যক্তির ভাষা অথবা সাধু ভাষা ব্যবহৃত হয় সেই বিশেষ ভাষা ভঙ্গিটিও তাঁর রচনায় উদ্ধার করেছেন। অবাঙ্গালীর মুখে বাংলা ভাষা উচ্চারণে যে বিচিত্র রূপ গ্রহণ করে অথবা স্থল বিশেষে বাংলা সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ তাঁরা কথ্য ভাষাতেও ব্যবহার করেন - প্রভাতকুমারের সংলাপ রচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায় । চরিত্রানুসারে কিছু কিছু বিশুদ্ধ হিন্দী সংলাপ তাঁর রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে এমনকি আঞ্চলিক হিন্দী ভাষাও সংলাপে স্থান পেয়েছে। প্রভাতকুমার বিহার প্রবাসে বহুদিন কাটিয়েছেন, স্বভাবতই হিন্দী ভাষার উপর তাঁর আধিপত্য জন্মেছিল তাই হিন্দীতে সংলাপ রচনায় তাঁর পক্ষপাতিত্ব এবং কৃতিত্ব সমধিক পরিলক্ষিত হয় । পাহারাদার অথবা পুলিশ কনেস্টবলের মুখে যে হিন্দী ভাষা উচ্চারিত হয়েছে তার সঙ্গে একজন মৈথিলী পন্ডিত অথবা শিক্ষিত হিন্দীভাষীর হিন্দী এক হয়ে উঠতে পারেনি । আবার একজন বাঙালীর মুখে উচ্চারিত হিন্দী এবং মাদ্রাজ অথবা মাড়োয়ারবাসীর মুখের হিন্দীতে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । শিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত বাঙালীর দ্বারা প্রায়শঃই ইংরাজী ভাষা ব্যবহার একটি বিশেষ কথ্যরীতি - প্রভাতকুমার এই ধরণের চরিত্রের সংলাপে সেই রীতি অনুসরণ করেছেন । তাঁর সংলাপরচনার কথ্যরীতি মূলত: কলিকাতা কেন্দ্রিক কথ্যভাষা অবলম্বনে গঠিত ।

সংলাপ রচনায় প্রভাতকুমার যেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন তেমনি তাঁর বাক্যগঠন রীতির বিচিত্রতাও লক্ষনীয় ।ক্রিয়াপদের কৌশলপূর্ণ ব্যবহারে অর্থাৎ বাক্যে নির্দিষ্টস্থানে ক্রিয়াপদের অবস্থিতি না ঘটিয়ে বাক্য-মধ্যে তাদের স্থান পরিবর্তন কখনও বাক্যে ক্রিয়াপদকে উহ্য রেখে আবার কখনও হ্রস্ব ক্রিয়াপদের ব্যবহারে বাক্যের গঠন ভঙ্গী সাবলীল হয়ে ওঠে এবং বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয় । ভাবানুষঙ্গিক সার্থক শব্দচয়ন এবং বিশেষণ প্রয়োগের রীতি বর্ণনীয় বিষয়কে সুপরিস্ফুট করে । বস্তুত: বাক্যমধ্যে এই সকলের সার্থক প্রয়োগের উপর লেখকের কৃতিত্ব নির্ভরশীল।প্রভাতকুমারের বিভিন্ন সময়ের রচনা থেকে সেই পরিচয় নেওয়া যেতে পারে ।

(ক)'সেই ঘরের পশ্চাতেই বারান্দা । বারান্দার নিম্নেই একটা প্রকান্ড দীর্ঘিকা । জল বড় নির্মল , মন্দাকিনীর শরীর বড় উত্তপ্ত , পিপাসায় কন্ঠাগত প্রাণ ।ঝিকে বাজার করিতে পাঠাইয়া মন্দাকিনী স্নান করিতে লাগিল । তখনও সে যথেষ্ট বিশ্রাম করে নাই, গায়ের ঘাম পর্য্যন্ত মরে নাই । যতক্ষণ ঝি ফিরিলনা , ততক্ষণ - আধঘন্টা হইবে , - মন্দা জলে পড়িয়া রহিল । ঝি আসিলে উঠিয়া মাথা গা মুছিয়া রান্না চড়াইয়া দিল ,' ৫১ ('বউচুরি'-প্রকাশ কাল ১৩০৭)

এখানে কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমেই লেখক মন্দাকিনীর উৎকন্ঠিত প্রাণের পরিচয় এবং অবিবেচনা প্রসূত কার্য্যকলাপের বর্ণনার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। বাক্যগঠন প্রনালী এবং ভাব প্রকাশের জন্য শব্দ চয়ন লক্ষনীয়। প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে। চতুর্থ বাক্যে অসমাপিকা এবং সমাপিকা উভয় বিধ ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত এবং বাক্যের শেষে সমাপিকা ক্রিয়ার অবস্থান। পঞ্চম বাক্যে ক্রিয়াপদের স্থান পরিবর্তন ঘটেছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে বাক্যের বিরতি ঘটেছে, ফলত: বক্তব্য বিষয়ে একঘেয়েমি এসে শ্রুতিকটু হতে পারে নাই। যতি বিন্যাসের কৌশলে জটিল বাক্যের কাঠিন্য অপসারিত। বাক্যে তৎসম তদ্ভব শব্দগুলিও অতি পরিচিত। সাধু ভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষার শব্দের (মাথা, গা ইত্যাদি) মিশ্রণ ঘটিয়ে বাক্য সরলীকৃত হয়েছে। বাক্যমধ্যে বিশেষণের স্বল্প প্রয়োগও লক্ষণীয়। সমস্ত বাক্যগুলির মধ্যে একটি মাত্র শব্দ (কন্ঠাগত) সন্ধিযুক্ত হয়েছে।

অন্যত্র —

(খ) ' পৌষমাস। ঠিক সন্ধ্যার সময় এক ব্যক্তি কালীঘাটের ট্রাম হইতে ভবানীপুর থানার সম্মুখে নামিয়া পড়িল। তাহার মাথায় আলবার্ট টেরি, গায়ে একজোড়া বাদামী রঙের শাল, পায়ে ফুলমোজার উপর পাম্প-সু, হাতে একগাছি রূপা বাঁধানো বেতের ছড়ি। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হইবে।

তাহার পর প্রায় দশ মিনিটকাল পদচালনা করিয়া লোকটি প্রাসাদোপম এক বৃহৎ বাসভবনের বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিল, " বাবু হায় ?" ' ৫২

(বাল্যবন্ধু প্রকাশকাল, অগ্রহায়ণ- মাঘ, ১৩১৯)

ব্যক্তি বিশেষের সৌখিন মনোভাব পরিহিত পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনায় এখানে আভাসিত। এখানেও দেখা যায় প্রথম বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যের শেষে সমাপিকা ক্রিয়ার অবস্থান, তৃতীয় বাক্যে ক্রিয়ার পদ উহ্য চতুর্থ এবং পঞ্চম বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদের অবস্থিতি ঘটেছে। ক্রিয়াপদের ব্যবহারের এই কৌশল বাক্যকে ক্লান্তিকর করেনি। শব্দচয়নে দেখা যায় প্রচলিত তৎসম তদ্ভব ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে বিদেশী শব্দের (আলবার্ট, পাম্প-সু, ফুলমোজা ইত্যাদি) যথেচ্ছ ব্যবহার আমাদের কথ্যভাষারীতিকে স্মরণ করায়। সাধারণত: সংযোজক অব্যয় দিয়ে যৌগিক বাক্য গঠন করা হয় কিন্তু এখানে তৃতীয় বাক্যে কোন সংযোজক অব্যয় ব্যতীত, যতি বিন্যাসের অভিনবত্বে যৌগিক বাক্য গঠিত হয়েছে।

(গ) ' ঘোর অন্ধকার । কিন্তু নিনা কিছুমাত্র ভীত হইল না। এ সুড়ঙ্গপথ তাহার পরিচিত - অভ্যস্ত তবে মুস্কিল এই যে, পথটি আগাগোড়া সরল নহে , মাঝে মাঝে বাঁক আছে । প্রথম বাঁকে আসিয়াই, পাথরে নিনার মাথা ঠুকিয়া গেল — কিন্তু তাহা সে গ্রাহ্য করিল না । সেই গুরুভার পৃষ্ঠে বহন করিয়া , বহু ক্লেশে ক্রমে সে নিজ শয়ন গুহায় আসিয়া পৌঁছিল । আন্দাজে আন্দাজে কিশোরীকে আপন শয্যায় শোয়াইয়া দিয়াই, শয়ন - গুহা হইতে অপর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, বাহিরের কবাট উন্মুক্ত করিয়া দিল । হু হু করিয়া হিমালয়ের রাশি রাশি ঠান্ডা তাজা হাওয়া ভিতরে ছুটিয়া আসিল।' ৫৩

('সত্যবালা'- অষ্টম পরিচ্ছেদ - প্রকাশকাল ১৩৩১)

এখানে প্রথম বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ উহ্য কিন্তু পরবর্তী বাক্যগুলিতে বাক্য-শেষে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হলেও শ্রুতিকটু হয়ে ওঠেনি । যতি বিন্যাসের ফলে জটিল বাক্যগুলিকে সরল বলেই মনে হয় । সাধু ভাষার সঙ্গে 'বাঁক' 'ঠুকিয়া' ইত্যাদি কথ্য ভাষার মিশ্রিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ।

বিভিন্ন সময়ে রচিত প্রভাতকুমারের রচনার অংশবিশেষের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় বাক্য বিন্যাসে সরলতার দিকে মনোযোগই তাঁর সমধিক। বাক্যে সন্ধি-সমাসের জটিলতা যথাসম্ভব পরিহার করে, পরিচিত তৎসম , তদ্ভব , আরবী ফার্সী - ইংরাজী ইত্যাদি বিদেশী শব্দকে আশ্রয় করে, বিশেষণ এবং অলংকারের সীমিত প্রয়োগে তাঁর বাক্য গঠন রীতি সংযত এবং সরল হয়ে উঠেছে ।

নায়ক নায়িকার চিত্তের ভাবপ্রকাশের আনুষঙ্গিক অথবা নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতির রূপ বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে একটি প্রথাগত রীতি । কোন কোন সাহিত্যিক আবার প্রকৃতির অন্তরালে মানবজীবন দর্শনের সন্ধান করেছেন , প্রকৃতির রহস্যময়তায় অনেকে অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন। প্রভাত সাহিত্যে নিসর্গ চেতনা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নাই । প্রভাত-রচনায় প্রকৃতির প্রতি রূপমুগ্ধতা অথবা লেখক মনের বিভোরতায় বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না ।রবীন্দ্রনাথ অথবা পরবর্তীকালের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় প্রকৃতির অন্তরালে যে গভীর মানব জীবনদর্শন ব্যাখ্যাত হয়েছে প্রভাতকুমারের এই দর্শন উপলব্ধি অথবা প্রকৃতির নিগূঢ় সৌন্দর্য বর্ণনার চিত্রও বিরল। তাঁর রচনায় ইতস্তত: ভাবে প্রকৃতির যে বর্ণনা পাওয়া যায় সে সমস্ত প্রায়শই বর্ণিত চরিত্রের ভাব প্রকাশের আনুসঙ্গিক উপকরণ হয়ে দেখা দিয়েছে । স্থলবিশেষ প্রকৃতির নিছক রূপ বর্ণনাই লেখকের উদ্দেশ্য হয়ে দেখা দিয়েছে । প্রভাতসাহিত্য থেকে প্রকৃতি বর্ণনার কিছু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে ।

(ক)' কুসুমের পরিহিত বসনখানি জলসিক্ত পৃষ্ঠলম্বিত ঘন কৃষ্ণ

কেশরাজির প্রান্ত দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছ, আর্দ্র মুখখানি XXX প্রভাতের সোণালি রৌদ্র লাগিয়া প্রতিমার মত চিক্ চিক্ করিতেছে। দেখিয়া মানিক হৃদয় হারাইল।

ইহারা চলিয়া গেলেপর মাণিক তাহার অন্তরে যেন এক অপূর্ব আলোকের রশ্মি প্রতিভাত দেখিল। সে আলোক তাহার মনোদেহের XX প্রতি পরমাণুটিকে যেন XXX বেড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আলোক মন অতিক্রম করিয়া ক্রমে তাহার চক্ষুযুগলে আসিয়া উপনীত হইল এবং নিমেষের মধ্যে নিখিল বিশ্বচরাচরে ছড়াইয়া পড়িল। সেই নবীন আলোকে মাণিক আকাশের পানে চাহিল — আকাশ আশ্চর্য্য নীল — এমন কখনও দেখে নাই। - বসুন্ধরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, বসুন্ধরা আজ পরমা সুন্দরী। দূXXX দূরে দীর্ঘিকাতীরে ঘুঘু ডাকিতেছে - উক্ষু পাখী পাখি কলরব করিতেছে, বউ - কথা - কও মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিতেছে, পাখীর ভাষায় যেন আজ নূতন প্রাণ, নূতন সুর। মাণিক নিশ্বাস ফেলিয়া, গাছ হইতে নামিয়া আসিল।' ৫৪

(খ) 'তখনও আলোকের পরিমাণ একান্ত অল্প। বাগানে দেশী বিলাতী অনেকগুলি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে — দূরের ফুল তখনও ভাল XX নজর হয় না। তাহাদের মিশ্রিত সৌরভটুকু অনুভব করা যায় মাত্র।' ৫৫

(গ)' ঈষৎ বায়ুসঞ্চারে গঙ্গাবক্ষ তরঙ্গায়িত। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর রৌদ্র পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। ওপারে একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। দুই একখানি জেলে নৌকা নাচিতে নাচিতে অনেক দূর দিয়া চলিয়া গেল,' ৫৬

কেবলমাত্র কথোপকথনের ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র সাধু ভাষার সঙ্গে কিছু কিছু কথ্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। বর্ণনায় সাধুভাষা এবং সংলাপ অংশে কথ্যভাষা প্রয়োগের দ্বারা রচনা শুরু করলেও প্রধানত: ১৯১৫ সালে 'ঘরে - বাইরে' উপন্যাস রচনার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনারীতিতে কথ্য ভাষাই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রভাতকুমার কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত রচনারীতির বর্ণনা অংশে সাধুভাষা এবং কথোপকথনে কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। শরৎচন্দ্রও তাঁর উপন্যাস রচনায় এই রীতিই অবলম্বন করেছেন। এই রচনারীতিই মূলত: XX বাংলা গল্প - উপন্যাস রচনায় অনুসৃত হয়েছে। এমনকি আধুনিককালের X ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর গল্প উপন্যাসে এই রচনারীতির আশ্রয় নিয়েছেন।

প্রভাতকুমারের দৃষ্টি ছিল সরলতা এবং ভাবসমৃদ্ধি অনুশীলনের দিকে, ভাষার X ঐশ্বর্যবিধান অথবা XXXX রূপরচনায় নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রী-র

রূপ বর্ণনা অথবা রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'দুরাশা' ইত্যাদি গল্পের ভাষার চিত্র সৌন্দর্য প্রভাতকুমারের রচনায় হয়ত তেমন পাওয়া যায় না, কিন্তু সীমিত বাক্য বিন্যাসে, অনাড়ম্বর সরল ভাষায় হৃদয়ের আর্তি প্রকাশের পারঙ্গমতা প্রভাত-সাহিত্যে অবিরল। তাঁর 'দেবী', 'ফুলের মূল্য', 'কাশীবাসিনী', 'আদরিণী' ইত্যাদি গল্পে, 'রত্নদীপ', 'জীবনের মূল্য' ইত্যাদি উপন্যাসে সেই পরিচয় আছে।

বাংলা গদ্য ভাষা গঠনে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যে স্বতন্ত্র মনোযোগ দিয়েছিলেন প্রভাতকুমারের চিন্তায় সেই বিশেষ মনোযোগ হয়ত নাই কিন্তু কাহিনীর সহজ প্রকাশে প্রয়োজনীয় যে ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন সেই ভাষা তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব স্পর্শে স্বতন্ত্র।

উল্লেখ পঞ্জী।

১। বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য - সুকুমার সেন পৃ: ৮৬

২। বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক - প্রমথনাথ বিশী পৃ: ২০৪

৩। রত্নদীপ - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রভাত গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড) - শ্রীভবন প্রকাশিত - পৃ: ৩৭৮

৪। গৃহদাহ — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ (সপ্তম সম্ভার) - এম.সি.সরকার এণ্ড সন্স পৃ: ২৩৩

৫। ঘরে বাইরে — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। - রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড) - জন্মশতবার্ষিক সং পৃ: ৫৪৭ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

৬। পত্নীহারা — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — প্রভাত গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড) - শ্রীভবন প্রকাশিত পৃ: ১১১

৭। পত্নীহারা — ঐ — ঐ — ঐ — ঐ - পৃ: ১১৯

৮। সত্যবালা — ঐ — ঐ — (সপ্তম খণ্ড) — ঐ — পৃ: ৩৩৬

৯। আধুনিক সন্ন্যাসী — ঐ — ঐ — (তৃতীয় খণ্ড) — ঐ — পৃ: ৩৩

১০। উকিলের বুদ্ধি ঐ - প্রভাত গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড) - শ্রীভবন প্রকাশিত - পৃ: ৬৯

১১। হাতে হাতে ফল - ঐ ঐ (ঐ) — ঐ - পৃ: ৯২

১২। সত্যবালা — ঐ ঐ (সপ্তম খণ্ড) — ঐ - পৃ: ৩৫৫

১৩। সত্যবালা ঐ ঐ (ঐ) — ঐ - পৃ: ৩৭৮

১৪। সারদার কীর্তি - ঐ ঐ (দ্বিতীয় খণ্ড) — ঐ - পৃ: ২২

১৫। মাষ্টার মহাশয় - ঐ ঐ (চতুর্থ খণ্ড) — ঐ - পৃ: ১৭১

১৬। রত্নদীপ ঐ ঐ (তৃতীয় খণ্ড) — ঐ - পৃ: ৩০৮

১৭। প্রেম ও প্রহার ঐ ঐ (সপ্তম খণ্ড) — ঐ - পৃ: ৫৯

১৮। আরতি - ঐ ঐ (ঐ) - ঐ - পৃ: ১৭০ ১৭১

১৯। বন্য শিশু ঐ ঐ (দ্বিতীয় খণ্ড) - ঐ - পৃ: ৪৯

২০। গহনার বাক্স - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভাত গ্রন্থাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) শ্রীভবন প্রকাশিত - পৃঃ ১৪৩
২১। জীবনের মূল্য - ঐ - ঐ - (চতুর্থ খণ্ড) ঐ - পৃঃ ৩৩৬
২২। রত্নদীপ - ঐ - ঐ - (তৃতীয় খণ্ড) ঐ - পৃঃ ৩০৩
২৩। রত্নদীপ - ঐ - ঐ - (ঐ) ঐ - পৃঃ ৩২৮
২৪। খোকার কাণ্ড - ঐ - ঐ - (চতুর্থ খণ্ড) ঐ - পৃঃ ১৩
২৫। নীলু দা - ঐ - ঐ - (ঐ) ঐ - পৃঃ ১৩৫
২৬। রত্নদীপ - ঐ - ঐ - (তৃতীয় খণ্ড) ঐ - পৃঃ ২৬৯
২৭। লেডি ডাক্তার - ঐ - ঐ - (চতুর্থ খণ্ড) ঐ - পৃঃ ১০৩
২৮। সতীর পতি - পৃঃ ঐ - পৃঃ ২৩
২৯। রত্নদীপ - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় - ঐ - (তৃতীয় খণ্ড) ঐ - পৃঃ ৪৯০
৩০॥ মনের মানুষ - ঐ - ঐ - (তৃতীয় খণ্ড) ঐ - পৃঃ ৩৫৮
৩১। পোস্ট মাস্টার - ঐ - প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প - জগদীশভট্টাচার্য - পৃঃ - ২০৩ - ২০১
৩২। স্বর্ণ সিংহ - ঐ প্রভাত গ্রন্থাবলী - (তৃতীয় খণ্ড) শ্রীভবন প্রকাশিত - পৃঃ ৪৪
৩৩। নবীন সন্ন্যাসী - ঐ - ঐ - (দ্বিতীয় খণ্ড) ঐ - পৃঃ ৪৭৩
৩৪। ঐ - ঐ - ঐ - (ঐ) ঐ - পৃঃ ৪৭৩
৩৫। নিষিদ্ধ ফল - ঐ - ঐ - (ষষ্ঠ খণ্ড) ঐ - পৃঃ ১৮
৩৬। সিন্দুর কৌটা - ঐ - ঐ - (পঞ্চম খণ্ড) ঐ - পৃঃ ১৪৬
৩৭। খালাস - ঐ - ঐ - (তৃতীয় খণ্ড) ঐ - পৃঃ ১১১
৩৮। বাস্তু সাপ - ঐ - ঐ - (দ্বিতীয় খণ্ড) ঐ - পৃঃ ১৩৩
৩৯। বলবান জামাতা - ঐ - ঐ - (ঐ) ঐ - পৃঃ ১৭৫
৪০। মনের মানুষ - ঐ - ঐ - (ষষ্ঠ খণ্ড) ঐ - পৃঃ ২৬৯
৪১। রেলে কলিসন - ঐ - ঐ - (সপ্তমখণ্ড) ঐ - পৃঃ ৩১২
৪২। মনের মানুষ - ঐ - ঐ - (ষষ্ঠ খণ্ড) ঐ - পৃঃ ৩৪৪
৪৩। গহনার বাক্স - ঐ - ঐ - (ঐ) ঐ - পৃঃ ১১৯
৪৪। আম্র তত্ত্ব - ঐ - ঐ - (ঐ) ঐ - পৃঃ ১৪৭
৪৫। সিন্দুর কৌটা - ঐ - ঐ - (পঞ্চম খণ্ড) ঐ - পৃঃ ১৪৭
৪৬। ঐ - ঐ - ঐ - (ঐ) ঐ - পৃঃ ১৫১
৪৭। বাজীকর - ঐ - ঐ - (ষষ্ঠ খণ্ড) ঐ - পৃঃ ২১৩
৪৮। মনের মানুষ - ঐ - ঐ - (ঐ) ঐ - পৃঃ ৩০৮
৪৯। খালাস - ঐ - ঐ - (তৃতীয় খণ্ড) ঐ - পৃঃ ১৩০
৫০। রত্নদীপ - ঐ - ঐ - (ঐ) ঐ - পৃঃ ৪৬২
৫১। বউচুরি - ঐ - ঐ - (দ্বিতীয় খণ্ড) ঐ - পৃঃ ১৫
৫২। বাল্য বন্ধু - ঐ - ঐ - (সপ্তম খণ্ড) ঐ - পৃঃ ৪৩১

৫৩। সত্যবালা – প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়–প্রভাত গ্রন্থাবলী (সপ্তম খণ্ড)–শ্রীভবন প্রকাশিত – পৃ: ৪৩৪

৫৪। প্রণয় পরিণাম – ঐ – ঐ – (দ্বিতীয় খণ্ড) – ঐ – পৃ: ১০৩

৫৫। গুরুজনের কথা – ঐ – ঐ – (দ্বিতীয় খণ্ড) – ঐ – পৃ: ২০১

৫৬। ঐ – ঐ – ঐ – (ঐ) – ঐ – পৃ: ২০২

X